হরপ্রসাদ-রচনাবলী

প্রথম সম্ভার

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

হরপ্রসাদ-রচনাবলী

॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের
সমগ্র বাঙ্গালা রচনার সংগ্রহ ॥

সম্পাদক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল
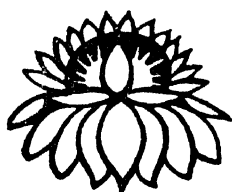
ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী

বুক্‌স্ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্‌স্

সূচী

---

* প্রবন্ধটীর শিরোনাম 'বাঙ্গালার সাহিত্য' এইরূপ ছাপা হইয়াছে, হইবে 'বাঙ্গালা সাহিত্য'।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নিবেদন

পরমকরুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র প্রথম সম্ভার প্রকাশিত হইল। পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুদীর্ঘ জীবন কেবল বাগ্‌দেবীর উপাসনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ন্যূনপক্ষে ষাট বৎসর ধরিয়া জ্ঞানতপস্বী পিতৃদেব ক্রমাগত বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণা ছিল মৌলিক ও বহুমূল্যবান্, তাঁহার জিজ্ঞাসা ছিল বহুমুখী, তাঁহার মেধা ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ, এবং তাঁহার ভাষা ছিল গম্ভীর, সুতেজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে এই প্রবন্ধ-রাজির মূল্য অপরিমেয় এবং তাঁহার লেখাগুলি এখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট সম্পদ্ ও গর্বের বস্তু। ৺পিতৃদেবের তিরোধানের পর তাঁহার সযত্নরচিত লেখাগুলিই এখন তাঁহার দুর্লভ বিভূতির একমাত্র নিদর্শন, কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

বিশেষ লজ্জার কথা যে আমরা পূজনীয় পিতৃদেবের বাঙ্গালায় লিখিত রচনাবলী প্রকাশ করিতে পারি নাই। এইরূপ বহুব্যয় ও বহুপরিশ্রমসাধ্য কার্য্য আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য নানা হিতৈষীর অনুরোধ সত্ত্বেও আমরা তাঁহার রচনাবলী সঙ্কলন করিবার বা ছাপাইবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারি নাই।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশে ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে নৈহাটীতে আমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য আসেন। প্রিয়দর্শন, লক্ষ্মীর বরপুত্র, "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী"র ন্যায় তিনি ৺পিতৃদেবের বাঙ্গালা লেখমালাকে রাজোচিত মর্য্যাদা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বর্গত পিতৃদেবের পঞ্চপুত্রের মধ্যে আমরা এখন তিন ভ্রাতা জীবিত আছি। বলা বাহুল্য, আমরা তিন ভাই, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য এবং আমি শ্রীমান প্রিয়দর্শীর প্রস্তাব সানন্দে অভিনন্দন করি এবং যথারীতি অনুমোদনপত্র লিখিয়া দিই। সেইসূত্রে এক্ষণে 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র প্রথম সম্ভার প্রকাশিত হইল। পরে আরও দুই বা তিন সম্ভারে সমগ্র লেখমালা সমাপ্ত হইবে।

বিধিলিপির নির্বন্ধে আমরা পুত্র হইয়াও এইরূপে পিতৃতর্পণের পুণ্য অর্জন করিতে অক্ষম হইলাম। আমাদের হইয়া পুণ্যশ্লোক স্নেহভাজন শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী পিতৃতর্পণের

পুরোহিত হইলেন। তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক অতঃপর নিবিড়তর হইল। ইহাতে আমাদের কোন দুঃখ নাই, বরং ৺পিতৃদেবের ন্যায় অর্বাচীন ঋষির মহামূল্যবান্ লেখরাজি যে বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে আমাদের জীবদ্দশাতেই রক্ষা পাইল, তাহা চাক্ষুষ করিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী আমাদের সকলকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সমগ্র 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' সম্পাদনের গুরুভার লইয়াছেন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রথম সম্ভারের ভূমিকাও তিনি লিখিয়াছেন। পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। এই বৃহৎকায় রচনাবলীর সম্পাদনকার্য্যে সুনীতিবাবু যে অমূল্য সময় ব্যয় করিয়াছেন, যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা সকলে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং তাঁহাকে হার্দ্দিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সুনীতিবাবু এই পুণ্যকার্য্যের জন্য যে স্বর্গত পিতৃদেবের আত্মার আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীমান্ অনিল কাঞ্জিলাল 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র সঙ্কলনে ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন। সেজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী ও বিদ্যোৎসাহী যুবক বাঙ্গালাদেশে কদাচিৎ নজরে পড়ে। অপরাপর যাঁহারা পুস্তক প্রকাশে সহযোগ দিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের উদ্দেশে এই বহুব্যয়সাধ্য পুস্তক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত হইল, সেই বঙ্গভাষাভাষী পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'কে যেন স্নেহের চক্ষে দেখেন। যদি রচনাবলী প্রকাশ করিয়া শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষোভের আর অন্ত থাকিবে না।

৺পিতৃদেবের ইংরাজী প্রবন্ধগুলি কবে যে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে সেই শুভদিনের আশায় বসিয়া রহিলাম।

শাস্ত্রী ভিলা
নৈহাটী
৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে—
শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বালক-কালে মাণিকতলায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে আমার যাওয়া-আসা ছিল। গাম্ভীর্য্যে বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর বুদ্ধি-উজ্জ্বল সহজ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কাছে নিজের জোরে প্রশ্রয় দাবী করিনি, তিনি স্নেহ ক'রে আমায় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে আমি তাঁরই কাছে শুনেছিলেম। অনুভব ক'রেছিলেম শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সহযোগিতা ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে বিশেষ ভাবে আদর ক'রেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task ; and he did his work to my full satisfaction.

এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হ'য়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হ'য়ে উৎকর্ষলাভ ক'রেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ ক'রতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত ক'রতে পারেন না ; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ ক'রতে শেখেননি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, সে যুগে

বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চ্চাও শিথিল। ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাক্‌লেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজ হ'য়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠ্‌ল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধ'রে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা ক'রেছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ ক'রে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে ক'রতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট ক'রতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক্, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখ্‌তে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন

তিনি অধিকার ক'রেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে গেছেন, এবং অতীত কালকে যিনি ধন্য ক'রেছেন ভাবী কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ ক'রবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট লেখকগণের নিকট থেকে ভারত-তত্ত্ব-বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে লেখমালাগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবিত-কালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বা'র হ'য়েছিল। তাঁর পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পরে এখন এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই সাধু কার্য্যের দ্বারা পরিষৎ যে আদর্শ দেখালেন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তা সার্থক হোক্।

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা
দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বচন

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্ম্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনী-শক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনী শক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙ্গিতে পারে—যেমন মাতাইতে পারে—তেমনি ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে, তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বতঃপ্রসারী এবং সর্ব্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্‌গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশই দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায়

তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার-স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ইতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

[ইংরেজী ১৯২১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে উপরে উদ্ধৃত "আশীর্ব্বচন" পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ হইতে 'তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা' ও 'তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য' ইংরেজী ১৯৩১ সালের ১৬ই মে তারিখে 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন' হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং দেশের মুখ্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরে প্রচারিত ঐ পরামর্শ-সভার আমন্ত্রণ-লিপিতে তাঁহারও স্বাক্ষর ছিল। সংবর্দ্ধনা-উৎসবের ব্যবস্থাদি করিবার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া এই অধিবেশনে "রবীন্দ্র-জয়ন্তী-পরিষদ্" গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব শুরু হয় ২৫এ ডিসেম্বর (১৯৩১), এবং চলে বারো দিন ধরিয়া। তাহার পূর্ব্বেই, ১৭ই নভেম্বর তারিখে, শাস্ত্রী মহাশয় দেশবাসীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়া যে মান-পত্র পাঠ করেন, তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "...সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা-সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসা-বাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদ্‌দের [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী] অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য শুব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।"—সম্পাদক।]

*পৃষ্ঠা ১৯৯, পংক্তি ১২ : "কৃত্তিবাস, কাশীদাশ" হইবে "কৃত্তিবাস, কাশী দাস"।

পৃষ্ঠা ৩৮১, পংক্তি ৬ : "দিনকতক শতানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল।" 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এইরূপই মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু নদীর নাম 'শতানীরা' নহে, 'সদানীরা'। দ্রষ্টব্য 'শতপথব্রাহ্মণ', ১।৪।১।১৪-১৭। মুদ্রিত পাঠের এই ভুলটী পুনর্মুদ্রণে যথাস্থানে সংশোধিত হয় নাই। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে : "দিনকতক সদানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল।"—সম্পাদক—।*

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ১৮৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৯৩১ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে (বাঙ্গালা ১২৬০, ২২এ অগ্রহায়ণ—১৩৩৮, ১লা অগ্রহায়ণ)। এই সুদীর্ঘ আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তাঁহার জীবৎকালে বাঙ্গালা দেশে ধীরে ধীরে একটী সাংস্কৃতিক ক্রান্তি বা যুগান্তর অথবা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। এই বিপ্লব একটী আকস্মিক ব্যাপার রূপে দেখা দেয় নাই। ইহার দ্বারা বাঙ্গালীর চিন্তাধারার মধ্যে একেবারে একটা উলট-পালট ঘটে নাই। ইহাকে বরং বাঙ্গালীর চিন্তাধারার একটী স্বাভাবিক বিবর্ত্তনই বলা যাইতে পারে। Violent Revolution অপেক্ষা ইহা ছিল Gradual Evolution-এর ব্যাপার। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজদের এদেশে রাজা হইয়া বসা পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মনোভাব ধীর-মন্থর গতিতে, মধ্যযুগে যে পথ সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, সেই পথেই চলিতেছিল। অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর চিত্ত নিখিল ভারতের সঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্রে মিলিত হইলেও, তাহার জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং চিন্তারীতি বিশেষভাবে গ্রামীণ বা গ্রাম্যই ছিল। ভারতের অন্যান্য অংশে যে নাগরিক সভ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতেছিল, বাঙ্গালা দেশে তাহার একান্ত অভাব ছিল। ভারতের অন্যত্র যে সমস্ত ক্রান্তিকারী ব্যাপার ঘটিতেছিল, বাঙ্গালী তাহার কোন সংবাদ রাখে নাই বা রাখিবার সুযোগ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় সংক্ষেপে এই অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

> সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
> পায়নি সংবাদ,—
> বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
> শুভ শঙ্খনাদ।
> শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল
> শ্যামল উত্তরী
> তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
> ছিল বক্ষে করি'॥

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা॥

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিক্‌-লক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে॥

বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি তখন উত্তর ভারতের সংস্কৃতিরই একটী অনুকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি তখন হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ও সংমিশ্রণের ক্ষেত্র এবং অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতে ও আংশিকভাবে দক্ষিণাপথে যে মিশ্র হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি-জগৎ অনেকটা গ্রাস করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাঙ্গালার গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর উত্তর ভারতের নাগরিক এবং রাজকীয় পরিবেশের প্রভাবের এক লক্ষণীয় উদাহরণ। নূতনের আগমনের জন্য যেন বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালীর মনের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আগ্রহ ও অশান্ত প্রতীক্ষা দেখা দিতেছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ইঙ্গিত, কবি ভারতচন্দ্র (যাঁহার রচনায় বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির মধ্যযুগের চিত্তের এবং নাগরিকসংস্কৃতিময় ধ্যানধারণার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল), এই অস্বস্তিময় প্রতীক্ষার কথা তাঁহার বিখ্যাত পদ—'ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে।/অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥'—যেটী তিনি 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারই শেষ দুই ছত্রের মধ্যে যেন বলিয়াছেন।

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে॥

চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি অনুসারে, ভারতচন্দ্রের তিরোধানের (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসা সম্ভবপর হইল, সে পরিবর্ত্তন ভালর জন্যই হউক বা মন্দর জন্যই হউক। কতকগুলি ভাল ও মন্দ প্রকৃতির দেশনেতার সাহচর্য্যে ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয় হইল; এবং ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এই দেশের মধ্যে নূতন খেলা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

কিন্তু এই নূতনকে বুঝিয়া উঠিতে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কিছুটা বিলম্ব হইয়াছিল। দেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা ইংরেজ শাসনকে মানিয়া লইলেন,—কলিযুগের অবশ্যম্ভাবী ম্লেচ্ছ রাজাদের শাসনেরই একটী রূপান্তর রূপে। ইংরেজ এদেশে আসিল, মুখ্যতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে ও পরে শাসনক্ষেত্রে শোষকরূপে। তাহারা আসিত ভারতবর্ষে 'মোহরের গাছ নাড়া দিয়া' মোহর কুড়াইয়া জেবে ভরিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে—to shake the Pagoda tree and retire as Nabobs. যে ইংরেজ শাসকেরা আসিত, তাহাদের কাজ ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে মুখ্যতঃ এ দেশের রাজস্ব আদায় করা। তাহারা ছিল Collector 'কালেক্টর'। ১৭৬৫ সালে যখন মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করে, তখন তাহাদের মুখ্য কাজই ছিল এ দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ দিল্লীর সরকারে পেশ করা। কোম্পানীর নিযুক্ত ইংরেজ 'কালেক্টর' বা রাজস্ব আদায়কারীদের 'ম্যাজিষ্ট্রেট বা শাসকের কাজ' করিতে হইত—কাজী ও ফৌজদারের পদ ইহারাই দখল করিল। তখন দেশে আধুনিকতার প্রসার হয় নাই; এবং শিক্ষাবিস্তার কোনও দেশে, এমন কি ইউরোপেও, সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ইংরেজরা তাহাদের জ্ঞানগোচর মত এদেশের পুরাতন রীতি বহাল রাখিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছিল। কালেক্টর সাহেবকে যখন দেশী লোকের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার লইয়া বিচার করিতে হইত, তখন তিনি এদেশের চিরাচরিত হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারেই বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে চেষ্টিত হইতেন। তাঁহারা ফারসীর মাধ্যমে রাজকার্য্য চালাইতেন। ইংরেজী প্রচারের আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ তাঁহাদের ছিল না। বিচারকার্য্যে সাহায্যের জন্য আবশ্যকতা ছিল কোর্ট পণ্ডিতের ও কোর্ট মৌলবীর; এবং টোলের পণ্ডিত, স্মৃতিতে যাঁহারা প্রবীণ, এবং মক্তবের মৌলবী, যাঁহারা মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রে প্রবীণ, তাঁহাদেরই কিছু কিছু ডাক পড়িত। ইংরেজ

ইউরোপ হইতে যে সভ্যতা ও ভাবধারা এদেশে আনিতেছিল, তাহা প্রথমটায় দেশের লোক বুঝিতেই পারে নাই, এবং দেশের হিন্দু ও মুসলমান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে সম্বন্ধে প্রথমটায় অবহিত হয়েন-ই নাই।

ইংরেজী শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল প্রথমটায় ব্যবসায়ী মহলে, যাঁহারা ইংরেজ সওদাগরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে মিলিত হইতেন; এবং একদিকে যেমন ইংরেজরা বাঙ্গালা শিখিত, তেমনই অন্যদিকে ইংরেজদের সাহচর্য্যে আসিয়া তাঁহারা দুই-দশটা ইংরেজী শব্দ শিখিয়া লইতেন ও তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। (ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশে ও অন্যত্র কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রকম ভাঙ্গা-ভাঙ্গা পোর্ত্তুগীস ভাষা ইউরোপীয় বিদেশীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত। সে ভাষা এখনও কিছু কিছু সিংহলে আছে, কিন্তু এক গোয়া ব্যতীত ভারতের অন্যত্র ইহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে।) ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখাইবার জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। শুনা যায় যে, ঐ বৎসর একজন আর্ম্মানী সাহেব বাঙ্গালী ছেলেদের ইংরেজী পড়াইবার জন্য কলিকাতায় একটী ইস্কুল খুলিয়াছিলেন। দেশের মুসলমান ও অন্য মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে ইংরেজরা ফারসীর মাধ্যমে কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্বয়ং রবার্ট ক্লাইভের ফারসী নাম ছিল 'সাবুত-জঙ্গ'। বাঙ্গালী দালাল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ শিখিয়া রাখিতেন; এবং সাহেবদের সহিত কাজ করিতে চাহে এমন অনেক উমেদার ইঁহাদের নিকট ইংরেজী শিখিবার আশায় গতায়াত করিতেন। অবশ্য যাঁহারা বাণিজ্যসূত্রে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ মনে পোষণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম হইতে ইংরেজী ছিল অর্থকরী বিদ্যা। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষিত ব্যক্তি, অর্থাৎ হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী মুনশী মোল্লা, ইঁহাদের ইংরেজী শিখিবার গরজ বা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইংরেজদের প্রতাপ এবং ইংরেজের জ্ঞানবিজ্ঞান, দুইই এক বিস্ময়কর ব্যাপার রূপে দেখা দেয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে ইংলাণ্ড তথা ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় জাতির শক্তি, সভ্যতা ও বিদ্যার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব দেখা দেয়। কোন্ গুণে ইংরেজ এইরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জাতি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাচাই বা নিরিখ করিবার কথা অনেকেরই মনে জাগিতে থাকে, এবং এই যাচাইয়ের একমাত্র পথ যে ছিল ইংরেজের ভাষা ও তাহার বিদ্যা আত্মসাৎ করার পথ, এই চিন্তা অনেকেরই মনে উদিত হয়। ইহার ফলে, ১৮১৭ সালে কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতার প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় মতের হিন্দু অভিজাতগণ কর্ত্তৃক 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ইংরেজ সরকারের দ্বারা এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা হইবার পূর্ব্বেই, বাঙ্গালী নিজের তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। এ বিষয়ে একজন ইংরেজের সাহচর্য্য কলিকাতার

অধিবাসিগণ পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য David Hare ডেভিড হেয়ার। ইনি ব্যবসায় করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচারকেই তিনি নিজের জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ সম্পর্কে মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' পুস্তিকাতে (খ্রীঃ অঃ ১৮৭৬) বলিয়াছেন: "প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।......হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথমে হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণ স্বরূপ ছিলেন।......এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী।...হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।......গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইঁহারা স্কুলের [হিন্দু কলেজের] গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" রাজনারায়ণ তাঁহার 'আত্ম-চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society's School ছিল।......স্কুলের প্রকৃত নাম School Society's School হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত।" লোকের দেওয়া Hare School নামটীই উত্তরকালে পাকা স্বীকৃতি লাভ করিয়া, অদ্যাবধি সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

তখন রাজভাষা ছিল ফারসী, এবং যাঁহারা ইংরেজী শিখাইবার জন্য হিন্দু কলেজে স্থাপিত করেন, ব্যবহারিক ভাবে অর্থকরী বিদ্যার কথা না ভাবিয়া তাঁহারা উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শ ছিল—যে ইউরোপকে আর ঠেকাইতে পারা গেল না, তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহার সহিত একটা আপস করিয়া নিজের দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। অবশ্য কেহ কেহ পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, দুই একটী বিষয় ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার সামনে ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার উপযোগিতা বা মূল্য তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার ১৮২৪ সালে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপিত করেন। ইহার পূর্ব্বেই, স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর চেষ্টায় ১৭৮০ সালের

শেষ দিকে 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপিত হয়। এই দুই বিদ্যালয়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষা দেওয়া হইত। ভারতবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করেন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী মনীষী Thomas Babington Macaulay টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। ইনি ১৮৩৪ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ভারত সরকারের Law Member রূপে। ইঁহার এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি Indian Penal Code বা 'ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন' প্রণয়ন। গ্রীক, লাটিন ও অন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে ইঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, প্রাচ্য ভাষা ও তন্নিহিত বিদ্যা সম্বন্ধে ছিল তেমনই অজ্ঞতা আর অবজ্ঞা। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবাসীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক, এবং ইংরেজীর মাধ্যমে তাহার সহিত পরিচয় তাহাদের পক্ষে সহজ ও সঙ্গত হইবে। ইহাতে একসঙ্গে দুই কাজ হইবে—একদিকে ইংরেজী শিখিয়া ভারতবাসী মানুষ হইবে, আবার অন্যদিকে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার ক্রমবর্দ্ধমান রাজ্যের জন্য অল্প বেতনে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী ভারতীয়দিগের মধ্য হইতেই পাইবে। বেশী মাহিনা দিয়া ইংলাণ্ড হইতে ইংরেজদের আনিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। এই সম্বন্ধে মেকলের প্রস্তাব ১৮৩৫ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু তদনুসারে ইংরেজ সরকারের সহিত স্থির করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়া গেল। মোটামুটি ১৮৪০ সালের পরে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এদেশে অল্প বেতনে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার করা উচিত, এবং প্রত্যেক জেলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলিবার নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিলেন।

এদিকে হিন্দু কলেজ প্রায় এক পুরুষ ধরিয়া তাহার কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রমুখ সাহিত্যপাগল অধ্যাপকের হাতে পড়িয়া প্রায় কুড়ি বছর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের কতগুলি বুদ্ধিমান্ যুবক ইংরেজী সাহিত্যের রসে মজিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিজ জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চ্চা কিছুই ছিল না—কেহ তাঁহাদের সংস্কৃত পড়াইবার কথা ভাবে নাই, এবং বাঙ্গালাতেও তখন কোন আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। তাঁহারা কেবল ইংরেজীই পড়িতেন, এবং ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় প্রাচীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের বিরাট্ সাহিত্যসম্ভার বন্যার মত আসিয়া তাঁহাদের মনকে প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ও চিন্তা-নেতাদের সমকক্ষ কাহাকেও তাঁহারা স্বজাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্যে পাইলেন না। ইহাতে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ইংরেজীশিক্ষিত যুবকের উদ্ভব হইল, যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয় সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট বা বিকেন্দ্রিত হইয়া পড়েন, এবং মনে প্রাণে ইংরেজ হইবার ব্যর্থ সাধনায় লাগিয়া যান। এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আদর্শবিপর্য্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। সেটী হইতেছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের

ইউরোপীয় বিদ্যাদানের মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচার—এখানে [illegible] ব্যাত্মিকতা প্রচার অপেক্ষা ভারতীয় যুবকগণকে মনে প্রাণে বিজাতীয় হইবার [illegible] দেওয়া হইত।

এই অবস্থায় যখন বিদেশীয় শিক্ষার প্লাবনে বাঙ্গালার যুবকদের বহিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা চিন্তান্বিত হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের উপনিষদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ভারতীয় [illegible]-বিদ্যার মৌলিক আধার সম্বন্ধে দেশের লোকেদের অনেকটা সচেতন করিয়াছিল। [illegible] ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কার ও অধ্যয়নের ফ[illegible]র [illegible]শিত ভাবে ইউরোপ হইতে ভারতের প্রাচীন মনীষার প্রতি যে শ্রদ্ধা জাগিয়া [illegible]ছিল, তাহার এক বিশেষ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দেখা দিল। এই দুইটী জিনিস নূতন করিয়া ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের সহিত এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আবেদন আনিয়া দিল। ১৮৫৭ সালে যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইল, তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যবস্তুর মধ্যে, ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও লাটিনের মত, ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ও ভারতের মুসলমানদের ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির ভাষা আরবী-ফারসীর পঠন-পাঠনের একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রথমে ভারতবর্ষে Democratization of Sanskrit অর্থাৎ জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের কাছেই সংস্কৃতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের আধুনিক যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ঘটনার মূল্য অসাধারণ।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ১৮২০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত এই ৪০ বৎসর ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচিত হইবার দ্বিতীয় যুগ। ১৭৬০ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত ইংরেজের সহিত সংস্পর্শের প্রথম যুগে ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। ১৮৬০ হইতে আমাদের দেশে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত আমাদের পরিচয়ের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল, এবং এই যুগ হইল ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই যুগে যে সকল মনীষী বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালার সংস্কৃতিকে আত্মস্থ এবং পরিপুষ্ট করিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রথম পুরুষের মানুষ বলিয়া ধরা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষিগণ। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন প্রমুখ সন্ধিযুগের মনীষিগণ। বিদ্যাসাগর প্রমুখ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধকদের অব্যবহিত পরে দেখা দিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও চিন্তানেতৃগণ—যেমন

কেশবচন্দ্র সেন, [illegible]োপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশ[illegible] [illegible], বিবেকানন্দ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাদের অপেক্ষা সময় হিসাবে কিছু অর্ব্বাচীন। কিন্তু ইনিও সেই একই মন্ত্রের ধার[illegible] বাহক ছিলেন। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত বাঙ্ময়, বাঙ্গালা সাহিত্য—ইহারই মাধ[illegible] বাঙ্গালা দেশের চিন্তাধারায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে[illegible] কৃতিত্ব। তিনি ছিলেন অন্যতম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গালীর তথা ভারতবা[illegible]সিক সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন প্রধান পরিচালক। প্রাচীনকে বুঝিয়া আধুনিককে সৎ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে যাঁহারা পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। শাস্ত্রী মহাশয় নিজের শিক্ষা ও মানসিক জীবনে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন সংস্কৃতজীবী অধ্যাপক পণ্ডিতের ঘরে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে নিজেদের বাড়ীতে একটা টোল খুলেন। এই টোলটী নৈহাটী অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পুরুষানুক্রবে চলিতে থাকে। এ সম্পর্কে স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি উদ্ধারযোগ্য। বাঙ্গালা ১৩৩১ সালে রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী'র মূল সভাপতির অভিভাষণে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাচর্চ্চার উল্লেখ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

> "আমার পূর্ব্বপুরুষ নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যদের সঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক অতি মিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন গঙ্গার পশ্চিম পারের সমস্ত দেশ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, তখন হইতেই কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত-সমাজ অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সময়েই আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়-শাস্ত্রের টোল খুলেন। একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন। বেশীদূর যাইতে হইবে না, এখানকার [খানাকুল-কৃষ্ণনগরের] প্রবীণ নৈয়ায়িক কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আমার ন' ঠাকুরদার পড়ুয়া ছিলেন। ···তাঁহার ভ্রাতা বারাণসী-দাদা রামকমল ন্যায়রত্নের [হরপ্রসাদের পিতৃদেবের] নিকট পাঠ স্বীকার করেন এবং অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বাবার এক প্রধান ছাত্র সত্যব্রত [সামশ্রমী]। সত্যব্রতের বাড়ী খানাকুল। বাবা বলেছিলেন সত্যব্রতের মত ছাত্র পাওয়া কঠিন। আমার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিতেন, কমলের বড় ভাগ্য যে সত্যব্রতের মত ছাত্র পাইয়াছে। ক্ষীরপাই রাধানগরের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় আমার বাবার পড়ো ছিলেন।···"

শাস্ত্রী মহাশয় যখন আট বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু সে সময় কান্দীর ইস্কুলে হেড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর নন্দকুমার তাঁহার বালক ভ্রাতা হরপ্রসাদকে নৈহাটী হইতে কান্দীতে লইয়া আসেন এবং কান্দীর ইস্কুলে ভরতি করিয়া দেন। ইংরেজী ১৯২৩ সালে লিখিত একটী প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন :

"বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেড্ পণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর স্কুল এ্যাঙ্গ্লো সংস্কৃত স্কুল ছিল, হেডমাষ্টার ও হেড পণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ-বি-সি শিক্ষা কান্দীর স্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর...। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমায় ভরতি হইতে হইয়াছিল।" ['পুরাণ বাঙ্গলার একটা খণ্ড', পৃ ৪]

কিন্তু নন্দকুমারও অকালে দেহ রক্ষা করেন। কান্দীর ইস্কুল ত্যাগ করিয়া হরপ্রসাদকে নৈহাটীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে সমগ্র পরিবারে আর্থিক বিপর্য্যয় দেখা দেয়। কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেও বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শরৎনাথের শিক্ষা ক্ষান্ত থাকে না। নৈহাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমে কাঁটালপাড়ার টোলে এবং পরে স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। পরে, 'হর-প্রসাদে' অর্থাৎ মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্তির পর হইতে 'হরপ্রসাদ' নামান্তরে পরিচিত শরৎনাথ, ইংরেজী ১৮৬৬ সালে, তেরো বছর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন। এই সময় হরপ্রসাদ কিছুদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার ছাত্রাবাসে থাকিয়া সর্ব্বপ্রথম সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইংরেজী ১৮৭১ সালে আঠারো বৎসর বয়সে হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন চার বৎসরের শিশু, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ঐ সময় মধ্যবিত্ত ঘরে যে ইংরেজী শিখিবার একটা প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র দেখা দেয়, সংস্কৃতজীবী পণ্ডিত-বংশের সন্তান হইলেও হরপ্রসাদ তাহার প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। বহু পণ্ডিতঘরের কিশোর ও যুবকের মত তিনি শিক্ষা-বিষয়ে সব্যসাচী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত চর্চ্চা তিনি কখনও ছাড়েন নাই, এবং সংস্কৃত কলেজে একই সঙ্গে F. A. পরীক্ষা পাঠের সহিত সংস্কৃত পাঠও গ্রহণ করেন। এইভাবে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ শিক্ষাধারার দোষ ও গুণ উভয়েরই সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল। তখন প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কৃত চর্চ্চা দেশে পূর্ণভাবে চলিতেছে, এবং মধ্যযুগের সংস্কৃত বিদ্যার ধারা তখনও দেশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুণ্যশ্লোক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের মধ্যকালীন সংস্কৃত চর্চ্চার ধারায় যুগোপযোগী আধুনিক পদ্ধতি আনীত হয়, তাঁহার 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও কয়েক খণ্ড 'ঋজুপাঠ' কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের মধ্যে ও সারা বঙ্গদেশে ও পরে সমগ্র উত্তর ভারতে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত আরও কতকগুলি মনীষী ভারতের অন্যত্র উদ্ভূত হন, যাঁহারা একাধারে প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত বিদ্যা ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই উভয়েই প্রাবীণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যেমন—রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী, ভাউ দাজী, সুধাকর দ্বিবেদী, গঙ্গানাথ ঝা, গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা, কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী, র. শামশাস্ত্রী। ইঁহারা সকলেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, বিদ্যা ও সংস্কৃতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করেন, এবং তথ্য ও তত্ত্ব উভয় দিক্ হইতেই সার্থকভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন সাধারণ জ্ঞানতপস্বী পণ্ডিতেরই জীবন ছিল—ইহাতে চমকপ্রদ ও লোমহর্ষণ ব্যাপার বা ঘটনার স্থান ছিল না। তিনি সারা জীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার কার্য্যেই অতিবাহিত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনার পক্ষে পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত তথ্যপূর্ণ পুস্তিকাখানি ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৭৩ সংখ্যক পুস্তিকা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) অমূল্য। 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র সর্ব্বশেষ সম্ভারের পরিশিষ্টে হরপ্রসাদের জীবনীপঞ্জী ও লেখপঞ্জী থাকিবে, সেই পঞ্জী হইতে তাঁহার বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র ও নানা বিষয়ের প্রতিভার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একাধারে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, এবং রসসর্জ্জনা ও রসপরিবেষণ, এই উভয় প্রকার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্বের অন্তর্গত। প্রাচীন আলঙ্কারিক ও সাহিত্যিক রাজশেখর দুই প্রকারের প্রতিভার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—'কারয়িত্রী প্রতিভা' এবং 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা যায় Creative Genius এবং Reflective or Critical Genius. অন্যভাবে এই দুই প্রকারের প্রতিভাকে বলা যায় যে, একদিকে রসস্রষ্টা ও অন্যদিকে রসিক বা ভাবুক এবং তথ্যনির্দ্দেশক। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে যেখানে তিনি সাহিত্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা হইয়াছে Literature of Power—অর্থাৎ মানুষের মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে, রসসিক্ত করিতে পারে, উচ্চচিন্তায় প্রণোদিত করিতে পারে এমন সুসাহিত্য ; এবং অন্যদিকে তাঁহার অন্য রচনা হইতেছে Literature of Information বা তথ্যনির্ণায়ক ঐতিহাসিক অথবা সমালোচনা সাহিত্য। একাধারে এই দুই প্রকার বৃত্তির এইরূপ অদ্ভুত বিকাশ জগতে সুলভ নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্য একমাত্র

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই উভয়বিধ গুণ দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সুন্দর সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান এবং প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে বোধ এই উভয়ের আধারে, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত নূতন ধরণের দুইখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস ('কাঞ্চনমালা' এবং 'বেণের মেয়ে') তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম গদ্যকাব্য। 'মেঘদূতের ব্যাখ্যা'য় তিনি নূতনভাবে সংস্কৃত সাহিত্যরস গ্রহণের রীতি বাঙ্গালার মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন; এবং এই হিসাবে তাঁহাকে টীকা রচনার নূতন পদ্ধতির স্রষ্টা বলিতে পারা যায়। ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কাজ হইতেছে সংস্কৃত পুঁথির আলোচনা। এই বিষয়ে ইঁহার আট দশ খণ্ড বর্ণনাত্মক সংস্কৃত পুঁথির সূচী, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমগ্র বিভাগের পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য অমূল্য উপাদানের আকর-পুস্তক হইয়া আছে। বহু দুষ্প্রাপ্য এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় ভাষার পুস্তক, যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই, তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়া, হয় সেগুলি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, না হয় সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ইতিহাস রচনা করিবেন, এবং এইরূপ একখানি ইতিহাস তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান কৃতিত্ব হিসাবে দেশবাসীর নিকট সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলে হয় তো তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত, এবং তাহাতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ ধন্য হইত, আধুনিক ভারতের সংস্কৃতচর্চ্চা গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু যোগাযোগে সেই রূপটী ঘটিল না; কতকগুলি সূচীপুস্তক ও প্রকীর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই তিনি এ বিষয়ে দিয়া যাইতে পারেন নাই। নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু সেখানেও তিনি যথেষ্ট সম্মাননা পাইলেও, আশানুরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম আবিষ্কার হইতেছে তাঁহার মাতৃভাষার সাহিত্য। যে সময়ে বাঙ্গালী জাতি তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং সারদাচরণ মিত্র, জগদ্বন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রমণীমোহন মল্লিক প্রমুখ অল্প দুই চারিজন গবেষক এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশন আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়, এখন হইতে পঁয়ষট্টী বৎসর পূর্ব্বে, শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাঁহার পুরাতন সাহিত্যের একটী দিগ্‌দর্শন দিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও তাহার ইতিহাস প্রণয়ন বিষয়ে

যেমন আত্মনিয়োজিত হন, তেমনি মুখ্যতঃ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সার্থকভাবে ব্যাপক গবেষণা করিয়া যান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাধ্যমে তিনি 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন, এবং ধর্ম্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু লইয়া কতকগুলি অনুসন্ধানমূলক লেখ বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তদ্রূপ তাঁহার সম্পাদিত 'কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব্ব' প্রাচীন বাঙ্গালার একখানি প্রধান গ্রন্থের এক অতি মূল্যবান্ সংস্করণ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা তাঁহার নিকট একটী বিশেষ কারণে চিরঋণী থাকিবে—সেটী হইতেছে তাঁহার দ্বারা নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরীতে বৌদ্ধ 'চর্য্যাপদ' গ্রন্থে রক্ষিত পুরাতন বাঙ্গালা পদের পুঁথি আবিষ্কার, ও তাহার প্রকাশন। এই পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাঙ্গালা ভাষার কোন অবিসংবাদিত রূপের প্রাচীন নিদর্শন আমাদের জানা ছিল না। এই চর্য্যাপদ প্রকাশের ফলে, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে আমরা সমর্থ হইলাম। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য তথা নব্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এই পুস্তকের মূল্য সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং সুখের বিষয়, এই বই লইয়া সার্থক আলোচনা বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞমহলে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্ম-দেবতার সহিত এদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের একটা সংযোগ আছে বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই মনে করেন। এই বিষয়ে আরও গভীর ভাবে গবেষণার অবকাশ আছে, এবং হয় তো শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবিত এই সংযোগের কথা পূর্ণভাবে সমর্থিত না হইতেও পারে; কিন্তু তাহা হইলেও এই গবেষণার সূত্রপাত শাস্ত্রী মহাশয়েরই দান। তাঁহার সম্পাদিত কতকগুলি মূল্যবান্ এবং অপূর্ব্ব-প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আছে। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই (যথা সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত 'রামচরিত' নামে দ্ব্যর্থক ঐতিহাসিক কাব্য, অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য, আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা', 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' প্রভৃতি) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে 'রামচরিত' কাব্যের মূল্য অসাধারণ, এবং সমস্ত ঐতিহাসিক মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। তদ্রূপ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য ও আর্য্যদেবের রচনাও মহামূল্য।

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি কেবল ইতিহাস ও সাহিত্য লইয়াই নহে, প্রাচীন জীবনপদ্ধতি, সমাজ, ধর্ম্মনীতি ও দর্শন লইয়া নহে, উপরন্তু আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনের ছোট-খাটো নানা সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষণীয়—তাঁহার বিচারশৈলীর যৌক্তিকতা, তাঁহার রচনাভঙ্গীর সাবলীলতা, এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার রোচকতা; এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বাঙ্গালার

এক অপূর্ব্ব সম্পদ্। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার গদ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাঙ্গালা ভাষাকে সাহিত্যিক মর্য্যাদায় উপযুক্ত করিয়া তোলার কৃতিত্ব ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তিনি কেবল যে চিন্তার ধারাকে সুযুক্তিপূর্ণ ভঙ্গীতে পরিচালিত করিবার পথ বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই নহে, বাঙ্গালা সাধুভাষার যে একটা অন্তর্নিহিত ছন্দের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, তাহার পাঠকালে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়া যে একটী aesthetic appeal অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবোধের আবেদন বিদ্যমান, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম দেখাইয়া দেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অপরের পক্ষে সাহিত্যিক প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্য তাঁহার রচনায় সাধুভাষা ভিন্ন চলিত ভাষার লঘু ও চটুল গতির পক্ষপাতী ছিলেন না, যদিও তিনি তাঁহার বেনামী রচনায় (বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন প্রসঙ্গে) সরস চলিত-ভাষার অবতারণা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেদিকে প্রথম অবহিত হইয়াছিলেন বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকজন লেখক, যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র গুরুগম্ভীর ও দুষ্পাচ্য সংস্কৃত-শব্দাড়ম্বরপূর্ণ রচনাশৈলীর অন্তরালে কতকগুলি লৌকিক কাহিনী রচনার দ্বারা; পরে মৌখিক ভাষার শক্তি প্রকাশ করিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শেষ বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী গদ্যলেখক, বিশেষতঃ যাঁহারা একটু সংস্কৃত পড়িতেন, তাঁহারা গুরুগম্ভীর সংস্কৃতমূলক ভাষার মন্থর ও আড়ষ্ট গতির নিগড়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশশক্তিকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিলেন বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ববিধ শক্তির এক অভাবনীয় প্রকাশক রূপে—তাঁহার প্রথম যুগের পুস্তক 'দুর্গেশনন্দিনী'র সংস্কৃতময় ও কতকটা আড়ষ্ট শৈলী একদিকে, এবং অন্যদিকে তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সরল সাবলীল মৌখিক ভাষার অনুকারী বাঙ্গালায়। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষাও অতি সুন্দর, এবং এই উভয় শৈলীর এক অতি মনোহর সমন্বয়। এদিকে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত গুণী নাট্যকার দেখা দিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কথ্য ভাষার শক্তি ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে অজ্ঞাতসারে সচেতন করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-তে চলিত-ভাষার পুনরাবাহন করিলেন,—যদিও তিনি সাধু ও সংস্কৃতপ্রধান বাঙ্গালাতে অপরূপ কবিতা ও গদ্য তাঁহার প্রথম জীবনে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতবহুল সাহিত্যিক শৈলী অনুসরণ করেন। গবেষণাত্মক রচনায় বিষয়গৌরবের জন্য তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। 'ভারত-মহিলা ও 'বাল্মীকির জয়'-এর ভাষার সহিত তাঁহার শেষ জীবনের রচনা 'বেণের মেয়ে'-এর ভাষার তুলনা

করিলেই, কোন্ দিকে তাঁহার লেখনী অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠেন। বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য, এবং বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও, তাহার নিজস্ব একটা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এবং এই সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও আধুনিক। তাঁহার বাঙ্গালা রচনায় একাধিক স্থানে বাঙ্গালা ভাষা কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নিজের মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি যে কেবল নিজের মত প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, হাতে-কলমে তিনি নিজের বিচারের যাথার্থ্য প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। প্যারিসে ছাত্রাবস্থায় আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক্ বলিতেন যে, মাতৃভাষা সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিতদের এই আদর্শ যে, অতি মহাপণ্ডিতও যদি কোনো গভীর দার্শনিক বা সাহিত্যসংক্রান্ত তত্ত্ব বা তথ্য লইয়া আলোচনা করেন (বিজ্ঞানের কথা পৃথক্, কারণ বিজ্ঞানে বিশেষ প্রবেশ অপেক্ষিত), তাহার ভাষা এমনই প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হওয়া চাই যে, ফরাসী ভাষা শুনিয়া বা পড়িয়া যে বুঝিতে পারে এমন মানুষের পক্ষে ভাবগ্রহণে ও রসগ্রহণে যেন কোন বাধা না হয়। এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, ফ্রান্স দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত College de France নামক প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মনীষিগণ তাঁহাদের গবেষণার বিষয়ে যে সকল ভাষণ দেন, সেই সব ভাষণে ফরাসী জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চতম প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহা শুনিয়া জনসাধারণ কিছু-না-কিছু জ্ঞান অথবা রস পায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রকাশ সম্পর্কে অনুরূপ বিচার ছিল—যতই গভীর বিষয় হউক না কেন, প্রকাশভঙ্গী এমনই স্বচ্ছ, সহজ ও সর্ব্বজনবোধ্য হওয়া উচিত, যাহাতে বক্তব্য অনায়াসে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই পৌঁছিতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তাঁহার লেখায় এই গুণ যে সহজভাবে প্রকটিত হইত, তাহার পিছনে ছিল সহজভাবে কথাপ্রসঙ্গে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার তাঁহার অসামান্য শক্তি। শাস্ত্রী মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ Conversationalist অর্থাৎ সংলাপ-রসিক ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে কোনও প্রয়াস ছিল না, এবং উপরন্তু কথোপকথনে হাস্যরসের অবতারণা করিবার শক্তি এই পরিহাসপটু পণ্ডিতটীর মধ্যে অসাধারণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের রসিকতার অনেক গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন। 'রসানাম্ আদিঃ শ্রেষ্ঠঃ'—কচিৎ তাঁহার রসিকতায় এই শ্রেষ্ঠ রসেরও আভাস যে আসিত না, তাহা নহে; কিন্তু এইজন্যই তাহা রসজ্ঞ জনের নিকট বিশেষ উপভোগ্য ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিবন্ধগুলিতে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তবে সমাজের গতি বা সামাজিক সমস্যা লইয়া, দুই চারিটী প্রবন্ধ ভিন্ন অন্যত্র তিনি তেমন স্পষ্টভাবে নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। জীবনের প্রায় সব দিক্ সম্পর্কেই তাঁহার দর্শন ও সমীক্ষা ছিল; এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রাচীনভারতবিদ্যাবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তিনি বাঙ্গালা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও নিজ সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটী প্রবন্ধে ('প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ', পৃঃ ৬৪-৬৯) তিনি ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজের চিরানুসৃত মতের পরিপন্থী কথাও প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন: সত্যই কি এই প্রবন্ধে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, না, কেবল একটু রসিকতা করিয়াছেন? যাহাই হউক, প্রথমে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হর-প্রসাদের রচিত 'ভারত-মহিলা' বিষয়ক প্রস্তাবে কিছু আপত্তিকর অর্থাৎ প্রচলিত মতের বিরোধী 'ভিউ' আছে মনে করিয়া প্রস্তাবটী ছাপাইতে চাহেন নাই (দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০), কিন্তু পরে সেই 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকারই সম্পাদক, আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হইলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিত সূচনার পরে, এই প্রবন্ধটী ('প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ') প্রকাশিত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণাত্মক প্রবন্ধের নামকরণই অনেক সময় পাঠকের আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিত, যেমন—'যৌবনে সন্ন্যাসী', 'একজন বাঙ্গালি গভর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব', 'খাজনা কেন দিই?', 'স্ত্রী-বিপ্লব', 'নূতন কথা গড়া', 'সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন করা"', 'হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা', 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'বিরহে পাগল', 'শকুন্তলার মা', 'শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী', 'এক এক রাজার তিন তিন রাণী', 'বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়', 'রঘু আগে কি কুমার আগে', 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ', 'এস, এস বঁধু এস', ইত্যাদি। এই কৌতূহল জাগাইয়া তোলা সকল প্রকার রচনারই একটী বড় সার্থকতা, এবং শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ পাকাপোক্ত ছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষের বহুস্থানে ঘুরিয়াছেন, এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত এবং বাঙ্গালা দেশ ছাড়া, ভারতের অন্য প্রদেশেও তাঁহার বিচারের রশ্মি আলোকপাত করিয়াছে। একদিকে যেমন তিনি বাঙ্গালা ভাষার আদিম রচনা 'চর্য্যাপদ' আবিষ্কার করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই তিনি মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম উপলব্ধ গ্রন্থ জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত কথকতার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর' আবিষ্কার করিয়া সে-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং এই পুস্তকের একখণ্ড পুঁথি তাঁহারই আবিষ্কারের ফলে Asiatic Society Library-তে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে। *

* এই পুস্তক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুআ মিশ্র ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সমেত Asiatic Society হইতে ইংরেজী ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালা দেশে একজন বৈষ্ণব সাধক কবি ও পদকর্ত্তা 'মহাজন' বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম বিদ্যাপতির কবিত্বের স্বরূপ ও তাঁহার ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালীর কাছে প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি যে পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে যেরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা ও সাধনমার্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল তদনুরূপ ভাবধারা ও সাধনমার্গের পথিক যে তিনি ছিলেন না, এবং তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ যে কেবল সংস্কৃত প্রেমের কবিতারই পথানুযায়ী কবিতামাত্র ছিল—এই সমস্ত কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বিদ্যাপতির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ 'কীর্ত্তিলতা'র বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় ব্যক্ত করেন। ইহাতে ভক্তিপ্রবণ বৈষ্ণব কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তির খণ্ডন হয় নাই। রাজস্থানের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন পুঁথি লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। * আমার মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত শাস্ত্রী মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি রাজস্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়া সেখান হইতে কবি চন্দ বরদাঈয়ের বংশধর একজন ভাট কবিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশনে আমাদের অনেকের পক্ষে, সর্ব্বপ্রথম রাজস্থানের ভাটের মুখে 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' হইতে পাঠ শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সভায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি অতিথি ভাট মহাশয়কে প্রশস্তি করিবার কালে 'চারণরাজ' বলিয়া সম্বোধন করায়, শাস্ত্রী মহাশয় তখনই উঠিয়া তাঁহার প্রশস্তিবাচনে বাধা দিয়া, আমাদের সকলকে রাজস্থানের ভাট ও চারণের এবং বারহঠ প্রমুখ অনুরূপ অন্য জাতির বৈশিষ্ট্য ও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন—চারণেরা ভাটেদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া পরিষদের অতিথি ভাট মহাশয় চারণ আখ্যায় খুশী হইতেন না। এইরকম খুঁটিনাটী অনেক বিষয় হইতে বুঝিতে পারিতাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় আধুনিক ভারতের জীবনের বহু দিক্ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে তাহার প্রকাশ হইত।

আর একটী বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে এক Silent Revolution বা নিঃশব্দচারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। সেটী হইতেছে নাট্যকলায় ইতিহাসানুমোদিত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ইত্যাদির ব্যবহার। শাস্ত্রী মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি একবার কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্কৃত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি নিজে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া, যতদূর সম্ভব প্রাচীন ভারতীয় পাত্রপাত্রীদের পরিধেয় অলঙ্কারাদির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ও তদনুসারে এই সমস্ত প্রস্তুত করাইয়া-

* দ্রষ্টব্য Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles. শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ১৯১৩ সালে Asiatic Society-তে এই রিপোর্ট পেশ করেন।

ছিলেন। অভিনয়ের পরে দুই তিন বাক্স ভরা সেই সমস্ত কাপড়চোপড় ও গহনা প্রভৃতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটকে তিনি দান করেন। তখন আমরা কলেজের ছাত্র ও ইন্‌ষ্টিটিউটের সদস্য; এবং ইতিপূর্ব্বেই স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের শেক্‌স্‌পিয়রের Julius Caesar নাটকের অভিনয়কালে প্রাচীন রোমের পোষাকের নকল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই অভিনয়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী অন্যতম অভিনেতা ছিলেন; পরে ইন্‌ষ্টিটিউটে শিশিরকুমার ও অন্য বন্ধুগণ যখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয় করেন, তখন আমাদেরই ডাক পড়িল বেশকারীর কার্য্য করিতে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পিত এই প্রাচীন ভারতের পোষাক ও গহনাগুলি তখন আমাদের কাজে আসিল; এবং আমাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়ে প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন গ্রীসের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ইত্যাদি যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা, কলিকাতার পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সমাজের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হয়। এখন ক্রমে বাঙ্গালা নাটকে ও দেখাদেখি ভারতের অন্যত্র, পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকতাবোধ আসিয়া গিয়াছে; এবং আমি বলিব, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম চেষ্টা এই ব্যাপারের বীজস্বরূপ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত সংযোগের কথা একটু বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তিনি সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর ছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কারণে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। অগ্রজকল্প রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে শাস্ত্রী মহাশয় সম্পর্কে অনেক কথা শুনি; এবং উভয়ের মধ্যে কোন-কোনও বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, শাস্ত্রী মহাশয়ের বিদ্যা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি রাখালদাসের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯১৬ সালে আমি প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাই, এবং আমার আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণতত্ত্ব; এবং আমার পক্ষে এক বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা এই যে, আমার পরীক্ষক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং ইঁহাদের উভয়েরই অনুমোদন পাইয়া আমার গবেষণা সাফল্যলাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশিত হইবার পরে, চর্য্যাপদের ভাষা লইয়া কেহ কেহ নানা অবান্তর কথা বলেন। কিন্তু প্রথম হইতেই আমার ধারণা ছিল যে, চর্য্যাপদ কয়টীর ভাষা নিঃসন্দেহ-রূপে পুরাতন বাঙ্গালা (দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষা কিন্তু বাঙ্গালা নহে, পশ্চিমা অপভ্রংশ)। শাস্ত্রী মহাশয় আমার ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। ১৯২৬ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমার গবেষণাত্মক পুস্তক

Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশিত হয়, তখন শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করেন। এই বই পড়িয়া তিনি এত খুশী হন যে, একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার গৃহে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গণপতি সরকার ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক ও পণ্ডিতকে ও আমাকে একটী অন্তরঙ্গ সভায় আহ্বান করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন, —যেমন নৈহাটীর গজা, জনাইয়ের মনোহরা, বর্দ্ধমানের খাজা, মিহিদানা ও সীতাভোগ, পেনেটির গুঁপো, জয়নগরের মোয়া, বড়বাজারের রাতাবি সন্দেশ। এইরূপ মিষ্টান্ন ও ফল দিয়া আমাদের জলযোগ করাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় আমার রচিত দুইখণ্ড পুস্তক আনাইয়া হীরেন্দ্রবাবু প্রমুখ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "আজ আপনাদের যে বিশেষ কারণে আহ্বান করিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, এই ছোকরা মাতৃভাষায় একখানি সম্পূর্ণ ভাষাতত্ত্বমূলক ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই গ্রহণ-যোগ্য। আমরা পুরাণ পদ্ধতিতে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এ নূতন পথ দেখাইয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে, এই ছোট ঘরোয়া মিলনে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।" আমি এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে অভিভূত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করি। আমার এই স্বল্প কাজের জন্য বাঙ্গালা দেশের আর দুইজন মনীষীর নিকট হইতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অনুরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি—তাঁহারা হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সেইদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি এই সম্পর্কে একটী ছোট মন্তব্য Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি ইহা উল্লেখ করেন যে, এইভাবে প্রাচীন কর্তৃক নবীনের আবাহন, বাঙ্গালা দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রে একটী লক্ষণীয় ঘটনা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের অপরাপর গুণগ্রাহিতার আরও অনেক উদাহরণ আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিষদ্-পরিচালনের পদ্ধতি লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু মতভেদ হইয়াছিল। কিন্তু রাখালদাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য, তাঁহার প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ একটী স্নেহ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলিবার ভঙ্গী অনেক সময় কটু হইত, এবং তিনি স্পষ্টবক্তা ছিলেন; কিন্তু কখনও-কখনও সুযোগ পাইলে তিনি অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারিতেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বৈমনস্য হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানিত। আশুবাবুর মৃত্যুর পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্মৃতি-সভায় শাস্ত্রী মহাশয় আশুবাবুর নানা গুণের কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বলেন, ও সেই সঙ্গে এই মন্তব্য করিয়া সকলকেই প্রীত ও বিস্মিত করিয়া দেন: "আর একটা কথা বলি,

না ব'ললেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর অহি-নকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, তার একটা লক্ষণ—এই ছেলেপুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে; আমার ছেলেদের নামের শেষে 'তোষ', আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে 'প্রসাদ'। এটা কি মনে করেন শুধু accident? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল।" (দ্রষ্টব্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ)। এমন মিষ্টি কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রাণ খুলিয়া সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা বাঙ্গালীর সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে বিশেষ লক্ষণীয় সহায়তা করিয়াছে। বাঙ্গালীর মনের প্রসার এবং তাহার আত্মমর্য্যাদাবোধ, উভয়ই শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী—কেবল সহজ ও বাস্তবের অনুকারী রচনাভঙ্গীতেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বকীয় মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বাঙ্গালা লেখমালা বাঙ্গালা ভাষার একটী প্রধান সম্পদ্—কি তাহার আভ্যন্তর বস্তুর দিক্ হইতে এবং কি তাহার প্রকাশভঙ্গীর শক্তি ও সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে। এইভাবে তাঁহার সম্পূর্ণ বাঙ্গালা রচনা প্রকাশে অনুমতি দিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের সুপুত্রগণ বঙ্গভাষার পাঠকগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন; এবং পুস্তক প্রকাশের পক্ষে আজিকার এই সঙ্কটময় সময়ে যিনি লাভ ও অলাভের কথা চিন্তা না করিয়া এই গুরুভার এবং ব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, সেই প্রকাশক শ্রীযুত প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়ও সকলের ধন্যবাদের পাত্র,—বিশেষভাবে আরও এই হেতু যে, খেলো ও সস্তা সাহিত্যের প্রসারের দ্বারা পসার লাভের হুজুগের দিনে, 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' লইয়াই ইনি পুস্তক প্রকাশনের শুভসূচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে অসংখ্য প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে এই বিপুল রচনাসম্ভারের সামান্যতম অংশই মাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে, ইংরেজী ১৯৪৬ সালে, বিশ্বভারতী তাঁহার একটী দীর্ঘ অভিভাষণ ('প্রাচীন বাংলার গৌরব') পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি ইহার বছর দুই পরে 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (ইং ১৯৪৮)। 'ভারত-মহিলা', 'বাল্মীকির জয়', 'কাঞ্চনমালা', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'বেণের মেয়ে' প্রভৃতি পুস্তকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে বাজারে এখন আর কিনিতে পাওয়া যায় না। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী'

বাজারে প্রচলিত আছে, এবং তাহাতে এই রচনাগুলি সমেত অন্যান্য কিছু রচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই গ্রন্থাবলীতে হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙ্গালা রচনার কিয়দংশ মাত্র ধৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক একটী রচনাকে হরপ্রসাদের রচনা বলিয়া তাঁহাদের প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গুরুতর ক্রটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙ্গালা রচনাবলীর সঙ্কলন ও প্রকাশনের আয়োজন বা চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রবন্ধপুস্তকাদির তালিকা প্রণয়ণের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে। এই ব্যাপারে পরলোকগত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। অশেষ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী এবং নানা পত্রপত্রিকাদি ঘাঁটিয়া তাঁহার বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী রচনাবলীর একটী দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর অল্প পরে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯) প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে এই জীবনীপঞ্জী ও লেখপঞ্জী মুদ্রিত হয়। ইহার ঠিক পরেই ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় Indian Historical Quarterly পত্রে (ইং ১৯৩৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাবলীর একটী ব্যাপক কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশিত করেন। কয়েক বৎসর পরে, বাঙ্গালা ১৩৫৬ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত 'সাহিত্য-সাধক-রচিতমালা'র ৭৩ সংখ্যক পুস্তিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কৃতির বিবরণ সমেত তাঁহার বাঙ্গালা রচনাবলীর একটী কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশিত করেন। এই তালিকাগুলি হাতের কাছে থাকিবার ফলে, হরপ্রসাদের রচনাবলীর সঙ্কলন যে অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য, এবং এই জন্য ইঁহাদের নিকট ঋণ স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী তালিকাকারেরা জানিয়া সুখী হইবেন যে, তাঁহাদের তালিকায় ধৃত হয় নাই এমন কয়েকটী রচনারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং সেগুলির মধ্যে দুইটী প্রথম সম্ভারে স্থান পাইয়াছে।

'বঙ্গদর্শন' হইতে শুরু করিয়া 'বঙ্গশ্রী' পর্য্যন্ত প্রায় তেইশখানি সুপরিচিত অল্পপরিচিত পত্রপত্রিকায় হরপ্রসাদের অসংখ্য বাঙ্গালা রচনা ছড়াইয়া ছিল। হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙ্গালা রচনার সংগ্রহ প্রস্তুত করিবার জন্য দিনের পর দিন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বসিয়া এই বহুবিক্ষিপ্ত রচনাগুলি নকল করিতে হইয়াছে। শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত রাধামাধব চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত অমরকুমার দে ও শ্রীযুত শৈলজাশঙ্কর মজুমদার বিশেষ যত্ন সহকারে এই শ্রমসাধ্য কার্য্যটী সমাধা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রথম সম্ভারের অধিকাংশের প্রথম প্রুফ দেখিয়াছেন শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এবং অর্দ্ধেক অংশের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রুফ দেখিয়াছেন শ্রীযুত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র গ্রন্থের মেক্‌আপ প্রুফ দেখিয়াছেন শ্রীমতী লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শেষ মেশিন প্রুফ দেখিয়াছেন তিনি ও শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইঁহারা প্রত্যেকেই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। বিশেষ ভাবে যাঁহারা মেশিন প্রুফ দেখিয়া অনেক গুরুতর ছাপার ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের শেষে হরেক রকম ভ্রম সংশোধনের দীর্ঘ তালিকা যোগ করিবার অপ্রীতিকর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সম্পাদকের নিকট হইতেই নহে, পাঠকবর্গের নিকট হইতেও ধন্যবাদ আশা করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত রমেন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের নামটী উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। প্রুফ দেখার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, এবং বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও, ইনি কৌতূহলবশে কোনও ফর্ম্মার প্রুফ পড়িতে পড়িতে, কোন স্থানে কোনও শব্দের বানান-ভুল দেখাইয়া দিয়া শব্দের অর্থবিভ্রাট নিবারণে সহায়তা করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা যাহাতে নির্ভুল ও সুন্দর ছাপা হয়, সেজন্য প্রেসের কর্ম্মীরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন নাই। অনেক সময় ছাপা বন্ধ রাখিয়াও তাঁহারা খারাপ টাইপ বদলাইয়া দিয়াছেন এবং ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়াছেন। কোন-কোনও ক্ষেত্রে ছাপা চলিবার সময়ে, মূল পাঠে বন্ধনীর মধ্যে কিম্বা পাদটীকায় কিছু যোগ করিবার জন্য, মেশিন হইতে গোটা ফর্ম্মা নামাইয়া কিছুটা নূতন কম্পোজ করিয়া সবটা ঢালিয়া সাজাইতে হইয়াছে, এবং এই কষ্টকর কাজটী ইঁহারা সানন্দেই করিয়াছেন। ইঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল থাকিয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ পাদটীকায় ব্যবহৃত বাঙ্গালা বর্জাইস টাইপগুলি এমনই যে, স্মলপাইকা টাইপের সহিত একত্রে ছাপিবার কালে ইহাদের অঙ্গবৈকল্য, এবং এমন কি, সময়-সময় অন্তর্দ্ধানও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। প্রতিষ্ঠাবান্ টাইপ ফাউণ্ড্রির প্রস্তুত টাইপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও এইরূপ ঘটিয়াছে, এবং তাহার ফলে কোন-কোনও ফর্ম্মা ছাপা হইবার পর বাতিল করিয়া পুনরায় নূতন কম্পোজও করিতে হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ঐ একই কারণে ভুল থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তবে সে ভুল পাঠকেরা সহজেই ধরিতে পারিবেন।

'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র সঙ্কলনকার্য্যে ও ইহার প্রথম সম্ভারের প্রকাশনা ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, এসিয়াটিক সোসাইটী ও তাহার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শিবদাস চৌধুরী, ফার্ম্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর মিত্র,

আবশ্যকীয় সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা ও ইংরেজী গ্রন্থ-পুঁথি-পত্রাদি সরবরাহ করিয়া কিম্বা দেখিবার সুযোগ দিয়া, সম্পাদনার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। এই মূল্যবান্ সাহায্যের জন্য ইঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সমগ্র রচনাবলীর সম্পাদনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহা আমি ঋষিঋণ পরিশোধের কর্ত্তব্য ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্যে যিনি আমার সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহার কথা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলাল প্রকাশকের পক্ষ হইতে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার মুদ্রিত পাঠের নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া ও বহু ব্যাসকূটের সমাধান করিয়া প্রস্তুত গ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষরূপে বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রত্যেক পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিকের নিকট সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ-গুলির যে যে স্থান হইতে শ্লোক সূত্র ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, সেইগুলি খুঁজিয়া বাহির করা ও নির্ভুল করিয়া সেগুলির সংশোধন করা; শাস্ত্রী মহাশয়ের কোনও বিশেষ রচনার উপর যাহাতে আলোকপাত এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের আলোচিত বস্তু আরও পরিস্ফুট হয়, সেইজন্য তিনি অতন্দ্র পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বয়সে তরুণ এবং তাঁহার তরুণোচিত এই উদ্যমের সহযোগিতা না পাইলে, ৬৬ বৎসর বয়সে এবং কর্ম্মব্যস্ত জীবনে আমাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হইত। যদি এই সংস্করণে পাঠকগণের পক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার রস আস্বাদনে বিশেষ সহায়তা ঘটে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জানানো আবশ্যক মনে করি যে, তাহাতে শ্রীমান্ অনিলকুমারেরই কৃতিত্ব অনেকখানি।

রাস-পূর্ণিমা,
১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ

এই খণ্ডে 'বিবিধ' পর্য্যায়ে যে রচনাগুলি প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল, সেগুলি সাধারণভাবে রচনাকাল ধরিয়া সাজানো হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা হিসাবে আমরা হরপ্রসাদের পরিণত বয়সের দুইটী নিবন্ধ দিলাম। পরবর্ত্তী জীবনের রচনা প্রথম জীবনের রচনার পূর্ব্বে মুদ্রিত করিয়া সংগ্রহ আরম্ভ করার পক্ষে যুক্তি এই যে, এই দুইটীতে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিজের প্রথম জীবনের কতগুলি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ নিজের লেখার মধ্যে কোথায়ও নিজেকে প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঐতিহাসিক—নৈর্ব্যক্তিক। সেই কারণে তাঁহার জীবনকথার আলোচনার জন্য এইরূপ রচনার সার্থকতা আছে, এবং আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের কথায় তাঁহার জীবনের দুই একটী পৃষ্ঠা পাঠক সমক্ষে ধরিয়া দিয়া, শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র বাঙ্গালা রচনা-সংগ্রহের 'শ্রীগণেশায় নমঃ' করিলাম।—সম্পাদক—।

পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড

১৯২৩ সালের এপ্রেল মাসের শেষে আমি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে পুষ্করিণী ও হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুইটী পান্থশালা মহামহিম রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠার্থ জেমোগ্রামে যাই। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় আমার আতিথ্যের ভার লন। শুক্র, শনি, রবি, সোম চারিদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকি। নিজের বাড়ী থাকিলে যতটা স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায় ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীতে তাহা অপেক্ষা অধিক বই অল্প স্বচ্ছন্দতা পাই নাই। তাঁহার চাকরটিকে কখনও ভুলিতে পারিব না। সে আমার খুব যত্ন করিয়াছিল। শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু জলধর সেন ঐ বাড়ীতে বাসা পান এবং রবিবারে স্বয়ং লালগোলার রাজাও ঐ খানেই আসেন, কিন্তু দুর্গাদাস বাবুর যত্ন ভাগ হইয়া গেলেও যেন আমাদের সকলেরই উপর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। দারুণ রৌদ্র ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত, ঘরের বাহির হওয়া যায় না। তাহাতে রাঢ়দেশ ভয়ানক টানের দেশ, তথাপি আমরা কদিন বেশ সুখেই ছিলাম। আতিথ্যের জন্য প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল; শুদ্ধ যে ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ী তাহা নহে, জেমোর সকল বাড়ীতেই বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। মোটরকার সমস্ত সময়ই মোতাএন থাকিত। যাহার যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইত।

রবিবার ৫টার সময় রামেন্দ্রবাবুর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজা বাহাদুর, আরও অনেক অনেক স্থানীয় ও জেলার বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোক পুষ্করিণী ও পান্থনিবাসের মধ্যস্থলে মিলিত হইয়াছিলেন। স্থানটী অতি মনোরম। কান্দীর স্কুলের একটু দক্ষিণে একটী ছোট খাল—খালের উপর একটী পুল—পুলের একটু দক্ষিণে পান্থশালা ও তাহার দক্ষিণে পুষ্করিণী। মাঠ তিনদিকে ধূ ধূ করিতেছে—উত্তরে স্কুল কোর্ট কাছারী ডাকবাঙ্গালা ও কয়েক জন উকীলের বাড়ী। সামিয়ানার নীচে বেঞ্চ ও চেয়ার সাজান। কিন্তু চারিপাশে বেশী লোকই দাঁড়াইয়া। রৌদ্রে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইয়াছিল, রৌদ্র পড়িল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। বক্তৃতা অনেকেই করিয়াছিলেন, আমি শুদ্ধ তাঁহার প্রতিভার কথাই বলি। বক্তৃতাগুলি সবই বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর দেশের লোক

তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। আমার এক এক বার বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। পান্থনিবাসের দোয়ার খোলা হইলে খানিকক্ষণ সেখানে থাকিয়া আমরা আপন আপন স্থানে গেলাম।

রামেন্দ্রবাবু জীবিত থাকিতে আমার অনেকবার কান্দী যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইবার কথা বলিয়াও ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকিয়া যায়, ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি রাখিতে আমায় জেমোকান্দী যাইতে হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইস্কুল এ্যাঙ্গ্‌লো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর, খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম—সব জায়গায়ই যাইতাম। নানা বাগান হইতে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলিতাম—নানা পুষ্করিণী-স্নান করিতাম। সে সকল কথা আমার স্মৃতিপটে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই শেষ বয়সে কান্দী যাবার জন্য আমার এই ঝোঁক। গিয়া দেখিলাম কান্দীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আগে রাধাবল্লভের বাড়ীর চারিদিকেই সহর ছিল—এখন আদালতের চারিদিকে সহর হইয়াছে—আগে যেখানে মাঠ ধান বন ছিল এখন সেখানে কোটাবাড়ী হইয়াছে, আর যেখানে অনেক কোটাবাড়ী ছিল সেখানটায় কোটাবাড়ী আছে। কিন্তু বড় বেমেরামত আছে। পুকুরগুলি প্রায় দামে ঢাকিয়া গিয়াছে। রাধাবল্লভের নহবৎখানা পড়িয়া গিয়াছে। রাজাদের যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল তাহা পড়িয়া গিয়াছে—খানিক খানিক জায়গা লইয়া নূতন বাড়ী হইয়াছে। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল, তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী ছিল, জগন্নাথের মন্দির ছিল, আর কত যে ফুল গাছ ছিল বলা যায় না। বাগানের পাঁচিলের কোথাও কোথাও চিহ্ন আছে, জগন্নাথদেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাগান ভাঙ্গিয়া বাজার হইয়াছিল, এখনও আছে। সহরটা বাগানের দক্ষিণে অনেক দূর বাড়িয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়ীটাতে ছিলাম সে বাড়ীটা ঠিক তেমনই আছে। একজন সম্ভ্রান্ত উকীল এখন সেই বাড়ীতে থাকেন। আমরা যেদিন যাই সেদিন তাঁহার পরিবারেরা বাড়ী ছিলেন না। তিনি আমাদের অবাধে সকল ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে দিলেন, ছাতে উঠিতে দিলেন। ৬২ বৎসরের পর সেই বাড়ী সেই ভাবে আছে দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল যেন আবার সেই ছেলেবেলায় সেই সুখের দিনে ফিরিয়া আসিলাম। পাশের বাড়ীগুলিও ঠিক সেই রকমই আছে।

ইস্কুলে আসিয়া এ্যাডমিসন রেজিষ্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমার ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাএরাও সেই দিনে

ভরতি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আমাদের এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া গেলেন—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল হাজরা। পরস্পর আলাপ হইল, আমরা দুজনে খুব প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পুরাণ বেড়াইবার জায়গাগুলি অনেক দেখাইলেন। তিনিও এখন পেন্সনার। কিন্তু তিনি আমার মত ভবঘুরে হন নাই। তিনি কান্দীর আদালতেই চিরদিন চাকরী করিয়াছেন এবং সেইখান হইতে পেন্সন লইয়াছেন। আর দশদিন থাকিলেও বোধ হয় আমাদের সব পুরাণ জায়গাগুলি দেখা হইত না। কিন্তু সকলে যেদিন চলিয়া আসিলেন আমাদেরও সেই দিনই চলিয়া আসিতে হইল। কলিকাতা হইতে ৩১ জন সাহিত্যসেবী রামেন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় গিয়াছিলেন। সকলেই রামেন্দ্রের আত্মীয়, সুতরাং আমারও আত্মীয়। ইঁহারাও সব জেমোয় ছিলেন। ও কদিন জেমো যেন উৎসবময় হইয়া গিয়াছিল। সব রাজারাই বিপুল আয়োজন রাখিয়াছিলেন। সবাই বিশেষ রূপ আতিথ্য করিয়াছিলেন—আহারের সময় ৬০।৬৫ টা বাটী প্রত্যেক পাতে পড়িত, কিন্তু যেদিন রাধাবল্লভের প্রসাদ পাওয়া যায় সেদিন আরও বেশী—সেদিন ৭৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত বাটী ছিল—অথচ রাধাবল্লভ নিরামিষাশী, লঙ্কা খান না, হলুদ খান না।

পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড এখনও এখানে আছে বলিয়া মনে হইল।

এখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসোজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটার, তিনি মুখে মুখে পদ্য লিখেন, তাঁহার কাগজও পদ্যে। তিনি এক আধারে এডিটার, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটার, ডেস্পাচার—তিনি কেবল সবস্ক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ক্লাসের ভাঁড়। কিন্তু ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকেই হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।

জেমো ও কান্দী হইতে ফিরিবার সময় মনটা বেশ একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

আরও এক কথা—সোমবার সকালে কান্দী ইস্কুলের পারিতোষিক দান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি আমায় আহ্বান করায় আমি কৃতার্থ মনে করিলাম। কান্দীর লোকে, মাষ্টার মহাশয়েরা, বিশেষ হেডমাষ্টার বাবু বেশ আয়োজন করিয়াছিলেন। ছেলেদের রিসাইটেশন গান পাঠ সব বেশ হইয়াছিল। হাজরা পাড়ার একটি ছেলে "ব্রজ গোপিকানন্দ" ধুয়া ধরিয়া একটী গান গাহিল, তাহা আমার কানে এখনও লাগিয়া আছে। রামেন্দ্রবাবুর দৌহিত্র 'রে সতী রে সতী কান্দিল পশুপতি' এই গানটী গাহিল। তাহাও বেশ হইয়াছিল। মহারাজা ছেলেদের অনেক উপদেশ দিলেন। পাঁচকড়ি ও আমি ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালা পড়িতে বলিলাম। মহারাজা আমাদের প্রতিবাদ করিলেন। সকালটা বেশ কাটিয়া গেল।

[২রা জুলাই, ১৯২৩]

মাঘ, ১৩৪০

তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। আমার এক এক বার বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। পান্থনিবাসের দোয়ার খোলা হইলে খানিকক্ষণ সেখানে থাকিয়া আমরা আপন আপন স্থানে গেলাম।

রামেন্দ্রবাবু জীবিত থাকিতে আমার অনেকবার কান্দী যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইবার কথা বলিয়াও ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকিয়া যায়, ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি রাখিতে আমায় জেমোকান্দী যাইতে হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইস্কুল এ্যাঙ্গ্লো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর, খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম—সব জায়গায়ই যাইতাম। নানা বাগান হইতে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলিতাম—নানা পুষ্করিণী-স্নান করিতাম। সে সকল কথা আমার স্মৃতিপটে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই শেষ বয়সে কান্দী যাবার জন্য আমার এই ঝোঁক। গিয়া দেখিলাম কান্দীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আগে রাধাবল্লভের বাড়ীর চারিদিকেই সহর ছিল—এখন আদালতের চারিদিকে সহর হইয়াছে—আগে যেখানে মাঠ ধান বন ছিল এখন সেখানে কোটাবাড়ী হইয়াছে, আর যেখানে অনেক কোটাবাড়ী ছিল সেখানটায় কোটাবাড়ী আছে। কিন্তু বড় বেমেরামত আছে। পুকুরগুলি প্রায় দামে ঢাকিয়া গিয়াছে। রাধাবল্লভের নহবৎখানা পড়িয়া গিয়াছে। রাজাদের যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল তাহা পড়িয়া গিয়াছে—খানিক খানিক জায়গা লইয়া নূতন বাড়ী হইয়াছে। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল, তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী ছিল, জগন্নাথের মন্দির ছিল, আর কত যে ফুল গাছ ছিল বলা যায় না। বাগানের পাঁচিলের কোথাও কোথাও চিহ্ন আছে, জগন্নাথদেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাগান ভাঙ্গিয়া বাজার হইয়াছিল, এখনও আছে। সহরটা বাগানের দক্ষিণে অনেক দূর বাড়িয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়ীটীতে ছিলাম সে বাড়ীটী ঠিক তেমনই আছে। একজন সম্ভ্রান্ত উকীল এখন সেই বাড়ীতে থাকেন। আমরা যেদিন যাই সেদিন তাঁহার পরিবারেরা বাড়ী ছিলেন না। তিনি আমাদের অবাধে সকল ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে দিলেন, ছাতে উঠিতে দিলেন। ৬২ বৎসরের পর সেই বাড়ী সেই ভাবে আছে দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল যেন আবার সেই ছেলেবেলায় সেই সুখের দিনে ফিরিয়া আসিলাম। পাশের বাড়ীগুলিও ঠিক সেই রকমই আছে।

ইস্কুলে আসিয়া এ্যাডমিসন রেজিষ্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমার ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাএরাও সেই দিনে

ভরতি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আমাদের এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া গেলেন—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল হাজরা। পরস্পর আলাপ হইল, আমরা দুজনে খুব প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পুরাণ বেড়াইবার জায়গাগুলি অনেক দেখাইলেন। তিনিও এখন পেন্সনার। কিন্তু তিনি আমার মত ভবঘুরে হন নাই। তিনি কান্দীর আদালতেই চিরদিন চাকরী করিয়াছেন এবং সেইখান হইতে পেন্সন লইয়াছেন। আর দশদিন থাকিলেও বোধ হয় আমাদের সব পুরাণ জায়গাগুলি দেখা হইত না। কিন্তু সকলে যেদিন চলিয়া আসিলেন আমাদেরও সেই দিনই চলিয়া আসিতে হইল। কলিকাতা হইতে ৩১ জন সাহিত্যসেবী রামেন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় গিয়াছিলেন। সকলেই রামেন্দ্রের আত্মীয়, সুতরাং আমারও আত্মীয়। ইঁহারাও সব জেমোয় ছিলেন। ও কদিন জেমো যেন উৎসবময় হইয়া গিয়াছিল। সব রাজারাই বিপুল আয়োজন রাখিয়াছিলেন। সবাই বিশেষ রূপ আতিথ্য করিয়াছিলেন—আহারের সময় ৬০।৬৫ টা বাটী প্রত্যেক পাতে পড়িত, কিন্তু যেদিন রাধাবল্লভের প্রসাদ পাওয়া যায় সেদিন আরও বেশী—সেদিন ৭৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত বাটী ছিল—অথচ রাধাবল্লভ নিরামিষাশী, লঙ্কা খান না, হলুদ খান না।

পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড এখনও এখানে আছে বলিয়া মনে হইল।

এখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসোজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটার, তিনি মুখে মুখে পদ্য লিখেন, তাঁহার কাগজও পদ্যে। তিনি এক আধারে এডিটার, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটার, ডেস্পাচার—তিনি কেবল সবস্‌ক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ক্লাসের ভাঁড়। কিন্তু ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকেই হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।

জেমো ও কান্দী হইতে ফিরিবার সময় মনটা বেশ একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

আরও এক কথা—সোমবার সকালে কান্দী ইস্কুলের পারিতোষিক দান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি আমায় আহ্বান করায় আমি কৃতার্থ মনে করিলাম। কান্দীর লোকে, মাষ্টার মহাশয়েরা, বিশেষ হেডমাষ্টার বাবু বেশ আয়োজন করিয়াছিলেন। ছেলেদের রিসাইটেশন গান পাঠ সব বেশ হইয়াছিল। হাজরা পাড়ার একটি ছেলে "ব্রজ গোপিকানন্দ" ধূয়া ধরিয়া একটী গান গাহিল, তাহা আমার কানে এখনও লাগিয়া আছে। রামেন্দ্রবাবুর দৌহিত্র 'রে সতী রে সতী কান্দিল পশুপতি' এই গানটী গাহিল। তাহাও বেশ হইয়াছিল। মহারাজা ছেলেদের অনেক উপদেশ দিলেন। পাঁচকড়ি ও আমি ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালা পড়িতে বলিলাম। মহারাজা আমাদের প্রতিবাদ করিলেন। সকালটা বেশ কাটিয়া গেল।

২রা জুলাই, ১৯২৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটী ষ্টেশন হ'তে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ী প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়ীতে রাধা-বল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়াগাছা পরগণায় রাধা-বল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুই ঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিম-বাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটী মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট দশ খানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে-ভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়োর ও খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশী, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনূমান, কট্‌কটে ব্যাঙ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটী বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রী হয়—নানারকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল-সার গাছ এবং গোলাপ যুঁই জাঁতি বেল নবমালিকা কামিনী গন্ধরাজ মুচুকুন্দ বক্ কুরূচি কাঞ্চন টগর সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আটদিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোন গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এ সব ত ছিলই; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ্‌ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসী-কাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ্‌ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কুঞ্জ ছিল; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা, অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ী লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আটদিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধা-বয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেইদিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটীকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জম্‌জমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটী শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটীর দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিম দিকে একটী ঘর, তাহাকে বঙ্কিম-বাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির-সংলগ্ন একটী বড় দালান, উহা পূর্ব্বদিকে দুটী দরজা একেবারে খোলা জমীতে

পড়িয়াছে, আর পশ্চিম দিকে দুটী জানালা, ঘরটী খুব পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটী ঘর। দালানটী যতখানি লম্বা, ঘর দুটীও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটীতে একখানি খাট থাকিত। পূবের ঘরটীতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটীতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পূবের ঘরটীতে একা বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটীতে দুই একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটীতে দালানযোড়া একটী ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময় সময় অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটী দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ সব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোন নিদর্শন এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটী ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটী একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটীও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটী আলসে ও তাহার নীচে একটী বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটী চৌকা গাঁথান, হাতখানেক উচা, তাহারও আবার মাঝখানে একটী ছোট চৌকা হাতখানেক উচা, তাহারও মাঝখানে আবার একটী চৌকা হাতখানেক উচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমী ছিল, তাহাতে শুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমীতে যুঁই জাঁতি কুঁদ মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটীকে বড়ই ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন বাগানটী খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটীতে ঠেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনী ফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলে-পিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না। একবার ধরণীকথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম।

টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণীকথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ীর পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়ীতে তেমন হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটী বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ী হইতে কিছুদূর, পুবদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরণীকথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সেদিকে যাই নাই। চারি পাঁচদিন ধরণীকথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই। তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটী পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর'। কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালে প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ্ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর সার রিচার্ড টেম্প্‌লকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেননা একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারসিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরী পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটা টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটা টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ. মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ. আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটী স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীর ভাবে, বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমুল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চার বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সেজন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটীর কথা উঠিলে তিনি সেটী দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই

শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টী কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কে?" তিনি বলিলেন, "এটীর বাড়ী নৈহাটী, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হাঁ।" তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটী বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয়? কেন?" "শুনিয়াছি কামিনী গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটী? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটী রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটী প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গালা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে" বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটী পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটী পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে

তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও আচারব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল "রামফক্কড়।" নৈহাটী ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়ীতেই তাঁর অবারিতদ্বার ছিল। তিনি সব বাড়ীতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ী যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। এক দিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিল, "তুমি বঙ্কিমকে কি দিয়া আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "একটা লেখা।" সে বলিল, "তাই বটে। বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল 'নন্দর ভাইটী বেশ বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছে'। তুমি সেখানে যাও না কেন? বোধ হয় গেলে সে খুসী হ'বে।" রাম বাঁড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হ'য়েছে! তুমি এমন বাঙ্গালা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন, "ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরও কয়েকটী পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টী লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোণা।" বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটী হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই এক জন পড়িতেন,

তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্ত্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স" (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে, তখন সব অন্ধকার ছিল। তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারত-মহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়; কেন না, বঙ্গদর্শনের গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে ছিল, গ্রাহকেরাও বঙ্গদর্শনের টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক্ বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের

সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটীগিরিটী যায়। * তখন দিন কতক তিনি সব্‌রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্যলোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সহি করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কয়েকটী পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রীক্ট টাউন্স এক্ট' পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটীতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে; সঙ্কল্প হইল ৩০০৲ মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ্‌সাহেব বলিলেন, "আরও ৭৫৲ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গালা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে, বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-law's-Lane বলিতে হইবে।" জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black-footed Friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজসাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটী হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস্।" সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহ খানেক পরে খবর আসিল, জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাহার নাম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন। বলিলেন, "রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই আমার বাড়ীতে নাই। বৌঠাকুরাণীরা অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন, এখন পুত্রেরা বড় হইয়া কতকগুলি আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন, আমার এত যত্নের জিনিস একখানিও বাড়ীতে নাই।

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবিবন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম, দেখিলাম চুঁচুড়ার যোড়া-ঘাটের উপর দুইটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, একটীতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটীতে তিনি নিজে বসেন। যেটীতে তিনি বসেন, সেটী একতালা, বাড়ীটীর একটী গেট আছে। যে ঘরটীতে তিনি বসেন, তাহা একটী বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটী জানালা। সে ঘরের পূর্ব্বের দেওয়ালটী গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়া ছিলেন, সেদিন তার নীচেও খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটীর কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটী কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটীর নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি"—অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিনজন কবি বাইরন্, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

নারায়ণ
বঙ্কিমস্মৃতিসংখ্যা
বৈশাখ, ১৩২২

এই প্রবন্ধটী হরপ্রসাদের প্রথম রচনা এবং বাঙ্গালা ভাষার পুরাতন গবেষণাত্মক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কৃতির রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে (পৃঃ ৯-১২)। পুস্তকাকারে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দে। কিন্তু এই সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য—অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। বইখানির সমাদর হয়, এবং তিনটী সংস্করণও হইয়াছিল। প্রস্তুত পুনর্মুদ্রণ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সযত্নে সংশোধিত' 'তৃতীয় সংস্করণ' হইতে করা হইয়াছে।—সম্পাদক—।

ভারতমহিলা

প্রথম অধ্যায়

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যেহেতু কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন নূতন পদার্থ নির্ম্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমকালীন সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণিত নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে কোনরূপেই প্রকৃত সমাজচিত্র বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনাপ্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ। কেবল স্মৃতিসংহিতাসকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানে রক্ষা করিতে হইত

প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন পুরুষের অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাঁহাদিগকে দিনরাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রামসময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার নিদেশমত

কার্য্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতামাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয়-বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।" বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন প্রাচীন স্ত্রীলোক তরুণবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে, রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধপথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন। পৈঠীনসি বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে।" এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঋষিরা পরম যত্নে ও সাবধানে স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তী ছিল না

যদিও স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য ঋষিরা এত ব্যগ্র, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবের অদৃষ্ট-ভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্যগ্রন্থসকলে যে "শুদ্ধান্ত," "অন্তঃপুর," "অবরোধ" ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০।৮০০ বিবাহ করিবে, তাহাদের অবরোধ সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্য্যগণ প্রায়ই একটীমাত্র বিবাহ করিতেন এবং নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থতা নাই।" স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তী ছিল না তাহার আরও প্রমাণ এই যে, অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই নিয়ম থাকায় প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না, কোন সমাজ বা উৎসবস্থলে উপস্থিত হইবে না। ক্রীড়া করিবে না, হাস্য করিবে না এবং শরীরসংস্কার করিবে না।" অতএব, স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

---

* ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক, সেই-রূপ স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কিরূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এবং এক স্থলে দেখা যায়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ, কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকেও দেখা যায় যে, এক জন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর একখানি নাটকে কামন্দকী ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কামন্দকী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী, কিন্তু তিনি যে সময়ে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয়, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বতী বাল্যকালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়—

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী গণিতশাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সারসবাণী তাঁহাদের বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন। কর্ণাটদেশীয় রাজার মহিষী কবিত্ববিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে লিখিত হয়। উহাতে তৎকালপ্রসিদ্ধ কবিগণের ৫টী করিয়া কবিতা উদ্ধৃত আছে। এই কবিবৃন্দের মধ্যে ভাবদেবী, চণ্ডালবিদ্যা, সাটোপা, শিলা, ভট্টারিকা, বিদ্যা, বিজয়া, বিকটনিতম্বা ও ব্যাসপাদা এই কয় জনের নাম আছে। ইঁহারা তৎকালে কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স্ত্রীলোকের বিবাহ

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ইহাই সকল মুনির মত। কিন্তু

কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন, তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে (মনু)। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, নচেৎ নরকে যাইতে হয়, এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,

"নানাগুণবিশিষ্ট বেদবিৎ সমান বর্ণের পুরুষ বর হইবে। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে হইবে, তিনি যেন যুবা ধীমান ও লোকের প্রিয় হন।"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটীর বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে, যথা "যুবা" অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না। "ধীমান" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে। "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বরপরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয়, তবেই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরও বলিয়াছেন, যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায়, তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিবে, তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার

"পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন, এবং তাহাদিগের বেশভূষা করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয়, সেইখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্য্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীলোকেরা শোক করে, সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতি ইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে ভূষণ, আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগকে 'পূজা' করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সে কুলে কল্যাণ হয়" ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন, মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ; অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোনরূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" আর এক

জন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোককে শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, ইতর প্রাণীদিগেরও স্ত্রীজাতি মনুষ্যের অবধ্য, * মনু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে।

উপরিলিখিত প্রবন্ধ পাঠে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পুর্ব্বপিতামহগণও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানাস্থানে দেখা যায়, "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ, উহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে; হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না, অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না" (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ); এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্যদিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পুর্ব্বকালের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন, অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাঁহারা সতী, তাঁহাদের ত কথাই নাই, "যেখানে যেখানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে, আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম" (কাশীখণ্ড), কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়াছে।"

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কাণা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজ্য ও ইষ্টদেবতা। তাঁহার চরণসেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরমগতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতামাতার সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না। আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদিকার্য্যে দক্ষ

* অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যক্‌জাতিগতেষ্বপি।

হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। তাহার দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে সকল গৃহধর্ম্ম কি, বহ্নিপুরাণে তাহার এক বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

"স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে, তাহার পর স্বামী ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় অথবা জলের দ্বারা উঠান পরিষ্কার করিবে ও গৃহের কাজকর্ম্ম শেষ করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া দেবতা ব্রাহ্মণ ও পতির পূজা করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। সমস্ত গৃহকার্য্য শেষ হইলে অতিথি ও স্বামীর ভোজনান্তে পরমসুখে নিজে ভোজন করিবে।"

এই স্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসকলের উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে, তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল, জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁহারা ঐগুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার উপর অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায়, সেই সকল গুণ থাকিলেই তাঁহাকে অতি উন্নতচরিত্রা বলিতে হইবে।

স্ত্রীর ধনাধিকার

স্ত্রীলোকের ধনাধিকারবিষয়ে নিয়ম এই; স্ত্রীলোক নিজে উপার্জ্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন, তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, অর্থাৎ দান বিক্রয় ক্ষমতা নাই, কেবল যাবজ্জীবন ভোগমাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন, বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার ধনাধিকারে যথেষ্ট সুবিধা আছে। তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ধনাধিকারবিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যত সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এত অন্য কোন দেশে আজিও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

বিধবার কর্ত্তব্য

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে, পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে; কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণপ্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডুমহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্রবৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, এমন কি মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন, "যে স্ত্রী সহমৃতা হয়, সে স্বামীর সহস্র পাপসত্ত্বেও স্বামীর সহিত সার্দ্ধত্রিকোটি বৎসর স্বর্গবাস করিবে।" পরাশর বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপুর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে। কিন্তু সহমরণ স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও একথার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে, সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল; সত্য বটে, দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জ্বলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিত; সত্য বটে, এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া ইংরেজরাজ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কাহারও কাহারও মতে কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

দুষ্টচরিত্রাদিগের দণ্ড

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃপরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্তহস্তে ব্যয় করিত, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। পরিত্যাগ বলিতে গেলে একেবারে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া বুঝাইত না। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে, তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম বর্ণনীয়। যাঁহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্য্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীস্বভাবের ইঁহারাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডুবধূ দ্রৌপদী, রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয়া। সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্ররক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রলোভনসামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদিগের দেবতা। পতির সেবাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কার্য্য আছে, তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালনও স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণনীয়। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক হইতে সন্তানের উৎপত্তি ও তাহার লালন পালন হয়, অতএব স্ত্রীলোকই লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ উপায়।"

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরও একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্রপরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলাশিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি ব্রাহ্মণদিগের তত মনোগত ছিল না। কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নৃত্যগীতাদি ভদ্রমহিলাদিগের নিত্যকর্ম্মমধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন, "তুমি আমার গৃহিণী ছিলে, সচিব ছিলে, সখী ছিলে, কথার দোসর ছিলে এবং ললিতকলাবিধিতে প্রিয়শিষ্যা ছিলে, করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমায় হরণ করায় বল আমার আর কি রাখিয়াছে।" *

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃতসংহিতায় লিখিয়াছেন, "স্ত্রী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা পতির অনুগমন করিবে। মঙ্গলকার্য্যে সখীর ন্যায় যত্নবতী হইবে, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় তৎপরা হইবে।" †

---

* গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ রঘুঃ

† ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥

এই দুইটী বচনের মধ্যে প্রথমটীতে "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই বিশেষণটী অধিক আছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল, ঋষিগণ আপন স্ত্রী ও কন্যাদিগের নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে তত উৎসুক ছিলেন না।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল, পতিসেবা, গৃহকার্য্য, এবং নৃত্যগীতাদিও স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্ত্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশখানি সংহিতার মধ্যে ৮।৯ খানি অতি স্বল্পায়তন, তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ, উহাতে স্ত্রীধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহস্থধর্ম্মের মধ্যে কয়েকটী মাত্র কবিতা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তারক্রমে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই তিনখানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণুসূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্রধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্ম্মসম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা—

স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত একব্রতচারিণী হইবেন।

বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, স্বামী যে সকল বিষয়ে সঙ্কল্প করিবেন, স্ত্রীলোকেরও সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।

শ্বশ্রূ, শ্বশুর এবং দেবতাদিগের সেবা

টীকাকার লিখিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষসম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন। কারণ, স্ত্রীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটীর সহিত বিরোধ হয়, অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, দেবতা "সৌভাগ্যদাত্রী গৌরীপ্রভৃতি"। সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যাদ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা, বলে ক্ষত্রিয়ের, সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা।

অতিথিসেবা

মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতিথিসেবা একটী। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি-সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর সম্পূর্ণ ভার। গৃহিণী যদি সুন্দর-রূপে অতিথিসেবা করিতে পারিলেন, সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থমহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের

সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক দিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার

কেশববৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শঙ্খলিখিত একটী সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শঙ্খলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটী পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই—

"প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়নসামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান" ইত্যাদি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বহ্নিপুরাণের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থও এইরূপ।

অমুক্তহস্ততা ও সুগুপ্তভাণ্ডতা

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের ধনাধিকার অতি অল্প। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামিসঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয়ব্যয়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু স্বামীর অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। "ব্যয়ে চামুক্তহস্ততা", "ব্যয়বিবর্জ্জিতা", "ব্যয়পরাঙ্মুখী" সকল সংহিতামধ্যেই পাওয়া যায়। যদি স্ত্রী অধিক ব্যয় করেন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, আমি ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন, গৃহস্থমাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মঙ্গলাচারতৎপরতা

মাঙ্গল্যদ্রব্য হরিদ্রাকুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নিকট যে সকল আচার শিক্ষা করিবে, তাহার পালনে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচারগুলি শঙ্খলিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা—না বলিয়া কাহারও বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, বণিক্, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্য ভিন্ন পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। কাহাকেও নাভি

দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এ স্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী শরীরসংস্কার, বিবাহ ও উৎসবদর্শন, হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন—

যদি স্বামী কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন, তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার শঙ্খ-লিখিত একটী সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে সেটীর অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুরাদির গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। প্রোষিতভর্ত্তৃকাদিগের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎসর পর্য্যন্ত একবেণীধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণরসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন—

"তুমি দেখিবে যে, তিনি হয় দেবপূজায় ব্যস্ত আছেন, কিংবা বিরহে আমার শরীর কিরূপ কৃশ হইয়াছে মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাই চিত্রিত করিতেছেন, অথবা মধুরবচনা পিঞ্জরস্থিতা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সারিকে! তুমি তো তাঁহার বড় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?"*

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষপথে দেবারাধনশীলা দ্বারদেশদত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা, আধিক্ষামা সেই যক্ষপত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ, তিনি বিস্তৃত শয্যার একপার্শ্বে শয়ানা আছেন; বোধ হইতেছে যেন, পূর্ব্বগগনপ্রান্তে কলামাত্রশেষ সুধাংশুমূর্ত্তি অবস্থিত। উহাতে আকাশের শোভা বিশেষ হইতেছে না, কিন্তু দর্শকের অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

কোন কর্ম্মে স্ত্রীলোকের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে তাহাদিগের নরকদর্শন হইবে।

* আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥

বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্ম্মনির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দেখা যায়। যথা—"স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস কথা কিছুই নাই। স্বামীর শুশ্রূষা করিলেই স্বর্গে তাহার প্রতিপত্তি হয়। যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে গমন করে। সাধ্বী রমণী স্বামীর পরলোকপ্রাপ্তির পর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।" *

এই প্রস্তাবের মধ্যে দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল সংহিতারই সমালোচন করা হইল। দক্ষসংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যনির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষ-রূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাসসংহিতায় বিষ্ণুসংহিতা অপেক্ষা অনেক বিস্তারক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে শ্রেষ্ঠতালাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃ-কালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভাগার মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর? এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন—

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুষ্ঠিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতা-দিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভি-নিবিষ্টহৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। † অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম।

* নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্ত তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

† নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু॥
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু কলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন।

ব্যাসলিখিত স্মৃতিসংহিতায় আর একটী উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার সবিস্তার অনুবাদ এই—

"পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা অথবা বযস, বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর ব্যক্তিকে দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। * * পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভূ আপনার দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে।

যত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, ততদিন পুরুষকে অর্দ্ধকলেবর বলিতে হইবে। * * বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত গৃহনির্ম্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বদা একমন হইবে, এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গসাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতিদেশ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জ্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নিপরিচর্য্যার কার্য্য করিবে ও গৃহসামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধান করিবে। * * এইরূপে পূর্ব্বানুকৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজনপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ করিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহনীতি বিধান করিবে এবং উৎকৃষ্ট শয্যা আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহার নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্যকর্ম্ম গেল। ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার

পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে। যথা—"স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে, তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয়সংযমে তিনি যেন সর্ব্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা, পরুষবাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কথা বলা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ। তিনি যেন কাহারও সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপবাক্য ব্যবহার না করেন, ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্ম্মার্থবিরোধী কোন কার্য্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, সাহস, চৌর্য্য ও দম্ভ পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।"

ব্যাসসংহিতার এই সুন্দর পরিষ্কার দীর্ঘ বর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতিসংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন কি, এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন লোকের সংস্কার আছে যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এতকাল স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাসসংহিতার বচন কয়েকটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্মমাত্রের ভার ছিল না, তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন, তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাসসংহিতা পাঠ করিয়া বরং মনে হয় যে, স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল, পুরুষের কার্য্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল, তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক যেন নাস্তিক না হয়, এবং আর একজন বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায়, স্পষ্ট অবগতি হইবে যে, নারীগণ পূর্ব্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত একং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বা গুণ নির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেন এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। "পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন, তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গফললাভ হয়। যদি বর্ত্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায়, তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।" স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে, আর পুরুষের

ন্যায় উহাদিগকে তাড়না করার কথাও শঙ্খসংহিতায় আছে*—এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন, প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য। "অনুকূলকারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।" "যাহার রমণী অনুকূল-কারিণী, তাহার এইখানেই স্বর্গ ** এরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ। কিন্তু যদি এক জন অনুরাগী ও আর জন অননুরাগী হয়, তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য, সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্ব্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের মন এক না হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * * জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য্য, সুখ শোষণ করিতে থাকে। সে বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধপতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমনা হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। ইতরা জরা।"

১ম ও ২য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদয় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয়া হইতে পারিতেন, তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। যদিও পিতা যাহাকে ইচ্ছা কন্যাদান করিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্যকার্য্যমাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে, গৃহস্থের যে গুরুতর কার্য্য, সাংসারিক আয়ব্যয় চিন্তা ও ধনসঞ্চয়, তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অনেক কম ছিল, তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদিস্থলে যাইতে পারিতেন।

তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না, তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে সুদ শুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোন স্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না, তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

* লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা॥

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড এক প্রকার বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য লিখিত বলিলেই হয়। কালিকাপুরাণে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের প্রতিফল। ধ্রুবো-পাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র, কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য্যমাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতাসমূহের টীকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন ঋষিরা ততদূর করেন নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে। স্ত্রীলোকেরা যে লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকে না। অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য, আর্য্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভ-মাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেবল পিতৃবংশরক্ষার জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র

বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না; করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তিভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাঁহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা, দয়ালু, গুরুজনে ভক্তিমতী, পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতি-পরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধান ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনরূপ সাহসকর্ম্মে স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামিপুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্য্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে উহার সদর্থেরই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দোনুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভালবাসিতেন। ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর, গৃহদ্বার ও তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না, এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহা হইলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা এদেশীয় কাহারও অবিদিত নাই। এ জন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমানব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "সদ্ব্যবহারদ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে, তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে?" "কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে তৎপরা হইবেন, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইবেন।" কেহ যে বলিয়াছেন, কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য, সেটী তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাসভূমি।

নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি" এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন, স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাঁহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তমরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাঁহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অণুমাত্র অনাস্থাপ্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটী প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটীতে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতিমধ্যে ঋষিরা উদাহরণস্বরূপে একটীও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলী হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস ;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা ; পুরাণ রচনা সময়ে আর্য্যগণের সে তেজস্বিতা ও সেরূপ চরিত্রের ঔন্নত্য ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন, কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর কঠোর নিয়মও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ লিখিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, এ স্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্রনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধ্রী অধিক। কয়েকটী পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণ বলিতেছেন—

রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ (১) সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী (২)।
শতরূপা মনোর্ভার্য্যা (৩) শচীন্দ্রস্য চ গেহিনী (৪)॥
তারা (৫) বৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী (৬)।
অহল্যা গোতমস্ত্রী (৭) চাপ্যনসূয়াত্রিকামিনী (৮)॥
দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য (৯) প্রসূতির্দক্ষকামিনী (১০)।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ (১১)॥

লোপামুদ্রা (১২) তথাহুতিঃ (১৩) কুবেরস্থ তু কামিনী (১৪)।
বরুণানী (১৫) যমস্ত্রী চ (১৬) বলের্বিন্ধ্যাবলীতি চ (১৭) ॥
কুন্তী চ (১৮) দময়ন্তী চ (১৯) যশোদা (২০) দেবকী সতী (২১)।
গান্ধারী (২২) দ্রৌপদী (২৩) শৈব্যা (২৪) সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া (২৫) ॥
বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী (২৬) রাধামাতা কলাবতী (২৭)।
মন্দোদরী চ (২৮) কৌশল্যা (২৯) সুভদ্রা (৩০) কৈটভী তথা (৩১) ॥
রেবতী (৩২) সত্যভামা চ (৩৩) কালিন্দী (৩৪) লক্ষ্মণা তথা (৩৫)।
জাম্ববতী (৩৬) নাগ্নজিতী (৩৭) মিত্রবিন্দা তথাপরা (৩৮) ॥
লক্ষ্মী চ (৩৯) রুক্মিণী (৪০) সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীৰ্ত্তিতা (৪১)।
কলা যোজনগন্ধা চ (৪২) ব্যাসমাতা মহাসতী ॥
বাণপুত্রী তথোষা চ (৪৩) চিত্রলেখা চ তৎসখী (৪৪)।
প্রভাবতী (৪৫) ভানুমতী (৪৬) তথা মায়াবতী সতী (৪৭) ॥
রেণুকা চ ভৃগোর্ম্মাতা (৪৮) হলিমাতা চ রোহিণী (৪৯)।
একানংশা চ (৫০) দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ॥
বহ্ব্যঃ সন্তি কলাশ্চৈবং প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যস্তাঃ সর্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ *

উপরি উক্ত গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই, কারণ শ্রীবৎসপত্নী চিন্তা ও বালিরাজ মহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতরবিশেষ নাই। এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইঁহাদের সকলের চরিত্র-বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইঁহাদের কয়েকজনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডস্থ লোপামুদ্রার চরিত্র কীর্ত্তন পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ জন্য আমরা এই বর্ণনাটী সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উদ্ধৃতি কতকগুলি অংশে খণ্ডিত। তাঁহার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত পুরাণের কতগুলি প্রামাণিক সংস্করণ দেখিয়া আমরা এই অংশের একটী সম্পূর্ণ পাঠ দিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ, যাহা ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যাইবে, তাহাতে মাত্র ৪৭টী নাম তিনি ধরিয়াছেন। কিন্তু মূল পুরাণে সাকল্যে ৫০টী নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যা শক্তির কলা রূপে পরিগণিত। (তুলনীয়ঃ "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৬) কলা বলিয়া সংখ্যায় ৬৪-ই অপেক্ষিত। উপরে উদ্ধৃতির শেষ তিনটী ছত্র শাস্ত্রী মহাশয় ধরেন নাই। কৃষ্ণভগিনী একানংশা দেবীর নামান্তর সুভদ্রা, এবং পুরীধামে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের মূর্ত্তি ব্যতীত প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, একানংশা ও বলরামের পূর্ণাবয়ব দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বিদ্যমান।—সম্পাদক—।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, "হে মুনে! তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়াতুল্যা। ইঁহার কথা শুনিলে অন্যে পবিত্র হয়। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে, এমন আর কাহার নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উশবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয়ুঃ হ্রাস হয়, এই ভয়ে তিনি কখন তোমার নাম গ্রহণ করেন না ; পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন না। 'এই কর্ম্ম কর,' বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, 'স্বামিন্ ক্ষমা কর' বলিয়া, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, 'নাথ কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন ? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন।' দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্ব্বদা দ্বারে গমন করেন না, তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে পূজার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্নভাবে হৃষ্ট মনে যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। তোমার উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গোসমূহ ও ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্ব্বদা তৈজস পাত্র পরিষ্কার রাখেন। তিনি সকল কর্ম্মে দক্ষা ; সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতাচরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত সমাজ ও উৎসবদর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহদর্শনাদি এবং তীর্থযাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাক, তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে কিছু বলেন না। স্নান করিবার পর ভর্তৃবদনমাত্র দর্শন করেন, আর কাহারও মুখ দেখেন না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন, মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করেন। হরিদ্রাকুঙ্কুমসিন্দুরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করেন না, রজকী হৈতুকী আশ্রমত্যাগীর সহিত কখন বন্ধুতা করেন না। যে স্বামীর দ্বেষ করে, তাহার মুখদর্শন করেন না। কোন স্থানে একাকিনী থাকেন না, উদুখল মুষল বর্ষণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক একত্র হইবার সম্ভাবনা, সে সকল স্থলে কখন উপবেশন করেন না। স্বামীর সহিত প্রগল্‌ভতা করেন না। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি, তিনি সেই সেই দ্রব্যেই সর্ব্বদা প্রেমবতী। তাঁহার ধারণা এই যে, স্বামীর বাক্য লঙ্ঘন না করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র যজ্ঞ, একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবপূজা। স্বামী দুরবস্থ হউন, ব্যাধিত হউন, বৃদ্ধ হউন, সুস্থিত

হউন, বা দুঃস্থিত হউন, তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবে, বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণ হইবে। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপই হইবে। ঘৃত লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে 'নাই' এ কথা বলিবে না; এবং তাঁহাকে আয়াস-কর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবে। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী, শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন, তিনি স্বামীর আয়ুঃ হ্রাস করেন এবং মরিয়া নরক গমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দেয়, সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম যে স্বামীর চরণসেবা করিয়া আহার করিবে। কখন উচ্চ আসনে বসিবে না, পরের বাটী যাইবে না, লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়। দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন, তাম্বূল, ব্যজন, পাদসংবাহনা ও চাটুবচনদ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, সেই ত্রৈলোক্য জয় করে। পিতা অল্পপরিমাণে দেন, ভ্রাতাও অল্পপরিমাণে দেন, পুত্রও অল্পপরিমাণে দেন, স্বামী যাহা দেন, তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামিহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি।''

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনী-গণের আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা, এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পগুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ। তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও বর্ণিত আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকজন ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ "যশস্বিনী'' শব্দটী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া সন্তান ক্রোড়ে করিয়া রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন; কিন্তু দুষ্টামী করিয়া কহিলেন, "তুই কুলটা, আমি তোকে কখন চিনি না।" শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে, তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে!

শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষে তাঁহাকে আপন ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন, আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারতে ও রামায়ণে সাধ্বীগণের এরূপ অপূর্ব্ব সাহস দেখা যায় যে, তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা, সকলেই সাহসসহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে, বরং ইহাকে একটী গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপস্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই, এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটী অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজ অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে, তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এইরূপেই অনেক রমণী অভিলষিত পতি লাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশে পরিভ্রমণ করতঃ রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে তপোবনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, তোমার কন্যা সত্যবানকে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে, তুমি সত্যবানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী কহিলেন, * তিনি দীর্ঘায়ু হউন আর অল্পায়ু হউন, গুণবানই হউন আর নির্গুণই হউন, আমি যাঁহাকে একবার বরণ করিয়াছি, তিনিই আমার ভর্ত্তা; আমি অন্য লোককে বরণ করিব না। লোকে একবার বই ভাগ

* দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽথবা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥

লইতে পারে না, কন্যা একবার বই দান করা যায় না, 'দিলাম' এ কথা একবার বই বলা যায় না, এ সকল একবার বই দুইবার হয় না।

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে কৃতনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধ শ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন, এবং নিরন্তর দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা, হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফলমূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্য্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফল রক্ষা কর। আমি তোমার ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন যে সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূতদিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সাবিত্রি, তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মূল শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন, "স্বামীর সমীপে আমার শ্রম কোথায়? * স্বামী যে স্থানে গমন করিবেন, আমিও সেইখানে যাইব। হে সুরেশ, আপনি আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইতেছেন, আমি তথায়ই গমন করিব।"

কিয়দ্দূর গমন করিয়া যমরাজ বলিলেন, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা

* শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবম্।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ…………………॥

কর। তিনি বলিলেন, যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয়, করুন। যমরাজ "তথাস্তু" বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন। সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন, "তুমি বাটী ফিরিয়া যাও, সেখানে তুমি রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ।" সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন, "স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায়? আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন, আমার স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। স্বামী বিনা আমার সুখে কাজ নাই। † স্বামী বিনা আমার সৌভাগ্যে কাজ নাই। স্বামী বিনা আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না। স্বামিহীন জীবন আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।"

তখন যমরাজ জানিলেন, সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান জীবনপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, "উঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।" এই বলিয়া সত্বরপদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিতবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, সাবিত্রী প্রাচীনকালের রমণীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা ছিলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার এক জন সারথির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন, তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্তবিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিনী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য, রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান তখন একজন অন্ধমুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণপোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে।

একবার সত্যবানকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন, শুনিলেন না। বলিলেন, এ সকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধ শ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা এক দিনের জন্যও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু

† ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখম্
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ম্।
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্
ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥

সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজ বর দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভবর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামীবিয়োগে অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন, সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন; তাহা হইলে তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয়া হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাঁহাকে বিবাহ করেন? কোন্ রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাতসময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ়নিশ্চয়া হইতে পারেন? এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন?

স্মৃতিসংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে, সাবিত্রীর তাহা সকলই ছিল। তাহার উপর তাঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহাকে সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয়, সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী, সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শেষোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী, দয়মন্তী ও সীতা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী, প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। তিনি শোকজর্জ্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে থাকিয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করেন এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন, এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরিউক্ত দুইটী কার্য্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য ও বিশুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর সদৃশ। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটী প্রশংসনীয়া কামিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন, তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয়যজ্ঞ হইল, ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠিরের দোষে রাজ্য গেল, ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন, সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যার পর নাই অবমাননা করিল। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জ্জুনের আরও ভার্য্যা ছিল, ভীমেরও ছিল, সকলেই আপন আপন বাটী রহিল, কেবল দ্রৌপদী স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন; যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন; সর্ব্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। একদিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী আর আছে? যদিও দ্রৌপদী কোনরূপে অসহ্য বনবাসযন্ত্রণা সহ্য করিলেন, তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রুবাহনহস্তে অর্জ্জুনের পরাভব হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। যদিও তাঁহার পঞ্চ স্বামী হইয়াছিল, তিনি সেই পঞ্চ স্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।"

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন, তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন, বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, আমায় না লইয়া বনে যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত নহে।* তোমার সহিত তপস্যাই করি, আর বনেই বাস করি, সেই আমার স্বর্গ।

* স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥
ন চ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥
কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তুলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। তুমি আমায় যে কুশ-কাশ-শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও কণ্টকীবৃক্ষের ভয় দেখাইতেছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সহিত গমনকালে তাহাদের স্পর্শ তূলা ও অজিনের ন্যায় কোমল হইবে। এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা। বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন্! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু তাঁহার সে সকল কষ্ট কেবল রাম-মুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমনসময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাকস্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ, ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে; সীতা তাহাকে কেবল বলেন, রাম নামে পরম ধার্ম্মিক পুরুষ, তিন লোকে বিখ্যাত, তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও নয়ন বিশাল, তিনিই আমার স্বামী ও আমার দেবতা।*

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল, তুমি যদি আর একমাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর, তোমার মাংস ভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, আমার এ শরীর সংজ্ঞাশূন্য,

* রামো নাম স ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম ॥

তুমি ইচ্ছা হয় ইহাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয় ইহাকে নাশ কর, আমি আমার শরীর ও জীবন কিছুই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। †

হনুমান আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন; রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপনগুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনুমানকে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনুমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল, রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, সীতে! আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি, শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশস্বরে কহিলেন, জানকি! আমার কর্ম্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, স্বামিন্, তুমি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলে। আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি, তোমার দূত হনুমান সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে? তুমি যে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সে কথা একবার মনেও করিলে না! আমার স্বভাব ও ভক্তির কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলে?*

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "যেহেতু আমার মন কখনও রাম হইতে অপনীত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষী

† ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি রাক্ষস ॥

* ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥

পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু রামচন্দ্র আমায় শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানেন, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রেরই সেবা করিয়াছি, অন্য কাহারও কথা কখন মনে করি নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন।"†

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে এক জন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল, রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতাপরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রমগমনব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগসংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, নিরন্তর নিতান্ত দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহযন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।" পুনশ্চ বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি আর্য্যপুত্রকে বলিও যে, তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মে অবহিত হইতে বলিও।" এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখনসভামধ্যে উপস্থিতা হইলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি

† যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টা্ জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাভিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥

সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণ স্বরে স্বীয় জননী পৃথিবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার সকরুণ বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয়হৃদয়ে গভীর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। তিনি বলিতে লাগিলেন, যেহেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহার কথা আমি কখন মনেও করি নাই, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু চিরকাল কায়মনোবাক্যে রামেরই পূজা করিয়া আসিতেছি, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, অতএব হে দেবি, তুমি আমায় স্থান দেও। *

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্ব্বপ্রধান। সীতা সর্ব্বগুণ-সম্পন্না ছিলেন ; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল, কোনকালে কোন নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরাধরণীপতির মহিষী হইয়াও এক প্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন, তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা

সীতা ও সাবিত্রী দুই জনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন

* যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্ব্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোনস্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না; এবং এমন কষ্ট নাই যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুই জনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্য্য গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণপ্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না, তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন, কেবল দাসীমাত্র। রাজারা পূর্ব্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। দশকুমারচরিত পাঠ

করিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার ; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, না হয় মহাভারত বা রামায়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকলগুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থাবিষয়ক অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটীক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমারচরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যেগুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা এক প্রকৃতির নহে। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, এক জন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালে লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিল। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। কিছুদিন পরে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী ; কেন না, তিনি সুন্দরী, নৃত্যগীতাদিকলাভিজ্ঞা। তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন, সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন, মহারাণীর বিরাগ-ভাগিনী হইলেন, তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সমর্থ নহেন, তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্রবর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায়, কিন্তু তিনি একটী শ্রেণীর আদর্শ ; এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্ত্তাদিগের লোপামুদ্রা, ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী, সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরন্ধ্রীদিগের লোপামুদ্রা, যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্ব্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ, সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এস্থলে বর্ণিত হইল।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলোকিক কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছু নাই, যাহাতে তিনি সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থান প্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও একজন। মালতীমাধবের মধ্যে আর একটী অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহার নাম কামন্দকী—ইঁহার সংসারকার্য্যচাতুর্য্য, বুদ্ধিকৌশল, শাস্ত্রজ্ঞান,

কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ, মালতী ও মাধবের প্রতি অলৌকিক স্নেহ ছিল। ইঁহার সাহস পুরুষের ন্যায়, মনের বল পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাঁহাদের সমতুল্যা। দুই জনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে বিরাগিণী, বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতীমাধবের কামন্দকী, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায়, বিদ্যাবুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি যত দিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজকন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন, তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ, পণ্ডিত কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ, কামন্দকী তাহা হইতেও আবার কর্ম্মকুশল। তিনি আপন কার্য্যে অণুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস-সহকারে কালকাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন; সমভি-ব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুই জনেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই, বৌদ্ধের মঠে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। হিন্দুর মঠে দুই একটী ঈদৃশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল, পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণীকুলের বিভূষণস্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্ব্বস্ব গেল, তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, তখনও শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, "আর্য্যপুত্র স্বার্থপর হইও না। আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমার প্রণয় কেন বিরূপ হইতেছে?" এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যগণ! আমায় ক্রয় করুন। পরপুরুষ উপাসনা এবং পরের উচ্ছিষ্টভোজন ভিন্ন আমি সর্ব্বকর্ম্মকারিণী।" যখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল, তখন শৈব্যা হর্ষোৎ-ফুল্ললোচনে বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! আমি আর্য্যপুত্রকে অর্দ্ধেক প্রতিজ্ঞাভার হইতে উদ্ধার করিলাম।" আর্য্যপুত্রের ঋণের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী হইলেন, সেটী তাঁহার মনেও হইল না।

কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার একমাত্র সন্তানও কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্ব্বতী—ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন, দেবতা, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক ও পূজা আবশ্যক। পার্ব্বতী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পার্ব্বতী বিদ্যাবতী, পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প, কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ নহে, উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন, কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্ব্বতীর প্রণয় বর্ণন করিয়াছেন, তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না, এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্ব্বতী মহাদেবে প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন, পার্ব্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যবিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনই সে ভাব সংবরণ করিয়া কোপকটাক্ষে মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন, এবং স্ত্রীসন্নিকর্ষ পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপস্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিনশরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যে সকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম, পার্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে! তখন কোপ, প্রণয়, বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদ্গত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল, তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সামাজিক অবস্থা জানেন; কিন্তু জানিয়াও ভাবিলেন, বিশুদ্ধ প্রণয় প্রকাশে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম্মচতুরা, দেবারাধনায় তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে, মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন, তোমার পিতা দেবতাদের দেশের

অধিপতি, যদি দেবতা তোমার কামনা হয়, বল। পার্ব্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্ব্বতী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব দিলেন। পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল, তখন লীলাকমলপত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভালবাসেন না, গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয়, সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ব্বহেতুভূতা। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিয়াছেন, তাহা এখনও তীর্থ। তাঁহার নিকট সিতশ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগের উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি, দেবতায় ভক্তি, মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা, বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা, পিতৃভক্তি, স্বামিভক্তি, সখীগণের প্রতি ব্যবহার, এবং আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্রবিষয়ে কবিরা যে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, পার্ব্বতীচরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক, তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার শৈশবের কোন কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস, কিন্তু তাহার বিদ্যুত্ত্বরিতগতিবর্ণনায় একটী আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বনবাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন, তখন সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থিরদুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও * আমি প্রসবের পর সূর্য্যের দিকে নয়ন নিবিষ্ট

* সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥

করিয়া তপস্যা করিব, যেন অন্য জন্মেও রামই আমার পতি হন, কিন্তু যেন এরূপ বিচ্ছেদ কখনও না হয়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানেই যাই, তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।" মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন, তখন তিনি নিরন্তর অতিথিসেবা ও স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিলেন, আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না এবং তিনি হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্টের কতক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞসমাপনান্তে পৌরবর্গকে সমবেত করিয়া সীতার পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন, * "যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা কখনই করি নাই, অতএব হে দেবি বিশ্বম্ভরে, আমায় অন্তর্দ্ধান করিয়া লও।"

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতাচরিত্রের দুই একটী অতি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও ভাবপূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদায় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইয়া পড়ে, সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ, রত্নাবলী, বাসবদত্তা, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটী রমণীর চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবনপ্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়কেই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেককাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু, বনলতা, বনময়ূর, বনমৃগ, উভয়েরই প্রিয়পাত্র ; উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রগাঢ় প্রণয়বিশিষ্ট; বনবাসসখীদিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণকর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া

* বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি ॥

এক্ষণে রাজধানীতে প্রত্যাগতা হইয়াছেন, রাজরাণী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ব্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁহার সকল ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল, আর্য্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল, তপোবন দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে বলিলেন, "তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে।" রাম কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে! এ কথাও কি বলিতে হয়!" তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে চিত্রদর্শনজনিত নানা উদ্বেগ এখনও প্রশমিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রাভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব।" তাহার পরই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্য্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন, তখন সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্য্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে "সরসী আরসী"তে আর্য্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন, আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন, সঙ্গে কেহই নাই। রামের গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সীতা চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন, তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন, এবং একতান মনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন, তখন বলিলেন, "এ কথা এরূপ ঘটনার অসদৃশ।" তাহার পর বলিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি আজিও সেইই আছ।" রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন, এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "যা হবার হউক, আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব।" যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "সখি তুমি ভালর জন্য বলিতেছ বটে, কিন্তু দেখিতেছ না কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে। সখি তুমি বিরত হও।" তাঁহার পালিত করিশাবক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল, উহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাঁহার হর্ষ হইল এমন নহে, তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথধ্বজ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ কাহার সাধ্য সে দিক হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর

"অপূর্ব্ব পুণ্য হেতু আর্য্যপুত্রের দর্শনলাভ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীচরণে নমো নমঃ" বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধচরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজনপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্রে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।"

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তপোবন-তরুদিগের পরিপালন করিতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থগমনকালে বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিযাছিলেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্ব্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, পুষ্পবৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে, এবং তাঁহার ভাবিবিরহের আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অণুমাত্র চিন্তা নাই। তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাহারা দুর্ব্বাসার শাপ-মোচন করিল, তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক।" তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকে বলিতেন, এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরলহৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত, ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ

করিল, তিনি ম্রিয়মাণা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার কথা রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন, এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈবদুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না ; কণ্ব মুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং সত্বর তাঁহাকে দুই জন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালে আপন হরিণশিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালবাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজা দুর্ব্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন, তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃসংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল, তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত-গৃহগমনকালে কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহাকে লইয়া তিরোহিত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া পতিব্রতা-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপমোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন, "সে সময় আমার অদৃষ্ট আমার বিরোধী ছিল, নহিলে আর্য্যপুত্র এত সদয় হইয়াও এত বিকল হইয়াছিলেন কেন? যাহা হউক, আমার অদৃষ্ট পরিণামে সুখদ হইবে।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন, তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন, "আমি উহাকে বিশ্বাস করি না" এবং যখন শুনিলেন, শাপপ্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না, তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে আর্য্যপুত্র অকারণে ত্যাগ

করেন নাই।" আর্য্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্য্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ব্বতী, ভবভূতির সীতা, বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের চরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, সীতা পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী, পার্ব্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি যে সকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার, সেই সকল গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিক পরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ে মহার্হরত্ন, ইঁহারা সেই প্রণয়ের আধারভূমি। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের যে সকল কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, কবিরা সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চন, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব," তাহার পরক্ষণেই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" সাধ্বী রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন, শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন, এই ভয়ে ব্যাকুলা হইলেন। দক্ষ বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্য্যালাভ হয় না।

যৌবনে সন্ন্যাসী

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গেল। সরল ভাব, উদার ব্যবহার, খোলাখুলি প্রণয়, উচ্চ হাস্যের দিন শেষ হইল। ইস্কুল ঘর, টানা পাখা, পুস্তক-ভার বহন, অধ্যাপকের মিষ্ট প্রিয় উৎসাহ বাক্যের সহিত সম্পর্ক উঠিয়া গেল। ইস্কুলের লোক আমায় ভুলিয়া গেল। আমি তাহাদিগকে, কিন্তু, ভুলিতে পারিলাম না। সেই সেই সুখ-সময়ের স্মৃতি আমায় দিবানিশি কষ্ট দিতে লাগিল। সমপাঠিগণের ভাব বিকৃত হইয়াছে। যে ভাবে তাহাদিগের সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়া মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া আস্তে আস্তে গল্প করিয়া এত পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তাহাদের এখন আর সে ভাব নাই। কেমন নীরস, কেমন কপট, কেমন এক রকম কেমন কেমন ভাব হইয়াছে, তাহাদের সহবাসে আর তৃপ্তি হয় না।

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে কালে পড়িয়াছি ইহাতে ত তৃপ্তি হইতেছে না। আবার সেই কালে ফিরিয়া যাইতে চাই। কিন্তু পারি না কেন? আবার ইচ্ছা করে সেই রকম গঙ্গার ধারে বসিয়া সুরেন অমৃত মন্মথ ললিত প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করি, আর একবার প্রাণ ভরিয়া হাসি। তখন কত হাসিতাম, তখন ত হাসির এত দরকার ছিল না। এখন দুঃখ-দুর্ভর হৃদয়ে প্রাণ-ভরা হাসি আসিলে অনেক হৃদয়ের দুঃখ লাঘব হয়; কিন্তু এখন হাসিতে পারি না কেন? সেকালের যাহারা ছিল, তাহাদের সঙ্গেতে আর হাসিবার যো নাই; একালের বালকদিগের সঙ্গে মিশি না কেন? মিশিলাম কিন্তু সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকিলাম মাত্র, তাহারা ত আমার জন্য সেকালের সুরেন নবীন অমৃতের মত সহানুভূতি অনুভব করে না। তাহারা তাহাদের মত লোক চায়; আমি চাই আমার সেকালের মত, আমার সঙ্গে তাহাদের কেন মিল হইবে? বিষ্ণু ঘোষাল বুড়া-কালেও বলিত, "আমার ইয়ার আজিও জন্মায় নাই", আমিও তাহাই শুনিয়া ছেলের দলে মিশিলাম। কি জানি কেন? কি জানি কোন্ অভিমানে বা কোন্ কারণে আমি বিষ্ণু ঘোষালের মত হইতে পারিলাম না। ছেলের দলে মিশা হইল না। তাহারা আমার ভাব বুঝিল না, তাহারা আমায় দলে লইল না।

কবিরা যৌবন সুখের কাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মাথা মুণ্ড বকিয়া গিয়াছেন মাত্র। কই আমার ত পূর্ণ যৌবন, আমার কিছুই ভাল লাগে না কেন? যৌবন প্রেমের সময়, প্রণয়ের সময়, ভালবাসার সময়; যৌবন কার্য্যের সময়, সংসার প্রবেশের সময়, উন্নতির

সময়, বড় বড় কাজ করিবার সময়, যশোলাভ ও বিত্তালাভের সময়। ছাই কিছুই নহে, যৌবন অভুক্ত উৎকট লালসার সময়। এই সেই কাল, যে সময়ে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

যাই ধরি, যাই করিতে যাই, তৃপ্তি হয় না। কাজ করিয়া তৃপ্তি হয় না, ভাবিয়া তৃপ্তি হয় না, ভালবাসিয়া তৃপ্তি হয় না, যশোলাভে তৃপ্তি হয় না, বিত্তালাভে তৃপ্তি হয় না, ধনলাভে তৃপ্তি হয় না। লালসা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আরও চাই, এইটুকু আরও চাই, মন কেবল এই একমাত্র জবাব দেয়। আজি একটী কার্য্যে সফল হইলাম; মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, ভাবিলাম স্বর্গ হাতে। রাত্রি প্রভাত হইল, কালিকার আনন্দ স্মরণ হইল। কারণ অনুসন্ধান করিলাম—দেখিলাম এইটুকু—এইরূপ নৃত্যকর আনন্দের সঙ্গে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না? মনে কর তাই হইল। আনন্দ ইহা অপেক্ষা কি ঘনতর হয় না? তাহার পর এই কথা মনে হয়, তৃপ্তি কিছুতেই হয় না। যৌবন অতৃপ্ত লালসার সময়, উহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই।

যৌবনে লোককে পাগল করিয়া তুলে। যিনি সুখী তিনি সুখের ভাবনায় পাগল, তাঁহার কিছুতেই সুখ হয় না। যিনি দুঃখী তনি দুঃখের ভাবনায় পাগল। যিনি প্রণয়ী তিনি প্রণয়ের জন্য পাগল, যিনি প্রণয়-শূন্য তিনিও প্রণয়ের জন্য পাগল। তোমার আছে, তুমি বাড়াইবার জন্য পাগল। আমার নাই, আমি পাইবার জন্য পাগল। কোম্পানী বাহাদুর পাগল শাসিত করিবার জন্য বাতুলালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দেশটা যখন পাগলময় তখন ভবানীপুরে একটী বাতুলালয় করিলে কি হইবে? বাতুলালয়ের ডাক্তার সাহেব! তুমি যৌবনের বুক চিরিয়া দেখ দেখি তোমার কত বাতুল রোগী দেশে আছে? এই যে আমি নবীন পুরুষ কলম ধরিয়া যৌবনে সুখ নাই প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি, যদি আমার মনের সব ভাবগুলি তুমি টের পাও, তবে কি তুমি আমায় এইখানে বসিয়া থাকিতে দাও? কখনই না। তবে তোমার বাতুল আরাম করার চেষ্টা সকল বিফল।

যৌবনে সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল হয়। সকল ইন্দ্রিয়ই আহার চায়। সকলেই উদ্দাম হইয়া উঠে। কেহই আহার পর্য্যাপ্ত হইল বলিয়া তৃপ্ত হয় না। যদি পর্য্যাপ্ত হয় আরও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, যদি না হয় পর্য্যাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হয়, আবার কাহারই সহবাসে তৃপ্তি হয় না। ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। ভালবাসি কিন্তু সুখ হয় না। আজি একটী সুন্দর মুখ দেখিলাম, ভাবিলাম, এই মুখের কাছে থাকিলেই তৃপ্তি হইবে। তাহার কাছে গেলাম, সে হয়ত অতি পাষণ্ড, না হয় সে আমার সঙ্গ ভালবাসিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। আজি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমায় ভালবাসিলাম। কালি তোমার দোষ দেখিয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। আমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইল না, আসঙ্গলিপ্সা ফলবতীও হইল না, সুখেরও হেতু হইল না।

হয়ত আর একজন—মনের বিচিত্র গতি—আমায় ভালবাসিল ; যখন জানিলাম মন কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হইল ; কিন্তু কেমন আবার মনের গতি—তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না। সযৌবন সঙ্গিগণের সঙ্গে তৃপ্তি হইল না, বৃদ্ধগণের নিকট গেলাম আমার সমবয়স্ক লোক ভালবাসিতে জানে, বৃদ্ধদিগের সে প্রবৃত্তির ধার মরিয়া গিয়াছে। হয়ত একজন বৃদ্ধের নাম যশ সদ্‌গুণ শুনিয়া তাঁহার নিকট গেলাম, যাইবার সময় ভরসা করিয়া গেলাম নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাইব। হয়ত তাঁহার মুখ দেখিয়াই চটিয়া উঠিলাম। না হয় তাঁহার নীরস নিঃস্নেহ আমন্ত্রণে তৃপ্তি হইল না। ফিরিলাম, আসঙ্গলিপ্সা কোথাও সুখকরী হইল না। রমণী-সন্নিধান যৌবনের প্রধান সুখের কারণ ; গেলাম তথায়, কিন্তু সকলেই আমায় দেখিয়া ঘোমটা দিয়া পলায়ন করিল। বাল্যে কৈশোরে যে কাদম্বিনী কত হাসিত কত গল্প করিত, একটী ছেলেকে দিয়া আজ বাহিরে জলখাবার পাঠাইয়া দিল। কাদম্বিনী দিয়াছে, ফেলিতে পারি না ; কিন্তু তাহার স্বাদ লবণাক্ত।

পাঠক মনে করিলেন লেখক বিবাহিত নহেন। সে কথায় কাজ নাই। মনে কর শেষ কোথাও স্থান না পাইয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। গৃহিণী—আমায় ছাড়া আর কাহাকে ভালবাসা দেখাইলে দোষ হয় এই জন্য ভালবাসা দেখাইলেন, কিন্তু আমি কি জানি না যে উভয়ে স্বাধীন না হইলে ভালবাসা হয় না। যত দিন বিবাহবন্ধন থাকিবে, ততদিন স্ত্রী-প্রণয় প্রণয়ই নহে, একবারের চুক্তি মত কাজ করা মাত্র। চুক্তি যদি কাহার কপালে ভগ্ন হয় তবে সে ত সন্ন্যাসী, আর অতৃপ্ত-আসঙ্গলিপ্স আমিও সন্ন্যাসী।

ভালবাসিলাম সে ক্ষণিক, সঙ্গ করিলাম সে ক্ষণিক, ভক্তি করিলাম সে ক্ষণিক, স্নেহ করিলাম সেও ক্ষণিক ; আশা মিটিল না, তৃপ্তি হইল না। চিরস্থায়ী কিছুই হইল না। মানুষের চঞ্চল স্বভাব, উহাদের খামখেয়ালি মেজাজের উপর আমার সুখের ভিত্তি নির্ম্মাণ কখনই উচিত নহে। অতএব যে প্রণয় লইয়া যৌবন কবিকল্পনার পরম সুখের সময় বলিয়া পরিগণিত, সে প্রণয় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাহারও আবার মূল্য অত্যন্ত অধিক—স্বাধীনতা-বিনিময়—এবং সেও অতি দুর্লভ। এই জ্ঞানটী জন্মিল, আর সন্ন্যাসীতে আমাতে প্রভেদ কি ?

মানুষ খামখেয়ালি, মানুষ চঞ্চল, মানুষ নশ্বর, মানুষের প্রণয়ের মূল্য অধিক, কিন্তু আমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। এমন কোন জিনিস পাইতে চাই যে কাজ কর্ম্ম করিয়া তাহাকে লইয়া সুখে সময় কাটাইতে পারি। সে জিনিসটী কি ? তবে আকাশকে ভালবাস ; আকাশ যখনই দেখ নয়ন জুড়ায়, প্রাণ প্রফুল্ল হয়। আকাশ চঞ্চল নয়, অব্যাপ্যবৃত্তি নহে—অনন্তকালস্থায়ী চন্দ্র ভাব, চন্দ্রকে ভালবাস। মলয় পবন ! তোমায় অনেক দিন হইল বড়ই ভালবাসিতে লাগিয়াছি। তুমি যখনই আইস শরীর জুড়ায়, উষ্ণ মস্তক শীতল হয়, মনের অর্দ্ধেক যন্ত্রণা দূর হয়। যখন ধীরে ধীরে রাত্রি দশটার সময় গাঢ় চিন্তার সময় তুমি আমার বক্ষে ও মুখে লাগ, তখন তোমায় ভাল না বাসিয়া থাকিতে

পারি নাই ; কিন্তু যখন তুমি চাঁদ আর আকাশ আমার ভালবাসার পাত্র হইলে, তখন আমার গৃহে কাজ কি ? আমি তো সন্ন্যাসী—নবীন যৌবনে আমি সন্ন্যাসী।

যখন ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, যখন অন্তর্জগতে সদসৎ প্রবৃত্তিতে ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যখন নৈরাশ্য হৃদয়ের প্রতি কন্দর শূন্য করিয়া ফেলে, যখন দারুণ অভুক্ত লালসা সফল করিবার জন্য পরিশ্রম ও ভাবনায় শরীর ও মানসবৃত্তি সকল একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—তখন এক উপায়—এক সুখের উপায়—স্বভাব-সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচনা। আমাদের মনে এমনই একটী শক্তি আছে যে যাহা কিছু বৃহৎ প্রকাণ্ড, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু সুন্দর, আমাদিগের সুখ সমুৎপাদন করে। কারণ উহা প্রকাণ্ড অনন্ত অনন্তকালব্যাপী ঈশ্বরের আভাস মাত্র।

তবে ভাল কথা সেই ঈশ্বরকেই ভালবাস না কেন ? দেখ আকাশ মেঘাবৃত হয়, মলয়-মারুত ঋতুমাত্রস্থায়ী, চন্দ্রেরও পদে পদে বিপদ, অতএব এমন একজন লোক লও না যিনি তোমার মন হইতে অপনীত হইবার নহেন। তাঁহার চিন্তা কর না কেন ? যখন ক্লান্ত হইবে, যখন নিরাশ হইবে, তখন সেই প্রকাণ্ড অনন্ত সর্ব্বকালব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা কর না কেন ? জানু পাতিয়া বা কর উত্তোলন করিয়া অথবা করযোড়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বল না কেন ঃ—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগতাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

যে হৃদয় এখন শূন্যময় ভাবিতেছ, যেখানে কেবল দুঃখ-দুর্ভরতা মাত্র দেখা যাইতেছে, সেইখানে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। সে আনন্দ—অক্ষয়—অনন্ত—পবিত্র ; যেহেতু যাঁহার সহবাসে সে আনন্দ লাভ করিতেছি, তিনি সৎ—চিৎ—আনন্দ !

আর্য্যদর্শন
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪

প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে প্রকৃত প্রণয় মস্তকে দিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলে লোকে সহসা মনে করিতে পারে লেখক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন, কতকগুলি গিলিত পদার্থের উদ্গার করিবেন। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কা অমূলক বা অসঙ্গত নহে। ইয়ুরোপে এ পর্য্যন্ত কত লোকে যে প্রণয় শীর্ষক রচনা লিখিয়াছেন বলা যায় না। গ্রীসে বিদ্যাচর্চ্চার প্রাতররুণোদয় আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় যে কেহ লেখনী ধারণ করিয়া যশোলাভ করিতে গিয়াছেন, যে কেহ মানবসমাজের মনোরঞ্জন করিতে গিয়াছেন, তিনিই প্রণয়ের উপর কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। এবং এক্ষণে বাঙ্গালায়ও অনেকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রধানতম নবেল লেখক মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ অমানুষ প্রতিভাবলে মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণয়ের একটী আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আমরা লেখনী ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশ মাত্র, আমরা লিখিতে গেলে যে লোকে চর্ব্বিতচর্ব্বণ মনে করিবেন, তাহাতে লোকের কোন দোষই নাই। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, আমরা প্রস্তাবটীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্য করিতে চেষ্টা করিব বলিয়াই একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রকৃত প্রণয় বিষয়ে লিখিতে গেলে অনেকে আমাদের নিকট চাহিয়া বসিবেন প্রণয়ের লক্ষণ কি? আমরা বলিতেছি এরূপ লক্ষণ দিতে আমরা অসমর্থ। শুদ্ধ আমরাই অসমর্থ এরূপ বলি না, ইহার লক্ষণ হয় না। মনের প্রত্যেক বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লক্ষণ দিবার চেষ্টা বিফল। শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইয়ুরোপীয় ফিলজফর মহাশয় রাগ করিবেন না—আমরা বলি এরূপ সূক্ষ্ম লক্ষণের দিন গিয়াছে। প্রণয়ের লক্ষণ হয় না, কিন্তু প্রণয় এমনি জিনিস যে উহার লক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এল ডি হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত প্রণয় কি তাহাও জানে, প্রণয়ের কি বেগ তাহাও অনুভব করে। কোন্ পণ্ডিত কবে লক্ষণ দিয়া প্রণয় বুঝাইতে গিয়াছেন? আর লক্ষণ দিয়াই বা তিনি কি বুঝাইয়াছেন? আর যাহা সকলেই বুঝিতে পারে তাহারই বা লক্ষণের প্রয়োজন কি?

প্রণয়ের লক্ষণ হয় না, কিন্তু উহার বিবরণ দেওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী লোকে প্রণয় হইতে অন্য মানস প্রবৃত্তির ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন। এই ভেদ নির্ণয় আবশ্যক এবং আমরাও এস্থলে এই ভেদ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রণয় একটী মানসিক কোন বিকার। একটী সুন্দর বস্তু দেখিলে আমরা যে তাহাকে ভালবাসিতে চাই, শৈবলিনীর ন্যায় কোন একটী সুন্দর মুখ দেখিলে মীরকাশিম পর্য্যন্ত গলিয়া যান, তাহা প্রণয় নহে। ভবভূতি তাহার নাম তারামৈত্রক বা চক্ষুবাসা দিয়াছেন। সে তারামৈত্রক চক্ষুরাগ— প্রণয় নহে।

অনেক দিন একজনের সঙ্গে একত্র থাকিলে তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, ছাড়িতে কষ্ট বোধ হয়, মনে মনে একটু কষ্ট হয় ; সে মানসিক বিকার, প্রণয় নহে। অনেক স্থানে স্ত্রী ও স্বামী মনের মিল না থাকিলেও সাংসারিক অসুবিধার জন্য বা আবার কোথায় যাইব, দূর হক ছাই এই লইয়াই নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইয়া থাকি এইভাবে বাস করেন, সেটী প্রণয় নহে। অনেক অর্ব্বাচীন লোক, আমাদের প্রাচীন কালের অনেক কবিই প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরতার এমনি অভেদ্য মিলন করিয়া দিয়াছেন যে উহাকে প্রণয় বলিতে আমাদের লজ্জা হয়। অনেকে রূপতৃষ্ণার নাম প্রণয় বলিয়াছেন, তাহাও প্রণয় নহে। বঙ্কিমবাবু তাহাকে মদন-বাণ বা পঞ্চশর বলিয়াছেন। বাস্তবিকও সে মদন-বাণ বা পঞ্চশর। সে প্রণয় নহে। প্রণয় নামে যে প্রবৃত্তি আছে তাহার কার্য্য এই, তাহার কারণ এই— একজন লোকের সঙ্গে আর একজন অনেক দিন থাকিলে উহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাব ভঙ্গি, দোষগুণ, শ্বেত অংশ, কৃষ্ণ অংশ দেখিয়া আপনার মনের সহিত অনেক বিষয় তাহার সহিত ঐক্য হয়, ক্রমে তাহার সহিত একত্র বাস করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে না দেখিলে কষ্ট হয়, তাহার অদর্শনে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, তাহার কথা কর্কশ হইলেও প্রণয়ীকর্ণে উহা সুধাধারা বর্ষণ করে। উহার দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় না, গুণও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল সে যেমন আছে সেই ভাবে তাহার সহিত এক হইয়া—চিরকাল এক হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। স্বর্গে যদি বিচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে, তবে সে স্বর্গও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। উহার কষ্ট হইলে আপনার দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও উহার কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হয়, শেষ উহার সামান্য সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছা হয়। এই স্থায়ী প্রবৃত্তি, এই স্থায়ী ঘনতর মনের বিকার, এই আত্মবিসর্জ্জন— প্রণয়। তারামৈত্রক, চক্ষুরাগ, রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্য্যস্পৃহা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানাকারণে সহবাসের ইচ্ছা হয়। সেই সহবাস শেষ প্রণয়রূপে পরিণত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আজি কোন কারণে সহবাস ইচ্ছা হইল, কালি তাহারই বিপরীত কারণে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব সহবাস প্রণয়ের কারণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। এবং কোথায় কারণ হইবে কোথায় না হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্রণয় এইরূপ পদার্থ, কেন হয় কেন না হয় কেহই বলিতে পারে না।

হইলে তৃপ্তি হয়, মোহ হয়, আনন্দসমুদ্র সুখসন্তান বোধ হয়, আত্মজ্ঞান রহিত হয়, স্বার্থপরতা একেবারে থাকে না, পরকে আপনার অপেক্ষা বড় দেখিতে হয়, প্রণয়ীর সহিত একাকার হইয়া আপনার স্বতন্ত্রতা লোপ হইয়া যায়, পরের জন্য আপনার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করাও অসীম সুখকর বোধ হয়।

প্রণয় প্রভৃতির বিবরণ দিতে গেলে আরও কত প্রবৃত্তির সহিত যে উহার ভেদ নির্ণয় করিতে হয় তাহার ঠিকানা নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেক সময়ে অনেকের মনে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঙ্গে অন্য অন্য সু ও কু প্রবৃত্তি এমনি মিশ্রিত থাকে, এমনি ঘনীভূত থাকে যে আপাতত উহাকে শুদ্ধ নির্লক্ষণ * প্রণয় বলিয়া বোধ হয়; সেই স্থানে উহার অবিমিশ্রণ অতি আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক কবিরা প্রণয় ও ইন্দ্রিয়পরতা এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করিয়াছেন। যে কবিতায় মনের গভীর ভাব, অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক চাঞ্চল্য, তাহাতেই দুর্দ্দাম রুধির প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাসনা অনেক স্থানে দেখা যায়। এরূপ স্থলে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। প্রণয় শুদ্ধ আন্তরিক ভাব মাত্র, বাহিক্য তাহাতে কিছুই নাই। প্রণয় আত্মার গুণ, চিরস্থায়ী, ক্ষণিক নহে; মনের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, শরীরের নহে, বাহ্য জগতের নহে, একবিধ আত্মগুণাবলী প্রণোদিত মানসের বিকার; আন্তরিক চাঞ্চল্য উহার অনুভাব মাত্র, কার্য্যমাত্র, অন্য কিছুতে অন্য কোন কার্য্যতেই উহার নির্ণয় হয় না, ঠিক নির্ণয় হয় না। বাহিরের যে সকল কার্য্য দেখিয়া আপাতত আমরা প্রণয় আছে বলিয়া মনে করি, সে সকল কার্য্যপ্রবাহের মূল অনুসন্ধান করিলে অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা আত্মার অপর গুণাবলী হইতে নিঃসৃত, সুতরাং তাহা প্রণয়কার্য্য কিনা নির্ণয় হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্য কবিরা প্রণয় বর্ণনাস্থলে সর্ব্বপ্রথম লোকের অন্তরমধ্যে যান, সেখানকার গোপন ভাবগুলি খুলিয়া খুলিয়া পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখান; ক্ষুদ্র কবিরা গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লন, বড় কবিরা একটী অপূর্ব্ব বিস্তৃত বীচি-বিক্ষুব্ধ মানস-সমুদ্রের চিত্রপ্রদর্শন করেন। নাটকে প্রকৃত ভাব জানাইবার স্থান—স্বগতবাণী বা সখী সংবাদ।

এই পর্য্যন্ত প্রণয় লইয়া গেল; শুদ্ধ, বিশুদ্ধ অবিমিশ্র, মানসমাত্রগামী প্রণয়ের স্বভাবের উপর দুই এক কথা বলা হইল। এখন সেই প্রণয়ের স্ফূর্ত্তি হয় কখন? কোন্ সময়ে তাহার তেজের আধিক্য হয়? কোন্ সময়ে তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ থাকে? কোন্ সময়ে তাহার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে? কোন্ সময়ে? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে জানা চাহি কি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত হয়, কোন্ সময়ে মানসিক প্রবৃত্তি সকল বর্ষাস্নাত † পালি শস্যের ন্যায় সবল, সতেজ ও মনোবিমোহন মাধুর্য্য প্রাপ্ত হয়, কোন্ সময়ে তাহাদের কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত না থাকে, কোন্ সময়ে তাহারা স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। বীজ বপন করিয়া চাপা দিয়া রাখ, অঙ্কুর হইলেও হইতে

* মুদ্রিত পাঠে 'নির্লক্ষ'।—সম্পাদক। † মুদ্রিত পাঠে 'বর্ষাস্রাত'।—সম্পাদক।

পারে, কিন্তু সে অঙ্কুর কেবল শুকাইবার জন্য। নদীর স্রোত যে দিকে যাইতেছে তাহার অন্য দিকে লইয়া গেলে তাহার গতির লাঘব হইবে মাত্র। সেইরূপ কোন স্ফূরণোন্মুখ মানসিক বৃত্তির মুখে যদি বাধা চাপান যায়, সে বৃত্তিটী হাপসিয়া যাইবে মাত্র। প্রণয়ের মুখে যদি অধীনতা পাথর চাপাও, সে প্রণয়াঙ্কুরকে পিষিয়া ফেলিবে। বাড়িতে দিবে না, দিবে না।

প্রণয়ী যুগল যদি উভয়েই স্বাধীন হয়, কেহ কাহার কোন অধীনতা স্বীকার না করে, উভয়ে আপন ইচ্ছায় উভয়কে ভালবাসে, কেবল ভালবাসা ভিন্ন আর ভালবাসার কোন পার্থিব কারণ না থাকে, ক্রমে যখন সেই ভালবাসা ঘনতর হইয়া আসে—সেই বিশুদ্ধ প্রণয়, সেইখানেই প্রণয়ের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি। এরূপ একটী চিত্র জগতে যদি মিলে, তবে জগতে আর স্বর্গে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এইরূপ একটী চিত্র যদি কল্পনায় অঙ্কিত করা যায় তাহাতেও বিমলানন্দ। যিনি এরূপ চিত্র আঁকিয়া জগতের লোককে দেখাইতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত কবি। কিন্তু জগতে এরূপ চিত্র নাই কেন? জগতের লোকের অত্যাচারে, যে সমাজ বলিয়া জগতে এক বিধাতার অনির্ম্মিত সৃষ্টি আছে, তাহার অত্যাচারে; যে সকল লোক সমাজ বলিয়া দৈত্য সৃজন করেন তাঁহারা জানিতেন, উহাতে কুলোক শাসিত হইবে, কুপ্রবৃত্তির দমন হইবে, কুকার্য্য জগত হইতে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু সমাজ আমার পঞ্চানন্দ ঠাকুর, বড় ছেলেটীর কিছু করিতে পারেন না, ছোট ছেলেটীর ঘাড় ভাঙ্গেন। যাহারা কু তাহারা সমাজকে কদলী দর্শন করাইয়া কুকর্ম্ম করে। তাহারা গোপনে করে, গোপন করে বলিয়া আরও অধিক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে। সমাজ দেখিতে পান না বা দেখিতে পাইয়াও কিছু করিতে পারেন না ; মাথা খান সুলোকের, সুপ্রবৃত্তি-গুলিকে যুবড়া করিয়া রাখেন, তাহাদের জন্মাইতে দেন না, জন্মাইলে বাড়িতে দেন না, বাড়িলে প্রকাশ হইতে দেন না, প্রকাশ হইলে অঙ্গহীন করিয়া দেন। এরূপ অত্যাচারে দেবদুর্লভ পবিত্র প্রণয় কোথায় মিলিবে? গোময়রাশিমধ্যে উজ্জ্বল হীরক কখন কি মিলিয়া থাকে? পবিত্র বিশুদ্ধ নির্ম্মল উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় প্রণয়ের উপর সমাজের প্রধান অত্যাচার বিবাহপ্রথা প্রচলন। ইহাতে যে একটী উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়, চারি দিক হইতে প্রণয়-স্রোত বন্ধ করা হয়, উহাকে অপরাপর প্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া কলুষিত করা হয়, তাহার আর কোন সংশয়ই নাই। বিবাহে প্রণয়ের কত অনিষ্ট করা হয় একবার কল্পনাবলে দেখা যাউক। কুলোকে নানাবিধ উপায়ে সুনিয়ম কু করিয়া তুলে, ভালতে মন্দ করে, মিষ্ট পদার্থ কটু করে ; তাহাদের কথা আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহাদের কথা আমরা কহিতে চাহি না ; কহিতেওছি না। আমরা মনে করিয়া লইয়াছি জগতে কুলোক নাই, সবই সু, সবই ভদ্রলোক বিশুদ্ধচরিত্র সাধু সজ্জন। বিবাহ আসিয়া বলিলেন কি?—'অমুক ঘোষের কন্যা তোমার গৃহিণী, তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, সে তোমাকে ভালবাসিবে, অন্য লোককে তোমার ভালবাসিতে নাই। যদি বাস, তোমায় আমি শাস্তি দি, হয়ত শ্রীঘরেও দিব। এই নাও ইহার হাত তুমি ধর, তোমাদের শুভ দৃষ্টি হউক—।' নাও কথা,

তুমি আমায় ভালবাসিতে বাধ্য করার কে? তুমি সমাজ আছ, আমি দুষ্কর্ম্ম করিলে শাস্তি দিও। আমার অন্তর-স্রোত আমার ইচ্ছাধীন, আমি তাহাকে যে দিকে চালাইব সে সেই দিকে চলিবে। তুমি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কে? প্রথম ঘোর অত্যাচার। আমাদের দেশের দশা ঠিক এইরূপ। সে ঘোষের মেয়ে আমার মনে ধরিল না, আমার প্রণয় বলিয়া যে প্রবৃত্তিটী ছিল তাহার বিজয়া হইল। মনে কর ধরিল, তাহাকে আমি খুব ভালবাসিতে লাগিলাম; একদিন অতি বিশুদ্ধ কথোপকথন সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমায় বড় ভালবাস—না? সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—খুব। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইত তুমি কি করিতে? কাহাকে ভালবাসিতে?" "যাহাকে বিবাহ করিতাম!" ও হরি তবে ভালবাসার কল আছে। যার দিকে কল নড়িবে সেই চরিতার্থ হইবে। আমাদের দেশের বিবাহে স্ত্রীলোকের একেবারে স্বাধীনতা নাই। তাহারা যে ভালবাসে তাহা একপ্রকার কল মাত্র। তাহাদের পছন্দ করিবার ক্ষমতা নাই, ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। খাও দাও চিনির বলদের মত স্বামী ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা কর। শেষ ঐ এক ভাবে থাকিয়া, এক রকম কি গোলমালযুক্ত একটা মানসিক ভাবের উৎপত্তি হয়। এটী প্রণয় নহে। প্রণয় একটী প্রবৃত্তি, উহার কার্য্য-প্রবণতা অত্যন্ত বলবতী, প্রণয় গাঢ় হইলে কার্য্য-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহাতে আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত যে ভাবটী জন্মায় সেটী নিবৃত্তিমূলক, তাহার তলা অন্বেষণ করিয়া দেখ এই কয়টী অক্ষর পাথরে খোদা দেখিতে পাইবে। "আর ত উপায় নাই, এখন এই ভাবেই মানিয়ে জুনিয়ে থাকিতে হইবে"। সেই ভাবে বাস্তবিকই মানিয়ে জুনিয়ে থাকে। এই ভাবে মানিয়ে জুনিয়ে অধিকাংশ বাঙ্গালীর দিন কাটে, প্রণয় মুসড়িয়া যায়; প্রণয়—মনুষ্য ও পশু প্রভেদ করিবার একমাত্র উপায়, জগদীশ্বরের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মানস প্রবৃত্তি—বৃথা হইয়া যায়। বলিয়াছি এই প্রথম জঘন্য সর্ব্বথা পরিহারযোগ্য অত্যাচার। দ্বিতীয়—ইয়ুরোপীয় বলিবেন, নিজে পছন্দ করিয়া বাছিয়া দুজনে মিল হইলে অন্তরে অন্তরে ঘাত প্রতি-ঘাত জন্মিলে বিবাহ কর। এও বরং। কিন্তু বলি ইয়ুরোপীয় মহাশয়, আমাদের যদি মনের মিল হইল, আমরা যদি উভয়ে উভয়কে বুঝিলাম, পরস্পর যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এমন কি যদি একাত্মভাব দাঁড়াইল, বিবাহে প্রয়োজন? চর্চ্চে যাওয়া, দশজনের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করা, এত হাঙ্গাম কেন? উহাতে আমাদের কি কিছু বাড়িবে? কিছু বেশী ঘনিষ্ট প্রীতি উৎপন্ন হইবে? কখনই না, বরং এই হইবে যে আমাদের নিজের কথার উপরে হাত দেয় কেন? এই ভাবিয়া একটু বিরক্তি হইবে। আমরা আপন ইচ্ছায় যা করিব পরে বলিলে তা কখনই তেমন করিয়া করিব না। ছেলেরা আপন মনে যেমন খেলা করে কি যেমন পড়ে, বাপ মা কি গুরু মহাশয় যদি তাহাদিগকে হুকুম করেন সে তেমন করিয়া পড়া ত করিবেই না, অনেক জায়গায় দেখিয়াছি তেমন প্রফুল্ল মনে খেলাও করে না। হয়ত সমাজের এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের প্রণয়ে বিঘ্ন হইবে মাত্র। এত দূর ত হয়তর উপর দিয়া গেল।

তাহার পর তুমি পাদরি সাহেব বলিলে, আমাদের চির দিন এই দম্পতী ভাবে থাকিতে হইবে। কেন? চির দিন যখন কিছুই থাকে না, সকল পদার্থেরই যখন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া বলি যে আমরণ আমরা এই ভাবে থাকিব। হয়ত থাকিতাম যদি আমাদের নিজ ইচ্ছামত হইত, আমরা ঘরে ঘরে বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতাম। তোমার হুকুমে থাকিব কেন? এইরূপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর অত্যাচার নহে? তাহার পর বলিবে ডাইভোর্স প্রথা আছে। তোমরা অত্যাচার করিয়া একটী বন্ধন দিলে, আবার আমার সেইটী কাটাইতে হইবে। এ দোকর পরিশ্রম কেন? আর তোমাদের যেরূপ ডাইভোর্স প্রথা তাহাও ত বিশুদ্ধ প্রণয়ের পোষক নহে। পরস্পর অন্যায় ইন্দ্রিয়পরতা আদালতে প্রমাণ না করিয়া দিলে ত ডাইভোর্স হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও ত অনেক কারণে পরস্পর একত্র বাস কষ্টকর হইতে পারে; যখন সাত বৎসরে সমস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তখন যে মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবে না তাহার ঠিক কি? যদি এই রূপ শরীর পরিবর্ত্তনে মনেরও পরিবর্ত্তন হয়? তবেই গোলমাল।

এই রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে প্রকৃত প্রণয় স্থলে বিবাহপ্রথা—সমাজের হস্তক্ষেপ, প্রণয়ীর অত্যন্ত ক্ষতিকর, উহা যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই জগতে মঙ্গল।

শ্রীশরৎ।

* এই প্রবন্ধটী 'আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১২৮৪)। প্রবন্ধটীর তলদেশে 'আর্য্যদর্শনে'র সম্পাদক এই মন্তব্য করেন: 'আমরা এ প্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি না। প্রচলিত বিবাহপ্রথা অপনীত হইবার যোগ্য বলিয়া যে একেবারে বিবাহেই প্রয়োজন নাই ইহা আমরা স্বীকার করি না। আজীবন হউক বা সাময়িক হউক বিবাহপ্রথা আবশ্যক। এবিষয়ে আমাদের মত সকল একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। স।' এ বিষয়ে আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক—।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি ? এ কথা লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যে কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। কত লোক যে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার নির্ণয় হয় না। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ সহবাস, যাঁহার যেরূপ সমাজ তিনি সেই রূপ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত লইয়া আবার অনেকে কত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছে, কত বাগ্ বিতণ্ডা করিয়াছে, কত রাশি রাশি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছে। যখন বৈদিক সময়ে মনুষ্যজীবনের প্রথম অবস্থা, যখন মনুষ্য প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত, যখন যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল ; ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল, যখন পৃথিবীর সুখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ হইতে লাগিল, তখন ইহলোকের সুখে বিসর্জ্জন পরলোকের শুদ্ধ চৈতন্যভাবে অবস্থান করাই (মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন অসংখ্য অনার্য্যগণের মধ্যে আর্য্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া পিতৃপিতামহের নাম রক্ষা করা জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন দারুণ রৌদ্রতপ্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করতঃ প্রথম সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিল—প্রথম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল, তখন মৃত্যুর পর দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্বর্গপুরে মদিরা-পান করাই বিধেয় স্থির হইল। যখন পুরোহিতপদদলিত ইয়ুরোপ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, তখন ধর্ম্মের জন্য পুরোহিতদিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সঙ্কল্পিত হইল। ইহা অপেক্ষাও আবার যখন ইয়ুরোপের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব দাওয়ান হইয়া স্বর্গের এক প্রকার নোট (indulgences) প্রচার করিলেন, সেই নোট ভাঙ্গাইয়া যে টাকা দিবে তাহারই জীবন ধন্য ও সেই "স্বর্গলোকে মহীয়তে" স্থিরীকৃত হইল।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়াছে। সমাজ যখন প্রথম উন্নতির মুখে তখন একরূপ উদ্দেশ্য, যখন উন্নতি হইতেছে তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি তখন আর একরূপ। আবার যখন সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে তখন আর এক প্রকার।

ন্যায়সূত্রে প্রয়োজন নামে একটী পদার্থ আছে, তাহার দুই অঙ্গ, মুখ্য ও গৌণ। সুখলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য, দুঃখনাশ গৌণ। বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনে যা কিছু করা যায় তাহার উদ্দেশ্যই সুখ। কিন্তু দুঃখনাশ ব্যতীত সুখ হয় না। এজন্য দুঃখনাশও গৌণ প্রয়োজন অবধারিত হইয়াছে। দুঃখনাশ উপায়, সুখ উদ্দেশ্য। কিন্তু সুখ কি? আবার গোলযোগ! কেহ বলিবেন পরলোকের সুখই সুখ, কেহ বলিবেন ইহকালের সুখই সুখ, কেহ বলিবেন দুঃখ ও সুখ দুই খারাপ, দুইএর নাশই ভাল। কৃপণ বলিবেন অর্থ-সংগ্রহই সুখ, কেরাণী বলিবেন গার্হস্থ্য সুখই সুখ, পণ্ডিত বলিবেন লেখা-পড়ার সুখই সুখ, স্বদেশহিতৈষী বলিবেন দেশের মঙ্গলেই সুখ। আবার সেইরূপ লোকের শিক্ষা, প্রকৃতি, সংসর্গ, সহবাস, জাতি, গুণে সুখের আকার ভিন্ন ভিন্ন। আমি যাহাকে দুঃখ বলি, রামা চাঁড়াল তাহাকে সুখ বলে; আমি যাহাকে সুখ বলি, রামা চাঁড়াল তাহাকে আহাম্মকি বলে; নবীন কেরাণী তাহাকে দারুণ কষ্ট বলে। আমি কলম চালাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি; আমার ইহাতে যদি আনন্দ না হইত, কখন এ কর্ম্ম করিতাম না; কিন্তু আমার পাশে বসিয়া এক জন বলিতেছেন, আরে ভাই, যার জীবনে যে উদ্দেশ্য সেই তাহা বুঝিবে, তোর এত মাথাব্যথা কেন?

জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি, তাহা জানা চাই। আমরা ধর্ম্ম জীবন, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, পারমার্থিক জীবনের কোন কথাই বলিতেছি না। আমরা মনুষ্যজীবনমাত্রের কথা কহিতেছি। মনুষ্যের জীবনটী কি? শুদ্ধ জন্ম হইলেই কি জীবন হইল? তাহা নহে। জীবন বলিতে গেলে জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্য যে প্রকারে বাঁচিয়া থাকে, তাহার নাম জীবন। মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াই বহুসংখ্যক কষ্টকর ও জীবন অতিকর প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। জীবন আর কিছু নহে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিমেষান্ত বা ব্যবহিত যুদ্ধের নাম জীবন। মনুষ্যকে কষ্ট দিবার বা মনুষ্যজীবন নাশ করিবার জন্য কতশত কারণ রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যে বায়ু মনুষ্যের পরম বন্ধু, যাহা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত চলে না, সেই বায়ুই কত সময় পীড়ার কারণ, কত সময়ে ঝড়রূপে সহস্র সহস্র মনুষ্যবধের কারণ হয়। যে জল নহিলে এক দণ্ড চলে না, সেই জল খারাপ হইয়া কত দেশ একেবারে জনশূন্য বিজন অরণ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে। কত দেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এ সকল ত উপকারী জিনিসে অপকার করিতেছে। কত কত জন্তু আছে, মনুষ্যের জীবন অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য; কত কত বিষাক্ত দ্রব্য আছে, তাহার স্পর্শে জীবন নষ্ট হয়। কত কত পদার্থ আছে, যাহাতে জীবন একেবারে নষ্ট না হউক ক্রমে মনুষ্যের শরীর ও মন অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। স্বভাবের নিয়মে এমন অনেক মনোবৃত্তি অপর ব্যবহার জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে নিঃশব্দে অথচ নির্ব্বিরোধে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। এমন বিষ আছে, যাহা একবার খাইলে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়। নির্ব্বোধ চিন্তাশক্তিশূন্য

সদসৎ-বিবেকরহিত এমন অনেক পশুবৎ মনুষ্য আছে, যাহাদের সহিত একবার সংসর্গ হইলে যখনই তাহাদের কথা মনে হয়, তখনই মনে মনে কষ্ট হয়—ঘৃণা হয়। এই সকল অপকারী দুঃখদায়ক কারণপরম্পরার সঙ্গে অনবরত রণ করিয়া জয়ী হইয়া স্বচ্ছন্দে অক্লেশে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার নাম জীবন। এরূপ যুদ্ধে যে সর্ব্বত্র মনুষ্য জয়ী হইতে পারিবে, এমত নহে। অনেক সময়ে এমন করিয়া চলিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুঃখকর সামগ্রী কোনরূপ অপকার করিয়া উঠিতে না পারে। অনেক সময় উহাদের হস্ত হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। উদাহরণ—প্রতি বৎসর ৫।৬ বার করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়; প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার আহার, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার প্রয়োজন। ঋতু, তুমি পরিবর্ত্তন করিও না, বলিয়া রাখিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আজিও হয় নাই, সুতরাং বিধিমতে চেষ্টা করা উচিত যে, এই দুঃখদায়ক পরিবর্ত্তন কোন ক্ষতি করিতে না পারে। এইরূপ নানাপ্রকার দুঃখকর যন্ত্রণাময় কষ্টসঙ্কুল অবস্থায় আপনাকে এমন করিয়া চালাইতে হইবে যে, কোনরূপ কষ্ট না হয়। এই প্রকারে সুন্দররূপে আপনাকে চালানর নাম জীবন। রোগ-শোক প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্যের কষ্ট আছে, সে সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিতে না পারার দোষ। এতক্ষণ যে আমরা কেবল বাহ্যজগতের অবস্থার সঙ্গেই মিলাইয়া চলিতে বলিতেছি এমত নহে। অন্তর্জ্জগতের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া চলিতে হইবে। মনুষ্য স্বজাতিসংসর্গ ভিন্ন চলিতে পারে না। কিন্তু যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বায়ুও অনেক স্থলে জীবননাশক হয়, সেইরূপ মনুষ্যের সংসর্গও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশের হেতু হয়। যে মানুষ আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপে চালাইতে না পারে, সে মানুষ খারাপ হইয়া যায়, তাহার সংসর্গে লোকের অনেক দোষ জন্মায়। সে যেমন বইয়া গিয়াছে, অন্যলোকও তাহার সঙ্গে থাকিলে তেমনি বইয়া যায়। অতএব দূষিত বায়ু যেমন পরিহার্য্য, দূষিত মনুষ্যও সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়। এইরূপে শরীরস্থিত ও অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎস্থিত কার্য্যকারণপরম্পরায় যে সকল বিরোধ আছে, সেই সকল বিরোধের কোথাও প্রতিবিধান করিয়া, কোথাও হস্ত এড়াইয়া সকল অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের নাম জীবন। অনেকে বলিবেন, তবে স্বার্থপরতাই জীবন। তাহার উত্তর এই যে, জীবনটুকু পূর্ণ স্বার্থপরতা, ঐ স্বার্থপরতাটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থপরতাটুকু যে শুদ্ধ আমরাই আজি জাহির করিতেছি, এমন নহে, শত শত বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মনুও বলিয়াছেন :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

তাঁহার মতে আপনার প্রিয়ও একটী প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু কোন্‌টী আপনার প্রিয় সেটী বাছিয়া লইতে অনেক কষ্ট হয়, তাহার জন্য উত্তম শিক্ষা আবশ্যক ; নহিলে এক জন অশিক্ষিত লোক আজি আপনার প্রিয় বলিয়া এক কাজ করিয়া বসিল, কালি তাহা তাহার ঘোরতর অপ্রিয় হইল, সে হয় ত ইহজন্মের মত মাটী হইল। কিন্তু শিক্ষিত লোকের চক্ষে

আপনার প্রিয় কি? পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিরোধের হাত হইতে উদ্ধারের নামই সেই প্রিয় বস্তু।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নিরন্তর বিরোধ যেখানে, সেখানে সকলেই যে সে সমস্ত বিরোধের হাত হইতে উদ্ধার হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অনেকে দুই এক জায়গায় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনেকে বাহ্যজগতের প্রাতিকুল্যের সহিত বিরোধ করিয়া রোগগ্রস্ত হইলেন, অনেকে অন্যান্য সাংসারিক সামাজিক অনেক কারণে যে ভাবে আপনাকে চালান উচিত, সে ভাবে আপনাকে চালাইতে পারিলেন না। তবে তাহার জীবন কি জীবন বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অবশ্য হইবে। তাঁহারা যদি সেই অবধি সামলাইয়া বরাবর ভাল করিয়া চলিতে পারেন তাঁহাদের জীবনও জীবন; আর না পারেন তাঁহাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর রোদন করে; তিনি বাঁচিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে জীবন্মৃত, তাঁহার বাঁচিয়া সুখ নাই। তিনি নিজেও ভাবেন—

দুঃখসংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্যমাহিতম্।

আর তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দেন যে, জগৎ দুঃখময় ইত্যাদি। তাদৃশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা প্রদর্শন উচিত কি না সে বিষয়ে খুব সন্দেহ। আবার যাঁহারা একবার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরে শোধরাইয়া গেলেন, তাঁহারাই কি যাঁহারা কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই তাঁহাদের মত হইতে পারেন? কখনই না। জীবনের ঐ এক দুর্ঘটনার স্মৃতি চিরদিন তাঁহাদের মনে মনে না হয়, শরীরে গাঁথা থাকে, তাহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে দেয় না।

যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রীতিমত আপনাকে চালাইতে পারে, তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে, শরীর বলিষ্ঠ সুন্দর কর্ম্মক্ষম তেজস্বী হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি সকলও পরিবর্দ্ধিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি, শুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি, শুদ্ধ কর্ম্মক্ষমতার উন্নতি হইয়া নিবৃত্ত হয় না, সকল প্রকার মনোবৃত্তিই তাহাদের পরিপুষ্ট হয়। তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক কাজ হয় তাহারাই সমাজের শক্তি। সুস্থ শরীরে সবল মন থাকাই অনেকে মনুষ্যজীবনের প্রধান সুখ মনে করেন। তাহা নহে। সেটী সম্যক পরিপুষ্ট ও উন্নত মনুষ্য-জীবন মাত্র, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুস্থ শরীর ও সবল মন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। তাহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক।

মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করিল, তখন তাহার মত নিঃসহায় অকর্ম্মণ্য জানোয়ার আর নাই। এক বৎসর যাবে কথা ফুটিতে, দুই বৎসরে হাঁটিতে শিখিবে, তাহার পর কত কি শিখিলে পরে তবে সে আপনার আহার সঞ্চয় করিবার মত শক্তি পাইয়া স্বাধীন হইবে। এইরূপে স্বাধীন হইতে মনুষ্যের ২৭ বৎসর লাগে। এই সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহার যত্ন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, তবে সে স্বাধীন হইয়া নিজে খুঁটিয়া খাইতে শিখিল। যদি বল, সমাজ খাইতে দিল কৈ, দিল তার বাপ-মা।

সত্য, কিন্তু বাপ-মাই খাইতে দেয় কেন? সেও সমাজের নিয়ম বলিয়া ত। প্রাচীন রোমে অনেক বাপ-মা ছেলে হবামাত্র রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিত, আরও কত জায়গায় যে ছেলে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। ক্রমে সমাজবন্ধন যত দৃঢ় হইতে লাগিল, ততই সন্তান-প্রতিপালন পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার পর অনেক পিতামাতা সন্তান প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন না, অনেক জায়গায় পিতামাতা বালকের বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, এ সর্ব্বত্রই ত সমাজ যে কোনরূপে ছেলেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে, কোন ছেলে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, কেহ দীর্ঘকাল শিক্ষানবীশ থাকে। যেরূপেই হউক, পিতামাতাই হউক, আত্মীয় বন্ধুই হউক, উদাসীনই হউক, সুনিয়মবদ্ধ দান প্রণালীই হউক—সবই সমাজবন্ধনের হেতুই হইয়া থাকে। সমাজবন্ধন না থাকিলে শতকরা নিরনব্বই ছেলে মারা যাইত।

অতএব যখন সাতাইশ বৎসর বয়সে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া নিজের উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহার দেনা অগাধ। এখন হইতে সে যদি শুদ্ধ আপনার মত রোজগার করিয়াই ক্ষান্ত তবে সে মহা পাতকী, জুয়াচোর, কারণ, সে দেনা শোধ দিবার কোন উপায় করে না। আবার অনেকে আছেন, তাঁহারা একেবারে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন উপায়ই করেন না। তাঁহারা সমাজের পরম শত্রু, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারা অন্য লোকের ন্যায্য উপার্জ্জনের কড়ি লইয়া অনর্থক নষ্ট করেন, কারণ, যে নিজে রোজগার করিবে না, তাহার জীবনধারণই অনর্থক। ডাকাইত, জুয়াড়ি আর ভিক্ষুক এই তিন জন শেষোক্ত প্রকারের লোক। যাঁহারা আপন ক্ষমতাতীত দেনা করেন, পরের টাকা লইয়া দাঁও মারা ব্যবসায় ও বাবুগিরি করেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব যাঁহারা শুদ্ধ নিজের মত রোজগার করিয়া ক্ষান্ত হন ও যাঁহারা রোজগার না করেন, তাঁহারা আপনাদেরও কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দেনা শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন ও দেন, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্যক্ সাধন করেন। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনই ত জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর আরও কিছু করিতে হইবে।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে—সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, সমাজের উপকার কর। তোমার নিজের সন্তান-সন্ততির সুন্দররূপে প্রতিপালন কর; তাহাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দাও, সমাজের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাহার জন্য অর্থ, সামর্থ্য ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইও না। যাহাতে সমাজের উপকার হয়, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর; এইরূপেই সমাজের দেনা শোধ হইবে।

কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুদ্ধ এই হইলেই হইবে না, বৃদ্ধ অবস্থায় খতাইয়া দেখ, যদি তোমার দেনা থাকে, তবে তুমি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পার নাই। যদি ঠিক ঠিক হয়, তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ মাত্র; কিন্তু যদি তোমার হিসাবে

বেশী থাকে, তবে তোমার জীবন সার্থক। যত বেশী থাকিবে, ততই তোমার বাহবা। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পার, পরিশ্রমের দ্বারা পার, ধন দ্বারা পার, কর্ত্তব্য যাহা আছে তাহার অপেক্ষা সমাজের অধিক উপকার করিলেই তোমার মনুষ্যজীবন সার্থক।

সেকালে এক গল্প শুনিয়াছি, এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। তাহার বেতন লক্ষ টাকা। তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিবর, তোমার এত টাকার কি দরকার? সে বলিল, "মহারাজ, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয়, চৌথ ধার দিতে হয়, চৌথ আহার করা যায়, আর চৌথ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করি। মন্ত্রিবর ঠিক বলিয়াছিলেন। যে লোক ধার শোধ দিয়া ও ধার দিয়া যাইতে পারে, সেই ধন্য। মনুষ্যজীবনের দেনা যে যাহার নিকট হইতে লইয়াছি, তাহাকেই শোধ দিতে হইবে, তাহা নহে। লইলাম সমাজের নিকট, দিলাম সমাজকে; পিতা মাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ করিলাম সন্তানকে। দাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, দিলাম অনাথকে। দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন করিলাম বিদ্যালয়। গুরুর নিকট উপদেশ পাইলাম শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে। গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ পাইলাম, নিজে গ্রন্থপাঠ করিয়া রচনা করিয়া তাহার ঋণ শোধ দিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্র চেষ্টা করা উচিত, যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক দেওয়া। পৈতৃক সম্পত্তি কাহারও নয়, সমাজের নিয়মে আমি তাহা পাইলাম। সমাজ আমায় দেওয়াইয়া দিল, আমি সমাজের নিকট ঋণী। আমি যদি সেই টাকা তিন দিনে ফুঁকিয়া দিই, তবে আমি পাপী, আমি সমাজের সর্ব্বপ্রকার দণ্ডের যোগ্য। যদি তাহা কোনরূপে সঞ্চিয়া বঞ্চিয়া রাখিয়া যাই, তবে আমার মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমি শুদ্ধ পাকা দ্বারবানের কাজ করিলাম বটে, কিন্তু যদি সেই টাকা লইয়া খাটাই, তাহাতে সহস্র লোকের জীবন নির্ব্বাহ হইয়া আবার আমার টাকা বাড়িয়া যায়, তবে আমি সার্থকজন্মা। আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তি বিনা পরিশ্রমে পাইয়াছি, তখন আমি, যে না পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সমাজের নিকট অধিক ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমার তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত উচিত। যিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি অধিক পাইয়াছেন, তাঁহার একটা মস্ত সুবিধা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার উচিত সেই পরিমাণে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করা। যে বালক অনেক সুবিধায় উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট সমাজ অনেক আশা করে। যেহেতু সমাজে তাঁহার চারিদিক হইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, খতাইয়া যে অল্প বা অধিক স্থির করিতে হইবে, তাহার উপায় কি? কোনরূপ তুলাদণ্ড ত নাই, যাহাতে কার কাজ বেশী হইল, কার কম হইল, তা জানা যাবে। তাহার নিখতি নাই, সের বাটখারা নাই, ওজন নাই, মাপ নাই; টাকায় তাহার মূল্য করা যায় না যে জানিলাম ৫০০ টাকা ধার আর এই ১০০০ টাকা জমা, ধার শোধ দিয়াও ৫০০ টাকা অধিক থাকিবে। কিন্তু মন তাহার সের বাটখারা লইয়া বসিয়া আছে; আপনার মনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, সেই তাহার মাপ। আর এক মাপ যশঃ; বাহিরের

লোকে তোমায় ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে, তাহারা তোমার কাছ থেকে যতটুক আশা করে তাহা অপেক্ষা তুমি যদি অধিক করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহার পরিমাপক মাত্র। যাহারা সমস্ত জীবন কেবল কিসে লোকে ভাল বলিবে, কিসে লোকে ভাল বলিবে এই ভাবনায় অস্থির, কেবল লোককে খুসী করিবার চেষ্টায় ফিরে, তাহাদের যদি সার না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা, তাহারা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। যাহাদের সার আছে তাহাদের যশঃ সুখ্যাতি বাঁধা। যাহারা যশকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তাহারা সের বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয়।

অনেকে মনে করেন, বিদ্যা জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মোন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে, বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে দান করিবে, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গজগজ করে, তবে বিদ্যায় কাজ কি? যদি সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া সমাজকে কিছু ঋণ দিয়া যাইতে পার, তবে ত জানি তোমার জীবন সার্থক; নচেৎ তোমার পেটে বাস্তায় পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল আপনার পেট চলিলেই খুসী থাক, তবে তোমার বিদ্যার মুখে আগুন।

তাহাই বলিতেছি যে বিদ্যা যশঃ ধন মান পরোপকার এই সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর ও মনের উন্নতি হইয়া নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক, পরিশ্রম দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।

বঙ্গদর্শন
ফাল্গুন ১২৮৫

এক্সচেঞ্জ

বিদেশ হইতে আমদানী জিনিস কিনিতে হইলেই এক্সচেঞ্জ দিতে হয়। এই এক্সচেঞ্জের দরুণ কখন কখন লাভও হয়। লাভই হউক, আর লোকসানই হউক, শতকরা ২।৩ টাকার উপর এক্সচেঞ্জ প্রায় কখনই দিতে হয় না। কিন্তু আজি কালি শতকরা প্রায় ২২ টাকা এক্সচেঞ্জ দিতে হইতেছে। যদি কোনরূপ এক্সচেঞ্জ না থাকে, তবে এক পাউণ্ডের জিনিস এখানে ১০ টাকায় বিক্রয় হয়। এক পাউণ্ডের রীতিমত দাম ১০ টাকা। ১০ পাউণ্ডের জিনিস ১০০ টাকায় বিক্রয় হয়। কিন্তু এখন ১০ পাউণ্ডের জিনিসের মূল্য ১২২ টাকা হইয়াছে। ইহার দরুণ যে শুদ্ধ যাহারা বিলাতী জিনিস কেনে তাহাদেরই অসুখ হইতেছে তাহা নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর বিলাতে প্রায় এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অথবা পনর কোটী টাকা পাঠাইতে হয়। এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলমালের দরুণ প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক পাঠাইতে হইতেছে। ইহার দরুণ সমস্ত ভারতবর্ষবাসী প্রজাদিগেরই কষ্ট হইতেছে। যেখানে ১৫।১৬ কোটী টাকায় হইত, সেখানে এখন ১৯।২০ কোটী লাগিতেছে। এরূপ এক্সচেঞ্জ গোলমাল হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রতিপাদ্য বিষয় দুইভাগে বিভক্ত করিতে হয়। ১ম বিদেশীয় বাণিজ্য হইলেই অল্পবিস্তর এক্সচেঞ্জ কেন দিতে হয়? ২য় আজি কালি সেই এক্সচেঞ্জ এত বেশী কেন হইল?

প্রথম নিয়মমত এক্সচেঞ্জ হইবার কারণ এই যে, যখন দুইটী দেশে বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কিছু ক্রয় বিক্রয় নগদ টাকায় হয় না। বাণিজ্য—বিশেষতঃ বিদেশীয় বাণিজ্য ধারেই নির্ব্বাহ হয়। ফ্রান্সের লুইস যখন ইংলণ্ডের হেনেরির নিকট ব্র্যাণ্ডি বিক্রয় করিল, তখন হেনেরি তাহাকে এক খত লিখিয়া দিল যে উহার দাম ছয় মাস পরে দিব। আবার যখন ইংলণ্ডের জন ফ্রান্সের চার্লসের নিকট কাপড় বিক্রয় করিল, তখন চার্লসও পূর্ব্বোক্তরূপ খত লিখিয়া দিল। এইরূপ ইংলণ্ডের উপর ফ্রান্সের ও ফ্রান্সের উপর ইংলণ্ডের অনেক খত জমিল। ইংলণ্ডের লোক ফ্রান্সে টাকা পাঠাইতে হইলে নগদ টাকা না পাঠাইয়া ফ্রান্সের কোন সওদাগরের সই করা খত ফ্রান্সে পাঠাইবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের লোকও ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডের কোন সওদাগরের সহি করা খত পাঠাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং ঐ খতের নিয়মিত ক্রয়

বিক্রয় ব্যবসায় চলে। দালালেরা এই ব্যবসায় চালায়। যেমন অন্য ব্যবসায়ে জিনিস কম ও খরিদ্দার বেশী হইলে জিনিসের দাম অধিক হয় ও খরিদ্দার কম ও জিনিস বেশী হইলে জিনিসের দাম কম হয়, খতের ব্যবসায়েও ঠিক তাহাই হয়। কখনও খত অধিক মূল্যে, কখন অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। কেবল অধিকের মধ্যে এই যে অন্যান্য জিনিসের মূল্য অনেক বাড়িতে ও অনেক কমিতে পারে, খতের ব্যবসায়ে তাহা হয় না; যদি নিতান্ত অধিক মূল্য হইয়া উঠে, তবে লোকে খত না কিনিয়া টাকাই পাঠায়; সুতরাং খতের মূল্য টাকা পাঠানর খরচ পর্য্যন্ত বাড়িতে কমিতে পারে, ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে না। মনে কর ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে একশত পাউণ্ড পাঠাইতে ২ পাউণ্ড খরচ হয়। ১০০ পাউণ্ড খতের দাম যদি ১০৩ পাউণ্ড হইয়া উঠে, লোকে সে খত কিনিবে কেন? তাহাতে তাহাদের কি উপকার হইবে। তাহারা নিজের খরচে টাকা পাঠাইলে তাহাদের এক পাউণ্ড লাভ হইবে। অতএব নিয়মিত ব্যবসায়ের এক্সচেঞ্জ টাকা পাঠানর খরচের অধিক বা অল্প হইতে পারে না। সচরাচর আমরা যে অল্প বিস্তর এক্সচেঞ্জ দিয়া থাকি তাহার কারণ এই, আর কিছুই নহে। মনে যেন থাকে যে টাকা পাঠানর খরচ অপেক্ষা এই এক্সচেঞ্জ অধিক হইতে পারে না। আর এই এক্সচেঞ্জ প্রত্যহ পরিবর্ত্তনশীল। আজ শতকরা ২ টাকা বেশী দিতে হইল, কালি আবার শতকরা ২ টাকা কম। কিন্তু ২ টাকার অধিক কখন উঠিবে না।*

এখন লোকে মনে করিতে পারেন যে, যাহারা খত কিনিবে তাহারাই একচেঞ্জ দিবে। অন্য লোকে দিতে যাবে কেন? তাহার উত্তর এই যে, বিদেশে টাকা অধিকাংশই ব্যবসায়ীদিগের পাঠাইতে হয় সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে জিনিস কিনিতে হইলে তাহারা সেই এক্সচেঞ্জ খরিদ্দারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। সুতরাং যে কেহ বিদেশের আমদানী জিনিস কিনিবে, তাহাকেই এক্সচেঞ্জ দিতে হইবে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সাজে। কারণ দুই জায়গায়ই সোণার টাকা চলন। রূপার টাকার চলন এই দুই দেশে প্রায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে একথা নহে; ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলন, ইংলণ্ডে সোণার টাকা চলন; সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ে এই দুই ধাতুর মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত আর এক প্রকারে এক্সেচেঞ্জ হইবার সম্ভাবনা। কখন সোণার দর অধিক হয়, কখন সোণার দর কম হয়; কখন রূপার দর অধিক হয়, কখন উহার দর কম হয়, ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলতি, ভারতবর্ষের লোক রূপার দাম কমবৃদ্ধি বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে। রূপার দাম যা ছিল তাই আছে। যখন রূপার দাম বাড়ে, তখন তাহারা ভাবে সোণার দাম কমিয়াছে। যখন রূপার দাম কমে, তখন ভাবে

---

* মিল বলেন, টাকা পাঠানর উপর আরো কিছু দিতে হয়। যে দালাল হইবে তাহার লাভও দিতে হয়।

সোণা মহার্ঘ হইয়াছে। এইরূপ ইংলণ্ডের লোকও ভাবে। কিন্তু চিন্তাশীল লোক মাত্রেই দেখিতে পান, কাহার দাম বাড়িয়াছে ও কাহার কমিয়াছে। যাহারা দুই দেশে বাণিজ্য করে—তাহারা টের পায় যে এক্সেচেঞ্জ বাড়িতেছে ও কমিতেছে। যে দেশের এক্সচেঞ্জে লোকসান, তাহাদের টাকার দাম কমিয়াছে। যে দেশের লোকসান নাই বা লাভ আছে তাহাদেরই টাকার দাম বাড়িয়াছে। যখন রূপার দাম কম হয় বা সোণার দাম বেশী হয় তখন এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের লোকসান ও যখন রূপার দাম বেশী হয় বা সোণার দাম কম হয় তখন ভারতবর্ষের লাভ। বর্ত্তমান সময়ে সোণার দাম বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। যে সোণা ১৬ টাকায় তোলা বিক্রয় হইত তাহারই মূল্য এখন ১৯৷৷০ সাড়ে উনিশ টাকা। যে পাউণ্ড ১০ টাকা ছিল তাহার দাম সুতরাং ১২ টাকার উপর উঠিয়াছে।

যখন এক্সচেঞ্জে বড়ই লোকসান হইতে লাগিল, যখন এক্সচেঞ্জে শতকরা ২ টাকা লাভ থেকে একেবারে শতকরা ১০।১২ টাকা লোকসান হইতে লাগিল, তখন সকলে ভাবিত যে এক্সচেঞ্জের এ লোকসান প্রথম কারণ বশতঃ হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর বিল অধিক হইয়াছে, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের উপর বিল কম হইয়াছে। ব্যবসায়ের রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার দ্রব্য বিলাতে যায়, বিলাত হইতে ৪০।৪২ কোটী টাকার জিনিস আসে ; সুতরাং ভারতবর্ষে বিলের দাম সস্তা হইয়া এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের লোকসান। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রথম প্রকারে এক্সচেঞ্জে শতকরা ২।৩ টাকা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খরচ যাহা তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। তাহার পর আরও প্রমাণ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ১৫।১৬ কোটী টাকা নানাবাবদে বিলাতে পাঠাইতে হয়। ঐ ১৫।১৬ কোটী টাকা নগদ না গিয়া উহার পরিবর্ত্তে মাল যায়। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে যে মাল আসে তাহা অপেক্ষা ভরতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে ১৫।১৬ কোটী অধিক টাকার মাল যাওয়া চাহি। তাহার উপর ইংলণ্ডের লোকের অনেক টাকা ভারতবর্ষে খাটিতেছে, তাহার সুদ প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে যাইতেছে। সেও নগদ যায় না, জিনিসে যায় ; সুতরাং ভারতবর্ষে যদি ৪০।৪২ কোটী টাকার জিনিস আসে তো ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটী টাকার জিনিস যাইবে ; যখন বিলাতে পঁহুছিবে তখন পথখরচ সমেত এই জিনিসের দাম ৬৪ কোটী টাকা হইবে। এই ৬৪ কোটী ভারত দিল, ইহা হইতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীর দাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোমচার্জ্জেস ও বিলাতীয় টাকার সুদ সব প্রদত্ত হইবে। এক্সচেঞ্জ কম বেশী হওয়ার দরুণ ব্যবসায়ে ভারতবর্ষীয়দিগের লোকসান হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ের দরুণ ভারতবর্ষের এক্সচেঞ্জে লোকসান হয় নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের উপর যত বিল রাখে, ইংলণ্ডেরও বিল, সেক্রেটরী অব ষ্টেটের ড্রাফ্‌টে ও অন্যান্য রকমে প্রায় ততই হইয়া উঠে, সুতরাং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর অধিক বিল থাকিলে যে এক্সচেঞ্জ

গোলমাল ঘটিত তাহা আর ঘটে না, কারণ, বাস্তবিক বিল উভয় দেশে সমান সমান আছে।

অনেকে আবার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে রূপা সস্তা হওয়ার দরুণ এক্সচেঞ্জে লোকসান হইতেছে। ১৮৫১ সাল হইতে যখন সোণা বড়ই সস্তা হইতে আরম্ভ হইল, তখন ইয়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল রূপার টাকা ভাঙ্গাইয়া এসিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। আবার ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে বড় বড় রেলওয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল। সমস্ত রেলওয়েই বিলাতের টাকায় তৈয়ারি, সুতরাং অনেক রূপা ঐ সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসে। ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলিত, সুতরাং রূপা পাঠানতেই রেলওয়ে কোম্পানীর সুবিধা হইতে লাগিল। রূপার দরকারও বিলাতে কম হইতে লাগিল। এইরূপে অধিক রূপা দেশে আসার দরুণ এদেশে রূপা সস্তা হইত, যদি যত রূপা আসিয়াছিল সমস্তই টাকা হইয়া চলিত। কিন্তু অনেক রূপা টাকারূপে চলিতেছে না, অনেক লোক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্কিং এখানে ভাল নাই, সুতরাং এ দেশের লোক যাহা কিছু সঞ্চয় করে তাহা হয় গহনা গড়াইয়া রাখে না হয় পুতিয়া রাখে; সুতরাং রূপা যখন বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে না রহিল, তখন রূপা সস্তা হইল কেমন করিয়া বলিব। আর এদেশে রূপা সস্তা হইলে জিনিস পত্রের দাম মহার্ঘ হইত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হয় নাই। অকাল দুর্ভিক্ষ পড়ার দরুণ যে সকল জিনিসের দাম মহার্ঘ হইয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়া আর সর্ব্বত্র যে দাম ৫।৭ বৎসর ধরিয়া ছিল সেই দামই আছে, সুতরাং রূপা সস্তা হয় নাই। অতএব দুই চারিজন প্রধান সংবাদপত্রওয়ালা যে বলিয়াছিলেন যে জর্ম্মনির বাতিল রূপা কিনিয়া রাখিলে এক্সচেঞ্জে সুবিধা হইবে, তাহা ঠিক নহে। এরূপ কিনিলে এক্সচেঞ্জে একটু লাভ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে টাকা দিয়া কিনিতে হইত তাহার সুদ দিত কে?

এখন অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে সোণা মহার্ঘ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহারা তলাইয়া না বুঝে তাহাদের কাছে রূপা সস্তা হওয়া ও সোণা মহার্ঘ হওয়া দুইয়েরই এক প্রকার ফল, সুতরাং তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না সোণা মহার্ঘ হইল কি রূপা সস্তা হইল। বর্ত্তমান উদাহরণে তাঁহারা ঠিক উল্টাটি বুঝিয়াছেন।

যদি বল সোণা মহার্ঘ হইল কিরূপে জানা গেল। আজি কালি ইংলণ্ডে বাণিজ্যে বড় গোলযোগ, অনেক হাউস ফেল হইতেছে, লাভ কম হইতেছে, ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় প্রকাশ পায় যে, ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে যখন ব্যবসায় বড়ই ভাল ছিল তখন যে জিনিস যত আমদানী ও রপ্তানী হইত এখন তাহা অপেক্ষা জিনিসপত্র বেশী আমদানী রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু যখন দাম ধরিয়া দেখা যায় তখন প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প দামের জিনিস আমদানী রপ্তানী হইতেছে। আর বাজার দৃষ্টান্ত দেখিলেও সকল জিনিসেরই দাম কমিয়াছে—যেমন রূপার দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিয়াছে, তেমনি সকল জিনিসেরই দাম শতকরা

২২ করিয়া কমিয়াছে। সুতরাং সোণার দাম শতকরা ২২ করিয়া বাড়িয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি ৩০ মণ জিনিস রপ্তানী হইত তাহার দাম হইত ১৫০ পাউণ্ড, এখন হয়ত ৩৫ মণ রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু দাম হয়ত ১৪৫ পাউণ্ড বই নয়। এরূপ যদি একটা আধটা জিনিসের দাম কম হয় তবে জানা যায় যে অধিক উৎপন্ন হওয়ার দরুণ না হয় সেই জিনিসটাই সস্তা হইয়াছে, কিন্তু যখন সকল জিনিসেই এই রকম তখন তাহাতে কি বুঝায়? যে, যে বস্তু দ্বারা দাম নির্ণয় হয় তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে, এই না! ইংলণ্ডে সোণা দ্বারা দাম নির্ণয় হয়, সুতরাং সোণার মূল্য অধিক হইয়াছে।

এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে সোণা মহার্ঘ হওয়ার জন্য এক্সচেঞ্জে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কথা এই, সোণা মহার্ঘ হয় কেন? অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় এত সোণা আবিষ্কার হইল, সোণা কোথায় সস্তাই হইবার কথা, তাহা না হইয়া উপরন্তু মহার্ঘ হইয়া গেল! এ কেমন করিয়া হইবে! উত্তর এই যে ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইংলণ্ড স্থির করে যে, যে জিনিস যেখানে সস্তা পাইব সেই জিনিস সেইখানে কিনিব ও যেখানে যে জিনিস মহার্ঘ দেখিব সেইখানে সে জিনিস বেচিব। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্য করার দরুণ ইংলণ্ডের শীঘ্র শীঘ্র ধনোন্নতি হইতে লাগিল। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডে কেবল সোণার টাকা চলিতেছে, তাহার দরুণ ইয়ুরোপীয় রৌপ্যমুদ্রদেশ সকলকে মধ্যে মধ্যে এক্সচেঞ্জে লোকসান দিতে হইত। তাহারা মনে করিত যে ইংলণ্ডের উন্নতির মূল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার, উহাতে অপরাপর জাতির হানি করিয়া ইংলণ্ড বড় মানুষ হইতেছে। তাহার উপর আবার যখন স্বাধীন বাণিজ্য অবলম্বনের জন্য ইংলণ্ডের অতি শীঘ্র ধনোন্নতি হইল, তখন উহাদের পূর্ব্ব সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কার হইল, যেমন এসিয়ায় অনেক রৌপ্য চালান হইতে লাগিল ইয়ুরোপের জাতিরা অমনি স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মনিতে শুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা ছিল। ফ্রান্সে স্বর্ণ রৌপ্য দুই প্রকারের মুদ্রাই ব্যবহার ছিল। একটা অনুপাত বাঁধা ছিল, যেমন এক তোলা সোণার দাম ১৬ তোলা রূপা। ২০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তোমায় দিতে হইল, সে কালে তুমি ফ্রান্সে সোণা বা রূপার যে কোন মুদ্রা ইচ্ছা দিতে পারিতে। (ইংলণ্ডে এরূপ হইবার যো নাই—২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত রূপায় দিতে পার, তাহার উপর সোণা দিতেই হইবে) আমেরিকায় মাঝে দিনকত কাগজের টাকা চলিতেছিল; যুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনেক টাকার দরকার হয়,—অত সোণা বা রূপা উপস্থিত না থাকায় কাগজের টাকা কিছু দিনের জন্য বাহির করিতে হয়। ১৮৭০।৭১ সালে দেখা গেল, জর্ম্মনি রূপার টাকা তুলিয়া দিয়া সোণার টাকা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুইজর্লণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালী একত্রে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছামত রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ

স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিয়াছে। আমেরিকাও কাগজের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা ছাপাইতেছে। ইংলণ্ডেও বাণিজ্যবিস্তারের জন্য অনেক স্বর্ণমুদ্রা আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং অনেক সোণার দরকার হইয়াছে, সোণার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে, সোণার দাম ক্রমে উঠিতেছে—ওদিকে আবার ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম প্রথম অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় যে স্বর্ণ উৎপন্ন হইত এখন আর তত হয় না। সোণার দাম কাজেই আরও বাড়িয়া গেল, শেষ এখন শতকরা ২২ টাকা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আমেরিকায় অনেক রূপার খনি আবিষ্কৃত হয়, তখন একবার সোণা রূপার দামে এইরূপ তফাৎ হইয়া উঠে। তখন রূপা প্রায় শতকরা ৩৩ টাকা সস্তা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তখন শুদ্ধ স্বর্ণমুদ্র দেশ ছিল না, সকল দেশেই দুই প্রকারের মুদ্রা ছাপা হইত। স্বর্ণমুদ্রা অধিক পরিমাণে না ছাপিয়া রৌপ্যমুদ্রা অধিক পরিমাণে ছাপাইলে সে গোলযোগ অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিত। কিন্তু তখনও এত গোলমাল হয় নাই। রূপা সস্তার দরুণ যে ক্ষতি তাহাই মাত্র হইয়াছিল। এবার যদি স্বর্ণ সস্তা হইয়াই ক্ষান্ত হইত তাহা হইলে সেবারের মত ঠিক হইয়া দাঁড়াইত, কিন্তু এবার ইয়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের আহাম্মকিতে সোণার দাম সস্তা না হইয়া আরও মহার্ঘ হইয়া উঠিল। যদি মহার্ঘ হইয়াই ক্ষান্ত হইত তবেও ভাল ছিল। জানিলাম, বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর ১৬ টাকায় সোণার ভরি মিলিবে না, ১৯ টাকাই ভরি হইবে। সেই পরিমাণে এক্সচেঞ্জ বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত নহে। কেহই এখন পর্য্যন্ত অবগত নহে যে কত পরিমাণে সোণার দাম বেশী হইবে। জর্ম্মনি হইতে সব রূপার টাকা এখনও বাহির হয় নাই, এখনও জর্ম্মনিকে অনেক পরিমাণে সোণা কিনিতে হইবে, সোণার দাম তাহা হইলে আরও মহার্ঘ হইবে। এক্সচেঞ্জও কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, জিনিস বিলাত হইতে পাঠাইবার সময় এক রেট, সেই জিনিস ভারতবর্ষে পঁহুছিবার সময় রেট তাহা অপেক্ষা বেশী। এইরূপ এক্সচেঞ্জ রেট অনির্ণয়ে ব্যবসাদারদিগের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, খরিদ্দারদিগেরও অনেক অসুবিধা হইতেছে।

অনেকে আছেন তাঁহারা বলেন এই সময় ভারতবর্ষও স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুক, তাহা হইলে তাহাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের এক্সচেঞ্জ দিতে হইবে না, প্রথম প্রকারের এক্সচেঞ্জ দিলেই হইবে। এখন যদি ভারতবর্ষও আবার সোণার খরিদ্দার হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সোণার দাম অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে, কারণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে হইলে অল্প স্বর্ণে হইবে না, তত স্বর্ণ বাজারে নাই; সুতরাং সোণার দর এখন যদি শতকরা ২২ বেশী থাকে, তখন শতকরা ৫০ বেশী হইয়া দাঁড়াইবে।

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ হইতে এ পর্যন্ত যত সোণা রূপা পাওয়া গিয়াছে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। ইহা দেখিলেই জানা যাইবে এত সোণা আবিষ্কার হইয়াও কেন

সোণা মহার্ঘ রহিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর আগে কেয়ারণ সাহেব ও লেডি ফসেট বলিয়াছিলেন সোণা সস্তা হইয়াছে; লেডি ফসেট বলেন যে, তখন শতকরা ১৫ টাকা সোণার দাম কমিয়াছিল। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের এক প্রসিদ্ধ মাগাজিনে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সোণার মূল্য শতকরা ২২ টাকা বাড়িয়াছে। ১৮৫১ সালের পুর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত খনি হইতে ৬ কোটী টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইত, এই ৬ কোটীর ৪ কোটী ইংলণ্ডে আসিত। তাহার পর লেডি ফসেট যখন তাঁহার পুস্তক লিখেন, তখন গড়ে ১৯ কোটী টাকার সোণা প্রতি বৎসর উত্তোলিত হয় ও তাহা হইতে ১৪ কোটী টাকার সোণা ইংলণ্ডে আসিত। ইংলণ্ড ব্যবসায়ের দেশ, অন্যান্য দেশের লোক স্বর্ণ সমস্তই ইংলণ্ড হইতে পায়। অতএব ইংলণ্ডে যে স্বর্ণ আসে তাহাই ছড়াইয়া পড়ে। অবশিষ্ট স্বর্ণ যে দেশের খনি সেই দেশেই থাকে। সেও অল্প নয়। স্বর্ণ আবিষ্কারের পুর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় টাঁকশাল ছিল না। ২।৫ হাজার টাকা দরকার হইলেই ইংলণ্ড হইতে ছাপা হইয়া আসিত। এখন অষ্ট্রেলিয়ায় মস্ত টাঁকশাল হইয়াছে। কালিফর্ণিয়া অথবা ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে যদিও টাকশাল ছিল, মধ্যে দিনকতক সেখানে টাকা ছাপাই হইত না। এখন আবার সোণা রূপা প্রচুর পরিমাণে ছাপা হইতেছে। নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টি করিলে সোণা কি রূপা মহার্ঘ হইল কতক উপলব্ধি হইবে।

প্রথম রূপা

১৮৭১ সাল হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ৪৫ কোটী নাবারা রৌপ্য খনিতে পাওয়া যায়।

১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৩২ কোটী জর্ম্মনি বিক্রয় করে।

১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত ২৬ কোটী।

ইহার মধ্যে শেযোক্ত ২৬ কোটীর মধ্যে ২৫ কোটী টাকার রৌপ্য শুদ্ধ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই পরিমাণে বরাবর ১৮৭১ সাল হইতে ভারতবর্ষে টাকা আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডে টাকা ধার করিয়া এ দেশে পবলিক ওয়ার্কস চালাইতেছেন, সে টাকার ইংলণ্ড হইতে রূপার চাঁই আসে। এইরূপে ১৮৭১ হইতে এ পর্য্যন্ত যত নূতন রূপা বাহির হইয়াছে তাহার অনেক ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ৪।৫ বৎসর হইল একবার ফ্রান্সে ও ইতালীতে রেসম হয় না, সে বৎসর চীন হইতে সমস্ত রেসম যায়। চীনেরা বিলাতী জিনিস বড় লয় না, তাহারা রূপা লয়। তাহাতেও এই বাড়তি রূপার কিয়দংশ গিয়াছে। ১৮৭১ সালের পুর্ব্বে যে রূপা প্রতি বৎসর বাহির হইত এখনও তাহা হয়, তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ৮।১০ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডকে প্রায় ৭ কোটী টাকার রৌপ্য দিতে হয়। চীনের চা নহিলে বিলাত চলে না। বিলাতী জিনিস চীনেরা লইতে চায় না। সুতরাং অনেক টাকার রৌপ্য প্রতি বৎসর দিতে হয়। চীনের সঙ্গে এরূপ বিস্তৃত বাণিজ্য হইবার পুর্ব্বে অর্থাৎ

১৮৭১ সালের পূর্ব্বে এক ভারতবর্ষে রেলওয়ে কোম্পানীসমূহের ৬ কোটী টাকা খরচ হয়; ইহার কিয়দংশ সোণায় আসে কিয়দংশ ভারতবর্ষেও পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ইংলণ্ড হইতে রূপার চাঁই খরিদ হইয়া আসে। সুতরাং বিলাতে রূপা (কি পুরাণ কি নূতন) অধিক নাই প্রতিপন্ন হইল। প্রায় সমস্ত রূপাই ভারতবর্ষ ও চীনে পঁহুছিয়াছে। সমস্ত রূপা টাকাভাবে নাই। অনেকই কুলিগৃহিণীদিগের পঁইচারূপে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে সোণার হিসাব। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীতে ৬ কোটী টাকার সোণা উৎপন্ন হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

১৮৫২ হইতে ৫ বৎসর	গড়ে	২৯	কোটী	করিয়া	হইয়াছে।
১৮৫৭	„	„	২৪	„	„
১৮৬২	„	„	২২	„	„
১৮৬৭	„	„	২১	„	„
১৮৭২ হইতে ৪ বৎসর	„		১৯	„	„

গড়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০০ কোটী টাকার স্বর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার এক-চতুর্থাংশ গড়ে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় রহিয়া গিয়াছে। আগে যে রূপেই হউক, এক্ষণে বাহিরে যত সোণা যায় সমুদয়ই ইংলণ্ড হইতে। যাহারই সোণা কেনার দরকার হয় সেই ইংলণ্ড হইতে কিনিয়া লয়, সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় এই ৬০০ কোটীর মধ্যে ১৫০ কোটী রহিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেডি ফসেটও বলিয়াছেন যে, যখন ১৯ কোটী উৎপন্ন তখন ইংলণ্ডে ১৪ কোটী আসে। সেই অনুপাত ধরিলেও ১৫০ কোটীই দাঁড়ায়। ইহার উপর এক জর্ম্মনি ১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৮৪ কোটী টাকার স্বর্ণ খরিদ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের করেন্সি টাকা তিনগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৬৫ সাল হইতে ইতালী ফ্রান্স সুইজর্লণ্ড বেলজিয়ম লাটিন কনফারেন্স নামক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রৌপ্য মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখানকার পুরাণ রূপাও কতক ইংলণ্ড হইতে ও কতক নিজ ফ্রান্স হইতে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ সালে আমেরিকায় ৩০ কোটী টাকার সোণা Reserve ছিল। এখন ফ্রান্স ইংলণ্ড ও বর্লিন ব্যাঙ্কে ৩৭ কোটী টাকার রূপা ও ৯৮ কোটী টাকার সোণা Reserve আছে। সে টাকা না থাকিলে ব্যাঙ্ক চলে না। হিসাব করিয়া বেশ দেখান যায় যে ৬০০ কোটী টাকার সোণা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণে বাজার হইতে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। দেখিবে? আচ্ছা, ৬০০ কোটী হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ার ১৫০ ও জর্ম্মনির ৮৪ বাদ দাও, বাকী ৩৬৬। ইহা হইতে আমেরিকায় ৩০ = ৩৩৬। ব্যাঙ্ক Reserve সব বাদ দিতে পার না, কারণ ১৮৫১ সালের পূর্ব্বেও ব্যাঙ্কে রিসার্ভ ছিল। ১৮৪৬ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে সোণায় রূপায় ১৪ কোটী ছিল, ইহার মধ্যে যদি ১০ কোটী সোণা হয় আর ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সেও যদি সেই পরিমাণে সোণা থাকে, তাহা হইলে ২০ কোটী

হইল। জর্ম্মনির রিসার্ভ রূপায় ছিল। তবে এখন যে এই তিন ব্যাঙ্কে ৯৮ কোটী সোণা আছে তাহার অন্ততঃ ৭৬ কোটীও ১৮৫১ সালের পর আসিয়াছে। আচ্ছা, ৩৩৬ হইতে ৭৬ বাদ দাও, বাকী রহিল ২৬০ কোটী।

১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ৪ কোটী টাকার স্বর্ণ আসিত, ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ আন্দাজ গহনা আদি তৈয়ার হইত। মিল বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছিলেন যে, গহনাদিতে (art manufactures) উহা অপেক্ষা বৎসরে অধিক স্বর্ণ লাগে না। তখনও ইংলণ্ডের অনেক স্বর্ণ বাহিরে যাইত, অতএব আমরা যদি আন্দাজ করিয়া ধরি যে ২॥ কোটী টাকার সোণা প্রতি বৎসরে ইংলণ্ডে ছাপা হইত বোধ হয় আমাদের অধিক ভুল হইবে না। এখনকার অনেকে স্বীকার করেন যে ইংলণ্ডের করেন্সি তিনগুণ হইয়াছে, তবে ৭॥ কোটী প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হয়। প্রায় ২৮ বৎসর এইরূপ হইতেছে, সেও প্রায় ২০০ কোটী। বাকী রহিল ৬৬ কোটী, এখনও ফ্রান্স আছেন ও আরও কত দেশে কত রকম সোণার খরচ আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ পর্য্যন্ত হিসাবে দেখাইয়া দিল যে, অদ্যাবধি যত সোণা আসিয়াছিল সব চুকিয়া গিয়াছে।

এখন আর একটী জিনিস চাই। উপস্থিত যে সোণা বাজারে আসিয়া পড়ে তাহাতে পৃথিবীর সঙ্কুলান হয় কি না? যদি হইয়া বাঁচে, ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালানয় ভালই হইবে। যদি না থাকে চালাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। বাজার শব্দের অর্থ ইংলণ্ড। কারণ ইংলণ্ডেই স্বর্ণ ও রৌপ্য জমিয়া থাকে ও তথা হইতেই লোক উহা খরিদ বিক্রয় করে। ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে ১৪ কোটী স্বর্ণ আসিত ; এখন স্বর্ণ উঠা কমিয়াছে, ইংলণ্ডে আসাও কমিয়াছে। যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে এখন কমিয়া ১২ কোটী হইয়াছে। এক ইংলণ্ডেই তাহার ৭॥ কোটী ছাপা হয়। বাকী ৪॥ কোটী। জর্ম্মনি প্রায় তিন কোটী ছাপিতেছেন, লাটিন কন্‌ফরেন্সও তথৈবচ। সাড়ে তের কোটী প্রায় দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুল জমায় ১২ কোটী বই ঘরে নাই, এমনি টানাটানি দাঁড়াইয়াছে যে জর্ম্মনিও আবার রূপা ছাপাইতে হুকুম দিয়াছেন। এখন আবার যদি ভারতবর্ষ স্বর্ণ ধরেন তবে আর রক্ষা নাই।

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে ব্যবসায়ে শতকরা ২।৩ টাকা এক্সচেঞ্জ প্রায়ই দিতে হয়। তাহার উপর সোণা ও রূপার টাকা চলন লইয়া আর এক রকমের এক্সচেঞ্জ হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়ার দরুণ এই এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের ভয়ানক লোকসান হইতেছে। কেন স্বর্ণ মহার্ঘ হইল তাহাও একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সকল ভিন্ন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে আর এক রকমের এক্সচেঞ্জ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার জিনিস ইংলণ্ডে যায় ; আর ইংলণ্ডের, ভারতবর্ষে রপ্তানী সেক্রেটরী অব ষ্টেটের ড্রাফ্‌ট ও টাকার সুদে সেটা ভুক্তন হইয়া যায়। দেনাটা এক রকম গায়ে গায়ে শোধ যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন

বার ইংলণ্ড হইতে কোন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটী টাকা পাঠাইতে হয়, সেবার এক্সচেঞ্জ ভারতবর্ষে একটু না একটু সুবিধা নিশ্চয়ই হয়। আর মধ্যে মধ্যে এরূপ টাকা ধার হইয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসেই। এই ধারী টাকার অনেক রূপা আসে, যে অল্প বিল আসে তাহাতেই আমাদের কিছু সুবিধা হয়।

এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলযোগের ঔষধ কি? উত্তর এই যে, কোন ঔষধই আমাদের হাতে নাই। আমরা কোনরূপেই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারি না। তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে অতি অল্প দিনের মধ্যে রূপার দাম মহার্ঘ হইয়া আসিবে। রূপার বড় বড় খনিতে মাল তলায় পড়িয়াছে। ২০০০|৩০০০ ফুটের নীচে বসিয়া রূপা তুলিতে হইলেই রূপার দাম একটু একটু করিয়া মহার্ঘ হইবে। আর সোণার দাম বেশী হওয়ার দরুণ, ইয়ুরোপীয় অনেক গবর্ণমেণ্টের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে। জর্ম্মনি ত রূপা ছাপিবার হুকুম দিয়াছেন। ইংলণ্ডেও রূপার টাকা অল্প বিস্তর ছাপা হয় এ বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এখন উচিত চুপ করিয়া থাকা, অথবা ইয়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল যাহাতে রূপার টাকা ছাপেন তাহার চেষ্টা করা।

উপসংহার কালে, আমাদের একজন প্রধান সম্বাদপত্র যে বলেন পৃথিবী শুদ্ধ রূপার টাকা হইলে এক্সচেঞ্জ গোল হইবে না, তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জর্ম্মানি ফ্রান্স কেবল সোণার টাকা করিতে গিয়া এখন যেমন গোল বাঁধাইয়াছেন, যদি তাঁহারা ঐরূপ কেবল রূপার ধরিতেন তাহা হইলেও ঠিক এইরূপ গোল হইত। এখন সোণা মহার্ঘ হইয়াছে, তখন রূপা মহার্ঘ হইত, এইমাত্র বিশেষ।

বঙ্গদর্শন
চৈত্র, ১২৮৩

স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর

প্রথম অবস্থায় লোকে আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ আপনি নির্ম্মাণ করিয়া লইত। তখন পরস্পর দ্রব্য বিনিময়ে যে কত শ্রম লাঘব হয়, তাহা লোকে জানিত না। ক্রমে যাহারা নিতান্ত কাছাকাছি থাকিত, তাহারা আপন প্রতিবেশীর সহিত আপন দ্রব্য বদলাইয়া লইত। রাম তাঁত বোনে, শ্যাম ধান রোয়, শ্যামের ধানে রামের পরিবার প্রতিপালন হয়, রামের কাপড়ে শ্যামের পরিবারের শীত নিবারণ হয়। হরি লোহার কর্ম্ম করে, কৃষ্ণ দুধের ব্যবসা করে, ব্রজ নাপিত। পরস্পর পস্পরকে সাহায্য করে, পাঁচজনেই আপন আপন কার্য্য দ্বারা আর চারি জনকে সাহায্য করে, এবং তাহাদের সহায়তায় নিজেরও চলে। এই গ্রাম আরম্ভ। ক্রমে হরি যদি এত লোহার অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে নিজ গ্রামে তাহার প্রয়োজন হয় না, হরি কি করিবে? আপন গ্রামে যত প্রয়োজন তাহাই করিয়া বসিয়া থাকিবে, না বাহিরে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে।

যেমন এক সময়ে সকল লোকই আপন আপন দ্রব্য উৎপাদন করিত, তেমনি এক সময়ে সকল গ্রামই আপন আপন দরকারী জিনিস তৈয়ার করিয়া লইত। ক্রমে তাহারা দেখিল যে, পরস্পরের সহায়তা পাইলে সুবিধা হয়। হরিপুর দেখিল যে বিষ্ণুপুরে একজন কর্ম্মকার আছে, সে অল্প সময়ে অনেক লোহার অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে, তাহার নিজের গ্রামের যত দরকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সে তৈয়ার করে। সুতরাং হরিপুরের লোক বিষ্ণুপুরের হরির কাছ হইতে সস্তায় লোহার কাজ লইতে লাগিল। হরিপুরের কর্ম্মকার চাস করিতে লাগিল। এইরূপে একজন নাপিতে দুই গ্রামের চলিল। হয়ত হরিপুরের জমিতে অরহরের দাল বড় চমৎকার হয়। বিষ্ণু-পুরের লোক অরহরের দাল চাস আর না করিয়া লোহার কাজ ও নাপিত দিয়া অরহরের দাল পাইতে লাগিল। দুই দলেরই কিছু সাশ্রয় হইল, শ্রম ও ব্যয় লাঘব হইল।

ক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সাহায্যকারী অনেকগুলি গ্রাম একত্র হইয়া একটী গ্রামসমবায় হইল। এই গ্রামসমবায়ের নাম জেলা বলিলাম, এই এক এক জেলার লোক আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই জেলার মধ্যে তৈয়ার করিয়া লয়। জেলার মধ্যে

যে জায়গায় যে জিনিসটী ভাল হইতে পারে, সেখানকার লোক কেবল সেই জিনিসটীই তৈয়ার করে, অপর বস্তু তাহাদের প্রতিবেশবাসীদিগের নিকট আপন জিনিসের বদলে পায়। মনে কর, জেলার নাম বরিশাল। বরিশালের লোক দেখিল যে চাউল তাহাদের দেশে এত উৎপন্ন হয় যে, তাহারা চাউল অনায়াসে বাহিরে পাঠাইতে পারে। ঢাকার লোকও দেখিল যে তাহারা যত কাপড় তৈয়ার করিতে পারে তত কাপড় তাহাদের দরকার হয় না; সুতরাং তাহারাও কাপড় বিদেশে পাঠাইতে রাজি হইল। দুই দলই রাজি, বন্দোবস্ত হইল, ঢাকার লোকের চাল বরিশাল দিবে, বরিশালের কাপড় ঢাকা দিবে। আগে যেমন রামে ও শ্যামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এখন ঢাকা ও বরিশালে তাহাই আবার হইল। কিন্তু এবার বরিশালে যাহারা কাপড় তৈয়ার করিত তাহারা ও ঢাকায় যাহারা চাউল তৈয়ার করিত তাহারা প্রায় দুই তিন হাজার লোক। ইহারা কাজ পাইল না। ইহাদের দশায় কি হইবে! ইহাদের দিনকতক খুব ক্ষতি হইবে। বরিশালের তাঁতীদের মধ্যে যাহারা ভাল তাহারা ঢাকায় চলিয়া যাইবে, যাহারা মন্দ চাস করিবে। কতক অন্য অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, কতক এই হেঁপায় মরিয়াও যাইবে। ঢাকার চাসারাও কতক তাঁতীর কাজ শিখিবে, কতক অন্য ব্যবসায়ে যাইবে, কতক বরিশালে চলিয়া যাইবে। দুপাঁচজন না খাইয়াও মারা যাইবে। ঢাকা ও বরিশাল ত প্রথম হইতেই পরস্পরের কাপড় ও চাউল যত দরকার সবই দিতে পারিত; আর ঢাকায় তাঁতী বাড়িল, বরিশালে চাসা বাড়িল। ঢাকায় অনেক অধিক কাপড় হইতে লাগিল, বরিশালে অনেক অধিক চাউল হইতে লাগিল। লোকের সচ্ছল হইয়াও বাঁচিতে লাগিল। তখন লোকে শুনিল মালদহে উৎকৃষ্ট আম্র হয়, দেশের আম্র টক বিস্বাদ। অমনি ঢাকা ও বরিশাল দুই জায়গার লোকই মনস্থ করিল যে, আমাদের বাড়তি কাপড় ও চাউল দিয়া আইস, খুব করিয়া আম্র ভক্ষণ করা যাউক। মালদহের লোকও দেখিল মন্দ নয়, অনায়াসে চাউল ও কাপড় মিলিবে; মালদহের চাসা ও তাঁতী সবাই নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আমেরই বাগান তৈয়ার করিতে লাগিল। ঢাকা ও বরিশালে যাহাদের আমের বাগান ছিল, তাহারা নিজ নিজ বাগান বেচিয়া আবার কাপড় ও চাউল তৈয়ার করিতে লাগিল। মালদহওয়ালারা দেখিল যে তাহারা ঢাকা, বরিশাল ও মালদহের লোককে পেট ভরিয়া আম্র ভক্ষণ করাইয়াও প্রতিবৎসরে ১২।১৩ লক্ষ আম বাঁচাইতে পারে; তখন তাহারা ভাবিল আম বৎসরে দুই মাস বই পাওয়া যায় না, সম্বৎসর আম খাওয়া যায় ইহার কোন উপায় হয় না কি? ক্রমে বাহির হইল যে, যদি আমের রস শুকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সম্বৎসর চলে। আর কাঁচা আম কাছাকাছি ৪।৫টী জেলা বই ত দূরে পাঠান যায় না শুকাইয়া রাখিলে আরো অনেক দেশে পাঠাইতে পারা যাইবে। ঢাকা ও বরিশাল হইতে চাউল কাপড়ের সংস্থান হইতেছে, অন্য জায়গা হইতে আরও নানা জিনিস মিলিবে। ঢাকা ও বরিশালের তাঁতী

ও চাসা আবার বাড়িয়াছে, তাহারা অন্য অন্য জেলায় আপন আপন কাপড় ও চাউল পাঠাইতে লাগিল। মালদহে আম শুকাইয়া আমস্বত্ব করা একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে; ইহাদের তাহার আর প্রয়োজন নাই। এইরূপে স্বাধীন বাণিজ্যদ্বারা এই লাভ হইল যে, যে দেশের লোক যাহা সুবিধামত প্রস্তুত করিতে পারে, সে তাহাই প্রস্তুত করিতে লাগিল, তাহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল। উৎপন্ন অধিক হইল। একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়া হওয়াতে সম্বৎসর লোকে আমের স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আর এক জেলার কতকগুলি লোক, তিন জেলায় সর্ব্বদা যাতায়াত করার দরুণ ইহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি হইল।

আমরা এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম যে ব্যবসায়ের জন্য বরিশালে কাপড়ের কারবার উঠিয়া গেল, ঢাকায় চাউলের চাস উঠিয়া গেল ও মালদহ হইতে দুই উঠিয়া গেল। বাস্তবিক তাহা হয় না, জীবনধারণোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু কখন একবারে কোন বিস্তৃত ভূভাগ হইতে উঠিয়া যায় না। কিছু না কিছু পরিমাণে থাকিয়াই যায়। কিন্তু সে কথায় কোন আস্থা না করিয়া আমরা যে ভাবে বলিয়া আসিতেছি সেই ভাবেই বলিয়া যাই।

মালদহে আম্র উদ্বৃত্ত হইল। বরিশালে ধান্য উদ্বৃত্ত হইল, ঢাকায় বস্ত্র উদ্বৃত্ত হইল। তখন এই তিন জায়গার লোক দেখিল এত জিনিস মিথ্যা অপচয় না করিয়া সমুদ্রের পারে বা হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরভাগে এ সকল জিনিস প্রেরণ করিলে অনেক জিনিস পাওয়া যাইবে, যাহাতে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং তাহারা আপন আপন জিনিস লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ভ করিল। আরাকান বা উড়িষ্যায় যাইতে হইলে বড় নৌকার প্রয়োজন, সুতরাং বড় নৌকা প্রস্তুত হইল, আরাকান হইতে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য আনিতে লাগিল। আরাকানওয়ালারা শিল্পকার্য্য বিস্তৃত করিয়া চাউলাদির জন্য কিয়ৎপরিমাণে বরিশালের উপর নির্ভর করিতে লাগিল আর নূতন জিনিস আমস্বত্ব পাইতে লাগিল। দিনকতক আমস্বত্ব খাইয়া তাহাদের সখ গেল যে আম খাইতে হইবে। অনেক চেষ্টার পর আম্র Preserve করিবার উপায় উদ্ভাবন হইল, আরাকানের লোক ইচ্ছা করিলে এখন আমও খাইতে পাইল।

এইরূপে ক্রমশঃ বাণিজ্য বিস্তার হইলে ক্রমে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সস্তা হয়, নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়া জড় জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যের পরিশ্রম কম হয়, বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানবজাতির সহিত সহানুভূতি করিতে শিখে, জগৎ শুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়ায়।

যদি জগৎ শুদ্ধ লোক বরিশাল ঢাকা ও মালদহের মত সোজা বুঝে, তবে যে

দেশে যাহা সহজে উৎপন্ন হইতে পারে সে দেশে তাহাই উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য। সকল লোকে সকল জিনিস সস্তা পায়। জগতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও লোকের সাংসারিক দুঃখ কমিয়া যায়। ইংলণ্ডের টাকা অনেক, ইংলণ্ডের লোক খুব পরিশ্রম করিতে পারে, ইংলণ্ড সভ্য, ইংলণ্ডে নানাবিধ কলের প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং ইংলণ্ডের উচিত যে চাসবাস একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল নানাবিধ শিল্পের অনুশীলন করা। ফ্রান্সে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা জন্মে, উৎকৃষ্ট রেসম তৈয়ারি হয়, অতএব ফ্রান্সের উচিত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মদ্য ও রেসমের কাপড় সরবরাহ করা। ইতালীর লোক চিত্রকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ, ইতালীর জল ও বায়ু এবং ইতালীর নির্ম্মেঘ পরিষ্কার গগনমণ্ডল চিত্রকর্ম্মের অনেক সুবিধা করিয়া দেয়, অতএব ইতালীর উচিত কেবল চিত্রকর্ম্মে মনঃসংযোগ করা। ভারতবর্ষ ও ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে অপর্য্যাপ্ত উর্ব্বরা ভূমি আছে, অতএব ইহাদের উচিত কেবল চাসবাস করা। রুশিয়ার অপর্য্যাপ্ত অনুর্ব্বরা ভূমি আছে, সেখানে অনেক পশু পালিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের উচিত পশুপালনবৃত্তি অবলম্বন করা।

কিন্তু লোকের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, তাহারা মনে করে তাহারা যতই বেশী খরচ করিয়া আপন আপন দেশে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবে ততই তাহাদের বাহাদুরী বেশী। ইংলণ্ডে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাওয়া যায়, প্রস্তুত করিতে হয় না। ফ্রান্স শুদ্ধ বহনের খরচ দিলে সেখান হইতে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাইতে পারে। কিন্তু ছি! ইংলণ্ডের লবণ ফ্রান্স খাইবে। কখনই হইতে পারে না। ফ্রান্স প্রতি বৎসর এক কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ঘরে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইবে, তথাপি নিতান্ত অল্প মূল্যে ইংলণ্ডের লবণ লইবে না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইংলণ্ডের লোক গিয়া কেন ফ্রান্সে লবণ বেচিয়া আসে না? তাহা হইবার যো নাই। ইংলণ্ড হইতে লবণ গেলেই তাহার উপর এত ট্যাক্স দিতে হয় যে বেচিয়া লোকসান বই লাভ হয় না। মনে কব ফ্রান্সে লবণ তৈয়ারি করিতে মণ করা দুই টাকা খরচ হয় ও ইংলণ্ড হইতে আনিতে চারি আনা খরচ হয়। তাহাতে ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে লবণ আসিলে শতকরা সাড়ে সাত শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। চারি আনা জিনিসে সাড়ে সাত সিকা ট্যাক্স। ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সে গিয়া হইল ২৶০, ইহার উপর ব্যবসায়দারদিগের মুনাফা আছে; সুতরাং ফ্রান্সে ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সের লবণের দাম অপেক্ষা বেশী হইল, আর কেহ ইংলণ্ডের লবণ কিনিল না। এইরূপ নিজদেশে সব প্রকার শিল্পকর্ম্ম রক্ষার জন্য ট্যাক্স করার নাম Protection অথবা রক্ষাকর। ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর তাবৎ দেশেই এইরূপ রক্ষাকর প্রচলিত। অন্য দেশের জিনিস ইংলণ্ডে গেলে ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের জিনিস অন্য দেশে গেলেই ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা বেশী। এত বেশী যে ইংলণ্ড প্রায় প্রতি বৎসর খরচ খরচা বাদে ৯৭ কোটী টাকা বিদেশ হইতে সুদ পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকের ব্যবসায়বুদ্ধি অতি

উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডের লোকের এমন ক্ষমতা আছে যে, তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছুরী কাঁচি তুলার কাপড়, পাটের জিনিস, লোহার সব রকমের জিনিস, গরম কাপড়, ষ্টকিং, কতক কতক কাঠের জিনিসও দিতে পারে। কিন্তু রক্ষাকরের জন্য অনেক দেশে ইংলণ্ডের দ্রব্যাদি যাইবার যো নাই। ইয়ুনাইটেড ষ্টেট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে কোন জিনিস আসিতে দিবেন না; এমন কি কুমারের জিনিসের উপর শতকরা ৪০৲ টাকা রক্ষাকর বসাইয়াছেন। লেডি ফসেট ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের রক্ষাকর সম্বন্ধীয় আহাম্মকির এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের লোক যে পোষাক পরে তাহার সূতার উপর ট্যাক্স, কাপড়ের উপর ট্যাক্স, সঞ্জাবের কাপড়ের উপর ট্যাক্স, বোতামের উপর ট্যাক্স; এইরূপে সমস্ত জামাটীর নিয়মিত মূল্যের উপর শতকরা প্রায় ৫০৲ টাকা দিতে হয়। নিম্নে লেডি ফসেটের সেই প্যারাগ্রাফটী অনুবাদিত হইল।

"আমেরিকানেরা যে পোষাক পরিয়া থাকে তাহার উপর ট্যাক্সের তালিকা। টুপি—টুপির রেসমে শতকরা ৬০৲ টাকা, ফিতার শতকরা ৬০৲ টাকা, ধারে যে আলপাকা থাকে তাহাতে শতকরা ৫০ অথবা ৩৫, ভিতরের চামড়া ৩৫, মসলিন এক বর্গ গজে ৭, আটা শতকরা ২৩ টাকা; কোট—কাপড়ে শতকরা ৫৫, রেসমে ৬০, আলপাকা ৫০, বোতাম এক পাউণ্ডে ২০, সেণ্টব্রেড এক পাউণ্ডে ৫০, সেণ্ট, গলাবন্দে যে মকমল থাকে তাহাতে শতকরা ৬০ টাকা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রক্ষাকরের জন্য পৃথিবীর যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রোফেসর ফসেট হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে শুদ্ধ লবণের রক্ষার জন্য ফ্রান্সকে প্রতি বৎসর ১ কোটী করিয়া টাকা লোকসান দিতে হয়, অর্থাৎ ইংলণ্ডের লবণে ও ফ্রান্সের লবণে দাম এত তফাৎ যে ফ্রান্সের লবণ কেনার দরুণ ঐ টাকা প্রজাদিগকে লবণের দামে বেশী দিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই টাকা গবর্ণমেণ্ট পান, সুতরাং রক্ষাকর একটী ট্যাক্স, প্রজাদিগের পকেট হইতে না আসিয়া বিদেশীয় বণিকদিগের পকেট হইতে আসে, বেশ ত। কিন্তু তাহা নহে। মনে কর ফ্রান্সে কোটী মণ লবণের দরকার, ফ্রান্সে ৭৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, প্রতি মণের পড়তা বার আনা। ইংলণ্ড হইতে আসে ২৫ লক্ষ মণ, এই ২৫ লক্ষ মণের উপর মণকরা ৷৷০ আনা ট্যাক্স বসিল। গবর্ণমেণ্টের সাড়ে বার লক্ষ টাকা আদায় হইল। কিন্তু প্রজাদের দিতে হইল কত? ইংলণ্ডে কিছু লবণ এত সস্তা নয় যে আট আনা ট্যাক্স দিয়া বার আনায় বিক্রয় করিতে পারে, সুতরাং ইংলণ্ডের লবণ এক টাকা দুই আনায় বিক্রয় হইল। কিন্তু লবণের বাজারে কতক ১৶০ কতক ৷৷০ আনায় বিক্রয় হইতে পারে না, সবই বিক্রয় হইল ১৶০। সুতরাং ফ্রান্সের লোককে আপনাদের ৭৫ লক্ষ মণে মণকরা ছয় আনা

দাম অধিক দিতে হইল। আবার যদি ট্যাক্স না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত ইংলণ্ড হইতেই কোটী মণ লবণ আসিয়া দশ আনায় বিক্রয় হইত। মণকরা আট আনা অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ফ্রান্সের লোককে লোকসান দিতে হইল। গবর্ণমেণ্টে সাড়ে বার লক্ষ আদায়ে প্রজাদের দিতে হইল ৫০ লক্ষ, লাভ হইল ফ্রান্সের জনকতক ব্যবসায়দারের। সমস্ত প্রজার নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া কেন জনকতক ব্যবসাদারকে বকৃসিস দেওয়া হইল।

আমাদের দেশে যে সকল কর আছে তাহার মধ্যে কেহই রক্ষাকর নহে। কারণ বিদেশীয় দ্রব্য আমাদের দেশে না আসুক, এ অভিপ্রায়ে কোন করই স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যাহার কিয়দংশ দেশে উৎপন্ন হয় ও কিয়দংশ বিদেশ হইতে আসে। এরূপ অবস্থায় যে অংশ বিদেশ হইতে আসে শুদ্ধ তাহার উপর কর বসাইলে যে অংশ দেশে উৎপন্ন হয় তাহার অনেক সুবিধা হয়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী তাহাতে কিছু কম হইবার সম্ভাবনা। এক বাজারে এক জিনিস দুই দরে বিক্রয় হয় না। বিদেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয়, সুতরাং তাহার দাম অধিক, দেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয় না, তাহার দাম কম। বাজারে দুই আসিয়া পড়িল, দেশীয় ও বিদেশীয় দুইয়েরই সমান দাম হইল। দেশীয় জিনিসে লাভ হইল বেশী, বিদেশীয় জিনিসে লাভ কম। দেশীয় সওদাগরেরা দাম শতকরা দশটাকা কমাইয়া দিলেন, তাঁহাদের জিনিস বিক্রয় হইল, বিদেশীয় জিনিস কেহ লইল না। যদি কখন এমন হয় যে, দেশীয় জিনিস বাজারে নাই, তবেই বিদেশীয় জিনিস বিক্রয় হইবে; নচেৎ বিদেশীয়দিগকে লোকসান দিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় ওরূপ কর রক্ষাকর হইয়া উঠে; এই জন্যই ইংলণ্ডে দুই প্রকার বস্তুর উপর সমান ট্যাক্স বসান। ইংলণ্ডের মদ কতক দেশে, কতক বিদেশে জন্মে। দেশীয় মদের উপর একসাইস ও বিদেশীয় মদের উপর কষ্টম ডিউটি লওয়া হয়। অতএব ইংলণ্ডে রক্ষাকরের কোন কথাই নাই। আমাদের দেশে রক্ষাকর নাই। কিন্তু আমাদের দেশের কাপড় কতক দেশে তৈয়ারি হয়, কতক মাঞ্চেষ্টর হইতে আসে। মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের উপর আমরা শতকরা পাঁচ টাকা ট্যাক্স লই। এইটী পাকতঃ রক্ষাকর স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা গবর্ণমেণ্টে জানায়। গবর্ণমেণ্ট ঐ করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেন। অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ কোটী টাকার বিদেশীয় কাপড় আমাদের দেশে আসে, তাহার কর হইতে পঁচাশি লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়; ঐ টাকার বিশলক্ষ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দেন। মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের কথায় গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু এরূপ কর উঠাইয়া দেওয়া যে উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কর যে রক্ষাকর তাহা ফসেট সাহেব তাঁহার Free Trade and Protection নামক গ্রন্থে শেষ প্যারাগ্রাফে মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা রক্ষাকর হইলেও তিনি উহা উঠাইয়া দেওয়ার বিরোধী, কারণ তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের সময় ভাল নয়, উঠাইয়া দিলেই কোন নূতন কর লইতে হইবে, সেটা বড় অত্যাচার হইবে। অতএব তাঁহার কথায় এই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের সময় হইলে শত কার্য্য ত্যাগ করিয়া আগে ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

আমরা উক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী; কারণ উহাতে দেশীয় জিনিসের পর্য্যন্ত দর বাড়ান হয়। আর আমাদের মত এই যে, যে সকল দ্রব্য আবাল-বৃদ্ধ, ভদ্র, দরিদ্র সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মূল্য যাহাতে কমে তাহা গবর্ণমেণ্টের দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থায় যে কোন উপায়ে ঐ ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজাসাধারণের হিতচিন্তা গবর্ণমেণ্টের কাজ। যেটী যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্টের সেইটী করা সকলের আগে। ঐ ট্যাক্স উঠাইয়া দিলে ৮৫ লক্ষ টাকা দরিদ্র প্রজাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কারণ ধনী লোকে আজিও দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র (যাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছড়াইয়া পড়িলে যে চাসবাসের সুবিধা হইত, তার আর সন্দেহ নাই।

ইংরেজি সংবাদপত্রওয়ালারা ঐ ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার সময় বড়ই চীৎকার করেন; তাঁহারা বলেন, এরূপ করিলে বোম্বায়ে যে সকল তুলাকল হইয়াছে, তাহার ক্ষতি হইবে। এটী সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বোম্বায়ে যে সকল কল আছে, তাহারা ৮।১০ বছর কাজ চালাইতেছে। মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা তাহাদের অনেক সুবিধা। মাঞ্চেষ্টরকে এদেশ হইতে তুলা কিনিয়া বহনি খরচ করিয়া লইয়া যাইতে হয়; আবার বহনি খরচ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়। ইংলণ্ডে মজুরি বড় অধিক, এখানে মজুরি বড় কম। ভারতবর্ষীয় বাজারে মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা দেশস্থ বোম্বেওয়ালাদের প্রভুত্ব অধিক। বোম্বেওয়ালা ইংলণ্ড হইতে অল্প সুদে টাকা লইয়া এইখানে বসিয়া দুইবারকার বহনি বাঁচাইয়া অল্প মজুরিতে যদি মাঞ্চেষ্টরকে ডরান, তবে তাঁহাদের ব্যবসায় না করাই ভাল।

মিল বলেন যে, যখন বিদেশে একটা কাজ অনেকদিন চলিয়া আসিতেছে, দেশে সেই কাজটা আরম্ভ করিতে হইবে, তখন তাহাকে রক্ষা না করিলে বিদেশীয়দিগের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিবে কেন? এরূপ করা ফসেট সাহেব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না; কারণ তিনি বলেন, যাহাদিগকে একবার রক্ষা করা হয়, তাহারা চিরকাল "রক্ষাকর রক্ষাকর" বলিয়া চীৎকার করে, তাহারা আত্মনির্ভর শিখে না। আমরা ফসেটের যুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না; কারণ রক্ষা করা না করা রক্ষিতদের কথানুসারে ত হইবে না, তাহার জন্য একটা গবর্ণমেণ্ট আছে, গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন বুঝিবেন যে রক্ষা আর উচিত নহে, তখন রক্ষা উঠাইয়া লইবে। অতএব প্রথম অবস্থায় মিলমতানুযায়ী হইয়া রক্ষা করা উচিত। এরূপ রক্ষা বোম্বেওয়ালারা ৮।১০ বৎসর পাইয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্ট যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, তাঁহাদের আর রক্ষা চাওয়া অন্যায়।

আমাদের দেশীয় লোকেরও ট্যাক্স উঠিয়া গেলে সুবিধা বই অসুবিধা নাই, সুতরাং দেশীয় সম্বাদপত্রওয়ালারা যে কেন উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহারা আজিও বোধ হয় গড্ডালিকাপ্রবাহবৎ অগ্রণীর পথানুসরণ করেন।

বঙ্গদর্শন
বৈশাখ, ১২৮৭

খাজানা কেন দিই ?

বহুকালাবধি লোকে খাজানা দিয়া আসিতেছে। শতপুরুষ ধরিয়া লোকের সংস্কার এই যে জমি লইলেই খাজানা দিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে খাজানা ছাড়া জমী পাওয়া যায় না। ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর আদি যে সকল জমীর খাজানা দিতে হয় না তাহা আগে মালের জমী ছিল, কোন ভূম্যধিকারী দয়া করিয়া তাহার খাজানা দেওয়া রহিত করিয়া দিয়াছেন, অথবা খাজানা লন না এই পর্য্যন্ত। খাজানা লওয়াটাই নিয়ম, না লওয়াটা নিয়মবহির্ভূত। এইরূপ অনেক পুরুষ ধরিয়া দেখিয়া আসাতে সংস্কার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, খাজানা লওয়া যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে এটী একটী প্রাকৃতিক নিয়ম, জমী লইলেই খাজানা দেওয়া সেইরূপ। যখন খাজানা দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, তখন খাজানা কেন দিই, এরূপ প্রশ্ন লোকের মনে উদয় না হওয়াই সম্ভব। জমী লইব, যাহার জমী তাহাকে খাজানা দিব, ইহাতে আবার কেন কি? যেমন টাকা লইলে সুদ দিতে হয়, বাড়ী লইলে ভাড়া দিতে হয়, জমী লইলেও সেইরূপ খাজানা দিতে হয়। এর আবার কারণ জিজ্ঞাসা কেন?

কারণ জিজ্ঞাসা করার হেতু আছে। তুমি টাকা রোজগার করিয়াছ, টাকা তোমার। তোমার টাকা আমি লইতে গেলে তোমার কিছু লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তোমার বাড়ী তোমার নিজ যত্নে প্রস্তুত, নিজে তাহার জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছ, আমি তাহা ব্যবহার করিব, তোমার নিজের লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তুমি বলিবে আমার জমী আমি তোমাকে দিব, আমার লাভ না থাকিলে দিব কেন? কিন্তু কথা এই, তোমার জমী হইল কিরূপে। তুমি বলিবে আমি কিনিয়াছি। কিন্তু জমী কার যে তুমি কিনিবে। তোমার জিনিস তুমি ইচ্ছামত নষ্ট করিতে পার, তোমার বাড়ী তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, তোমার টাকা তুমি সমুদ্রের

অগাধ জলে ফেলিয়া দিতে পার, তোমার অজ তুমি লাঙ্গুলের দিকে বলিদান দিতে পার, কিন্তু তোমার জমী তুমি নষ্ট করিতে পার না। বাস্তবিকও তুমি জমী কেন নাই, তুমি কিনিয়াছ জমী ব্যবহারের স্বত্ব। কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে গেলে তাহার পুর্ব্বে অনেক কথা বলা চাই। অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা চাই। আমরা আজি এই প্রস্তাবে চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

(১) জমী কার?

(২) কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে?

(৩) খাজানা কেন দিতে হয়?

(৪) খাজানা কত হওয়া উচিত? তাহার পর প্রসঙ্গক্রমে

(৫) যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হয় কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১। জমী কার?

আমরা যে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে বাস করি তাহার পরিধি ১১০০০ ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ। এই ভূপৃষ্ঠের দুই ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। স্থলভাগের কোথাও মরুভূমি, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও বন, কোথাও জল। অবশিষ্ট উর্ব্বর ভূমি, এই উর্ব্বর ভূমিখণ্ড হইতে আমাদের প্রাণধারণোপযোগী পদার্থের উৎপত্তি হয়। যে কেহ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই জীবনধারণ প্রয়োজন, সুতরাং জীবনধারণোপযোগী পদার্থ যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। জীবন বলিতে যে শুদ্ধ মনুষ্যেরই জীবন বুঝাইবে এমন কোন লেখা পড়া নাই। যাহার প্রাণ আছে, যাহারই প্রাণধারণ করিতে হয়, তাহারই পৃথিবীর জমিতে অধিকার। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কীটাণু প্রভৃতি সকলের পৃথিবীর জমীতে যে অধিকার, আমার তোমার ও মহারাজা গোপালনগরেরও সেই অধিকার। প্রাণধারণোপযোগী পদার্থ এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইবে, প্রাণও সকলকে ধারণ করিতে হইবে; অতএব একজনকে ভূমিস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করাও যাহা, তাহাকে মরিতে বলাও ঠিক তাই।

ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের জন্য যেমন আকাশ হইতে ম্যানা বর্ষণ করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা করেন না, এখন আমাদিগকে নিজ পরিশ্রমে স্বহস্তে এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আমাদের আহার সংগ্রহ করিতে হয়। জমী ভিন্ন আমাদের চলে না, অতএব জমী কাহারও নহে—উহাতে প্রাণী হইলেই স্বত্ব জন্মে।

এই সাধারণ নিয়মের অনেক ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। অনেক হিংস্র জন্তু অপর জন্তুর মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। অনেক মনুষ্যও অর্দ্ধেক উদ্ভিজ্জ ও অর্দ্ধেক প্রাণিজ আহারে দেহ পুষ্টি করেন। অনেক জাতি আছে তাহাদের মৎস্যই প্রধান

আহার। মৎস্যের সঙ্গে জমীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। এ সকল বিষয়ের তর্ক তুলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পশু আহার যাঁহারা করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন; তাঁহারা যে আর একজনের স্বত্বনাশ করেন, শুদ্ধ তাহাই নহে; তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত নাশ করেন। তাঁহাদের মত যাহাই হউক, তাঁহারা যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন, সেও ত এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আপনার দেহপোষক দ্রব্য সংগ্রহ করে। তবে ফলে একই দাঁড়াইল। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মাংসাশীরাও এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করেন, সুতরাং জমীতে তাহারও প্রয়োজন। এখন মাছের কথা। যাহারা মাছ খাইয়া বাঁচে তাহারা ত জমীর ধারধারে না; কিন্তু জমীতে যেমন জলেও তেমনি সকলেরই সমান স্বত্ব। জমীরও যে জন্য খাজানা দিতে হয়, মৎস্যক্ষেত্রসমূহেও সেই প্রকার খাজানা দিতে হয়। সেই কারণে ও সেই পরিমাণে। প্রাচীন দেশসমূহেও এই নিয়ম ছিল যে জমী সবার, একজনের নহে। ইহুদীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, ৪৯ বৎসর অন্তর তাহাদের সমস্ত জমী অধিবাসীদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সকলে সমান ভাগ পাইত কি না বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ভাগ হইত নিশ্চয়। উহাদের সংস্কার ছিল যে, কানানদেশ ঈশ্বর ইস্রেলের বংশকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান করিয়াছেন। সুতরাং যে কেহ ইস্রেলের বংশ, কানানের জমীতে তাহার অংশ আছে। প্রাচীন রোমে রোমের অধিবাসী পেট্রি-সিয়ানরা জমীর ভাগ পাইতেন, কারণ প্রথম অবস্থায় তাঁহারাই রোমের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পর প্লিবিয়ানেরা যখন রোমের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইল, তখন তাহারাও জমীর ভাগ পাইতে লাগিল। প্রাচীন জর্ম্মনির সমস্ত জমী folkland অথবা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা জাতির কর্ত্তা, সুতরাং তিনি জাতীয় ভূমিরও কর্ত্তা। জাতীয় ভূমির বন্দোবস্তের ভার রাজা ও মহাসভার উপর স্থাপিত। আমাদের নিজদেশে রাজা সমস্ত দেশের কর্ত্তা, জমী তাঁহার, অর্থাৎ প্রজারা তাঁহার নিকট হইতে জমী লইবে, কেবল উৎপন্নের ছয় ভাগের এক ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে। এ নিয়ম অতি সুন্দর, ইহাতে রাজস্ব জমী হইতেই আদায় হইত, স্বতন্ত্র কর বসানর প্রয়োজন হইত না। জমী কাজেই প্রজাসাধারণেরই ছিল; প্রজাসাধারণকে সাধারণ-কার্য্যের জন্য স্বোপার্জ্জিত শস্যের ষষ্ঠাংশ দিতে হইত। এখনও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। যেখানে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত সেখানেই এই নিয়ম।

জমীতে যে কোন এক ব্যক্তির স্বত্ব হইবে না তাহার কারণ কি? অর্জ্জনই স্বত্বের একমাত্র কারণ, যে অর্জ্জন না করিল তাহার স্বত্ব কিসে? কিন্তু ভূমি অর্জ্জন করা যায় না, কারণ ভূমির তুমি মালিক থাক আর নাই থাক, জমী যে জমী সেই থাকিবে। জমী কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কেহ উহা নাশও করিতে পারে না। জমী

ঈশ্বরদত্ত, সুতরাং উহা অর্জ্জিত নহে, উহাতে কাহারও স্বত্ব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জমী ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না।

২। কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে ?

জমী কার, এ প্রশ্নের উত্তর হইল জমী কাহারও নহে, উহাতে জীব মাত্রেরই স্বত্ব আছে। তবে জমিদারের জমী, তোমার জমী কেমন করিয়া হইল? জমীতে যদিও অর্জ্জনস্বত্ব না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ব্যবহারিক স্বত্ব উৎপন্ন হইতে কাহারও আপত্তি নাই। মনে কর আমি এক জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলাম। আমার উহাতে কোন স্বত্ব নাই; তুমি আমা অপেক্ষা বলবান, কালি তুমি আমার গালে চড় মারিয়া আমার জমীখানি কাড়িয়া লইলে। যে শুনিবে সেই বলিবে এটী অত্যাচার হইল। কেন? জমী আমার নয় সত্য, কিন্তু আমি যে সেটী ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছি সেটুকুতে আমার স্বত্ব আছে, আমি পরিশ্রম করিয়া সে জমীর জঙ্গল আবাদ করিয়াছি, তাহাতে সার দিয়াছি, দুই তিন বার চাস দিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি। জমী আমার না হইলেও আমি যে উহার উন্নতি সাধন করিয়াছি সেটী ত আমার, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই। সেটুকু আমি ছাড়িব কেন? ছাড়িতে গেলে তাহার ক্ষতিপূরণ চাই। এইরূপে অনেক জমীতে লোকের স্বত্ব জন্মিয়াছে। যত উপনিবেশ সর্ব্বত্র এই কারণে স্বত্ব। আমাদের দেশে যে গ্রামিকবৃন্দ আছেন তাঁহাদেরও এইরূপে জমীতে স্বত্ব হইয়াছে। ব্যবহারিক স্বত্ব পুরুষানুক্রমে চলা উচিত কি না সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। অনেক সময়ে রাজা বা রাজসভা কোন বিশিষ্ট উপকার করার জন্য কোন সেনাপতি, পণ্ডিত, চিকিৎসককে ভূমি দান করেন। ইংলণ্ডের বক্‌লাণ্ড, আমাদের জায়গীর ব্রহ্মোত্তর জমীতে এইরূপে স্বত্ব জন্মিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ স্থলে দুর্ব্বল জাতি কোন পরাক্রান্ত জাতি কর্তৃক পরাজিত হইলে শেষোক্ত জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতির সমস্ত জমী দখল করিয়া লন। রোম ধ্বংসের পর ইয়ুরোপে সর্ব্বত্র এইরূপে বর্ব্বরজাতিগণ আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আসে। এরূপে ভূমিতে স্বত্বস্থাপন যে ঘোরতর অত্যাচার তাহা কে অস্বীকার করিবে। বাঙ্গালায় যে জমিদারের জমী হইয়াছে ইহা কেবল সেকালের ইংরেজদের বুঝিবার ভুলে। যেরূপেই হউক যদিও জমীতে সকল প্রাণীর সমান অধিকার, আজি কালি পৃথিবীর প্রায় তাবৎ জমীই মনুষ্যনামক জাতির কতিপয়মাত্র লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা কিছু করুন আর নাই করুন জমী তাঁহাদের। উহা লইয়া তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে সকল লোক বা জীবজন্তু তাঁহাদের জমী হইতে উদরপূর্ত্তি করে, তাহারা তাঁহার অধীন, তাহাদের উপর তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

এরূপ অন্যায় অমিত ক্ষমতা প্রকাশকে অত্যাচারই বল আর প্রাকৃতিক নিয়মই বল আর সমাজের নিয়মই বল।

অতএব জমীর উপর লোকের যে স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে তাহা ব্যবহারে, উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই **অত্যাচারে**।

৩। খাজানা দিতে হয় কেন?

আবার সেই কথা, জমী যখন আর একজনের তখন তাহার জমী লইয়া ব্যবহার করিলেই খাজানা দিতে হইবে। এটী মোট কথা। যদি সকল জমী সমান উর্ব্বরা হইত তাহা হইলে খাজানা হইত কি? তাহা হইলে জোর করিয়া জমী দখল করিবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে যে যে জমী পাইত, সে সেই জমী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। তুমি না হয় গঙ্গার ধারে জমী লইয়াছ, আমি না হয় দশ হাত তফাতে লইব, এই মাত্র প্রভেদ। লাভ তোমারও যেরকম আমারও ঠিক সেই রকম, তবে তোমার উপর আমার অত্যাচার করার প্রয়োজন কি? কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে, জমীর গুণে অনেক প্রভেদ। আমার খানি খুব উর্ব্বরা, তোমার খানি পতিত বা কঙ্করময়; তোমার সুতরাং ইচ্ছা হইবে যে তুমি আমার জমীখানি পাও। তোমার জমীর দর কম হইবে, আমার অধিক হইবে।

অন্যান্য ব্যবসায় যেমন জিনিসের খরচা ধরিয়া দাম হয়, জমীর উৎপন্নে তেমন হয় না। মনে কর কাপড় বুনিতে হইবে, তুলা ছয় আনা, মেহন্নৎ ছয় আনা, কোর দেওয়া দু পয়সা ও অন্যান্য খরচ দু পয়সা। কাপড়খানার খরচা হইল তের আনা, তাহার ব্যবসায়ের মুনাফা আট পয়সা দিলাম, কাপড়ের দর হইল পনর আনা। এই দরে অধিকাংশ কাপড় বিক্রয় হইবে। শস্যাদির ত ঠিক এরূপে মূল্য নির্ণয় হয় না। তোমার জমী আমার জমী পাশাপাশি, তুমিও যে খরচ করিলে আমিও সেই খরচ করিলাম; তুমিও যেমন খাটিলে আমিও তেমনি খাটিলাম; তোমার উৎপন্ন হইল দশ সলি ধান, আমার হইল দু সলি। এই জন্য আদম স্মিথ বলেন যে অন্যান্য শিল্পে উৎপন্ন কিছুই হয় না, পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি হয় না, কেবল কৃষিকর্ম্মেই ধনবৃদ্ধি হয়। কৃষিকর্ম্মে যে খরচ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। সেবার আর্য্যদর্শনে ইক্ষু নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইক্ষুর চাসে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়। এই লাভের অধিকারী কে হইবে? যে ভূম্যধিকারী সেই লাভের অধিকারী হইবে। যে সমাজে জমীদার ভূম্যধিকারী সে সমাজে জমীদারের লাভ, যে সমাজে রাজা ভূম্যধিকারী সেখানে রাজার লাভ, যে সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী সে সমাজে প্রজার লাভ। এই যে উৎপন্নের কম বেশী এইই খাজানার কারণ। যদি সব জমী সমান হইত তাহা হইলে খাজানা হইত না। যদি সব জমী এমন হইত যে প্রজার শ্রম ও

খরচা মাত্র উঠিত, তাহা হইলে কেহই খাজানা দিতে পারিত না। যদি সব জমীতেই দ্বিগুণ লাভ হইত, তবে কাহার নিকট খাজানা আদায় হইত। যাহার নিকট আদায় করিতে যাইত, সেই ভাবিত অত্যাচার হইতেছে। সমাজের বন্দোবস্ত অন্যরূপ হইত। অতএব খাজানার কারণ জমীর গুণ তারতম্য।

৪। খাজানা কত হওয়া উচিত?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জমী সমান হইলে খাজানা হইত না, কেহই খাজানা দিত না। এখন প্রশ্ন এই যে যাহারা খাজানা দিবে তাহারা কত দিবে? যখন কতকগুলি লোক একটী গ্রাম পত্তন করিল, যে কয়খানি উর্ব্বর ভূমি ছিল সব কয়খানি তাহারা দখল করিয়া লইল। কিন্তু সব উর্ব্বরভূমি ত সমান নয়। মনে কর দশখানি উর্ব্বর জমী আছে; একখানিতে দশ সলি, দুইখানিতে সাড়ে নয় সলি, তিনখানিতে নয় সলি ও চারিখানিতে আট সলি আর একখানিতে সাড়ে সাত সলি উৎপন্ন হয়। ইহার নীচের জমী আবাদ হয় না। যাহার জমীতে সাড়ে সাত সলি জন্মে তাহার যদি তাহাতে শ্রম ও খরচা না পোষাইত, তবে সে কখন আবাদ করিত না। সুতরাং বুঝা গেল যে সাড়ে সাত সলি উঠিলেই চাসার খরচা উঠে। অতএব সাড়ে সাত সলির উপর যে জমীতে যত উৎপন্ন হয় সমুদয়ই সে জমীর খাজানা হইবে। যাহার উৎপন্ন দশ সলি সে আড়াই সলি দিলে তাহার লোকসান হইবে না। যাহার সাড়ে নয় সলি তাহার দুই সলি দিলে লোকসান হইবে না। অতএব যে সকল জমী চাস হয় তাহাদের মধ্যে যে জমী সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ তাহার উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জমীর উৎপন্ন হইতে বাদ দিলে বাকি যা কিছু থাকে তাহার নাম খাজানা। বলিবে যে দেশে প্রজা ভূম্যধিকারী সে দেশে ত খাজানা দিতে হয় না। আমরা বলি সেখানে প্রজা খাজানা ও মুনাফা দুই পায়; অন্য জায়গায় মুনাফা পায় প্রজা, খাজানা পায় রাজা বা জমীদার।

এ ত হল শস্যানুযায়ী খাজানা। যেখানে খাজানা টাকায় দিতে হয় সেখানে ইহা অপেক্ষা একটু জটিলতা অধিক। মনে কর পূর্ব্বোক্ত গ্রামে আর দশ ঘর লোক বাড়িল, পাঁচ ঘর চাসা আর পাঁচ ঘর চাউল কিনিয়া খায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে ভাল জমী আর নাই। নূতন চাসা যাহারা আসিল তাহারা যে জমী পাইল তাহাতে তিনখানিতে ছয় সলি ও দুইখানিতে পাঁচ সলি মাত্র। একে বারে সকল জমীর খাজানা বাড়িয়া গেল। যাহাতে দশ সলি উৎপন্ন হইত তাহার খাজানা আগে ছিল আড়াই সলি, এখন হইল পাঁচ সলি; যাহার সাড়ে নয় সলি তাহার খাজানা আগে ছিল দুই সলি, এখন হইল সাড়ে চার সলি; কেবল যাহার উৎপন্ন পাঁচ সলি সেই কোনমতে খরচা পোষায় বলিয়া তাহাকে খাজানা দিতে হয় না। এইরূপে পাঁচজন লোক বৃদ্ধি হওয়ায় খাজানা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমীই খাজানা দিবে না। তাহা অপেক্ষা

যে ভূমির উৎপন্ন যত অধিক ততই তাহার খাজানা। আগে ছিল সাড়েসাতসলি-ওয়ালা জমী নিকৃষ্ট। এখন পাঁচসলিওয়ালা জমী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ভাল জমীর খাজানা বাড়িয়া গিয়াছে।

আবার দেখ উর্ব্বর জমীতে খরচা কম। মনে কর, দশসলিওয়ালা জমীতে যে খরচা হয়, সাড়েসাতসলিওয়ালাতেও সেই খরচা হয়। মনে কর দুই জায়গায়ই ৭৫ টাকা খরচ হয়। কিন্তু একের উৎপন্ন কম, অপরের উৎপন্ন বেশী। সলিকরা ভাল জমীর খরচা কম, মন্দ জমীর খরচা বেশী। ভালজমীওয়ালা সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে, মন্দজমীওয়ালা তত সস্তা দিতে পারে না। কিন্তু এক বাজারে এক সময়ে এক জিনিসের দুই দর হইতে পারে না [খুজরা জিনিসের যদিও হয়, কিন্তু বড় কারবারে হয় না]। সুতরাং সাড়েসাতসলিওয়ালা যে দরে বিক্রয় করিবে, দশসলিওয়ালাকে সেই দরে বিক্রয় করিতে হইবে। দশসলিওয়ালা একে ত উৎপন্ন বেশী পায়, তাহার উপর তাহার জিনিসের দামও তাহার খরচা অপেক্ষা অনেক অধিক। মনে কর সাত-সলিওয়ালার সলিকরা দশ টাকা খরচা হইয়াছে, দশসলিওয়ালার সলিকরা সাড়ে সাত টাকা মাত্র খরচা পড়িয়াছে; কিন্তু দুইজনকেই বিক্রয় করিতে হইল পনর টাকা সলি। একের হইল ৭॥০ × ১৫ = ১১২॥০, অপরের হইল ১৫ × ১০ = ১৫০। খরচা দুইজনেরই এক। যাহার ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা তাহার উৎপন্ন বেশী, খরচা কম, মুনাফা সুতরাং খুব বেশী।

এখন মনে কর পাঁচজন চাসা ও পাঁচজন অপর লোক আসিয়া জুটিল। চাসারা আরও নিকৃষ্ট জমী চাষ করিতে লাগিল। মনে কর সেই ৭৫ টাকাই খরচ হইতে লাগিল, উৎপন্ন হইল পাঁচ সলিমাত্র, সলিকরা খরচা পনর টাকা হইল। নূতন লোক আসায় চাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে, প্রতি সলি এখন মনে কর পঁচিশ * টাকায় বিক্রয় হইল। পাঁচসলিওয়ালার ৭৫ টাকা খরচ, ৫ × ২৫ = ১২৫ টাকা আয়, পঞ্চাশ টাকা মুনাফা। সাড়েসাতসলিওয়ালার ৭৫ টাকা খরচ, ৭॥০ × ২৫ = ১৮৭॥০ আয়, মুনাফা ১১২॥০ টাকা। দশসলিওয়ালার খরচা ৭৫ টাকা, আয় ১০ × ২৫ = ২৫০, মুনাফা ১৭৫ টাকা। আগে ছিল ৭৫ টাকা, এখন হইল ১৭৫ টাকা, অথচ তিনি নিজে ইহার কিছু করেন নাই। ইহার মধ্যে পাঁচসলিওয়ালার যে ১২৫, তদ্বাদে সমুদয়ই খাজানা যাওয়া উচিত। অর্থাৎ চাসা আপনার খরচা মেহন্নৎ মায় মুনাফা উঠাইয়া লইলে পর যা কিছু বাকি থাকিবে তাহাই খাজানা। সুতরাং যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, নিকৃষ্ট জমী চাস হইতে আরম্ভ হইবে, ততই জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। যতই টাকা দেশে বাড়িবে, লোকে অল্প মুনাফায় টাকা খাটাইবে; চাসার মুনাফা কমিয়া আসিবে, জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। এই যে খাজানা ইহার নাম Economic Rent, আমরা ইহাকে যথার্থ

* মুদ্রিত পাঠে 'বিশ'।—সম্পাদক—।

খাজানা কহিব। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে খাজানা দিয়া থাকি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক জায়গায় কম ও অনেক জায়গায় বেশী। ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প খাজানা কেন হয়?

আমরা খাজানা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা অধিকাংশই রিকার্ডো নামক প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদের মত। তাঁহার মত যে প্রমাণ সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার মত ইংলণ্ড ভিন্ন অপর দেশে গৃহীত হয় না। ইংলণ্ড অর্থপ্রধান দেশ, ভূমিপ্রধান নহে; ইংলণ্ডের লোক বেশ বুঝিতে পারেন যে, চাসা যে খরচ ও যে পরিশ্রম করিল তাহার উদ্ধার ও তাহার মুনাফায় তাহার স্বত্ব, এ সমুদয়ের অধিক যা কিছু তাহাতে তাহার স্বত্ব নাই। আমাদের দেশ ভূমিপ্রধান। চাসারা জানে তাহারা চাস করিয়া নিজের গুজরান করিয়া যদি উদ্বৃত্ত হয়, তবে জমীদার পাইবে; অতএব রিকার্ডোর মত যে সত্য তাহা আমাদের দেশীয় লোকদিগকে বিশ্বাস করান অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দেশের ত কথাই নাই, ফ্রান্সের লোকও রিকার্ডোর কথায় বিশ্বাস করেন না। রিকার্ডোর কথা তুলিলে আমাদের দেশীয় লোক মনে করিবেন, লেখক জমীদারের অথবা গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতা করিয়া প্রজাবৃন্দের অনিষ্টের মূল করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার কিছুই করিতেছি না, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস তাহাই লিখিতেছি।

লোকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি রিকার্ডোর মতই সত্য হয়, তবে খাজানা কোন দেশেই রিকার্ডোর মতানুযায়ী হয় না কেন? তাহার উত্তর এই, ইংলণ্ডের খাজানা প্রায়ই রিকার্ডোর মতে গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের জমীদার ফারমারকে জমী দিলেন। ফারমার দেখিল তাহার টাকা উঠিবে, মুনাফাও উঠিবে, সে জমী লইল। ইংলণ্ডের ফারমার ধনী, সে যদি চাস না করিত তবে ব্যবসায় করিত। ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের জমী নাই, তাহারা ফারমারের মজুরদার। ইংলণ্ডে জমীর সম্পূর্ণ স্বত্ব জমীদারের, গবর্ণমেণ্টের বা প্রজাদের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। অন্য কোন দেশেই প্রায় সেরূপ নাই। আমাদের দেশের জমীতে (বাঙ্গালা ভিন্ন) গবর্ণমেণ্ট, জমীদার ও প্রজা সকলেরই স্বত্ব আছে, ইহা অনেকে স্বীকার করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ঠিক রিকার্ডোর কথামত খাজানা হইতে পারে না। জমীদার উৎপন্নের অংশ পাইবেন, গবর্ণমেণ্ট, অংশ পাইবেন, প্রজা অংশ পাইবে। প্রজা নিজের খরচ তুলিয়া লইয়া বাকি যেটা থাকিবে তাহার অংশ পাইবে। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট নিজ অংশ জমীদারকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়াছেন —যখন দিয়াছিলেন তখন প্রজার স্বত্বের দিকেও বড় বিশেষ মনোযোগও করেন নাই। সুতরাং এই সময়ে জমীদারেরা প্রজার উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন। এখন আবার প্রজার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য বহুতর চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং জমীদার প্রজার নিকট সমস্ত বাড়তি উৎপন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ জমীতে এবং জমীর

খাজানায় প্রজারও স্বত্ব আছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে জমীর খাজানা অর্থাৎ জমীদারের প্রাপ্য রিকার্ডোর খাজানা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, কারণ তাহার এক অংশ প্রজার নিজের।

ইতালীতে জমী জমীদার ও প্রজার ভাগে বিলি। আমাদের অল্পব্রহ্মোত্তর-ভোগীরা যেমন ভাগে বিলি করেন, সেও ঠিক সেইরূপ; তবে আমাদের ব্রহ্মোত্তরভোগীরা মিয়াদি বন্দোবস্ত করেন, সুতরাং জমীতে প্রজার স্বত্ব জন্মাইতে না দিয়া অনেক সময়ে রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা আদায় করিয়া লন। ইতালীতে তাহা হয় না; ইতালীতে এই নিয়ম মেরায়স সলা জুলিয়স কায়সর প্রভৃতির সময় হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। এক এক জায়গায় সেই জমীদার ও সেই প্রজা ৩।৪ শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রজাদেরও জমীতে স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। কোন জায়গায় জমীদারের অৰ্দ্ধেক, কোন জায়গায় জমীদারের দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ইতালীর জমী এত ভাল যে তথাপি প্রজা আপনার খরচা ও মুনাফা পোসাইয়া খাজানার কিছু অংশ আত্মসাৎ করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ফ্রান্স ও জর্ম্মনি প্রভৃতি স্থানে জমীই প্রজার, সুতরাং সেখানকার খাজানা প্রজাই পায়।

যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল সৰ্ব্বত্র খাজানা রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা অপেক্ষা কম। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের এমনি দুর্ভাগ্য যে সেখানে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী খাজানা। প্রজায় দিতে পারে না, কিন্তু জমীদারের খাতায় তাহার নামে পাওনা লেখা থাকে। তাহার কারণ এই যে সেখানে প্রজার স্বত্ব লোপ হইয়াছে; জমীদার সর্ব্বেসর্ব্বা। লোক অনেক। জমী একখানি বন্দোবস্ত হইবার সময় হাজার হাজার লোক দরখাস্ত করে, যে সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে পারিবে সেই জমী পাইবে। গরীব লোক ক্ষমতার অতিরিক্ত দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া জমী লয়, দিতে পারে না, পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ বৰ্দ্ধনশীল ঋণভার বহন করে।

বঙ্গদর্শন
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭

হৃদয়-উদাস

মন সদাই উদাস। অন্তরের অন্তরে সদাই প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিপলে যেন কোন জিনিসের জন্য মন কেমন করে। মন হুহু করে; নিজ সুখের জন্য মন একবারও ভাবে না, ভাবিতে চায় না, ভাবিতে ভুলিতে চায়! আর কিছুতেই সুখ নাই, কাজে কর্ম্মে সুখ নাই, ধনে সুখ নাই, যশে সুখ নাই; যে সকল চির-অভিলষিত, যাহার জন্য এক একবার জীবন উৎসর্গ করিতে চাহিতাম, তাহাতে আর সুখ নাই। বড় হইবার আশা স্বাভাবিক, তাহাতেও সুখ দেখিতে পাই না। যে সকল গ্রন্থ পাঠে চিরকাল এত আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর ভাল লাগে না। যে সকল কথায় এত আগ্রহ ছিল, তাহা বিষবৎ বোধ হয়। যাহাদের সংসর্গে পূর্ব্বে এত আমোদ হইত, তাঁহাদের সংসর্গ অরণ্যবাস হইতেও বিষম কষ্টকর বোধ হয়। যে সকল স্বভাবসৌন্দর্য্য পরমরমণীয় বোধে শত শত বার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে সকলের সৌন্দর্য্য যেন হঠাৎ কমিয়া আসিয়াছে।

সদাই বোধ হয় জগৎ অরণ্যবিশেষ, ইহার মধ্যে আমি একটী সামান্য কীট। আমার মত শত শত কীট চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না—একা ইহা অপেক্ষা ভাল। কিন্তু সে একা কেন? আমার মনের মত একটী মানুষ গড়িয়া তাহাকে মনসিংহাসনে বসাইয়া একা অতি গোপনে তাহার সঙ্গে মনের কথা কই। মনের কথা কি? আমি তাহাকে ভালবাসি, সুতরাং আমি এখন বিজনপ্রিয় হইয়াছি। বিজনে আমার মনের মানুষ গড়া ভাল হয়। তাহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, অনেক কথা তাহার সঙ্গে কহিতে পারি। অনেকক্ষণ তাহার উপাসনা করিতে পারি। অনেক বার তাহার সুখ উৎপাদন ও দুঃখ বিমোচন করিতে পারি। অনেক বার অতি গোপনে বিনা সর্ত্তে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি; অনেক বার তাহার সেই প্রেমময় ছবি দেখিতে পাই। তাহার হাস্যবদন দেখিয়া অনেক বার মনে সুখ পাই। আমি লোকের সংসর্গ ভালবাসি না। লোকে আপনার সুখে হাসে, আপনার দুঃখে কাঁদে, আপনার জন্য পরকে বিরক্ত করে, দেক্ করে; লোকে স্বার্থপর। আমার ইচ্ছা হয় অন্যের জন্য ভাবি, অন্যের জন্য কাজ করি। অন্যের যাহাতে তৃপ্তি হয়, তাহাই করি। অন্যের কাজে আত্মজীবন উৎসর্গ করি। অন্যকে

ভালবাসি, আমি আমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারি না। আমার আর লোক চাই। আমি ভালবাসিতে চাই। নিজে খাইয়া নিজে পরিয়া, আর তৃপ্তি হয় না; আর কাহাকেও ভাল করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা করে। চাঁদের আলো বড় সুখের জিনিস, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু আমার বোধ হয় আমার সে দেখিল কই। দুজনে দেখিতাম ত বেশ হইত। ফুলগুলি বেশ, বেশ জিনিস, কেমন গন্ধ ভরভর করে, কেমন কোমল, কেমন গঠন, কেমন টাটকা, কেমন সুখস্পর্শ; আমার বোধ হয়, এমন ফুলগুলি তুলিয়া তাহার গলায় মালা করিয়া দিলে কতই সুন্দর হইত। যখন কোন জিনিস দেখিয়া তৃপ্তি হয়, অমনি বোধ হয়, আমার মনের মানুষ আমার সঙ্গে থাকিলে দুজনে উপভোগ করিতাম। যখন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া নয়নে অশ্রুজল উপস্থিত হয়, তখনি মনে হয়, আমার সঙ্গে কাঁদিবার লোক থাকিলে বড়ই আমোদ হইত। সুখে দুঃখে, আশায় হতাশায়, ভয়ের সময়, উৎসাহের দিনে, উৎসবে, ব্যসনে, ভ্রমণে, আলস্যে কেবল বোধ হয়, আর একটী লোক থাকিলে ভাল হইত। কাজেকর্ম্মে একান্ত অন্যমনস্ক থাকিলেও যেন তাহার জন্য ঔৎসুক্যের একটী প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু সে মানুষটী কই। যাহার জন্য আমি ভাবিতে পারি, যাহাকে সিংহাসন দিয়া হৃদয়ের অধীশ্বর করিতে পারি, যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যাহাকে দেখিলে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হই, যাহার কথায় কর্ণরন্ধ্র ভরিয়া যায়—একবার শুনিলে যাহার প্রতিধ্বনি চিরদিনের তরে কাণে লাগিয়া থাকে, কখন অপনীত হয় না—সে মানুষ কোথায় পাই। কেহ কি বলিয়া দিতে পার? কমলাকান্ত বলিবেন, চাঁদ ভালবাস, চাঁদের সঙ্গে বিবাহ কর, ফুলের বিবাহ দাও, ফুল ভালবাস; কিন্তু কমলাকান্ত আহাম্মক, নহিলে সে এমন কথা কেন কহিবে। আমি যে মানুষ ভালবাসিতে চাই। স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকা যায় সত্য; কিন্তু সে কয়দিন? চাঁদ ভালবাসিয়া মন পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু সে কয়দিন। একদিন দুইদিন। কি না হয় যখন মনে বড় কবিত্বের ঢেউ উঠিল বলিলাম স্বভাবই সুন্দর, কিন্তু স্বভাব কি আমার দুঃখে কখন দুঃখী হয়? একটা মানুষের জীবন বড় লম্বা, শুধু স্বভাব ভালবাসিয়া কাটে না, আর কিছু চাই। মানুষ চাই, মনের মতন মানুষ চাই। আমি তাহাকে চিনি, সে আমাকে চেনে। এমন মানুষ কোথায় পাই? আমার এ বিবাহে কে ঘটকালী করিবে? আমি কুল চাহি না, কোষ্ঠী চাহি না, গোত্র চাহি না, পুরুষ চাহি না, পর্য্যায় চাহি না, দানসামগ্রী চাহি না। আমার এ বিবাহে দিন নাই, নক্ষত্র নাই, লগ্ন নাই, সম্বন্ধ হইলেই রাজযোটক হইবে। কাল অকাল দরকার নাই। পছন্দ হইলেই যথেষ্ট—তৎক্ষণাৎ বিবাহ। কিন্তু ঘটক মিলে না, ঘটকে আর সব মিলাইতে পারে, কেবল মন মিলাইতে পারে না; আমার অমন ঘটকে কাজ নাই।

আরসীতে মুখ দেখিতে যাও—আরসীর দোষে আপনার মুখ কখন লম্বা দেখিবে, কখন সরু দেখিবে, কখন দেখিবে বাঁকা, কখন দেখিবে গোল, কখন দেখিবে থেবড়া, কখন দেখিবে চেপটা। মানুষের মনও তেমনি আরসী বিশেষ। মানুষের মন যদি ভাল হয়, সবই ভাল দেখায়। সবই সুন্দর দেখায়। কখন কখন বড় সুখের সময় সব সুখময় বোধ হয়, স্বর্গের সঙ্গীত দূর হইতে কাণ জুড়াইয়া দেয়, জনকোলাহলপূর্ণ নির্ব্বাতপ্রদেশও কোকিলকলরবসঙ্কুল নন্দনবনের ন্যায় বোধ হয়। সকল মানুষের মুখেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখায়। আবার কখন বোধ হয় সব অন্ধকার, পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে, সমস্ত জগৎ কাঁদিতেছে—মানুষের মুখ শূকরের মত; আমার মন এখন আপন লইয়াই ব্যস্ত, আপন মনের মানুষ গড়িতে ব্যস্ত, অপর সকল বিষয়েই নির্জীব, উৎসাহ-শূন্য। আমার কাছে জগতের অস্তিত্ব নাই, যদিও আছে ত নির্জীব প্রাণশূন্য। নদীর জল চলিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; তাহাতে চন্দ্রকলা নাচিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; ফুল ফুটিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; মানুষে গান গাহিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; আমিও ভালবাসার জন্য পাগল হইয়াছি স্বভাবনিয়মে, জীবন কোথাও নাই। কিন্তু এই ভুবন নির্জীব বোধ হয় কেন? বাস্তবিকও স্বভাব আজিও যেমন আছে কালিও তেমনি থাকিবে, কালি তেমনিই ছিল, ইতরবিশেষ কিছু হয় নাই হইবে না হইবার সম্ভাবনাও নাই; তবে আজি নির্জীব বোধ হয় কেন। ফিলজফররা বলিতেন, যাহা আমরা দেখিতে পাই না তাহা নাই, আরবের উপকূলভাগ নিরন্তর সুগন্ধে আমোদিত। কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক নাই, সুতরাং তাহা না থাকারই মধ্যে। জগতে জীবন আছে কিন্তু আমার মনে নাই। আমি যে আরসী দিয়া দেখি তাহার দোষে সবই নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। আমার আরসীর দোষ কে সারিয়া দিবে? আমার কাষ্ঠপুত্তলীবৎ মৃণ্ময়-দেবপ্রতিমাবৎ অন্তঃকরণে কে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে? এ প্রাণ প্রতিষ্ঠার পুরোহিত কোথায় মিলিবে? যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ অবশ্য হাসিবে, নদীর জলে সুখের গান শুনিতে পাইব, পক্ষী গাহিবে প্রেমভরে, ঝিল্লী ডাকিবে রাগভরে, ফুল দুলিবে আলিঙ্গনের জন্য, কোকিল কুহু কুহু করিবে বিরহে। এ প্রাণ কে প্রতিষ্ঠা করিবে? কবে আবার এ প্রতিমা প্রাণ পাইয়া দুলিবে আর প্রকৃতি পুরোহিতপ্রদত্ত ধূপধুনা গন্ধপুষ্প উপহার পাইয়া হাসিবে! বিসর্জ্জনের সময় দূরে, এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা কখন হইবে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা কি মিলিবে? মনের মানুষ প্রাণের প্রাণ কি মিলিবে?

বঙ্গদর্শন
শ্রাবণ, ১২৮৭

যৌবনে-সন্ন্যাসী

নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর মত

রেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। প্রায় বৎসরাবধি ধরিয়া এই রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন বড় ঝড় বৃষ্টির আগে সব নিথর হইয়া যায়, জল থমথমে মারিয়া যায়, গাছপালার পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না, রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্র সেইরূপই ছিল। যেমন নিস্তব্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠে, নিস্তব্ধ সম্বাদপত্রসমূহমধ্যে ২১শে জুলাইয়ের রিপোর্ট পড়িয়াও ঠিক তাহাই হইয়াছে। রিপোর্ট বিল ও কাগজপত্র লইয়া স্পেশাল গেজেটখানির পত্রসংখ্যা ৫০৪। সকলের পড়িবার অবসর হয় নাই, হইবার কথাও নাই, অথচ সকলেই আপন আপন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেহ বলিলেন, হাজার রিপোর্ট কর আর বিলই কর, রায়তের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে কিছু হইবে না। কেহ বলিলেন, বাপু যা ছিল বেশ ছিল, আবার কেন ঘুমন্ত বাঘ জাগান হয়। কেহ বলিলেন, জমীদারের সর্ব্বনাশ হইল; কেহ বলিলেন, প্রজার শোষণ করাই রাজার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে কলিকাতা রিবিউ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

The permanent settlement is a great accomplished fact in Bengal, and can already claim an antiquity of nearly a century ; it has only just recovered from the position of unstable equilibrium into which it was—we still cling to the belief—unintentionally thrown by the Act X of 1859. The elaborate draft Bill in two parts is designed to upset it, it does not purpose this and that minor alteration in the multiform system of rights which has grown under the shadow of the permanent settlement, but it deliberately aims a decisive blow at its fundamental condition ;—

'—But that two-handed engine at the door
Stands ready to smite once, and smite no more.'

অর্থাৎ দশসালা বন্দোবস্তে যে সব স্বত্ব জমীদারকে দেওয়া হইয়াছিল, '৫৯ সালের ১০

আইনেই তাহার প্রায় সবই লোপ হইয়াছে, যাও কিছু ছিল এইবার তাহাও গেল। আইন সাঁকারির করাত হইয়া দাঁড়াইল, আগু হইলেও কাটিবে পিছু হইলেও কাটিবে।

এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্রের লেখা। যেমন কলমের জোর, তেমনি লেখার বাঁধনি, তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কিন্তু হইলে কি হয়, লেখা দেখিলেই বোধ হয় কোন উকীলের বক্তৃতা; কেবল মক্কেলের দিকেই টান। লেখার সবই ভাল, কেবল গৌতম আর আরিষ্টটলের পিণ্ডদান ও আদ্যশ্রাদ্ধ। আজি কালি যদি গৌতম ঋষি সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহাকে Fallacy Chapterএর হেত্বাভাস ছল জাতিনিগ্রহস্থানের উদাহরণের জন্য আর কোথাও যাইতে হইত না। এক আশুবাবুর প্রবন্ধমধ্যেই সব পাইতেন।

প্রবন্ধটী ইংরেজীতে লিখিত; কিন্তু ইংরেজী যেই পড়িয়াছে সেই হাসিয়াছে, বাস্তবিক ইংরেজীতে তাহার খণ্ডন অনাবশ্যক। এই জন্য বাঙ্গালায়ই তাহার খণ্ডন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যুক্তিখণ্ডনের পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক State Literature এর উপর বড় চটা, তাঁহার মতে আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মিনিট, রিপোর্ট ও অন্যান্য লেখালেখি চলে সে সকল ত্যাগ করাই লোকের কর্ত্তব্য। তিনি চান যে, লোকে আইনে যা আছে তাহারই অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করুক। কিন্তু আইনের অর্থবিষয়ে সন্দেহ হইলে যেখানে ব্যাখ্যাবুদ্ধিবলাপেক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবে, সেখানেও মিনিট রিপোর্ট ইত্যাদির পাঠের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের মতে ঐ রিপোর্ট আদি অমূল্য, উহারা আইনের অর্থবৈশদ্য পক্ষে যেরূপ সাহায্য করে এত আর কিছুতেই করে না। লেখক ষ্টেট লিটারেচরের উপর চটা, অথচ আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিও Pemberton Leigh সাহেবের মত উদ্ধার করিতে কসুর করেন নাই। (পৃঃ ৩৫৯)

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কণ্ট্রাক্ট বই ত নয়। যেমন নোট কণ্ট্রাক্ট, তেমনি উক্ত বন্দোবস্তও কণ্ট্রাক্ট। চুক্তি অতি জটিল, এজন্য অনেকে উহার অনেক প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। তথাপি উহা চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এই চুক্তিতে বর্ত্তমান জমীদারদল যে লাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের মতে উহা চুক্তি নহে, উহা আইন, ব্যবস্থাপক সমাজদ্বারা বিধিবদ্ধ; উহা হইতে অনেক চুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহা নিজে চুক্তি নহে। যদি চুক্তি হয়, কে কে সে চুক্তি করিল? গবর্ণমেণ্ট আর জমীদার। প্রজা এ চুক্তির মধ্যে কেহ নহে। যাহার দ্রব্য তাহার মত না লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সামান্য কর্ম্মচারীকে ভূস্বামী বলিয়া প্রকাশ করিবার গবর্ণমেণ্ট কে?

পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যদি চুক্তি হয় তবে উহা চোরের চুক্তি, আইনমতে উহার

কোন মূল্য নাই। যদি আশুবাবুর কথামত উহা চুক্তি, সিদ্ধ চুক্তিই হয়, তবে উহা দ্বারা কি প্রজাদের ভূস্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই? উহা কি যথেচ্ছাচারপ্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? তাহা হইলে এক কলমের ঘায় ৩ কোটী প্রজার সমস্ত জমীস্থ স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া জনকতক ধনী লোককে ভূমিতে নিবূ্র্ঢ় স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করা ঘোর মূর্খতার কর্ম্ম হইয়াছে। এমন পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

আরও এক কথা, যদি এই বন্দোবস্ত চুক্তিই হয়—যদি উহা আশুবাবু যাহা বলিয়াছেন তাই হয়,—যদি সমস্ত ইতিহাসের মুণ্ডপাত করিয়া সমস্ত যুক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তি হয়—তথাপি জমীদারেরা চুক্তিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম রেগুলেশনের সপ্তম ধারায় লিখিত আছে—

To discharge the revenues at the stipulated periods without delay or evasion and to conduct themselves with good faith and moderation towards their dependant Talukdars and Ryots are duties at all times required from the proprietors of land and a strict observance of those duties is now more than ever incumbent upon them in return for the benefits which they will themselves derive from the order now issued.

যদি দশসালা বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তবে প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও সে চুক্তির এক করার। কিন্তু জমীদারেরা কি এই করার মত কাজ করিয়াছেন? তাঁহারা কি প্রজাদিগের প্রতি সত্য সত্যই good faith and moderation দেখাইয়াছেন? দশসালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজিও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে খোদকস্ত রায়তের নাম লোপ হইয়াছে। পরগণা নিরীখ,—যাহার অধিক খাজানা আদায় করা চিরদিন আইনবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ,—জমীদারেরা উঠাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র, আইনসঙ্গত হউক আর নাই হউক, খাজানার বৃদ্ধি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় কত প্রজা দেশত্যাগ করিয়াছে। কতস্থানে গৃহদাহ গ্রামদাহ করিয়া তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের প্রতি এতই অত্যাচার করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় নির্জীব, নিরীহ প্রজাগণও আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই কি তাঁহাদের good faith and moderation? কর্ণোয়ালিস তাঁহাদিগকে যে করারে দশসালা বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি দিয়াছেন সে করার কি ভঙ্গ হয় নাই? একপক্ষ হইতে করার ভঙ্গ হইলে সে চুক্তি কি বাতিল ও নামঞ্জুর হয় না? অতএব শুদ্ধ এই এক করার ভঙ্গ অপরাধ বশতঃ দশসালা বন্দোবস্ত কি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়?

কিন্তু বাস্তবিক দশসালা বন্দোবস্ত চুক্তি নহে—উহা ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বিধিবদ্ধ আইন। নচেৎ দুই পক্ষ চুক্তি করিয়া তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লোপ করা দস্যুর চুক্তি ভিন্ন

আর কিছু নহে। প্রকৃত ভূস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করা চুক্তির কর্ম্ম নয়। আইন ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারে না। এবং দশসালা বন্দোবস্তের আইনে তাহাও করে নাই।

আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রজাই ভূমির মালিক। আমাদের যে মণ্ডল ও পাটোয়ারী প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজার স্বত্বই সাব্যস্ত করিয়া দিতেছে। জমীর দরুণ খাজানা (Rent) আমাদের দেশে ছিল না। মনুতে তাহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত কোন পুস্তকে খাজানা দিবার উল্লেখ নাই। কাহার কত করে রাজস্ব দিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন "ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠ দ্বাদশ এব বা," অর্থাৎ ধান্যের ষষ্ঠ অংশ অথবা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশ রাজাকে করস্বরূপ দিতে হইবে। রাজার জমী কর আর নাই কর তোমাকে রাজস্ব দিতে হইবে। এইজন্য ঋষিরা বনে কুড়াইয়া যে অকৃষ্টপচ্য ধান্য সংগ্রহ করিতেন, তাহারও ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিতেন। প্রজারা সকলেই রাজাকে কিছু না কিছু দিত, কেহই রেয়াত পাইত না। কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সকলেই রাজস্ব দিত, অথচ হয়ত তাহারা কেহই জমী করিত না। এইরূপ করের নাম বরং রাজস্ব revenuc হইতে পারে, কিন্তু খাজানা নহে। সময় সময় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যেমন নানা প্রকার ট্যাক্স বসান, সেইরূপ আমাদের দেশে চিরস্থায়ী ট্যাক্স ছিল, জমির খাজানা স্বতন্ত্র ছিল না। সেই ট্যাক্স বা রাজস্ব কখন কখন রাজারা বৃদ্ধি করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা কর রেয়াতও করিতেন। প্রজা ক্ষীণ এবং রাজা অত্যাচারী হইলে দুর্ব্বহকরভার তাহারা কষ্টে স্বষ্টে বহন করিত, কিন্তু ফাঁক পাইলে তাহারা বিদ্রোহ করিতেও ছাড়িত না। এইরূপে ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকারকালে প্রজার ট্যাক্স ছাড়িয়া ভূমির ট্যাক্স হয়, সেই ট্যাক্স কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া, আকবরের সময় এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়, ইহার নাম আসল জমা। ক্রমে মুসলমানেরা নানা কারণবশতঃ আরও কিছু কিছু আদায় করিত, তাহার নাম আবওয়াব। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টও দেওয়ানী পাইয়া অবধি বরাবর ঐরূপ আবওয়াব আদায় করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম আইন দ্বারা যখন জমীর স্বত্ব চিরকালের জন্য জমিদারকে দেওয়া হয়, তখন এই আবওয়াব ইত্যাদি সমস্ত আসল জমাভুক্ত হইয়া যায়। এবং তাহার পর আবওয়াব ইত্যাদি আদায় করা এককালীন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (১৭৯৩ সালের অষ্টম আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারা) অর্থাৎ প্রজার নিকট হইতে কোন ভাবে আর অধিক কর লইব না, স্বীকার করাইয়া এবং সেই অবর্দ্ধনীয় কর নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার জমীদারের উপর দিয়া গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে চিরদিনের মত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব দশসালা বন্দোবস্ত বলিলে উহা শুদ্ধ জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায় না, উহাতে প্রজার সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়। এ কথা আমরা যে আজি বলিতেছি এরূপ নহে, আমাদের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশুবাবু State Literatureএর

উপর বড় চটা। এইজন্য তাহা ছাড়িয়া আইনের কথা ধরিয়া দশসালা বন্দোবস্তের ঐ অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে আমাদের একটী কথা কেবল বলিতে হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি প্রজার সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল তবে জমীদারকে ভূস্বামী করিবার লাভ কি? প্রজার খাজানা যদি বৃদ্ধি করিতে না পারিলেন তবে জমিদার ভূস্বামী হইলেন আর না হইলেন তাহাতে ক্ষতিই বা কি, বৃদ্ধিই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে লর্ড কর্ণোয়ালিস বাঙ্গালার জমীদারেরা যে কি ধাতুর লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জমীদারেরা যে আশী বৎসরের মধ্যে চিরপ্রচলিত পরগণানিরিখ উঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। খাজানা ও কর সম্বন্ধে যে সব নূতন নূতন মত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার সময়ে হয় নাই। তিনি শোর সাহেবের আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন, জমীদারের উপস্বত্ব বৃদ্ধির দুইটী মাত্র উপায় থাকিবে। পতিত ভূমির পুনরুদ্ধার এবং উৎকৃষ্টতর শস্য উৎপাদনে প্রজাদিগকে প্রবর্ত্তন করা। জমীদার যে খাজানা বৃদ্ধির জন্য উৎপীড়ন করিয়া আপনার লাভবৃদ্ধি করিবে এবং প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে, ইহা তাঁহার একেবারে অভিপ্রায় ছিল না। কার্য্যেও তিনি তাহার কোন পথ রাখিয়া যান নাই। তৎপ্রণীত অষ্টম আইনের ধারাগুলি উদ্ধৃত করা উচিত, কিন্তু স্থানাভাবপ্রযুক্ত কেবল দুইটী ধারা উদ্ধৃত করা গেল।

54. The impositions upon the Raiyats, under the denomination of abwab, mathaut, and other appellations, from their number and uncertainty having become intricate to adjust, and a source of oppression to the Raiyats, all proprietors of land and dependent Talukdars shall revise the same in concert with the Raiyats, and consolidate the whole with the assal into one specific sum.

In large Zemindaries or estates the proprietors are to commence this simplification of the rents of their Raiyats in the Parganas where the impositions are most numerous, and to proceed in it gradually till completed ; but so that it be effected for the whole of their lands by the end of the Bengal year 1198 in the Bengal districts, and of the Fasli and Wilayate year 1198 in the Behar and Orissa districts, these being the periods fixed for the delivery of Pattas, as hereafter specified.

55. No actual proprietor of land or dependent Talukdar or farmer of land, of whatever description, shall impose any new abwab or mathaut upon the Raiyats, under any pretence whatever.

Every exaction of this nature shall be punished by a penalty equal to three times the amount imposed ; and if at any future period, it be discovered that new abwab or mathaut have been imposed, the persons imposing the same shall be liable to this penalty for the entire period of such impositions.

আশুবাবুও অনেক ধারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত যে ৫৪ ও ৫৫ ধারার উপর সমস্ত নির্ভর করে, সেই দুইটী না দিয়া তাহার কেবল marginal note দুইটী তুলিয়া দিয়া ঠিক উল্টা বুঝাইয়াছেন। আমরা ঐ ধারার ব্যাখ্যাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব।

যে সব নিয়মাবলীতে জমীদার বাধ্য হইবেন, তাহার প্রথম এই। আমলনামা ভিন্ন কেহ প্রজা বা তালুকদারের নিকট খাজানা আদায় করিতে যাইতে পারিবেন না।

২য়। আবওয়াব ইত্যাদি আসল জমাভুক্ত হইয়া যাইবে।

৩য়। ১১৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সর্ব্বত্র আবওয়াব আদি জমাভুক্ত হইয়া যাইবে। কোন্ প্রজাকে কত জমা দিতে হইবে, তাহা স্থির এবং নির্ণীত করিতে হইবে।

৪র্থ। ইহার পর কেহ আর নূতন আবওয়াব লইতে পারিবে না। যদি কেহ লয়, তাহাকে ৩ গুণ জরিমানা দিতে হইবে। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণ হয় যে, কোন জমীদার বরাবর আবওয়াব লইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বরাবর যত আবওয়াব আদায় করিয়াছেন, সমস্ত জরিমানা দিতে হইবে।

৫ম। জমীদার ও প্রজার প্রায়ই খাজানামাত্র লইয়া সম্বন্ধ থাকিবে। প্রজা যে কোন প্রকার শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু যেখানে এরূপ প্রথা আছে যে, অন্য প্রকার শস্য উৎপাদন করিলে অধিক রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে সেই প্রথাই বলবৎ থাকিবে।

৬ষ্ঠ। প্রজাদের রাজস্ব কি নিয়মে লইতে হইবে, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিবার পাট্টা দিতে হইবে। ঐ পাট্টায় প্রজাকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লেখা থাকিবে।

৭ম। পাট্টায় যেখানে হার ধরিয়া রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে হার এবং যেখানে শস্যে রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে শস্য দানের নিয়মের পাকা বন্দোবস্ত থাকিবে।

৮ম। জমীদারেরা পাট্টার উক্ত নিয়মানুযায়ী ফরম প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের অনুমতি লইয়া দেওয়ানী আদালতে রেজেষ্টরী করিবেন।

৯ম। জমা নির্ণীত এবং স্থিরীকৃত হইয়া গেলে জমীদার যদি প্রজাকে সেই জমীর পাট্টা না দেয়, তাহা হইলে রায়তের পাট্টা লইতে মোকদ্দমা করিবার সমস্ত ব্যয় জমীদারকে দিতে হইবে।

১০ম। রায়ত কিম্বা পেটাও ইজারদারদিগের সহিত এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা যদি এই সকল নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা বন্দোবস্তের মেয়াদের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। জুয়াচুরি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে সে বন্দোবস্ত বলবৎ হইবে না।

১১শ। কোন জমীদার নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত খোদকস্ত রায়তের পাট্টা রদ করিতে পারিবে না। যে সকল কারণবশতঃ পাট্টা নামঞ্জুর হইবে তাহা এই। জুয়াচুরি করিয়া পাট্টা লইলে, পরগণানিরিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে রাজস্ব কম হইলে, জুয়াচুরি করিয়া রাজস্ব রেয়াত পাইলে, কিম্বা পরগণার জরীপ হইলে।

১২শ। ১১৯৮ সালের মধ্যে জমীদারেরা সকল প্রজাকে পাট্টা দিবেন। ১১৯৮ সাল অতীত হইয়া গেলে, প্রজার সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন প্রকার বন্দোবস্ত আইনানুমোদিত হইবে না। যে সকল জমীদার আবওয়াব ইত্যাদি জমাভুক্ত করিয়া প্রজাকে পাট্টা না দিবেন, তাঁহারা রাজস্বের জন্য নালিশ করিলে সে নালিশ নামঞ্জুর হইবে।

এই সমস্ত ধারার অর্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, জমীদারও প্রজার সহিত তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন। যে জমা স্থির হইবে তাহার উপর আর এক পয়সা লইতে পারিবেন না।

বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের কাগজপত্র দেখিয়া, মোট আদায়ের ৯ ভাগ নিজে লইলেন এবং একভাগ জমীদারের জন্য রাখিয়া দিলেন, কিন্তু প্রজার বেলা প্রজা কত দিতে পারিবে এবং তাহার উৎপন্ন কত কিছুই না দেখিয়া আবওয়াব ইত্যাদিতে সে যাহা যথার্থ দিত তাহাই তাহার ন্যায্য দেয় বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। প্রজার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন যাহাতে না নয়, লর্ড কর্ণোয়ালিস তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্ণোয়ালিসের সমস্ত আইনগুলির মধ্যে প্রজার উপর রাজস্ববৃদ্ধির নামও নাই। বরং পূর্ব্বে আবওয়াব প্রভৃতি নানা কারণে প্রজার নিকট যে অধিক রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা চিরকালের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রজার খাজানা চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আইনে কেবল ইহাই দৃষ্টি হয়।

নিয়মমত রাজস্ব দিলে প্রজার যোত উচ্ছেদ করা আমাদের দেশে কখন ছিল না, কর্ণোয়ালিসের আইনেও যোত উচ্ছেদের কোন বিধান নাই। যে কৃষক একবার কৃষিকার্য্যের জন্য * ভূমি লইল, সে যতদিন রাজস্ব দিবে ততদিন সে ভূমি তাহারই থাকিবে,

* মৌরসী, মকররী, মেয়াদী প্রভৃতি পাট্টা বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাগাত প্রভৃতি স্থলেই চলিত। কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি লইলে ঐরূপ পাট্টা চলিত নহে। কৃষকেরা প্রায় পাট্টা লয় না। ১৭৯৩, ১৮৫৯, ১৮৮৬ সালে পাট্টা লইবার এত সুবিধা করিয়া দিলেও অতি অল্প লোকেই পাট্টা লইয়াছে। কৃষক রায়ত একটু পুরাণ হইলেই তাহারা কদীমী রায়ত কহিত, তাহাদের স্বত্ব প্রায় মৌরসীর ন্যায়।

এই আমাদের দেশে চিরন্তন প্রথা। যোত ছাড়াইয়া দেওয়া ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা, এদেশীয় লোকের অরুচিকর। তবে প্রজা দুর্ব্বল ও জমীদার সবল, এ জন্য প্রজারা জমীদারকে খুসী করিবার জন্য নজর প্রভৃতি সময়ে সময়ে দিত, কিন্তু রাজস্বের উপর এক পয়সা বৃদ্ধি করিতে তাহারা কখনও চায় না, এবং কখনও অর্থাৎ দশ আইন পাশ হইবার পরও অনেক জায়গায় জমীদার চারি পয়সা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে চাহিলে প্রজারা জমীদারকে দশ টাকা নজর দিবে, জমীদারের আমলাকে দশ টাকা ঘুষ দিবে, তথাপি সে চারিটী পয়সা বৃদ্ধি দিতে চাহিবে না। কর্ণোয়ালিসের আইনে যখন ঐ নজরাদি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যখন আবার ১১৯৮ সালের মধ্যে আবওয়াব আদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্বের মোট স্থির করিয়া সেই রাজস্বে পাট্টা দিবার কথা রহিল, না দিলে রাজস্বের নালিশ চলিবে না এমত বন্দোবস্ত রহিল, তখন সে পাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়ত কি?

প্রজাদিগের রক্ষার জন্য বিশেষ বিধান করা আবশ্যক বলিয়া লোকে যখন কর্ণোয়ালিসকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, তখন তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, শত শত বৎসর হইতে প্রচলিত স্থানীয় হার এবং পরগণানিরিখ কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই চিরন্তন প্রথা প্রজাদিগের পরিত্রাণ করিবে। কিন্তু বাঙ্গালী জমীদার যে কতদূর স্বার্থপর, নৃশংস এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কত গর্হিত, ন্যায়বিরুদ্ধ ও জঘন্য কার্য্য করিতে পারেন, তাহা উদারচেতা লর্ড কর্ণোয়ালিস কিছুই জানিতেন না। জানিলে তিনি আর রাজস্বনির্ণয় এবং পাট্টাদান কার্য্যের ভার ঐ জমীদারদের হস্তে সমর্পণ করিতেন না; সেটা নিজেই করিয়া দিতেন। জমীদারদের হাতে দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, ঐ সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় নাই, যাহাও বা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার সর্ব্বনাশ বই আর কিছুই হয় নাই। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার কবডেন ক্লাবের প্রবন্ধে এই রেকর্ড না রাখাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান ভুল ও বঙ্গীয় প্রজার প্রধান অনর্থ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রায়তেরা জানিত, জমী করিব খাজানা দিব। খাজানা বাড়ান, যোত ছাড়ান, এ সকল তাহাদের পক্ষে নূতন; এবং যখন দশসালা বন্দোবস্তে উহার কথা নাই, তখন উহা রায়তের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ক্যাম্বেল সাহেব লিখিয়াছেন, "There are in them (regulations) expressions which would seem to imply that no more is to be taken from any class of ryots, old or new, than the customary rates in the neighbourhood."

লর্ড কর্ণোয়ালিস জমীদারী ফেরাবীর তলা পর্য্যন্ত বুঝুন আর নাই বুঝুন, তিনি জমীদারদের তত বিশ্বাস করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বটা ঠিক ঠিক আদায় হইয়া যায় সেই দিকেই তাঁহার অধিক নজর ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কতকটা

নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি প্রজার রক্ষার্থ পূর্ব্বোক্ত ধারা সকল প্রণয়ন করিয়াও একটী ক্ষমতা নিজ হস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেটী এই—It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of dependent Talukdars, Ryots and other cultivators of the soil, and no Zemindar, independent Talukdar or actual proprietors of land shall be entitled on this account to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectively agreed to pay.

এই ধারার প্রকৃত অর্থ এই যে রায়তদের রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আইন করিবেন, জমীদার সেইজন্য অবধারিত খাজানা দিতে পারি না বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আশুবাবু বলেন উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধ হইতে একটী বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এবং সেটী বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়াছেন। সেটী এই— No power will then exist in the country by which the rights vested in the landholders by the regulations can be infringed or the value of the landed property affected.

অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে যদি জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাই এ দেশের মধ্যে কাহারও না রহিল, তবে গবর্ণর জেনেরল ইন্ কৌন্সিল উক্ত স্বত্বে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? অর্থাৎ প্রজার রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনেরলেরও আইন করার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ৯৩ সালের প্রথম আইনের অষ্টম ধারার অন্যরূপ অর্থ।

কিন্তু আশুবাবু প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিবার সময় গোড়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা রিবিউ, পৃষ্ঠা ৩৮৮। "None but a fool or madman will deny the power of the legislature to redistribute property in land and indeed private property of every other description." কিন্তু তিনি আবার নিজেই বলিয়াছেন যে, দেশের মধ্যে জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। এইরূপে তিনি আপনার পদেই আপনি কুঠার মারিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় রেগুলেশনের উপরোক্ত যে পদটী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা "চক্ষুরোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ।" এই অশ্বচিকিৎসার বচনটী মনুষ্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত করিলে যেরূপ ফল হয়, তদ্রূপ ফল প্রসব করিয়াছে। আমরা স্থান অভাব প্রযুক্ত

দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধটী তুলিয়া দিতে পারিলাম না, পারিলে পাঠকগণ দেখিতেন যে ঐ রেগুলেশন দ্বারা কেবল মাল আদালত উঠিয়া যায় ও তাহার কার্য্য দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হয়। তাহার মধ্যে প্রজার স্বপক্ষে আইন করিবার ক্ষমতা কাহারও রহিল না এমন কোন কথাই নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

আশুবাবুর উদ্ধৃত পদের কেবল উপর এবং শেষ অংশ পড়িলেই উহার অর্থ বোধ হইবে—এইজন্য আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম, আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কথা কহিব না। উদ্ধৃত অংশটুকু এই—

The collectors of the revenue must not only be divested of the power of deciding upon their own acts but rendered amenable for them to the courts of judicature and collect the public dues subject to a personal prosecution for every exaction exceeding the amount which they are authorized to demand on behalf of the public and for every deviation from the regulations prescribed for the collection of it; no power will then exist in the country by which the rights vested in the landholders by the regulations can be infringed or the value of landed property affected.

অর্থাৎ কালেক্টর নিজে অত্যাচার করিয়া নিজেই বিচারপতি হইলে জমীদারের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার যে সম্ভাবনা তাঁহার থাকিত তাহা আর থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সমাজের এবং গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতার সহিত ঐ power শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। আশুবাবু তাহা পাকা উকীলের ন্যায় গোপন করিয়াছেন।

তিনি Right Hon'ble T. Pemberton League র একটী রায় হইতে একটী পদ উদ্ধার করিয়া বলেন যে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী সুন্দররূপে চালাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য East India Company জমিদারকে ভূস্বামীরূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদের সদর জমা চিরকালের জন্য স্থির করিয়া দিয়া সুশাসনের সর্ব্বপ্রথম সোপান করিয়া দিলেন। তিনি বলেন, এই প্রথম সোপান ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরলের ঘোষণাপত্র! আশুবাবু ঘোষণাপত্রেরও কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু অষ্টম ধারার কি অর্থ তিনি করেন কোন স্থানেই খুলিয়া বলেন নাই। তিনি বলেন, আমরা উহার কি অর্থবোধ করি তাহা ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িলেই অনুমান করিতে পারা যাইবে। এরূপ অর্থ অনুমান করিয়া লওয়ার ভার পাঠকের হস্তে দেওয়া বড় মন্দ নহে। তাঁহার ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া আমরা ত বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে যেন একটু একটু বোধ হয় যে, লোকে বুঝিবে জমীদারেরা পূর্ব্বে পুলিস-বিচার প্রভৃতি যে সকল

রাজকীয় ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই ক্ষমতা উচ্ছেদ করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিবার ভার গবর্ণর জেনেরল রাখিলেন। কিন্তু প্রথম রেগুলেশন বরাবর পড়িয়া আসিলে কখনই এরূপ অর্থ হয় না। সমস্ত প্রথম রেগুলেশনের মধ্যে জমীদারের দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদির নামও নাই গন্ধও নাই। সুতরাং মাঝে হইতে তাহার অষ্টম ধারার জমীদারের ফৌজদারী ক্ষমতা নিষেধরূপ অর্থ কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপ চুক্তি করিবার সময় জমীদারকে তাহার অনেক মূল্য Valuable consideration দিতে হইয়াছিল, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার একটী এই যে হাজা সুখা, জন্মা অজন্মা, সমস্ত সত্ত্বেও লাটের ঠিক তারিখে রাজস্ব আদায় দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জমীদারী নিলাম হইবে, আর যদি নিলামে রাজস্বের বাকি টাকা না উঠে তবে জমীদারের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। আশুবাবুর মতে এই Valuable consideration। তাঁহার মতে ইহা অতি কঠিন নিয়ম। কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁর বৈকুণ্ঠ, মুঙ্গেরের হাজত, কয়েদ, জমীদারী খাস করা, জমীদারীর খাস বন্দোবস্ত, জমীদারীর স্বত্বলোপ * এ সকলের চেয়েও কি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এত কঠিন? হইতেও পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সাবেক আমলে জমীদারকে নবাব কয়েদ করিত, মারিত, না হয় অপমানই করিত। মুসলমানেরা ত টাকা লইতে পারিত না, সুতরাং তাহা অপেক্ষা কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দেওয়া বড়ই শক্ত। বড়ই Valuable consideration.

আশুবাবু যে আর এক কথা কেন বলেন নাই তাহা বলিতে পারি না। ৯৩ সালের চতুর্দ্দশ আইনের নবম দশম একাদশ ধারায় জমীদারকে বাকী খাজানার দায়ে কয়েদ করার যে কথা ছিল, সেও ত দশসালা বন্দোবস্তরূপ চুক্তির এক অংশ। ১৭৯৪ সালের তিন আইনের ৩ ধারায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কয়েদ করার ক্ষমতা ত্যাগ করার দরুণ জমীদারের নিকট কি কিছু ক্ষতিপূরণ লইয়াছেন? লন নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট এখন প্রজার রক্ষার জন্য আইন করিতেছেন, জমীদারগণ নানা কথা তুলিতেছেন কেন? তাহার পর আশুবাবু foot noteএ লিখিয়াছেন।—

It would be interesting to compute the sum total of the "other real or personal property", sold in the seventy-five years between 1793 and 1868.

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, জমীদারেরা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপায়ে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত অংশ তাহার শতাংশের অর্দ্ধাংশও নহে।

* আমরা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পড়িয়াছি যে অনেক স্থলে মুসলমানেরা দুষ্ট জমীদারের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজাকে দিয়াছেন।

আর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রজার কি হইয়াছে! জমীদারেরা যাহা লোকসান দিয়াছেন তাহা আইন অনুসারেই দিয়াছেন। কিন্তু প্রায় তিন কোটী প্রজা তাহাদের শাসনের গুণে তাঁহাদের দয়াধর্ম্মের গুণে জমীর মালিক ঘুচিয়া প্রায় ইচ্ছাধীন রায়ত tenant at will হইয়া উঠিয়াছে। † অধিকাংশই লাঠী জুতা ও গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা ও মাঙ্গন মাথট ভিক্ষা গোমস্তার পার্ব্বণি হিসাবানা নজর ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ আদায়ের চোটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এত পুলিস, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী স্থাপন করিয়াও ত প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। এখনও জমীদারের নায়েব গোমস্তা মফস্বলে হর্ত্তাকর্ত্তা; এখনও নানাস্থানে তাহারা জরিমানা করে, রামের ধন শ্যামকে দেয়, শ্যামের ধন হরিকে দেয়। কিন্তু গরিব প্রজাদিগের জন্য কথা কহে এমন লোক কোথায়? জমীদারের দুগ্ধে চিনির ত্রুটি হইলে তাহা লইয়া চীৎকার করিবার লোক দেশশুদ্ধ মিলিবে, কিন্তু গরিব প্রজার যে পান্তাভাতে একটু লবণও জুটিয়া উঠে না তাহা কে দেখিবে! কে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবে, কে তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিবে! যাহারা প্রজাদের একমাত্র ভরসা, সেই শিক্ষিত যুবকদলও ক্রমে নানা কারণে জমীদারদিগের দলের সেনাপতি বা অন্নদাস হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

হে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল নির্জীব রায়তবৃন্দ! তোমরা ভরসা ত্যাগ কর। তোমাদের কেহই বন্ধু নাই, তোমাদের হইয়া দুকথা কয় এমন লোক একটীও নাই। ইংরেজী শিক্ষায় দেশের যে উন্নতি হইয়াছে সে তোমাদের জন্য নহে। সে ধনবানের জন্য। জানিও, শিক্ষিত লোক জমীদার বা তালুকদারের জন্য। কেন না তাহারা পয়সা ব্যয় করিতে পারে। শিক্ষিত লোক তোমাদের কেহ নহে। তোমরা নিজে বুদ্ধিমান হইতে চেষ্টা কর, লিখিতে পড়িতে ও আপন স্বত্ব বুঝিয়া লইতে শিখ। তোমরা নিজে আপন সাহায্য করিতে পারিলে ঈশ্বর তোমাদিগের সহায় হইবেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তোমাদের রক্ষার্থ নানা যত্ন করিয়াও তোমাদের রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তোমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিলে তাঁহারাও সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন। তোমরাও বাঁচিয়া যাও, নচেৎ তোমাদের ভরসা নাই। আশা নাই। (বঙ্গদর্শন : কার্ত্তিক, ১২৮৭)

* এই সন্দর্ভে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সমালোচিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধটী (The Proposed New Rent Law for Bengal and Behar) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকার ১৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃঃ ৩৪৫-৯৮)। প্রবন্ধলেখক হিসাবে আমরা Ashutosh Mookerjea-র নাম পাইতেছি। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের একজন গ্র্যাজুয়েট, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন, এবং প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। ইনি কিছুকাল ইংরেজীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, এবং পরে ওকালতীও করেন।—সম্পাদক—।

† হপ্তমের অত্যাচারে যে কত প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার তালিকা লইলেও it would be interesting to compute.

বামুনের দুর্গোৎসব

(১)

"মা তুমি কান্'ছ কেন ?"

একটী আট-নয় বছরের ছেলে, গলায় একগোছা ধপ্‌ধপে পইতা, দিব্য মোটা সোটা নুন্‌ধগ্‌ড়িপানা ছেলে, একটী ঘেরা বাড়ীর উত্তরের পোতার বড় ঘরের দাওয়ার এক পাশে খেলা করিতে করিতে দৌড়িয়া আর এক পাশে মায়ের কাছে গেল ও মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, মায়ের চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে—দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল :—

"মা তুমি কান্'ছ কেন ?"

অনেক দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বাড়ীতে যে চা'ল তৈয়ারি করা ছিল, তা' প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আগের দিন একটু ধরণ করায় মা কিছু ধান সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেইগুলি ঘরের বড় দাওয়ায় তালপাতার চেটাই বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছেন। ধান ত প্রায়ই উঠানে শুকায়, কিন্তু এখন বিশ্বাস ত নাই। কখন বৃষ্টি আসিয়া ধান সব আবার ভিজাইয়া দিবে, আর ভিজাইয়া দিলেই চা'লে এক নাদবুড়া গন্ধ বাহির হইবে। তাই মা ধানগুলি দাওয়াতেই শুকাইতে দিতেছেন—এমন সময়ে দূরে খোলকরতালের শব্দ ও হরিনামের রোল উঠিয়া মাকে জানাইয়া দিল যে, আজ জন্মাষ্টমী।

জন্মাষ্টমীর দিন এ বাড়ীর কাঠামপূজা হইত। মা ক'নে বৌ সাজিয়া যেদিন এ বাড়ীতে পা দিয়াছেন, সেইদিন হইতে এ পর্য্যন্ত কোন জন্মাষ্টমীর দিনেই কাঠামপূজা ফাঁক যায় নাই—এবার বুঝি ফাঁক যায়। কারণ, কর্ত্তাটী চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক আট বছরের ছেলে ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর বছর ফিরিবে না। তাই মাঘ মাসেই তিনি ছেলেটীর পইতা দিয়াছিলেন, এবং তাহাকে শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গের পূজা করিতে ও ভোগ দিতে শিখাইয়াছিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর দরকারী লক্ষ্মীপূজা ষষ্ঠীপূজাটাও শিখাইয়াছিলেন। ছেলের বিদ্যা ত ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু সে বালক হইলেও অতি সাত্ত্বিকভাবে যে

সব নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা সে শিখিয়াছিল তাহার অনুষ্ঠান করিত; মাকে বড় একটা শুধরাইয়া দিতে হইত না।

আজ মায়ের চোখে জল দেখিয়া ছেলে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আর একশ' বারই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"মা তুমি কান্‌'ছ কেন?" ছেলে যতই জেদ করিতে লাগিল, মায়ের চোখের জলও ততই বাড়িতে লাগিল। মা একবার ভাবেন—বলিয়া ফেলি; আবার ভাবিলেন—ও যেরূপ ছেলে, বলিলে ত এখনই পূজা করিতে চাহিবে; কিন্তু আমার ত কোনই সম্বল নাই, কি দিয়া পূজা নির্ব্বাহ হইবে? আবার ভাবিলেন—মা জগদম্বার ত বছরের মধ্যে একবার আসা। তারই জন্য বাড়ী, তারই জন্য ঘর, তারই জন্য বিষয়, তারই জন্য বৈভব। তাই যদি না আনিতে পারিলাম, ত গৃহস্থালীতেই কাজ কি? গৃহস্থালী রাখিতে হইলে বিশেষ ব্রাহ্মণের পক্ষে জগদম্বাকে আনা চাই-ই চাই-ই।

মা এই সব ভাবিতেছেন, আর চুপ করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতেছেন। ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বল না মা কান্‌'ছ কেন?"—বলিয়াই মায়ের অঞ্চল দিয়া মায়ের চোখ দুটী মুছাইয়া দিল। বলিল—"তোমাকে বলিতেই হইবে।" ছেলে আবার জেদ করিল।

"আজ না জন্মাষ্টমী?"

"হাঁ মা, আজ তো জন্মাষ্টমী বটেই। ঐ যে বৈষ্ণবদের বাটীতে খোলকরতাল বাজিতেছে; আমিও পাঁজিতে দেখিয়াছি। কিন্তু জন্মাষ্টমী হইল, তা, তুমি কাঁদিবে কেন?"

"জন্মাষ্টমীর দিন না তোমাদের বাড়ী চিরদিনই কাঠামপূজা হইয়া থাকে?"

"হয় ত বটে। কিন্তু এবার ত কোনই উদ্যোগ দেখিতেছি না।"

"কে করিবে বাছা! কর্ত্তা কি আছেন?"

"আমিই করিব মা—কাঠাম ত রহিয়াছে।"

"দূর পাগলা ছেলে—তুই কেমন ক'রে করবি? দুর্গোৎসব কি কম ব্যাপার! অনেক অর্থবল চাই—অনেক লোকবল চাই। শেষ কি একটা ঢলাঢলি করবি?"

"না মা—ঢলাঢলি কেন হ'বে? বছরের মধ্যে একবার বই ত নয়? পারব না কেন? তারপর মা জগদম্বা ত প্রতি বছরই আসিয়া থাকেন। তাঁকেই আনিতে পারিবে না বলিয়াই ত তুমি কাঁদিয়া আকুল! তাঁরই কি আমাদের উপর কোন মায়া নাই? তিনি ত শুনিয়াছি না ডাকিলেও লোকের বাড়ী যান। তুমি এত ডাকিতেছ, এত কাঁদিতেছ, তিনি আসিবেন না?"

বলিয়াই ছেলে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের দুই বৃহৎ শাল-কাঠের আড়ার উপর কাঠামখানি বসান ছিল, পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুঁটি

বাহিয়া সে আড়ায় উঠিল, কিন্তু আড়ার উপর বসিয়া সে ভারি কাঠাম নাড়িতেও পারিল না। সে ভাবিল, যদি বা কোন রকমে কাঠাম নাড়াইবার চেষ্টা করি—কাঠাম পড়িয়া যাইবে, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং সে নামিয়া পড়িল—নামিয়াই সে একছুটে কিশোরীদাদার বাড়ীতে আসিল। কিশোরীদাদা জাতিতে সদ্গোপ, বেশ লম্বাচওড়া দেহখানি; গায়েও যথেষ্ট বল আছে। সে ব্রাহ্মণঠাকুরকে বাবা বলিত, তাই সে এই বালকের 'কিশোরীদাদা'।

কিশোরীদাদা তখন দোবৃজা কাঁধে করিয়া এক কলসী আখের গুড় লইয়া বেচিতে যাইতেছে। দশ বারো দিন মেঘ হওয়ায় সে ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। হাতে তার আজ একটী পয়সাও নাই। সে তাই গুড় বেচিয়া পয়সার সংস্থান করিবে। এখন বামুনদাদাঠাকুর আসিয়া ধরিল—"কিশোরীদাদা, চল, আজ আমাদের বাড়ী কাঠামপূজা।"

কিশোরীদাদা।—মা ত পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন?

"মা ত আছেনই, আমিও আছি। কিন্তু তুমি না গেলে হ'বে না—কাঠামই নামান হ'চ্ছে না। তুমি না গেলে পূজাই হ'বে না।"

কিশোরীদাদার আর গুড় বেচিতে যাওয়া হইল না। গুড়ের নাগরীটী ছোট ভাইএর হাতে দিয়া বলিল—"ভাই, তুমিই যাও, যা' হয় তুমিই করিয়া আইস। মা আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমায় যাইতেই হইবে।"

কিশোরীদাদা আসিয়া এক লাফে আড়ার উপরে উঠিলেন, কাঠামর হাতল ছুইটী আড়া হইতে উঠাইলেন, ধীরে ধীরে কাঠামখানি আড়ার উপর হইতে ঝুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে দুই গাছা কাছি আনিয়াছিলেন, একটা হাতলের দুই দিকে কাছি বাঁধিয়া কাঠামখানি আস্তে আস্তে নামাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর শুয়াইয়া দিলেন।

ছেলের তখন ত ভারী আমোদ। ছুটিয়া মাএর কাছে গিয়া সংবাদ দিল—

"মা, কাঠাম নামান হইয়াছে।"

"বলিস কি রে? কে নামাইল?"

"কেন, কিশোরীদাদা।"

"কিশোরীও বুঝি আসিয়াছে? তাকে বাড়ীর ভিতরে ডাক।"

কিশোরী আসিয়া মাকে গড় করিয়া বলিল—"আমিও তাই ভাবিতেছিলাম—চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যাবে? এত কালের পূজাটা আজ বন্ধ হ'বে! যেমন জোটে, তেমনই করিয়া মাএর পদে জবা ও বিল্বদল দেওয়া হ'বে। তা আপনি ভালই সঙ্কল্প করিয়াছেন। বামুনের বাড়ী, বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী—চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যাওয়া উচিত নয়।"

মা। তা বাবা তোমরাই ভরসা। দেখ, যেন ছেলেটা মায়ের কাছে অপরাধী না হয়।

(২)

দুপুর বেলা ঢোল বাজিল, নৈবেদ্য আসিল, ধূপ ধুনা পুষ্পপাত্র সব আসিল, ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজা হইল—কাঠামপূজা শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে দাদাঠাকুরের প্রকাণ্ড উঠানে একটী একটী একটী করিয়া অনেকগুলি পাড়ার মেয়ে আসিয়া জুটিল। বুড়ী আছে, আধাবয়সী আছে, যুবতী আছে, বালিকাও আছে। উঠানটী নিত্যই গোবর দেওয়া হয়, ধূলা তাতে বড একটা হয় না। সকলেই উঠানে বসিল। বিশেষ সেদিন বৃষ্টি হয় নাই। বেশ রৌদ্র হইয়াছিল, খাসা হাওয়া বহিতেছিল। বাহিরে বসাই সকলে পছন্দ করিল। একজন বৌ গিন্নীকে বলিল—"তা মা, বেশ হয়েছে। আমরা পাড়ার সকলেই প্রতিমা দর্শন করিতে পাইব। পাড়ায় আরও ত অনেকে আছেন। কিন্তু তাঁরা ত ওকাজ করেন না। তোমার বাড়ীতে পূজা হ'লে তবু আমরা দেখতে-শুনতে, করতে-করমাতে পাব।"

একজন আধাবয়সী—গিন্নীবান্নী গোছের—তিনি বলিলেন :—"তোমাদের কর্ত্তাটীর ত কাল হ'য়েছে চার-পাঁচ মাস। এর মধ্যে ত তোমাদের আর কিছুই হয় নাই। সংসার চলাচলেরই কষ্ট। তুমি কি সাহসে কাঠামপূজা করিয়া দুর্গোৎসবে ঝাঁপ দিলে ?"

ইহার উত্তরে আর একজন গিন্নীবান্নী বলিয়া উঠিলেন :—"না দিয়াই বা কি করে ? চিরদিনের পূজা বাদই দেয় কি ক'রে ? চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক দেখিলে প্রাণটা যেন হু হু ক'রে উঠে, তাই গিন্নী যেমন ক'রেই হোক কাঠামপূজাটা ক'রে মায়ের আসবার পথ ক'রে দিলেন।"

বাড়ীর কর্ত্রী।—আমি ত জানি, কত ধানে কত চাল। পূজা করতে কি খরচ—কত লোকজন দরকার—সবই জানি। কর্ত্তা গিয়া অবধিই সংসারে কি অনটন হইয়াছে, তাও দেখিতেছি। কিন্তু কি করিব ? পোড়া ছেলে যে ছাড়ে না ! আমার চোখে জল দেখে—'মা, তুই কাঁদলি কেন ?—মা, তুই কাঁদলি কেন ?'—এই যে ধরিল, আমার মনের কথাটী বার ক'রে নিলে, তবে ছাড়লে। তারপর যা কিছু করিবার সেই সব করেছে। কাঠাম নামাইয়াছে, পূজার আয়োজন করিয়াছে, পুষ্পপাত্র সাজাইয়াছে, নৈবেদ্য করিয়াছে, যেমন হোক ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজাটা করিয়াছে, ব'সে ব'সে একরূপ চণ্ডীও পাঠ করিয়াছে। তৃতীয় প্রহরে চারিটী খেয়ে কুমোর ডাকিতে গিয়াছে।"

আর একজন।—ওমা, সে কি ? সে কেমন ক'রে পূজা করলে ? তার যে এখনও মন্ত্র হয় নাই।"

গিন্নী।—সে কথা তুলেছিলাম, মা, সে কথা তুলেছিলাম। তা সে বললে—'চণ্ডীর পূজা সকল ব্রাহ্মণেই করিতে পারে। তবে দুর্গোৎসব মন্ত্র না নিলে হয় না। তা এই পূর্ণিমার দিন ঠাকুরবাড়ী গিয়ে মন্ত্র নিব। বোধনের আগেই আমাদের মন্ত্র নেওয়া হয়ে যাবে।"

আর একজন।—সে কি ? কালাশৌচের বছর—মন্ত্র নেওয়াই হ'বে কেমন ক'রে, দুর্গোৎসবই বা হ'বে কেমন ক'রে ?

গিন্নী।—কর্ত্তা বোধ হয় মনে মনে জানিতেন, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—'আমার ত একটী বই ছেলে নয়। তা সে যেন যোলটা মাসিক আর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পরই সারিয়া ফেলে।' তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, বৃষোৎসর্গ না হ'লে প্রেতত্ব-পরিহার হয় না, আর সপিণ্ডীকরণ না হ'লে পিতৃলোকে যাওয়া যায় না।'

আর একজন।—তাই বুঝি তোমাদের বাড়ীতে হপ্তাখানেক ধ'রে শ্রাদ্ধ হয়েছিল ? আর ঐ দুধের ছেলেটী কত উপোসই করেছে, আর কত কষ্টই পেয়েছে।

আর একজন।—ছেলেটী যথার্থই ব্রাহ্মণের ছেলে, বাপ-মার উপর বড়ই ভক্তি। যে ঐ বয়সে মায়ের চোখে এক ফোঁটা জল দেখে দুর্গোৎসব করতে যায়, সে যে বাপের জন্য তিন চারি দিন ধরিয়া শ্রাদ্ধ করিবে—আশ্চর্য্য কি ?

আর একজন গিন্নী নথ নাড়িয়া বলিলেন ঃ—'বুঝি না বাপু—যার ষোল দানেরই অস্থিত, সে কি ক'রে এ রকম বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেয়।'

এক যুবতী।—কাজ কি আমাদের সে কথায় বাপু ? আগুন খাবে যে—সেই যে কি বলে না ?

একজন বুড়ী বলিয়া উঠিলেন—"কাজ ত খুবই ভাল বটে—ছেলেও উৎসাহ ক'রে লেগেছে, মাও তার সঙ্গে খাটছে, তবে কি জান দুর্গাবিপত্তি না হ'লে হয়।"

এই সব কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। এক এক করিয়া কাপড় ঝাড়িয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন। গিন্নীরও ঘরে সন্ধ্যা দিবার সময় হইল। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার কাণে বাজিতেছে—'দুর্গাবিপত্তি না হ'লেই বাঁচি।'

এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে ছেলে আসিয়া উপস্থিত ! উপস্থিত হইয়াই বলিল—"মা, শ্যাম কাকার কাছে গিয়াছিলাম। সে কাল সকালেই আসিয়া কাঠামতে খড় জড়াইবে।"

(৩)

ছেলের ত রোখ চাপিয়াছে। তাহাকে ফিরাইবার যো নাই। গিন্নীর কিন্তু ক্রমে ভাবনা আসিয়া ঢুকিল।—কেমন করিয়া দায় উদ্ধারি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে তিনি একবার বার্ষিক আদায় করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু কি বার্ষিক, কত বার্ষিক, কোথায় বার্ষিক, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাহার কোনও ফর্দ্দও ছিল না। তিনি বাক্স পেঁটরা খুঁজিলেন, কিছুই পাইলেন না। যে পুথিখানি তিনি পড়িতেন, তাহার প্রতি পাতা

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন, ফৰ্দ্দ ত পাওয়া গেল না। তখন তাঁহার মনে হইল, পাশের গাঁয়ে স্বরূপ দাস বলিয়া এক জন সদ্গোপ অনেক বার বার্ষিক আদায় করিবার সময় তাঁহার তল্পীদার হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াই ছেলেকে স্বরূপ দাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিলে তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কর্ত্তা কোথায় কোথায় বার্ষিক পাইতেন, জান কি?" সে বলিল, "কলিকাতায় গেলে আমি সেই সব বাড়ী চিনাইয়া দিতে পারি, কিন্তু নাম ত কাহারও জানি না। বাগবাজারে দুই ঘর, শোভাবাজারে এক ঘর, হোগলকুঁড়েয় দুই ঘর, তারপর যোড়াসাঁকোয় দুই ঘর, পাথুরেঘাটায় এক ঘর, বৌবাজারে এক ঘর ও হাটখোলাতে এক ঘর। হাটখোলার দত্তেরা তাঁহাকে বড় ভক্তি করিত, তিনি সেই বাড়ী অতিথি হইতেন; যে কয় দিন থাকিতেন, তাঁহারা সিধা বাঁটিয়া দিতেন, সিধায় আমাদের দু'জনের কোন জিনিসেরই অকুলান হইত না। আমি সবই করিয়া দিতাম, তিনি কেবল চড়াইয়া নামাইয়া লইতেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০টী টাকা আদায় হইত।"

৫০টী টাকা আদায় হইতে পারে শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। ছেলেরও মহাস্ফূর্ত্তি! সে বলিল, "স্বরূপদাদা, তুমি যদি সঙ্গে যাও, ত আমি বার্ষিক আদায় করিয়া আনিতে পারি।"

স্বরূপদাদা।—আমি বুড়া হইয়াছি, আমার যাইতে দেরী হইবে। কিন্তু আমি না গেলেও তোমায় ত কেহ বাড়ী চিনাইয়া দিতে পারিবে না। কর্ত্তার অনেক খেয়েছি। তুমি বলিলে না গিয়াও ত থাকিতে পারি না।

গিন্নী।—তুমি বুড়া হইয়াছ, আস্তে আস্তে যাইবে। আর ঐ বা কোন জোয়ান! এও ত বালক। তোমরা দুই জনেই আস্তে আস্তে যাইবে, রাস্তায় তোমাদের মিল হইবে ভাল। তাহা হইলে তোমরা ব্রতপক্ষের প্রতিপদেই যাত্রা করিবে। কেন না, পূর্ণিমার দিন ছেলেটাকে আবার মন্ত্র লইতে হইবে।

মাঝে যে কয়টা দিন ছিল, মা ও ছেলে দুই জনেই যথাসাধ্য পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন: ধান ভানিয়া চাল তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন, ডালকড়াই ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, বড়ী দিতে লাগিলেন, সব গাছ ঝুড়িয়া নারিকেল পাড়াইলেন, বাল্‌দেগুলিকে কাটিয়া জ্বালানি কাঠ করিলেন, কাঠীগুলি ঝাঁটার জন্য রাখিলেন, পাতাগুলি জ্বাল দিবার জন্য আঁটি বাঁধিয়া রাখিলেন; নারিকেলের ছোবড়াগুলিও জ্বালানি হইবে—বিশেষ লোকজনের তামাক খাবার সময় বড়ই দরকারে লাগিবে; নারিকেলগুলি কুরিয়া, তাহা হইতে দুধ বাহির করিয়া কলসী পুরিয়া রাখিলেন—সে দুধ জ্বাল দিয়া তেল হইবে, নারিকেলকোরাগুলি কতক গুড় দিয়া নারিকেল লাড়ু হইল; কতক চিনি দিয়া পাক করিয়া রসকরা হইল।

খিড়কীর বাগানে যে সব তরীতরকারীর গাছ ছিল, সেগুলি বেশ করিয়া নিড়াইয়া

দেওয়া হইল, ঘাস মারিয়া দেওয়া হইল, মাচাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল; লাউ, কুমড়া, শশা, বরবটী, বেগুনগাছগুলির বেশ পাট করিয়া দেওয়া হইল, যেন যথাসময়ে সে সকল পূজায় লাগিতে পারে। কিন্তু গিন্নীর সকলের উপর এক কাজ; মাকে ডাকা—'মা, লজ্জা রক্ষা ক'রো।'

ব্রতপক্ষের প্রতিপদের দিন ছেলে ও স্বরূপদাদা বার্ষিক আদায়ে বাহির হইল। দশ বছরের ছেলে কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই, তাহাকে পাঠাইয়া—কোথায় যে পাঠাইতেছেন, তাহারও ঠিক নাই—গৃহিণী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলেন, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, তার পর মনে মনে মা জগদম্বার হাতে ছেলেটীকে সঁপিয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভোরে যাত্রা করিয়া স্বরূপদাদা ও ছেলেটী পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া দুপুরবেলায় স্বরূপদাদার এক কুটুম্ববাড়ীতে উপস্থিত হইল। স্বরূপদাদা কুটুম্বের বাড়ীতেই খাইলেন। ছেলেটী সদ্গোপদের গোয়ালে এক কোণে সিদ্ধ পক্ক রাঁধিয়া খাইল। সদ্গোপেরা দুধ ও গুড় দিল। বেলা দুই তিনটার সময়ে চানকের পাকা রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই তাহারা হাটখোলার দত্তদের অতিথিশালায় উপস্থিত হইল। দশ বছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া অতিথি হইয়াছে শুনিয়া বাড়ীর বড় কর্ত্তা ছেলেটীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার পরিচয় লইলেন। ছেলে বলিল, তাহার নাম মাণিক্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা, পিতার নাম ঠাকুর নবকিশোর শিরোমণি। নিবাস নোনাচন্নপুকুর।

কর্ত্তা শুনিয়াই বাড়ীর ভিতর খবর দিলেন—"নোনাচন্নপুকুরের নবকিশোর শিরোমণির কাল হইয়াছে। তাঁহার দশ বছরের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে।" মেয়েরা ছেলেটীকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং যথেষ্ট আদর করিলেন। সকলেই ছেলেটীকে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সে কিছুতেই খাইল না। কেন না, তাহার তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সে মিষ্টান্ন অতিথিশালায় পাঠাইয়া দিতে বলিল। ছেলেটী অতিথিশালায় যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাআহ্নিক করিল, ঠাকুরদেবতাদের নমস্কার করিল, পরে স্বপাক চড়াইয়া দিল, নিজে খাইয়া স্বরূপদাদাকে প্রসাদ দিল।

(৪)

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই ছেলেটী স্বরূপকে ডাকিয়া তুলিল, গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাআহ্নিক করিল, পরে স্বরূপদাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বার্ষিক আদায়ের জন্য প্রথম কোথায় যাওয়া যায়?" স্বরূপদাদা বলিল, "বাগবাজারে আমাদের এক স্বজাতি আছেন, তাঁহারা যাওয়া মাত্রেই বার্ষিকের টাকাটী দিয়া দেন। কর্ত্তা বলিতেন—এইখানে বার্ষিকের বউনি করিলে সেবার একটী পয়সাও অনাদায় থাকে না।"

বালকও তাহাই করিল। প্রথমেই বাগবাজারে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দেউড়ী পার হইয়াই প্রকাণ্ড উঠান ও সামনেই প্রকাণ্ড দালান। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই ছেলেটী থতমত খাইয়া গেল। একজন লোক আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাকে খোঁজ?" সে বলিল, "আমি বার্ষিক লইতে আসিয়াছি।" লোকটী বলিল, "ঐ সিঁড়ি, উপরে যাও।" সে উপরে দুই তিনটী ঘর ঘুরিয়া একটী ঘরে দেখে, একটী বাবু টেবিল পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাশে আর একটী লোক একখানি কিতাবতি খাতা দেখিতেছে। পইতা দেখিয়াই বাবুটী তাহাকে নমস্কার করিলেন, বলিলেন—"বার্ষিক চাই? বলুন, কাহার নাম, কোন্ গ্রাম?" বালক বলিলে, খাতাওয়ালা খাতা খুলিয়া বাবুর সামনে ধরিল। বাবু ছেলেটীকে বলিলেন, "এইখানে আপনি নাম সই করুন, আর এই সওয়া পাঁচ আনা পয়সা লউন।" বালক তাহাই করিল। পরে আর এক ঘর হইতে আর একখানি খাতা লইয়া আর একটী লোক আসিল। বাবু আবার বালককে সই করাইলেন, আর সওয়া পাঁচ আনা দিলেন। লোকটী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, এদের ও বাড়ীতে পাঠাইব কি?" বাবু বলিলেন—"না,—তাঁহারা ত দিতেই পারেন না। যাইতে ইঁহাদেরও কষ্ট, তাঁদেরও লজ্জা। তবে তেমন নাছোড়বান্দা লোক হইলে যাইতে বলিতাম। ইনি ত দেখিতেছি বালক।"

বালক সাড়ে দশ গণ্ডা পয়সা কোঁচার মুড়ায় বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল, এবং স্বরূপদাদাকে বলিল, "দাদা, সাড়ে দশ আনা পয়সা পাইয়াছি, এবার বোধ হয় আমাদের বউনি ভাল।"

স্বরূপদাদা তাহাকে একটু দূরে আর একটী বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ীতে বড় বড় থাম, বেশ একটী বাগান আছে ও গেট আছে। থামগুলি যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পাশেই দেওয়ানখানা। ইহারা দু'জনে সেখানে ঢুকিলেই দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও?" ছেলে বলিল, "বাবার কিছু বার্ষিক আছে।" দেওয়ানজী নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন—"বার্ষিক, তা এখন কেন? পুজার ত এখনও ঢের দেরী।" বালক—"তবে কবে আসিব?" উত্তর—"পঞ্চমী ষষ্ঠী।" বালক—"সে কি মহাশয়? আমাদের নবম্যাদি কল্পারম্ভ হইবে; পঞ্চমী ষষ্ঠীতে কি করিয়া আসিব?" দেওয়ানজী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"নবম্যাদি কল্পারম্ভ! উনি প্রায় দুর্গোৎসব করিতে যাইতেছেন, তাই নবম্যাদি কল্পারম্ভ!" তখন স্বরূপদাদা বলিল—"না মহাশয়, ওরূপ বলিবেন না। এ ছেলেটী বড় সাত্ত্বিক। ইঁহার বয়স এত অল্প হইলেও ইনি দুর্গাপুজার সব আয়োজন করিয়াছেন।" দেওয়ানজীর মেজাজ আরও গরম হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তুই কে রে? ব্যাটা শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন এস।"

দেওয়ানজীর মেজাজ একটু কড়া, বিশেষ বার্ষিক দিবার সময় মেজাজ তাঁর আরও কড়া হইয়া যায়। একথা বাড়ীর কর্ত্তা বেশ জানেন। তাই তিনি সর্ব্বদা কাণ রাখেন

—দেওয়ানজী কি করেন। উহারা দুই জন যখন গেটের বাহির হইয়া যায়, তখন কর্ত্তা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং উহাদের সব খবর শুনিলেন। শুনিয়া ছেলেটীকে সঙ্গে করিরা নিজে দেওয়ানখানায় আসিলেন ও বলিলেন, "দেওয়ানজী, এই দুধের ছেলেকে কেন তুমি মিছামিছি কষ্ট দিতেছ? দুইটা টাকা বই ত নয়, কেন মিছে ফিরাইতেছ? তুমি মনে করিতেছ, ও মিছা কথা কহিতেছে। এত অল্প বয়সে মিছা কথা কয় না, ওরা এখনও পাকে নাই।"

দেওয়ানজী কি করিবেন, অগত্যা একটী টাকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া ছেলেটীর হাতে দিলেন। কর্ত্তা তখন একটু সরিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"পাকে নাই, ঝিঁকুড় হইয়া গিয়াছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে দুই জায়গায় বার্ষিক আদায় হওয়ায়, তাহাদের দুই জনেরই একটু সাহস হইল। তাহারা শোভাবাজারে রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীর অনেক সরিক। অনেকেই বৃত্তি-বার্ষিক দিতে পারেন না, অনেকে আবার দেনও না। যাঁহারা দেন, তাঁহাদের কর্ত্তা মেজরাজা। রাজা নবকৃষ্ণের লেনে ঢুকিয়াই মাণিক দেখিল, উত্তর দিকে পাঁচিল, এক বাগান, ভিতরে একটা মস্ত বাড়ী, একটা গেট। দক্ষিণ দিকে সারি সারি দোতলা ঘর আর মেলা গলি। তাহারই একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া একটা অন্ধকার একতলা ঘরে দপ্তরখানায় উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর দেওয়ানজী মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেটীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও হে বাপু?"—"আজ্ঞে আমার বাবার কিছু বার্ষিক আছে।" "কি নাম? কোন্ গ্রাম?" দেওয়ানজী ফর্দ্দ খুলিয়া দেখিলেন, নাম ও গ্রাম ঠিক, বলিলেন, "গত বৎসর নবকিশোর শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া বার্ষিক লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সই আছে, তুমি যে বাপু তাঁহার পুত্র, তার প্রমাণ?" "আজ্ঞা, বাবার পুরাণ তল্পিদার সঙ্গে আসিয়াছে। একে আপনি আরও অনেক বার দেখিয়াছেন, এ বাবার সঙ্গে বরাবরই আসিত।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"তা হ'বেও। কিন্তু বাবু, মেজরাজা না বলিলে আমি তোমাকে বার্ষিক দিতে পারিব না। তুমি পার ত তাঁহার কাছে যাও। তিনি এই উপর ঘরে আছেন।" মাণিক উপরে উঠিয়াই প্রথমেই মেজরাজার নজরে পড়িল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ফরাসের উপর ময়লা পা কেমন করিয়া দিবে—একটু চিন্তিত হইল। রাজা বুঝিলেন ও তাহাকে আবার ডাকিলেন। তখন সে ভরসা করিয়া গিয়া রাজার কাছে বসিল।

কাছে গিয়া দেখিল, রাজার পা দু'খানি সরু, সরু, হাত দু'খানিও সরু সরু; পেটটী খুব মোটা, আর মুখখানি খুব বড়। রঙটী তাঁর ফরসা বলিলেও হয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিলেও হয়। ছেলেটী কাছে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিবাস?"

সে বলিল—"সোনাচন্দনপুকুর।" রাজা—"কে ? নবকিশোর শিরোমণির পুত্র ? তিনি আসেন নি ?" ছেলে—"তাঁর স্বর্গলাভ হইয়াছে।" রাজা—"এ্যাঁ, তাঁর বয়স কত হয়েছিল, বিয়াল্লিশের বেশী হবে না।" ছেলে—"আজ্ঞা হাঁ, এই বিয়াল্লিশই হয়েছিল।" রাজা—"কবে মারা গেলেন ?" ছেলে—"মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন।" রাজা—"আ-হা-হা, তিনি বড় ভাললোক ছিলেন। আমার এখানে সর্ব্বদাই পায়ের ধুলা দিতেন। এখন—"। ছেলে—"এখন আর কি ? জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামপূজা হ'ত। এবার পূজা হবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জন্মাষ্টমীর দিন মা কাঁদিতেছিলেন, তাই আমি কাঠামটা বার ক'রে ফেলেছি, এখন আপনাদের দ্বারে এসেছি।" রাজা—"অমন কথা বল না বাবা। তোমাদেরই ঘর, তোমাদেরই দুয়ার, আসিবে বই কি বাবা—তা বার্ষিক পেয়েছ ?" ছেলে—"আজ্ঞা, দেওয়ানজী বলিলেন, আপনার হুকুম ভিন্ন তিনি আমার নাম পত্তন করিতে পারেন না।"

এমন সময় একজন ভদ্রলোক রাজার ঘরে আসিলেন। তাঁহার আকার-প্রকার, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আসিবামাত্রই রাজা বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে। ঐ লও কাগজ-কলম—দেওয়ানজীকে একটু ফর্দ্দ লিখিয়া দাও ত। লিখ—'মাণিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা তোমার নিকট যাইতেছেন, ইঁহার পিতা নবকিশোর শিরোমণির যে বার্ষিক ছিল, ইঁহাকে দিয়া দাও'—তুমি এইটুকু লইয়া দেওয়ানজীর কাছে যাও, তিনি তোমাকে বার্ষিক দিয়া দিবেন। তুমি যেরূপে দুর্গোৎসব করিতেছ, শুনিয়া সুখী হইলাম।" পত্র দেখিয়াই দেওয়ানজী মাথায় ছোয়াইয়া ২২।৵১০ বালকটীর হাতে দিয়া বলিলেন, "একটী সই কর। আর তোমার মেজরাজার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে না।"

উহারা ফিরিয়া হাটখোলায় আসিল। সেদিন বৈকাল বেলা বৌবাজারে গিয়া দেখিল, যাহারা বার্ষিক দিত, তাহারা কেহই সেখানে নাই। বাড়ীটী ফিরিঙ্গিরা কিনিয়াছে। বাড়ী বিক্রয় হওয়ার পরে তারা যে কে কোথায় গিয়াছে—কেহই জানে না। হোগলকুঁড়ে গিয়া শুনিল, বাবুদের ভাল তালুকখানি অষ্টমে নিলাম হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রীপূজার পর আসিলে কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে। যোড়াসাঁকোতে যাহাদের বাড়ী স্বরূপদাদা লইয়া গেল, তাহাদের ঠাট সব ঠিক বজায় আছে কিন্তু ভিতরে কিছু নাই। স্বরূপদাদা অনেক পীড়াপিড়ি করায় দেওয়ানজী বার টাকার মধ্যে তিনটী টাকা দিয়া দিলেন, বলিলেন, "আর টাকার আশা নাই। তবে রাস-পূর্ণিমার সময় এস, যদি কিছু দিতে পারি।"

তাহারা হাটখোলায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যাপার কর্ত্তাকে খুলিয়া বলিল। তিনি নবকিশোর শিরোমণির যে বার্ষিক ছিল, তাহা ত দিয়াই দিলেন, উপরন্তু গিন্নীরাও পূজার জন্য সাতযোড়া লালপাড় ধুতি দিলেন।

এত টাকা আর কাপড় লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, উহারা দুজনেই হাটখোলার ঘাটে এক গহনার নৌকায় উঠিল ও পলতার ঘাটে নামিয়া চন্নপুকুর গেল।

(৫)

ছেলে যে বার্ষিক সাধিয়া আনিবে, মা ত সে ভরসা করেন নাই। সুতরাং সে যাহা আনিয়াছে তাহাতেই তাঁহার মহা আনন্দ। সে যে এক পয়সা আনিতে পারিবে, তা ত তিনি ভাবেন নাই। সে ৩০৲।৪০৲ টাকা আনিয়াছে। তিনি মনে করিলেন—এই ত মা জগদম্বার প্রথম অনুগ্রহ।

ব্রতপক্ষের পূর্ণিমার দিন মাণিক ত গুরুর বাড়ী গিয়া মন্ত্র লইয়া আসিল। গুরুদেব তাহার প্রতি সদয় হইয়া আপন এক শিষ্যকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে মাণিককে শুধু যে তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদির উপদেশ দিবে, তাহা নহে, দুর্গোৎসব ও তান্ত্রিক পূজাগুলি কিরূপে করিতে হয়, তাহাও শিখাইয়া দিবে। এ ছেলেটীরও বয়স বেশী নয়, ১৮।১৯ হইবে, লেখাপড়ায় বড় আসক্তি নাই, তবে পূজাপাঠে খুব ভাল। দুইটী ছেলে যখন গুরুর বাড়ী হইতে বাড়ী আসিল, মা ভাবিলেন, যেন মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। দুইজনে সমস্ত দিন দুর্গাপূজার পদ্ধতি পড়ে, পূজাপদ্ধতি শিখে ও শিখায়। হরিশ পুথি ধরে, মাণিক পূজা করে, কখনও বা মাণিক পুথি ধরে, হরিশ পূজা করে। এইরূপে তাহারা নবম্যাদি কল্প আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পূজা পাঠ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল। দেশে আর লোক নাই যাহাকে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে ৪।৫ ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। তথাপি একবার গিয়া গুরুদেবের কাছে তাহারা দেখাইয়া আসিল, কিরূপ শিখিয়াছে। তিনিও বলিলেন, "বেশ শিখিয়াছ।"

আজ অপর পক্ষের নবমী। আজ বেলতলায় দেবীর বোধন। দেবতারা সকলেই 'শয়নে'র সময় নিদ্রা যান। দেবীও নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বড় দরকার হইল তাঁহাকে জাগান—নহিলে রাবণ বধ হয় না। সেই অবধি অকালে দেবীর বোধন চলিয়া আসিতেছে। নবমী হইতে এই বোধন আরম্ভ হয়। পূজার সপ্তমীর দিন তিনি জাগিয়া উঠেন। আজ বোধন। হরিশ ও মাণিক পূজা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার মুখ লাগান হইয়াছে। আজ খড়ি দিবার দিন।

আজ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে একটু মত্ততার ভাব আসিয়া গিয়াছে। প্রথম মত্ত মা, তারপর মত্ত ছেলে, তারপর হরিশ, তারপর কিশোরীদাদা, তারপর স্বরূপদাদা, তারপর মত্ত শ্যাম কাকা। বোধনের বাজনা বাজিল। বাজনাদারেরা চিরকাল চাকরাণ ভুঁই খায়, তাদের না বাজাইয়া রক্ষা নাই। এই এক মাসের সব ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, উদ্যম-উৎসাহ—সব আজ সফল হইতে চলিল। আজ দেবীর বোধন। তাঁহাকে চিয়াইতে

হইবে। জাগিয়া উঠিলেই তিনি সকলের আগে এখানে আসিবেন। কেন না এত কাতর ভাবে তাঁহাকে আর কেহ ডাকে নাই। নবমীর বোধন হইতেই রোজ একরূপ করিয়া চণ্ডীপাঠ হইত; হয় হরিশ, নয় মাণিক পাঠ করিত। তাহাদের উচ্চারণ সকল সময় শুদ্ধ হইত, তা নয়; কিন্তু উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া পড়া ত ছোট কথা। তাহারা যখন ভক্তিগদগদ স্বরে পাঠ করিত, তখন লোকের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইত।

ক্রমে দুর্গার গায়ে রঙ উঠিল, রঙ শুকাইল, চালচিত্রে ঘরবাড়ী, সাজ-সজ্জা ক্রমে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাদেব সত্যসত্যই ষাঁড়ের উপর বসিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। ক্রমে ষষ্ঠীর দিন আসিয়া উপস্থিত। মায়ের মুখে গর্জ্জন-তেল মাখাইয়া দেওয়া হইল, লক্ষ্মী সরস্বতীর মুখেও দেওয়া হইল। সমস্ত প্রতিমা বেড়িয়া রাঙ্গতার সাজ দেওয়া হইল, প্রত্যেক সাজের মাথায় এক একটী পাখী বসাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিমাকে কাপড় পরান হইল। মায়ের মাথায়, লক্ষ্মী সরস্বতীর মাথায় মুকুট ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল, হাতে পায় নানারূপ গহনা পরান হইল—কত অলঙ্কার দিতে হইবে, ভক্তই জানেন। যত দাও, যা দাও, সব সাজিয়া যাইবে; কিছু দিতে না পার—তথাপি সাজিবে ভাল। সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিভূতি, কি সামান্য রাঙের গহনা দিয়া তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিব? যে পুরাণ জিনিস ভালবাসে সে মাকে পুরাণ গহনা দিয়া সাজায়, ন'নর দশ-নর হার গলায় দেয়, আর সব নবের মাঝখান দিয়া একটা ধুক্‌ধুকি ঝুলাইয়া দেয়। যে নূতন ভালবাসে, সে ইয়ারিং দেয়, চেলী দেয়, চুড়ী দেয়। কেহ বা বাউটী-সুটে সাজায়, কেহ বা বাউড়ী-সুটে সাজায়। যে যতই সাজাক, ভক্তিই প্রধান সাজ। যেখানে ভক্তি নাই, যত সাজেই সাজাও, ফাঁকা-ফাঁকা দেখায়। বোধ হয় সব আছে, কিন্তু কি যেন নাই। ভক্তি থাকিলে ঠিক দেখা যায়, কিছুই নাই, তবু যেন সবই আছে!

সকাল-সন্ধ্যায় স্তব্ধ হইয়া বাড়ীর কয়জন লোক প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, আর তাহাদের চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল বহিতে থাকে। মায়ের এখন আর সে ভয় নাই। পাছে দুর্গাবিপত্তি হয়, সে ভয় নাই; পাছে লজ্জা পাই, সে ভয় নাই; পাছে অপরাধী হই, সে ভয় নাই। সকলেই এখন বীরের মত আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে পঞ্চমীর পূর্ব্বেই গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, নবকিশোর শিরোমণির ছেলে প্রতিমা আনিয়াছে, মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে শিরোমণির বাড়ীর দিকে যত লোক সব ঝুঁকিয়া পড়িল। যাহার যে ভাল জিনিসটী ছিল, তাহারা সব আনিয়া পূজার জন্য যোগাইতে লাগিল। মা আজ রান্নায় শতহস্ত হইলেন। ছেলের শরীরে আজ দশহস্তীর বল। হরিশের কণ্ঠে সরস্বতী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিলেন। ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী অষ্টমী কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতে লাগিল। কেহ অভুক্ত রহিল

না, ভোজনে কাহারও অতৃপ্তি হইল না। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা যেন অমৃত পরিবেশন করিতেছেন। সকলে আজ অমৃত ভোজন করিতেছে।

অষ্টমী যায়, নবমী আসে ; মহাসন্ধ্যায় মহাসন্ধিস্থল, মহাসন্ধির পূজা। আজ সবই বড় বড়। নৈবেদ্য বল, বস্ত্র বল, পানীয় বল, ভোগ বল, সব বৃহদ্ব্যাপার। আজ রাশি রাশি ধূপ-ধূনা পুড়িতেছে। আজ শঙ্খ ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, কাঁসি—সব উদ্দাম শব্দ তুলিয়াছে। হরিশ আজ পূজায় বসিয়াছে, মাণিককে পুথি ধরিতেও বলে নাই। মাণিক হরিশের পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুই চামর ব্যজন করিতেছে, আর ধূপ-ধূনার ধোঁয়া মায়ের মুখের দিকে সরাইয়া দিতেছে। গর্জ্জন-তেলের উপর গরম ধোঁয়া লাগিয়া শিশিরবিন্দু জমিতেছে, বোধ হইতেছে মা সত্য সত্যই ঘামিতেছেন। পুঞ্জীকৃত ধূমরাশির মধ্যে মায়ের প্রতিমা যেন নড়িতেছে। আরতি শেষ হইল। হরিশ ঘণ্টা ফেলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। উপস্থিত সমস্ত লোক দণ্ডবৎ ভূতলে পড়িল। মা সকলের আগে উঠিলেন, দুর্গার মুখের কাছে হাত নিয়া বলিলেন, "এমনি ক'রে মা বছর বছর আসিস।"

আগমনী
পূজাবার্ষিকী, ১৩২৬

পাঁচ ছেলের গল্প

আমি আজ একটী গল্প বলিব। সেই—সেই—পুরাণ গল্প। ঠান্‌দিদিদের কাছে শোনা গল্প, তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে, তাঁরা তাঁদের ;—এই রকম ক'রে গল্প ঠান্‌দিদিতে ঠান্‌দিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। এখন ইংরেজীর চোটে ঠান্‌দিদিদের গল্প আর ভাল লাগে না, শোনাও যায় না। এই ঠান্‌দিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক। যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্ম্মার মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখনকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা। এসব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনী নাই, রকমারি নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরণী, তড়িৎ-সৌদামিনী, অমিয়ানিভা, চপলাপ্রভা প্রভৃতি একেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হা-হুতাশ নাই।

আছে শুদ্ধ একটী গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোকে পড়িত শুনিত। একালে যাঁদের ভাল না লাগে, পড়িবেন না, শুনিবেন না। গল্পটী এই :—

এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু—গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরুত পুত্র, আর কোটালের পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ী একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটীতে এক। রাজা ছেলেগুলিকে ভালবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালবাসেন, পাত্র ভালবাসেন, পুরুত ভালবাসেন, কোটালও ভালবাসেন। সকলেই পাঁচটী ছেলেকে আপনার ছেলের মত দেখেন। চাকরেরা ভালবাসে, কাছারীর লোকজন ভালবাসে, প্রজারা ভালবাসে এবং যে দেখে সে-ই ভালবাসে। কিন্তু পাঁচ জনের প্রকৃতি পাঁচ রকমের। তাঁরা পাঁচ রকম জিনিস ভাল করিয়া শিখিলেন, আপনার মনোমত জিনিস শিখিলেন। রাজপুত্র শিখিলেন পুণ্যকর্ম্ম, দান, ধ্যান, অতিথিসৎকার, সরলতা, অমায়িকতা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। গুরুপুত্র শিখিলেন বিচার করা, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্মে যাওয়া ; শিখিলেন শাস্ত্র, শিখিলেন বুদ্ধি কেমন করিয়া মাজিয়া লইতে হয় ; শিখিলেন শাস্ত্র কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুতের পুত্র শিখিলেন শিল্প, ৬৪ কলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি। পাত্রের পুত্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তিনি শিখিলেন চেহারাটা কেমন করিয়া খোলে তাই করিতে, রূপের কেমন করিয়া বাহার দিতে হয়। কোটালের পুত্র শিখিলেন কুস্তি, কসরৎ, লাঠীখেলা ইত্যাদি এবং শিখিলেন কেমন করিয়া দেহে জোর করিতে হয়, আর কেমন করিয়া সে জোর কাজে লাগান যায়।

বৌদ্ধ বইএ বলে, ইহাদের বাড়ী কাশী। ইহাদের প্রকৃতি অনুসারে নাম হইয়াছে—পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত, আর বীর্য্যবন্ত। রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড দেউড়ী, তারই ভিতরে অন্তঃপুর, হাতীশালা, ঘোড়াশালা, গোশালা, কাছারী, দেওয়ানখানা ইত্যাদি রাজার সমস্ত মহল। দেশের মধ্যে বড় রাস্তার উপর রাজার বাড়ী। একদিকে রাজার বাড়ী—আর একদিকে সব দেবমন্দির, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ একেবারে দুই তিনখানা টানা যায়। মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন, কার্ত্তিক আছেন, গণেশ আছেন, ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি আছেন। প্রত্যেক মন্দিরে ছোট-বড় নাটমন্দির, সেইখানে দেশের লোক ব'সে গল্প করে। দেবতার সামনে বসিয়া মিছা কথা বলিতে পারে না। উহারই মধ্যে একটায় পাঠশালা। রাজপুত্র প্রভৃতিরা পড়েন, লেখেন, খেলা ও গল্প করেন। গল্প করিতে করিতে একদিন কথা উঠিল, পুণ্য বড না প্রজ্ঞা বড়, না শিল্প বড়, না রূপ বড়, না বীর্য্য বড়। আপন আপন কোট কেহই ছাড়িলেন না। রাজপুত্র বলিলেন, পুণ্য বড় ; গুরুপুত্র বলিল, প্রজ্ঞা বড় ; পাত্রের পুত্র বলিল, রূপ বড় ; পুরুত-পুত্র বলিল, শিল্প বড় ; কোটালের পুত্র বলিল, বীর্য্য বড়। বিচার ত হয় না, অনেক বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল, এখানে এর বিচার হবে না, এখানে সকলে আমাদের

চেনে, পক্ষপাত করিবে। চল, আর এক ভিন্ন রাজার দেশে যাই। ঘর থেকে কেউ কিছু লইয়া যাইতে পারিবে না। যে যা উপার্জ্জন করিবে, ভাগ করিয়া খরচ চালাইব। যাইতে যাইতে তাঁহারা কাম্পিল্য নগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং পাঁচজনই আপনার গুণের পরিচয় দিয়া রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের মনের ইচ্ছা, তাঁহার গুণের পুরস্কার দেখিয়া অন্য বন্ধুরা অবাক হইয়া যাইবেন। দুপুরবেলা কোমরে গামছা জড়াইয়া পাঁচজন মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিতেছেন, সাঁতার দিতেছেন। দেখা গেল, একখানা বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বর্ষায় গঙ্গার বেগ খরতর, মাঝে মাঝে ঘূর্ণীও আছে, কেহই সে কাঠ ধরিতে যাইতে সাহস করিতেছে না। কোটালের পুত্র বলিল, "আমি যাইব," বলিয়া সাঁতার দিয়া কাঠের উপর উঠিল। তাহার পর যেমন দাঁড় বহে, হাতে-পায়ে সেইরূপ জল কাটাইয়া তাহাকে কৌশলে ডাঙ্গার কাছে আনিল এবং গায়ে অসীম জোর ছিল, উহাকে পাড়ে তুলিয়া ফেলিল। পাঁচ বন্ধুতে তখন বাহাদুরী কাঠখানাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ সুগন্ধ বাহির হইতেছে। কিসের গন্ধ? কিসের গন্ধ? চন্দনের গন্ধ। তবে এটা চন্দনের কাঠ। প্রকাণ্ড চন্দনের কাঠ নদীর পাড়ে তোলা হইয়াছে শুনিয়া কাম্পিল্যের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। গন্ধবেণেরা এমন দাঁও ছাড়া যায় না বলিয়া বীর্য্যবন্তের কাছ থেকে অল্প দামে কাঠখানি কিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া, ও "উহাকে ঠকান সহজ নয়" বুঝিয়া এক লক্ষ 'পুরাণ' নামে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল। সেও বাসায় আসিয়া আপনার বন্ধুবর্গকে ভাগ করিয়া দিল এবং একটী গাথা পড়িল—

"বীর্য্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
মানুষের বাহুবল সবার উপর॥
বীর্য্যের প্রভাবে দেখ কোটালের সুত।
আনিল প্রচুর ধন সহস্র অযুত॥"

সকলে বীর্য্যবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাহার পর শিল্পবন্তের পালা। তিনি বীণা লইয়া বন্ধুদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়া একটী মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। নগর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যত লোক কাম্পিল্য নগরে বীণা বাজাইতে পটু ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। কত অমাত্য-পুত্র আসিলেন, কত শ্রেষ্ঠী-পুত্র আসিলেন। সকলেই শিল্পবন্তকে হারাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার সাততারা বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। ছয়তার হইতেই সাততারার সমস্ত আওয়াজ ও সুর বাহির হইতে লাগিল। লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে আরও এক তার ছিঁড়িল, তবুও সেই সুর, যেন তার ছিঁড়েই

নাই। ক্রমে সব তার ছিঁড়িয়া যখন একটী মাত্র তারে ঠেকিল, তখনও সেই সাততারার সব সুর বাহির হইতে লাগিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া উহাকে 'পুরাণ' নামে টাকা ও বস্ত্র, অলঙ্কার পেলা দিতে লাগিল। সে সব পেলা কুড়াইয়া বাড়ী আসিল ও পাঁচ জনে ভাগ করিয়া লইল। সকলে খুব খুসী হইল ও গাথা গাহিল—

"শিল্পের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
শিল্পকলা মানুষের সবার উপর॥
শিল্পের প্রভাবে দেখ পুরুত-নন্দন।
আনিলেন কত ধন করি উপার্জ্জন॥"

সকলে শিল্পবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এবার রূপবন্তের পালা। তিনিও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া, অনুপম বেশ-বিন্যাস করিয়া, চকের রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। এ কোথা হইতে আসিল? এ কি "অমিয় ছানিয়া বিধি রূপ নিরমিল। তাহাতে গড়িল বরবপু"? স্ত্রীলোকরা দেখিয়াই মনে মনে স্বামি-নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল আমার এইরূপ একটী স্বামী হইলে কত ভাল হইত। তা নয়, বাবা একটা পোড়া কাঠের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছে!

যাহা হউক, চকের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র নগরের প্রধান গণিকার চোখে পড়িয়া গেলেন। সে দোতলার জানালায় বসিয়াছিল, উঁহাকে দেখিয়াই চাকরাণীকে বলিল, "তুমি যাও ঐ লোকটীকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া আইস।" তিনি দাসীর সঙ্গে গণিকার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গণিকা অমনই স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া মাথার চুল দিয়া পা মুছাইয়া দিল এবং বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি দাসীর এই খাটের উপর বসুন। আমার যা' কিছু আছে আপনি সকলেরই মালিক। আজ হইতে আমি আপনার দাসী। আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন, কৌতুক করুন, আর যাই করুন, সব আপনার স্বেচ্ছাধীন।" স্নানের ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গণিকা তাঁহাকে স্বহস্তে গন্ধতৈল মাখাইয়া দিল; নানারকম স্নান-চূর্ণ দিয়া জল সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। তাহার সুগন্ধ অনুলেপন দিয়া তাঁহার গা লেপিয়া দিল; মিহি কাপড় ও চাদর পরাইয়া তাহার মধ্যে নানারূপ ধূপের ধোঁয়া লাগাইয়া দিল। তাহার পর সে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চারি প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ঘরে আমার চারিজন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের এই সময়ে আনান আবশ্যক এবং তাঁহাদের টাকাকড়ি দেওয়া আবশ্যক।" তাহাদের ডাকা হইল। তাহারা আসিয়া সব দেখিল। তখন সে গাথা গাহিল—

"রূপের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
মানুষের রূপ হয় সবার উপর॥
দেখ রূপবন্ত গণিকার কোলে বসি।
আহরণ করিয়াছে কত ধনরাশি॥"

"তোমরা এখন এই লক্ষ টাকা লও ও খরচ কর।" তাহারা টাকা লইয়া বাসায় গেল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, এ দেশে এক মজার মামলা উপস্থিত হইয়াছে। রাজসভায় কেহই তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিতে পারিতেছেন না। ব্যাপারটী এই—একজন শ্রেষ্ঠী নগরের প্রধানা গণিকাকে এক রাত্রি তাঁহার সহিত কাটাইবার জন্য আহ্বান করেন এবং তাহাকে লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে দিন তাহাকে চান, সে দিন সে আসিয়া বলিয়া যায়, সে অন্যত্র ভাড়া লইয়াছে,—সে দিন আসিতে পারিবে না। তাহার পর দিন সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিতে হইবে? শ্রেষ্ঠী বলে, "তোমায় আর আসিতে হইবে না, আমি কাল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি।" তখন সে বলিল, "আচ্ছা, যদি আমারই সঙ্গে সারারাত কাটাইয়াছ তবে আমার ভাড়া লক্ষ টাকা দাও।" সে বলিল, "তা কেন দিব? তুমি ত অন্যত্র ছিলে, আমি তোমায় দক্ষিণা কেন দিব?" জবাব হইল, "তুমি ত আমাকেই পাইয়াছিলে, আমার প্রাপ্য আমায় দিবে না কেন?" তখন দু' পক্ষই রাজার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল। রাজা ও রাজার সভাসদ্‌গণ কেহই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছেন না এবং যে পারিবে তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই পক্ষই রোজ দরবারে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু কিছুই হইতেছে না।

শুনিয়া প্রজ্ঞাবন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। একজন তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সৎকার করিয়া বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দিলেন। তিনি বসিয়া আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা এই কঠিন মোকর্দ্দমার কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তিনি যদি ইহার কিনারা করিয়া দিতে পারেন, পুরস্কার দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত আছে?" রাজা বলিলেন, "আছে।" তিনি তাহাদের সামনা-সামনি দাঁড় করাইয়া তাহাদের ব্যবহার শুনিলেন। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিতেছে, তখন সাক্ষী-সাবুদের দরকার নাই। তিনি গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "তুমি এক লক্ষ টাকা এখানে রাখ।" আর মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, একখানা বড় আরসী আনাইয়া এইখানে রাখিবার আজ্ঞা হউক।"

বলিবামাত্রই দুই জিনিস আসিয়া পৌঁছিল। তিনি গণিকাকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "দেখ, শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে তোমার আবছায়া উপভোগ করিয়াছেন। তুমি যে তাহার ভাড়া বা দক্ষিণাস্বরূপ সত্যকার টাকা চাহিতেছ, তাহা হইতেই পারে না। তুমি এই আরসীর মধ্যে ঐ লক্ষ টাকার যে আবছায়া আছে, তাই তোমার দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ কর।" এই নিষ্পত্তিতে রাজসভায় একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এমন বিচার করিতে পারিতেন না।" কেহ বলিল, "বোধ হয়, রাজার বিপদে স্বয়ং বৃহস্পতি স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন।" রাজা মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা ত দিলেনই, আর তাহার উপরও কিছু দিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এত সহজে এমন মামলার বিচার হইবে। উদ্ধার পাইয়া শ্রেষ্ঠী বলিল, "আপনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন, এ লক্ষ টাকা আপনারই, আমি আর উহা বাড়ী লইয়া যাইব না।"

সমস্ত ধন-রত্ন লইয়া প্রজ্ঞাবন্ত তাঁহার বন্ধুদিগকে বাঁটিয়া দিলেন এবং গাথা গাহিলেন—

> "প্রজ্ঞার প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
> প্রজ্ঞা মানুষের হয় সবার উপর॥
> ঐ দেখ প্রজ্ঞাবন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া।
> রাশীকৃত ধন-রত্ন দিলেক আনিয়া।"

এবার রাজপুত্রের পালা। তিনিও বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া রাজবাড়ীর নিকট এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাজার এক অমাত্যপুত্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়াই অমাত্যপুত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে লইয়া আখড়ায় গেলেন, নানারূপ কুস্তী-খেলার পর তাঁহাকে লইয়া স্নানাগারে গেলেন, সেখানে স্নান করাইয়া অনুলেপন মাখাইয়া শরীর ধূপ দিয়া সুগন্ধ করাইয়া রাজপুত্রকে আহারে বসাইলেন। সে আহার ত রাজভোগ। আহারাদির পর অমাত্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া রাজার যানশালায় একটী সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনিও একখানি যান লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপুত্র উঠিলেই "তাঁহার সহিত কথা কহিয়া যাইব" ভাবিয়া "এই উঠেন, এই উঠেন" করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি যানশালা হইতে যানে চড়িয়া ঘরে যায়েন, তখন অমাত্যেরা ভাবিলেন, "এ কি? রাজকন্যা রাত্রিতে যানশালায় ছিলেন কেন?" খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন দেখা গেল। দেখিয়াই অমাত্যগণ তাঁহাকে রাজার কাছে লইয়া গেল এবং কন্যান্তঃপুরদূষক বলিয়া অভিযোগ করিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, অমাত্য-পুত্র আমায় যানশালায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,

আমি তথায় আর কাহাকেও দেখি নাই।" রাজকন্যাও সেইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। অমাত্যপুত্রও সব কথা খুলিয়া বলিল। রাজার বোধ হইল, আসামী নির্দ্দোষ। তিনি উঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উনি বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র, দেশভ্রমণে এখানে আসিয়াছি।" রাজা অপুত্রক ছিলেন, ঐ কন্যাটীই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার পুত্র হও ও আমার এই বিস্তীর্ণ রাজত্ব তোমার হউক।" পুণ্যবন্ত রাজা হইয়া আপন বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—

"পুণ্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
নরলোকে নাহি কিছু পুণ্যের উপর॥
এই দেখ পুণ্যবলে আমি পুণ্যবন্ত।
পাইলাম রাজ্য যার নাই সীমা-অন্ত॥"

এইরূপে পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কারে অন্য অন্য বন্ধুগণকে তাক করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন, পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য্য ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা যায় না। সকলই মানুষের কাজে আইসে এবং সকলেরই সময়ে সময়ে প্রচুর পুরস্কার হয়।

বৌদ্ধ গল্পে বলিল, ঐ যে রাজপুত্র পুণ্যের জোরে কাম্পিল্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উনিই অনেক জন্মের পর হইয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র ও কপিল-বাস্তবাসী। যিনি সে জন্মে বীর্য্যবন্ত ছিলেন, বুদ্ধের সময় তিনি শোণক হইয়াছিলেন; যিনি শিল্পবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন রাষ্ট্রপাল; যিনি রূপবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন সুন্দরনন্দ। আর যিনি প্রজ্ঞাবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন শারিপুত্র। যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষ তাঁহারাই এই সকল জাতকের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, তাহার জন্য আমার আর বাক্যব্যয় করা বৃথা।

বার্ষিক বসুমতী
পূজাবার্ষিকী, ১৩৩৩

ব্যনোগী টিব্বা

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটীতে মুসুরী গিয়া বাজারের পুবগায় একটী ছোট দোতলা বাড়ীতে আশ্রয় পাই। বাড়ীর মালিক আমার আত্মীয়; সুতরাং সেখানে থাকার কোনও কষ্ট ছিল না। তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিলাম, সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এত পরিষ্কার থাক কেমন করিয়া? তাঁহারা বলিলেন, না থাকিয়া করি কি? ময়লা হইলেই পিসু হয়। ছারপোকার চেয়ে পিসু অনেক বেশী কষ্টকর। ছারপোকা মারিলে মরে, পিসুর গায়ে খোলা আছে, টিপিলে মরে না, আর তার কামড়ও খুব কঠিন। যে ঘরটীতে আমি থাকিতাম, তাহার পুবদিকে জানালা ছিল, খুলিলেই একটী খড্, কত গভীর বলা যায় না। তাহারও ওপারে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—এক সারি দু'সারি। তারপর, তারপর, না কি, দূরে—অনেক দূরে বরফের পাহাড় দেখা যায়। কিন্তু আকাশ হয় ধূম নয় ধূলায় আচ্ছন্ন থাকায় দেখা যায় না। এখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা—বরফের পাহাড় দেখি। বাড়ী বসিয়া দেখিতে পাইব বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ত হইল না। আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম এবং সকলকে আমার দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আচ্ছা, যদি সত্যই বরফের পাহাড় দেখিতে চাও, তবে চল, একদিন ব্যনোগী টিব্বায় যাই। সেটা ১১ হাজার ফুট উঁচু। সেখানে এত ধূমও নাই, এত ধূলাও নাই। আর সেখানে বাঙ্গালীদের একটা মস্ত কীর্ত্তিও আছে।

শুনিয়া অবধি ব্যনোগী টিব্বায় যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। একদিন রাত্রি ৪ টার সময় উঠিয়া আমরা চারি পাঁচ জন, কেহ ডাণ্ডিতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া যাত্রা করিলাম। সেই সকালে একপেট যা হয় তাই খাইয়া লইলাম। আর যত খাইলাম, তাহার দ্বিগুণ খাবার সঙ্গে লইলাম। কারণ পাহাড়ে হাঁটিতে ক্ষুধা খুব বেশী হয়। রাস্তায় কিছু পাওয়া যায় না। বাজারের উত্তম মুড়ার ঠিক পিছনে পুবের দিকে আমাদের বাড়ী, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটী সাঁকো, সাঁকোর ঠিক সম্মুখেই মুসুরীর লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর পুব ধার দিয়া একটু গিয়াই আমাদিগকে একটা চড়াই উঠিতে হইল। চড়াইটা শতখানেক ফুট হইবে। তাহার পর একটা

পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া রাস্তা, রাস্তাটা বেশ চাটাল—বরাবর সমান। প্রায় সাত মাইল চলিয়া গিয়াছে সোজা পশ্চিম মুখ। আমার মনটা খুব খুসী হইল—একবারে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যাইতেছি। মুসুরীর সীমানা পার হইয়া আর বাড়ী-ঘর কিছুই নাই। পূবের দিকে খড্ আর পশ্চিমের দিকে একটা বেড়া। বেড়া গোলাপ গাছের। হলদে হলদে গোলাপ ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া আছে। বেড়া কত মাইল, মনে নাই—তবে ২।৩ মাইল হইবে। বেড়ার ওধারে বাগান, তাহার অপর সীমা অনেক দূরে—অনেক নীচে। এই বেড়ায় ঘেরা বাগানটী শুনিলাম দেরাদুনের উইলিয়ম 'সাহেবের'। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা দিল্লীর শেষ বাদশা সাহ আলমের সময় দিল্লী ও আগ্রা সুবার অনেক অংশ দখল করিয়া স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। এখন অনেকগুলি 'সাহেবই' ঐ দুই সুবায় ২।১০ লাখ টাকার জমী দখল করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে টমাস 'সাহেব' একজন, জর্জ্জ 'সাহেব' একজন, হার্সে 'সাহেব' এক-জন, সমরু 'সাহেব' একজন। সমরুর স্ত্রী বেগম সমরু রীতিমত রেজিমেণ্ট রাখিয়া নিজেই রাজত্ব করিতেন। আপনার সৈন্যসামন্ত শুদ্ধ সমস্ত রাজ্য বাড়ী-ঘর সমস্ত ইংরেজদের দিয়া গিয়াছেন। উইলিয়ম 'সাহেবের' পূর্ব্বপুরুষও এইরূপ হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিতেন। ইংরেজরা দেরাদুন দখল করিলে সেখানেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা বাড়ী-ঘর-দুয়ার বাগান সব করিয়াছিলেন। পাহাড়ের গায়ে যে প্রকাণ্ড বাগান, সেটী তাঁহার। আমাদের দেশের বাগান যেমন সমতল জমীর উপর চারিদিকে ঘেরা, এ সেরূপ নহে। জমী বিষম ঢালু, বাগানটী যেন কাত হইয়া রহিয়াছে। বাগানের ভিতর শীতের দেশের সব রকম গাছ আছে। আকরোট, নাস্পাতি, আলু-বোখারা, অঞ্জির, তিমলা প্রভৃতি ফলের গাছ, বাঁচ বোঁরাশ, সরলা, দেওদার ইত্যাদি বাহাদুরী কাঠের গাছ, নানারকম লতা—কেহ বা গাছে জড়াইয়া আছে, কেহ বা জমীতে খেলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ভূর্জ্জপত্রের গাছ—পাখীতে ঠোকরাইয়া উপরকার ছালে গর্ত্ত করিয়াছে, ভিতরকার ছাল টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই ভিতরকার ছালের নামই ভূর্জ্জপত্র। কতকটা বা গাছে লাগিয়া আছে, কতকটা বা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। আমরা বেড়ার বাহির হইতে বাগানের শোভা দেখিতেছি। আমরা বেড়ার বাহিরে রাস্তায়ই আছি। আমাদের দক্ষিণে কোনরূপ বেড়া নাই, কিন্তু বিশেষ অসাবধান হইলে গড়াইয়া একেবারে ৩।৪ হাজার ফুট নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ততটা অসাবধান কিন্তু আমরা হই নাই। আমাদের রাস্তাটী—বাঁকা নয়, পায়ে চলা রাস্তা, মাঝে মাঝে উঁচু আছে। উঁচুর উপর ঘাসও জন্মিয়াছে। বাঙ্গালার মাঠে পায়ে চলা রাস্তা যেমন, ইহাও ঠিক তাই। কিন্তু রাস্তায় অনেক দেওদারের গাছ। দেওদারের গাছ সরলা গাছেরই মত। দেওদারের গাছ আমি পূর্ব্বে দেখি নাই—এই প্রথম। দুই-ই ঝাউ জাতীয় গাছ—ইংরেজীতে ফার বলে। পাতা এক একটী সরল রেখা।

দুইয়ের পাতাই থোকা থোকা হয়। সরলার রং সোণার মত। দেওদারের রং কাল, কিন্তু কেলোর মত গাঢ় নয়। কেলো এই জাতীয় গাছ। মুসুরীতে তখন দেখি নাই, সিমলায় অনেক আছে। সরলা ৩০।৪০ ফুট না উঠিলে তাহার ডাল বাহির হয় না; কিন্তু দেওদার দুমানুষ-ভোর হইবার আগেই ডালে ভরিয়া যায়। সরলার ডাল ফাঁক ফাঁক, কিন্তু দেওদারের ডাল ঘন; সেইজন্য দেওদারের গাছের মাথায় ঝোপ ঝোপ বলিয়া বোধ হয়। সরলায় ঝোপ ত থাকেই না, বেশ তফাৎ তফাৎ—দেখিতে ঠিক ঝাড়ের মত। বিজলী বাতির কল্যাণে আমাদের দেশের লোক সেকালের বেলোয়ারের ঝাড় ভুলিয়া গিয়াছে। বেলোয়ারের ঝাড়ের যেমন নীচে বড় বড় ডাল ও প্রত্যেক ডালের মাথায় ২।৩টী করিয়া বাতি; যত উপরে উঠিতে থাকিবে, ডালগুলি তত ছোট হইয়া আসিবে; কিন্তু বাতি নীচেও যে কটা, উপরেও সে কটা থাকিবে, আর সকলের উপর ডাল নাই; একটী মাত্র ফানুস, তাতে একটী বাতি; সমস্তটা দেখিতে ঠিক মোচার আগার মত; সরলা গাছেও ঠিক তাই। ৩০।৪০ ফুটের উপর এক জায়গা হইতে বড় বড় ডাল বাহির হইল—প্রত্যেক ডাল হইতে কতকগুলি ফেঁকড়ী বাহির হইল, প্রত্যেক ফেঁকড়ীর মাথায় একগোছা করিয়া পাতা। পাতাগুলি লম্বা, সরু এবং রেখার আকার। সরলার গাছকে অনেক জায়গায় ঝাড়ের গাছ বলে।

বেলা হইতে লাগিল—রৌদ্র উঠিল। আমরা দেবদারুর তলায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া রৌদ্রের হাত এড়াইতে লাগিলাম ও হাঁপ ছাড়িতে লাগিলাম। সমতল দেশে বাস, যেদিকে চাই সমতল দেখিতে পাই; আমাদের পক্ষে সাড়ে ছ হাজার ফুট একটী পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া চলিয়া বেড়ানই একটী আশ্চর্য্য জিনিস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সমতল দেশের লোক, আমাদের চারিটা বই দিক নাই —উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম। কিন্তু পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, আর দুইটা দিক বাহির হইল। উপর আর নীচে। আমরা এত উপরে উঠিয়াছি যে আমাদের আর উপরে দিক নাই, কেবল নীচে দিক; ডাইনেও নীচে, বাঁয়েও নীচে। উইলিয়ম 'সাহেবে'র বাগান অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে আমরা মুসুরীর পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যে সাত মাইল পথ আসিবার কথা, তাহার শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন আমাদের নামিতে হইবে। নামিবার জন্য 'সাহেবরা' যে রাস্তা করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনেক জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং নামা বেশ কষ্ট ও বিপদের কথা হইয়াছে। পাহাড়ে নামার পথকে পাকডাণ্ডী বলে এবং এক ঢালুও নয় এক গোড়েনও নয়। একবার খানিক গোড়েন ধরিয়া নামিয়া আসিলাম, এক জায়গায় দাঁড়াইলাম, আবার উল্টাদিকে গোড়েন ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। এই রূপ হয়ত ২ শত ফুট চলিয়া মাত্র ২০ ফুট নামিলাম।

এখন মনে করুন ৩ হাজার ফুট নামিতে হইলে কিরূপ পাক খাইতে হইবে। ইহার মধ্যে আবার যদি কোথাও পাথর বা পাথরের ঢিপি থাকে, কষ্ট আরও বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ উপরে ছিলাম, ঢালুর অবস্থা এমনই ছিল যে পা বেশ চলিতে পারে। যতই নীচে নামিতে লাগিলাম, ততই ঢালুর খাড়াই বাড়িতে লাগিল; নামা কষ্টকর হইতে লাগিল। যাই হউক, সাড়ে আটটা নটার সময় আমরা যতদূর নামিবার নামিয়া আসিয়াছি, আর নামিতে হইবে না, সামনেই এক নদী। নদীতে একবিন্দু জল নাই, কিন্তু তাহার খাতে কোন গাছপালা এমন কি ঘাসও নাই। নদীর খোলা কত চটালো, কত গহেরা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

খাত পার হইয়াই আমাদিগকে উঠিতে হইল। ব্যনোগী টিব্বাটী শুনিয়াছি সমুদ্রের জল হইতে ১১ হাজার ফুট উঁচু। আমরা মুস্রীতে যেখানে ছিলাম, সেটা সাড়ে ছ হাজার, নামিয়াছি তিন হাজার; সুতরাং আমাদের এখনও আট হাজার ফুট উঠিতে হইবে। পাহাড়ে উঠায় তত ভয় নাই, একটু পরিশ্রম হয়, একটু শ্বাস লইতে হয়, একটু হাঁপ ছাড়িতে হয়; কিন্তু পড়িয়া মরিবার ভয় হয় না। নামিবার সময় মহা মুস্কিল:—পরিশ্রম অত হয় না, হাঁপ ছাড়িতে হয় না, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, এইবার পড়িয়া যাইব। হয় সামনে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইব, না হয় পাশে একেবারে খড়ের ভিতর পড়িয়া যাইব।

ব্যনোগী টিব্বার গা দিয়া উপরে উঠিবার যে রাস্তাটী ছিল, সেটী বেশ ঢালু। আমরা স্বচ্ছন্দে উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে মেলা পাক খাইতে হয় না, কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগ উঠিয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। পাহাড়ের খানিক ধ্বস্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রায় ২ শত ফুট রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেটুকু পার হওয়া যায় কি করিয়া? ২ শত ফুট বই ত নয়, সোজাসুজি চলিয়াই যাই। কিন্তু একটী পা দিয়াই দেখি, বজরী অর্থাৎ কুচো কুচো পাথর। পা দিলেই পা হড়কাইয়া যায়। একবার হড়কাইলে কোথায় যাইব ঠিক নাই; কিন্তু ইহজগতে যে থাকিব না, সেটা ঠিক। সুতরাং পা'টী তুলিয়াই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। শেষ স্থির হইল, পাহাড়ের গায়ে যে ঘাস থাকে সেগুলি খুব শক্ত, কিছুতেই ছিঁড়ে না, হাত দিয়া সেই ঘাসের মুটা ধরিয়া হয় হামাগুড়ি দিয়া, না হয়, পায়ে চলিয়া, যেখানে ধ্বস্ ভাঙ্গিয়াছে তাহার ৫০ ফুট উপর দিয়া এই দুই শত ফুট পার হইতে হইবে। সেই ভাবেই আমরা পার হইলাম। খুব উপরে গিয়া আর এক বিপদ। সেখানে কেবল পাথর, তাহা কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী হয় নাই। সেই পাথরের উপর দিয়া গিয়া আমরা কষ্টেস্বষ্টে ব্যনোগী টিব্বার মাথায় চড়িলাম। মাথাটী বিঘা দুই জমী হইবে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, মাঝখানটা একটু নীচু, পূবে একটু বেশী উঁচু, পশ্চিমে একটু কম নীচু। পূবের উঁচু জায়গায় পূর্ব্বে কয়েকখানি ঘর ছিল। ঘরগুলির দেয়াল

পাথরের—বালি ধরান—চুনকাম করা। ছাদ ছিল টিনের—উড়িয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর যে যখন আসিয়াছে, কয়লা দিয়া নাম লিখিয়া গিয়াছে। অনেক নাম লেখা আছে, আমরাও আমাদের নাম কয়লা দিয়া লিখিয়া রাখিলাম।

শুনিলাম, এই ঘরগুলি রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের তারা-ঘর (observatory) ছিল। তিনি এইখানে অনেক দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রথম আমলের হিন্দু কলেজে যে সকল ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার সকলের চেয়ে বড়। তিনি প্রথম হইতেই সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসে ঢুকিয়াছিলেন এবং খুব উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বেতন ৮ শত টাকা হইয়াছিল। তখনকার কালে ৮ শত টাকা বেতন—বিশেষ বাঙ্গালীর পক্ষে খুব বড় মাহিনা। রাধানাথ শিকদার জরীপের এক নূতন রীতি বাহির করিয়াছিলেন। তাহা অনেক দিন তাঁহার নামে চলিয়াছিল, এখন অনেক হাত বদল হইয়া তাহা রেট্রেসেস্ মেথড হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু সুস্থ হইয়া, একটু জল মুখে দিয়া, ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে যাহা দেখিলাম—তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বোধ হয় মানুষের নাই। বেলা তখন ১২টা। উত্তর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, বরফের পাহাড় দূরে, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল নিকটে। উত্তর-পশ্চিম কোণে কুলুর পাহাড়—সব বরফ; কিন্তু শীতকাল হইলে যেমন রাশীকৃত বরফ হয়, একেবারে ফাঁক থাকে না, এ সে রকম নহে। অনেক জায়গাই ফাঁক হইয়া গিয়াছে—বরফ গলিয়া গিয়াছে—অথবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে বরফ আছে, সেখানে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে; আর যেখানে নাই, সেখানে একেবারে অন্ধকার। হয়ত আবার একটু পাশেই সামান্য বরফের উপর একটু সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে মাত্র, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। উত্তর-পূর্ব্বে ধবলাগিরি। তত গ্রীষ্মকালেও বরফের রাশি ত্রিভুজাকারে আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। কিন্তু অনেক দূর একটু ম্লান বোধ হইতেছে। সংস্কৃত কবিরা যে বলেন, রাজাদের বাড়ীগুলা মেঘ ভেদ করিয়া উঠে, মেঘ চাটে—ধবলাগিরি দেখিলে একটু একটু তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়। ধবলাগিরির শিখর মেঘরাজ্যেরও উপরে—তিনি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছেন। কুলুর পাহাড় হইতে ধবলাগিরি পর্য্যন্ত যে সকল ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহাতে কত বিচিত্র বিচিত্র রংই যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারা ধবলাগিরি বা কুলুর পাহাড়ের মত উচ্চও নহে, প্রকাণ্ডও নহে এবং মাথা ঘুরাইয়া দিবার মতও নহে। একটী জিনিস কিন্তু সর্ব্বত্রই আছে। শোভাটা সব জায়গায়ই আছে, আর সে শোভা অত্যন্ত মনোলোভা। আর একটী জিনিস রঙের বাহার। কোথাও সাদার উপর লালের আভা, কোথাও লালের উপর সাদার আভা। কোথাও আভাটা ঘন, কোথাও ফিঁকে, কোথাও চকচকে, আবার কোথাও ম্যাড়্‌মেড়ে। আমার

কাছে অতি চমৎকারই বোধ হইল। কারণ, আমি ঐ দেখিতেই গিয়াছিলাম এবং এত দিন দেখিতে পাই নাই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও—আর সময় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিক দেখিয়া লইতে হইবে, তাই উত্তর দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলাম। পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখি, মুসুরী, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি পাহাড় হইতে আমরা অনেক উঁচুতে। মুসুরীর সকলের উঁচু যে শিখর —নাম লালটিব্বা, সেটীও একটী ছোট টিপি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিকে চক্ষু ফিরাইবার পূর্ব্বে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি ও বরফের মধ্যে পাহাড় যেখানে আছে, ইহার মধ্যে অগণ্য ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—অনেক নীচে বোধ হইতে লাগিল, যেন লাঙ্গলের ফাল দিয়া জমীটা চষিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়গুলা উঁচু মাটী আর নদীগুলা লাঙ্গলের ফালের দাগ। অথবা যেন সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা লম্বালম্বি দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু ফাটিতেছে না. ফেনা হইতেছে না। এই যে ঢেউ-খেলান জমী, ইহার নাম গড়োয়াল। এখানে গ্রাম আছে, নগর আছে, বাজার আছে, হাট আছে, মাঠ আছে, বাট আছে; এখানেও খাজানা আদায় হয়, গোমস্তারা খাজানা আদায় করে। খেরে টাকা আদায় না করিতে পারিলে তারা হাজতে যায়।

পূবের দিকে পাহাডগুলা উঁচু উঁচু—ঠিক যেন নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। কেবল চূড়ার উপর চূড়া। এখানেও গ্রাম নগর সবই আছে। যেখানে সরলা ও দেবদারুর বন আছে, সেগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। একটা একটা গাছই দেখিতে কত সুন্দর! যেখানে ঝাঁক বাঁধিয়া ঐ সব গাছ হইয়াছে, সেখানে আরও সুন্দর। আবার যেখানে পর্ব্বতের গায়ে হইয়াছে, ক্রমে উপর হইতে নীচে নামিতেছে, সেখানে ত একবারে চমৎকার! আমায় এইরূপ একটী সরলার বনে দিনকতক বাস করিতে হইয়াছিল। একটা ছুরি বা পেরেক দিয়া সরলার গাছে একটী লম্বালম্বি দাগ দিলেই উহা হইতে এক রকম রস বাহির হইত এবং তাহার গন্ধে বাড়ীটা তর্ হইয়া উঠিত। ঐ পাতলা রসই ঘন হইয়া গন্ধবিরজা হয় এবং বাজারে বিক্রয় হয়।

পূবদিকেও যেমন দেখিলাম, পশ্চিমেও তেমনই পর্ব্বতের পর পর্ব্বত বরাবর পঞ্জাব পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ দিক অতি সুন্দর। নিকটেই মুসুরীর সারি সারি পাহাড়—সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচু। এই সব পাহাড়ের আড়াল হওয়ায় দেরাহুনটা আমরা দেখিতে পাইলাম না, শিবালিক পর্ব্বতও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু শিবালিকের দক্ষিণ দিকে বরাবর ধূ ধূ করিতেছে। দেরাহুন হইতে ৫৩ মাইল সাহারাণপুর। সাহারাণপুর বেশ দেখা যাইতে লাগিল। রেলগাড়ীগুলি পিঁপড়ের সারির মত পূবদিক হইতে আসিয়া উইয়ের টিপির মত একটী ষ্টেশনে থামিল—খানিক থামিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। চোখ টানিয়া টানিয়া আরও দূরে—আরও দূরে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ একটা আলো চোখে লাগিল। তত দূর হইতে কিসের আলো

আসে, আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। একজন জরিপ মহালের লোক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন, দিল্লীর জুম্মা মসজেদের সার্সির উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে, তাই ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। বিশ্বাস হইল না, কিন্তু মনে করিলাম, হবেও বা।

আমরা এইরূপে পর্ব্বতের শোভা দেখিতে নিমগ্ন আছি, এমন সময় আমাদের এক ঘোর শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চিম দিক হইতে হাওয়া উঠিল। অত উপরে হাওয়া, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসিল ধূম ও ধূলা। পাহাড়ে ধুন্ধুলা বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাহাড়ে ছটা দিক আছে—সব দিকই ধুন্ধুলায় ভরিয়া গেল। এতক্ষণ একতানমনপ্রাণে যাহা দেখিতেছিলাম, তাহার আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা বিষাদে মগ্ন হইয়া গেলাম। ধুন্ধুলা শীঘ্র ছাড়িবে না বুঝিয়া নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নামিবার সময় অত হাঁপও লাগে না, পরিশ্রমও হয় না, আর ঘামও বাহির হয় না। যেখানে কোন বিপদ নাই, সেই রকম জায়গায় পা ছাড়িয়া দিলেই হয়, আপনিই নামিয়া আসে। যেখানে বিপদ আছে, সেখানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হয়। কারণ, গড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময় এক রকম লাঠী পাওয়া যাইত, তাহার সবটাই খুব শক্ত এক রকম বাঁশের আর নীচে এক রকম ছুঁচাল লোহা খুব শক্ত করিয়া আঁটা। সে লাঠী হাতে থাকিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম হইত; কিন্তু এখন সে লাঠী আর পাওয়া যায় না; তিনি আর্‌ম্‌স্‌ একৃটে পড়িয়া চম্পট দিয়াছেন।

আমরা নামিতে লাগিলাম। যেখানে ধ্বস্‌ ভাঙ্গিয়াছিল, উঠিবার সময় যেখানে খুব কষ্ট পাইয়াছিলাম, সেখানে প্রাণ হাতে করিয়া নামিলাম। ক্রমে ক্রমে আসিয়া নীচের নদীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় বলিতে ভুলিয়াছিলাম, নদীর ঠিক মাঝখানে একটা মোচার আকার পাহাড় আছে, তাহা ৩০।৪০ ফুট উঁচু হইবে। তাহার মাথায় একটা আকরোট গাছ। আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুই হাজার ফুটের উপরে উঠিয়া মুসুরীর রাস্তা পাইলাম আর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলাম। সেই সরলার গাছ, সেই দেওদারের গাছ, সেই উইলিয়ম 'সাহেবের' বাগানের বেড়া, সেই মুসুরীর লাইব্রেরী, সেই লাইব্রেরীর সামনে সাঁকো। তারপর মুসুরীর বাজার, বাজারের পিছনে আমাদের বাটী। রাত্রি ৯টা হইয়াছিল, কিন্তু বেশ চাঁদিনীর আলো ছিল। রাস্তায়ও অন্ধকার হয় নাই, বাটীতেও অন্ধকার হয় নাই, কিন্তু রাত চারিটা হইতে যুঝিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বার্ষিক বসুমতী
পূজাবার্ষিকী, ১৩৩৪

[লাইব্রেরী]*

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন কালি ছিল না, কলম ছিল না, কাগজ ছিল না, তালপাতা ছিল না, লেখবার কোন সরঞ্জামই ছিল না; কিন্তু লোকে তখনও জ্ঞান উপার্জ্জন করিত এবং যাহারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিত তাহারাই দেশে মান্য গণ্য হইত। সে জ্ঞান তাহাদিগকে মুখে মুখে অর্জ্জন করিতে হইত। তাই ছেলে আট বৎসর হইতে না হইতেই বাপ মা তাহাকে গুরুর বাড়ী রাখিয়া আসিত। এই রাখিয়া আসার নাম উপনয়ন। ছেলে সেখানে ৯ বছর, ১৮ বছর, ২৭ বছর এবং ৩৬ বছর থাকিয়া সেকালের যত জ্ঞান ছিল সব মুখস্থ করিয়া আনিত। বাড়ীতে ফিরিবার সময় গুরুর অনুমতি লইয়া তাহাকে স্নান করিতে হইত, এ জন্য তাহাকে স্নাতক বলিত। একজন স্নাতক ব্রাহ্মণকে নিজের দেশে বসাইবার জন্য রাজা রাজড়ারা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এই ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের আরম্ভ হয়। ইংরেজীতে সাহিত্যকে Literature বলে, অর্থাৎ যাহা কিছু লেখা হয় তাহা সাহিত্য। আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি—বাঙ্ময়। যাহা কিছু বলা হয় তাহারই নাম সাহিত্য,—তা তুমি মুখেই বল আর লিখেই বল।

স্মৃতি-শক্তির উপর অতি মাত্রায় আস্থা থাকায় এবং স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি করিবার নানারূপ চেষ্টা করায়, ভারতবর্ষে পুস্তকালয় বলিয়া একটা জিনিস বড় বাড়িতে পারে নাই। যীশু খ্রীষ্টের পর ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত। শুধু বেদ নয় তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ, যত বেদ লক্ষণ সব মুখে মুখে থাকিত। লিখিলে পাপ হইত। জৈন ও বৌদ্ধদেরও শাস্ত্র মুখে মুখে থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময় জৈনরা আপনাদের শাস্ত্রগুলিকে কলম-বন্দী করিতে চায়। বুড়ো যতীদের ধরিয়া বারটার মধ্যে ১০টা পূর্ব্বেই তাহারা লিখাইয়া লয়। আর দুটা কাহারও মুখস্থ ছিল না। এক বৃদ্ধ যতীর মুখস্থ ছিল, তিনি ছিলেন নেপালের। তিনি সেই নন্দরাজাদের সময়ের লোক। পাটনা হইতে তাঁহার কাছে এক deputation যায়। তিনি মুখে মুখে বলিয়া দেন,

* শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত 'লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা-বিস্তার' (বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত) নামক পুস্তকের 'মুখ-বন্ধ' রূপে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধটী লিখেন। আমরা 'লাইব্রেরী' এই শিরোনামা দিয়া প্রবন্ধটী এখানে মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক—।

deputation লিখিয়া আনেন। যীশু খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পরে ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন—বৌদ্ধ-পুথি সংগ্রহের জন্য। আসিয়া দেখেন পুথি নাই। তিনি বিপন্ন হইয়া পড়েন। লোকে তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—তুমি বুড়ো থেরাদের কাছে যাও। তিনি তাহাদের মুখ হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্র সব লিখাইয়া লইয়া যান।

ভারতবর্ষের এরূপ অবস্থা হইলেও, পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের লেখার একটা ব্যবস্থা ছিল। মিশর, আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া, কালডিয়া দেশে লিখিবার নানা উপায় ছিল। মিশরে পাতরের উপর ছবি আঁকিত, সেই ছবিতে লেখা হইত। এঁটেলা মাটী শুকাইয়া লইয়া, তাহাতে তীরের মত দাগ কাটিয়া আসিরিয়ানরা লিখিত। চীনেদের লেখাও ছবি দিয়ে হইত। আসিরিয়ায় মাটীর নোড়া একটা বড় ঘরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতে আসিরিয়ার সমস্ত সাহিত্য পাওয়া যায়। প্রায় চল্লিশ ফিট মাটীর নীচে এ হলটী চাপা পড়িয়াছিল। উহাতে মহাকাব্য ছিল, রাজাদের হিসাব পত্র ছিল, সন্ধি বিগ্রহের নোড়া ছিল, এমন কি দু তিন খানা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অভিধানও ছিল। এ সব যীশু খ্রীষ্টের দু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ভারতবর্ষে এরূপ নোড়া আজও বাহির হয় নাই। কিন্তু হরপ্পা আর মহেঞ্জো-দারোতে একরকম পাতরের অক্ষর বাহির হইয়াছে, তাহা ঐ সকল অক্ষরের চেয়ে পুরাণ হইবার কথা। আমরা এখন ঐ সব কথা কিছু বলিতে পারি না। কারণ মার্শাল সাহেব সে সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন। তাঁহার বই যতদিন না বাহির হয়, ততদিন তিনি অন্য কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না। সে ত অনেক প্রাচীন কথা। কিন্তু আমাদের দেশেও ত লেখা বলে একটা জিনিস ছিল। ব্যবসাদারেরা লেখা ভিন্ন কাজ করিতে পারিত না। রাজাদের আয়ব্যয় লেখাপড়া না হইলে চলিত না। দলিল লিখিতে হইত, চিঠি পত্র লিখিতে হইত, সন্ধি করিতে হইত, সুতরাং লেখাটা যীশু খ্রীষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেশ চলতি ছিল। বইও অনেক সময় লেখা হইত, কিন্তু স্মৃতিশক্তির উপর বেশী আস্থা থাকায়, বইয়ের উপর দেশের লোকের বেশী আস্থা ছিল না। তথাপি, সকল রাজা রাজড়াদের বাড়ী সকল প্রকার পুথি থাকিত। ভূর্জ্জপত্রে হয়, তালপত্রে হয়, তেড়েৎ পত্রে হয়, চ্যাটাল শোলায়, রূপার পাতে, তামার পাতে লেখা হইত এবং সে সকল বই সংগ্রহ হইত। মধ্য এসিয়ায় ভূর্জ্জপত্রে লেখা সংস্কৃত পুথি ইংরেজী ৪০০ বৎসরের পাওয়া গিয়াছে। চীনা কাগজে লেখা পুথি আরও দু' তিন শ' বৎসর পূর্ব্বের পাওয়া গিয়াছে। নেপালে যীশু খ্রীষ্টের ৪।৫০০ বৎসর পরের পুথি পাওয়া গিয়াছে। চীনারা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অল্পদিন পর হইতে ভারতবর্ষ হইতে অনেক পুথি লইয়া আপনাদের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছে। চীনাদের একখানা ক্যাটালগে ১৩০০ পুথি তর্জ্জমা আছে। ভুটিয়ারা প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুথি তর্জ্জমা করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে বলে বিদ্যালয়, আমরা যাহাকে টোল বলি, তাহার নাম চতুষ্পাঠী বা চৌপাড়ি, অর্থাৎ চারিদিকে ছেলেদের থাকবার ঘর, মাঝখানে উঠান, উঠানের মাঝখানে একখানা আটচালা, তাহার নাম **গ্রন্থাগার**। কেহ ব্যবস্থা লইতে আসিলে, তাহাকে একজন সর্দ্দার-প'ড়ো ধরিতে হইবে। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের কাছে সে কথা উপস্থিত করিতেন এবং তাহার হইয়া প্রশ্ন লিখিয়া দিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিয়া দিতেন—তুমি **গ্রন্থাগার** হইতে অমুক অমুক গ্রন্থ লইয়া আইস, এবং তাহার অমুক অমুক অধ্যায়ে এই সকল শ্লোক আছে বাহির কর। সে সকল বচন বাহির হইলে তাঁহারা ১০।১৫ জন মিলিয়া ব্যবস্থা দিতেন এবং তৌল-বট লইতেন। তৌল-বট সকলে ভাগ করিয়া লইতেন, এক ভাগ সর্দ্দার-প'ড়ো লইত।

মুসলমানদের সময়ে পণ্ডিতেরা আপনাদের ব্যবসার মত পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। যিনি পুরোহিত, তিনি বৈদিক পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, যিনি নৈয়ায়িক তিনি ন্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ করিতেন ইত্যাদি। রাজারাও পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা সকল বিষয়েরই পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠেও অনেক পুস্তক থাকিত। এ সকল ব্যবসায়ীদের পুস্তক নহে, এ সকল স্থানে সকল প্রকার পুস্তক ছিল। ভারতবর্ষের সকল অংশেই ব্রাহ্মণের গাঁ ছিল, তাহাকে "অগ্রহার" বলিত। সেখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাত থাকিত না। ব্রাহ্মণদের সকল বাড়ীতে পুস্তক থাকিত; এক একটী "অগ্রহারে" অনেক পুস্তক থাকিত। উড়িষ্যায় এই সকল অগ্রহারকে "শাসন" বলে। পুরী জেলায় জগন্নাথ মন্দিরের চারি পাশে ৩২টী শাসন আছে। এক এক শাসন ২৪জন করিয়া ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইত। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ৩২টী শাসনে প্রায় আড়াই লক্ষ পুথি আছে। নেপালে দরবার লাইব্রেরীতে ১৬,০০০ সংস্কৃত পুথি আছে। এছাড়া সমস্ত তিব্বত-সাহিত্য সেখানে মজুত আছে এবং সমস্ত চীনদেশের সাহিত্য সেখানে মজুত আছে। মুসলমানেরাও অনেক সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা আরবী ও পারসী পুস্তক ত রাখিতেনই; অনেক দেশীয় ভাষার পুথিও সংগ্রহ করিতেন।

ইংরেজ আমলে ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। এক একবারে এক পুস্তক ৫০০০।১০,০০০ করিয়া ছাপা হইতেছে; পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। আর, পুস্তকের দামও এখন সস্তা হইয়াছে; সুতরাং এখন লোকে সহজে পুস্তকালয় করিতেছে, এবং এখন লোকের জ্ঞান জন্মিয়াছে যে বিদ্যা-প্রচারের একটী প্রধান উপায়—পুস্তকালয়। তাই দেশীয় ভাষায় পুস্তক সংগ্রহ করিবার একটা আগ্রহ হইয়াছে, এবং যত দিন যাইতেছে সেই আগ্রহ তত বাড়িতেছে।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া যাহাতে বাঙ্গালায় লাইব্রেরীর উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে

অকাতরে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইয়াছে, অনেক জায়গায় আদর অপেক্ষা পাইয়াছেন, আবার অনেক জায়গায় উপেক্ষা এবং এমন কি তিরস্কারও সহ্য করিয়াছেন। একটা কাজ ঠিক হইয়াছে, লাইব্রেরী, লাইব্রেরী করিয়া তিনি আপনার আর্থিক পরকালটা নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার এমন কি সমস্ত ভারতের বেশ একটু উপকার হইয়াছে। সুশীলবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া এই পথে থাকিলে আরও উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি ক্রমে লাইব্রেরী ব্যাপারকে সমস্ত ভারতব্যাপী করিয়া তুলিয়াছেন। বৎসর বৎসর প্রদর্শনী করিতেছেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লাইব্রেরীর খোঁজ খবর দিতেছেন। ক্রমে লাইব্রেরী যে শিক্ষা-বিস্তারের একটা প্রধান অঙ্গ সেটা লোকের ধারণা হইতেছে। লাইব্রেরী সব জায়গায় হইতেছে। অনেক লোক নিজের বাড়ী লাইব্রেরী করিতেছেন। অনেকে চাঁদা তুলিয়া লাইব্রেরী করিয়া পাড়ায় পাডায় লোকের পড়িবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। ইস্কুল কলেজের লাইব্রেরী আছেই। ইউনিবার্সিটি ত একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছাড়া আর কিছুই নহে। ঢাকা ইউনিবার্সিটির লাইব্রেরী খুব বড় হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে বই রাখা, পড়া ও দেওয়ার খুব সুব্যবস্থা হইয়াছে। সুশীলবাবু ও তাঁহার সহযোগীরা চাহিতেছেন যে, এই সকল লাইব্রেরী একযোগে কাজ করেন। যাহার যাহা আছে তাহা, যাহার নাই, সে যেন ব্যবহার করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গাইকোয়ার মহারাজ খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি এড (aid) দিয়া গাঁয়ে লাইব্রেরী করিয়া দিতেছেন ও তাঁহার সদর লাইব্রেরী হইতে বই ধার দিবার বন্দোবস্তও করিতেছেন। লাইব্রেরীতে গ্রন্থকারের সুবিধা হইয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগকে রাজা, রাজ-রাজড়ার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না। ভাল বই হইলে লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে দু'দশ কপি করিয়া লইলে, তাহাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে। সুশীলবাবু গাইকোয়ারের ব্যবস্থার কথা বিস্তারিত করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছেন। লাইব্রেরীতে কিরূপে বই রাখিতে হয়, তাহারও উপায় তিনি বলিয়া দিয়াছেন। ডিউইর বই রাখার ব্যবস্থা সকলের চেয়ে ভাল, উহাতে শতকিয়া দিয়া বই রাখার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার বইখানি এ সময়ের পক্ষে খুব উপযোগী হইয়াছে। এখন লোকে তাঁহার কথামত কাজ করিলে এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিলে, দেশের খুব উন্নতি হইবে।

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

চিরঞ্জীব শর্ম্মা *

আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ একজন। ইনি কাশ্যপগোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার বংশে ১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাঙ্গালায় গাঞি বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কাশ্যপগোত্রে ষোল গাঁই। এই ১৬ গাঁইয়ের মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনও দক্ষের দোহাই দেন না।

আমাদের চিরঞ্জীব শর্ম্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তিনি কুলীন নন—চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপগোত্রের আর যে পনরটী গাঁই আছে, তাহার কোনওটীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেটী কোন্ গাঁই, তাহা আমরা জানি না। তবে চিরঞ্জীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক।

এই বংশে ইংরেজী ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন—তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়াও তাহার স্বভাব-চরিত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রক শাস্ত্র। কাশীনাথের উপাধি ছিল—সামুদ্রকাচার্য্য।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের প্রতিভা খুব উজ্জ্বল ছিল। ইনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথ শিরোমণি যে দীধিতি নামে টীকা করেন, তিনি তাহার উপর প্রকাশিকা

---

* বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালের ২৪এ মাঘ তারিখে (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়। 'শারীরিক অপটুতা বশতঃ' শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদে উপস্থিত হইতে পারেন না। সভাপতির অনুরোধে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৭শ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৭শ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, পৃঃ ৩০)।—সম্পাদক—।

নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ভবানন্দী বাঙ্গালা দেশে বড় চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্রদেশে। মহাদেব পুন্তামকর নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভবানন্দীর উপর দুই টীকা লেখেন। একখানির নাম—সর্ব্বোপকারিণী। এখানি ছোট। আর একখানি বড় টীকা লেখেন, ইহার নাম ভবানন্দীপ্রকাশ। ভবানন্দী বাঙ্গালায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে। তিনি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়—অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে নলাহাটী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্রে নলাহাটী এককালে একটা বড় পণ্ডিতসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও ছিল। তাঁহার পাশে বসিয়া এক শত জন লোকে এক শতটী কবিতা পাঠ করিল। তিনি প্রত্যেকের কবিতা হইতে এক একটী কথা লইয়া নূতন এক শতটী কবিতা করিয়া দিলেন। এইটী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণতঃ শতাবধান বলিতে যে এক শত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায়। পর পর এক শত লোক কথা বলিল—সেই কথা মনে করিয়া যে বলিতে পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর একরূপ শতাবধান। সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নানারূপ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। একখানির নাম মন্ত্রদীপ, আর একখানির নাম রামপ্রকাশ। একখানি বৈদিকমন্ত্রের বই, আর একখানি স্মৃতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুণ যে সকল বৈদিক কার্য্য তখনও চলিতেছিল—তাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূর করিবার জন্য তিনি মন্ত্রদীপ লেখেন। এখানি বোধ হয় বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। রামপ্রকাশ ধর্ম্মকার্য্যের কালনির্ণয়ের বই।

দুই জন কবি তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কবিতা লিখিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী।
সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বমবতীর্ণা সরস্বতী॥

হরিহর নামে তাঁহার কোন ছাত্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, সরস্বতী হইতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ শতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আর একজন কবি বলিয়াছেন,—

পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরস্বতী।
জিতঃ শতাবধানোঽহতো বিষ্ণুনাপি ন জিষ্ণুনা॥

সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালবাসেন বলিয়া পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই জন্য বিষ্ণুও শতাবধানকে জয় করিতে পারেন নাই।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ছাত্র হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্দ্ধ বলিয়াছিলেন,—

অয়ং কোঽপি দেবোঽনবদ্যাতিবিস্তচমৎকারধারামপারাং বিভর্ত্তি॥

এ ছাত্রটী কোনও দেবতা হইবেন। ইঁহার পড়াশুনা করিবার ধারা নূতন রকম ও চমৎকার।

রাঘবেন্দ্রর একটী পুত্র হইয়াছিল। পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন—বামদেব। তাঁহার জেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন—তুমি চিরঞ্জীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার বলে অপঠিত শাস্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন,—দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবন্ত সিংহ নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাই বাঙ্গালার স্বাধীনপ্রায় রাজা—নামে মাত্র দিল্লীর সুবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার থাকিতেন। যশোবন্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁর সময় বাঙ্গালায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মস্ত কথা। শায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্ম্মাণ করেন ও তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়া যান—আর যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি মহা সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। এখনও ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই গেট দেখাইয়া দেয়।

চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন বা তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে অলঙ্কারের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কাব্যবিলাস। কাব্য-বিলাসে তিনি সিংহভূপতির নাম করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তরত্নাবলীতে তিনি যশোবন্ত সিংহের প্রচুর স্তুতিগান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম। তিনি ৭২ শ্লোকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বাতিগর্ব্ব প্রভো

গৌড় **শ্রীযশবন্ত সিংহ** নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয়।

যত্র সূর্য্যসজা গণাস্ততগণৌ তাখ্যো গণোঽন্তেগুরু-
র্বিশ্রামো রবিভির্নগৈস্তদুদিতং শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥

তিনি তাঁহার কাব্যবিলাসে জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই,—

উপেত্য ত্রেতাতো নিজচরণহানিক্রমমতঃ
সমন্তাদ্ধর্ম্মোঽভূদ্বলবতি কলাবেকচরণঃ।
পুরস্তাদদ্যৈবং জয়িনি জয়সিংহক্ষিতিপতৌ
বভূবুশ্চত্বারঃ পুনরভিনবাস্তস্য চরণাঃ ॥

এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা। ইঁহার নাম ছিল—সেওয়াই জয়সিংহ। জয়পুরে ইঁহার রাজত্ব ছিল। এখনকার আলোয়ার তখন তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। সেখাবাটীও তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। তাহার উপর তিনি বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন এবং প্রায়ই দিল্লীতে থাকিতেন। কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুবার সুবেদারীও করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিতেছেন,—তিনি জয়লাভ করিলে ধর্ম্ম যে যুগে যুগে এক একটী পা হারাইয়াছিলেন, সেই সব কয়টী পা তিনি নূতন করিয়া পাইয়াছিলেন। যে জয়সিংহ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব এত বড় কথা বলিলেন, তিনি বাঙ্গালার সাধারণ জমীদার হইতে পারেন না। তিনি এই বড় জয়সিংহই হইবেন। জয়সিংহের নাম সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইনি ১৭১৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালী এক বৈদিক ব্রাহ্মণ জয়পুরনগর পত্তন করেন। ইঁহার নাম বিদ্যাধর। ইঁহার পূর্ব্বে আমের জয়পুরের রাজধানী ছিল। আমের দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গলি। রাজ্য বড় হইলে সেখানে আর রাজধানী রাখা চলে না বলিয়া সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহা এক কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমির উপর নির্ম্মিত—চারি দিকেই জল চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। এই নগর নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়সিংহের অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা হয়। অশ্বমেধ করিতে হইলে অশ্বকে ত যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিতে হয়। জয়সিংহ ত তাহা পারেন না। তাই তিনি অশ্বকে নিজের মণ্ডলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—দিল্লীর এলাকায়ও যাইতে দেন নাই—যোধপুরের এলাকায়ও যাইতে দেন নাই।

জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ আকবরের সময় দিল্লীর প্রধান ওমরাহ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের ত তিনি মামাই ছিলেন। তিনি দুইবার বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। শেষবার প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়া যান। বাঙ্গালায়—বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে—তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল।

তিনি অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতরাও তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাঁহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চিরঞ্জীব তাঁহার সম্বন্ধে এই কবিতাটী লিখিয়াছেন,—

অদ্যৈবায়ং প্রলয়জলধিস্ত্যক্তবেলোঽপ্যবেলম্
অদ্যাপ্যেষ ভ্রমতি পরিতো ভূপতির্মানসিংহঃ।
ইত্থং কীর্ত্তিক্ষিতিপ! ভবতো জৈত্রযাত্রান্তরালে
ভূয়োভূয়ঃ প্রসরতি সতাং ত্যক্তবাদঃ প্রবাদঃ॥

মানসিংহ প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বেকার লোক হইলেও তখনও তাঁহার কথা লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মত ছিল।

চিরঞ্জীব তাঁহার কাব্যবিলাসে বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার যশঃ ভুবনবিস্তৃত ছিল।

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যা কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা। তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহা হইতে বড় অন্য দেবতা কেহ আছেন বলিয়া জানিতেন না। মাধবচম্পূ নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন। তিনি বড় বাপের ছেলে বলিয়া গুমর করিতেন—নিজের কার্য্যকে ছোট বলিয়া প্রচার করিতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম,—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্বুদ্ধবুদ্ধিশ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।
বাল্যে কৌতুকিনা তদাত্মজচিরঞ্জীবেন যা নির্ম্মিতা
চম্পূর্মাধববর্ণিকেহ সমভূদুচ্ছ্বাসকঃ পঞ্চমঃ॥

এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থখানি তাঁহার পিতার জীবিতকালেই লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা কৌতুকবশতঃ বা বাল্যকালের চাপল্যবশতঃ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পিতা যখন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সঙ্গে ছিলেন। পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি অতি বিনয়সহকারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।

বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ ॥

ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালায় যত পণ্ডিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখ্যাত, তিনি কলাপ ও ভট্টির টীকাকার। কিন্তু তাঁহার কাল নির্ণীত হয় নাই।

ইনি কাব্যবিলাসে গুরুবিষয়া রতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসনা করিবার কোনও দরকার হইত না। ইনি লিখিয়াছেন,—

ইমৌ ভট্টাচার্য্যপ্রবররঘুদেবস্য চরণৌ
শরণ্যৌ চিত্তান্তর্নিরবধি বিধায় স্থিতবতঃ।
কিমন্যৈর্বাগ্‌দেবীপ্রমুখভাজাং প্রভজনৈঃ
পরিস্ফূর্ত্ত্যৈ বাচামমৃতলহরীনির্ঝরজুষম্‌ ॥

রঘুদেব জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক লোক। ইনি জগদীশের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার একখানা কাব্যের নাম মাধবচম্পূ। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রাজধানী মধুপুর। তিনি একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ায় যে সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের আকার, প্রকার, গতি প্রভৃতির বেশ বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয়, কখনও মৃগয়া দেখেন নাই—কখনও শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্‌!' এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশী। হাতীতে হাতীতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে শূকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়া—এই সকলই দেখিতে পাই।

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, তিনি এক হ্রদের ধারে বসিলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটী মেয়ে স্নান করিতে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলেন —কলাবতীও কৃষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পৌঁছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল—'উড়িষ্যার রাজার কন্যা কলাবতীর স্বয়ংবর। সেখানে অনেক দেশের রাজা আসিবেন, আপনিও চলুন।'

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালদেশের রাজা, গৌড়দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, কাশ্মীরের রাজা ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা ত জানাই আছে। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন—'ভারতখণ্ডে রাক্ষসের বড় উপদ্রব। আমি তাহা নিবারণ করিতে চলিলাম।' এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আর একখানি বই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী। ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রথমটীতে কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ। এক প্রভুর বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথম আসিলেন বৈষ্ণব—নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হলুদে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।' তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তারপর শাক্ত আসিলেন—মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক—নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জল পণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্ব্বিদ, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায় এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত—চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন,—বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে—দেবতাদের অর্চনা কর, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য কর, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল,—আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল

—কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন,—যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়,—যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল,—কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন,—এ কি, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিসের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক—বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কি? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক—কর্ম্ম যদি না থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক—কর্ম্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি? সুখ-দুঃখাদি ত প্রবাহধর্ম্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুতঃ জগৎটাই অসৎ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী—তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বগামী, তেজঃস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক—তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কি করিবে?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্ব্বভরে বলিলেন,—তুমি আপনার মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বল, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কাণা, সে যদি বলে—তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে। নাস্তিক ভাবিলেন,—আমরা যুক্তিধারা বর্ষণ করি। ঐ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু ভাবিয়া বলিল,—আমাদের মত শোন—মাধ্যমিকদিগের শূন্যবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষিকদিগের ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদ, চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, আমাদের এই ছয়টী প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত—স্বর্গ নাই, নরক নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, এ জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, ভর্ত্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন কর্ম্মফলভোগী কেহ নাই। সমস্তই মিথ্যা। এগুলিকে যে সত্য বলিয়া মনে হয়, সে কেবল মোহ। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপীড়ন মহা পাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, অভিলষিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ।

তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন,—যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক; কেন না, বিদেশগত আর মৃত, এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।

নাস্তিক বলিলেন,—মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে, তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে, কেন শোক না হইবে?

নাস্তিক—পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে?

তার্কিক—তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে ত? তবে অনুমানও ত প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়া?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন—তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন,—যোগীকে মুক্তি দিবার কর্ত্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন,—না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন,—রাম। তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন,—না, না, মুক্তি ত রাধা দিবেন। এইরূপে চার পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন,—হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে বলিলেন,—

যে চাত্মনো নূনমভিন্নতায়াং
শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।

তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
দেহার্দ্ধধারী হরিরপ্যকারি ॥

এই বইএ চিরঞ্জীব শর্ম্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনও করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহারা সকলেই নিরীশ্বর, সেই জন্য নাস্তিক বলিব,—তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন—যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।

দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা দর্শনশাস্ত্রের চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী। চটি বইএ এক এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়—অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুইই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসাল ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জমা * করিয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৩য় সংখ্যা, ১৩৩৭

* এই সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আলোচনা' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য (৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৭, পৃঃ ২৪০-৪২)।—সম্পাদক—।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার*

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কাল্‌নার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস। এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড়ই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়ই রসিক ছিলেন। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলো, এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বাঙ্গালা দেশকে অনেকদিন সজাগ রাখিয়াছিলেন। শান্তিপুরের লোক গুপ্তিপাড়ার লোককে বাঁদর বলিত এবং গুপ্তিপাড়ার লোক উলো শান্তিপুরের লোককে পাগল বলিত। তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত।

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ীশ্রেণীর বড বড় কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়, সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেইগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কাল্‌না হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটী মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এ দিক ও দিক করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ নানা রকম। সে সব পুরাণ কাসুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এইরূপে ছত্রিশটী মেলের উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়।

শোভাকর ২।৩ দিন দেবীবরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া একদিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবীবর! আমার কি কুল হইল? তাহাতে দেবীবর উত্তর করিলেন,—

* বাঙ্গালা ১৩৩৮ সালের ২৭এ অগ্রহায়ণ তারিখে (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটী অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক পঠিত হয়। এইটীই শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ প্রবন্ধ।—সম্পাদক—।

ডাক দিয়ে কয় দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর।

শোভাকর বলিলেন,—

ডাক দিয়ে কয় শোভাকর।
নির্ব্বংশ দেবীবর॥

শোভাকরের কুল হইল না বটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে বাঙ্গালায় খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল। শোভাকরের বংশ আয়দার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বংশে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের জন্ম।

আয়দা হইতে গুপ্তিপাড়া বেশী দূর নয়। সেখানে শোভাকরের বংশ থাকা বিচিত্র নয়। গুপ্তিপাড়া একটী গণ্ডগ্রাম। সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে এক ঠাকুর আছেন। তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি। একজন সন্ন্যাসী সেই সম্পত্তির মালিক। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। রথে বেশ জাঁক হয়। রামসীতারও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের কিছু সম্পত্তি আছে। অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেখানে ছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে ৫।৭ খানা পত্র প্রায় দিতে হইত। একখানি মাত্র পত্র দিতে হইলে একজন বড় নৈয়ায়িককে দিতে হইত; তাঁহাকে একপত্রী বলিত।

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচার-কালে তাঁহাকে সিংহের মত বলিয়া মনে হইত; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তাঁহার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্রও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যার যশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড় দুষ্টও ছিলেন। পিতা রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—কালে বাণুও পণ্ডিত হবে। হইয়াছিলও তাই। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ার লোকের মত সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কি রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পড়েন। তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। খ্রীষ্টীয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ়দেশে মহা উৎপাত আরম্ভ করেন, তখন রাজা কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের রাজা। তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে শোভাসিংহ সেই কন্যার

হাতে প্রাণ হারান, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরায়। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার পর চিত্রসেন রাজা হন। চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে চিত্রচম্পূ নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বর্গীর হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে চিত্রচম্পূ লেখা হয়। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্পূ বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব কাব্য। এখন ইহার পুথি বড় পাওয়া যায় না। কোলব্রুক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে দিয়াছেন। আর একখানি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় আছে। ইহা হইতে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পারি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহারাজা চিত্রসেন বর্গীদের সহিত অনেক বার লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি বর্গীদের হাত হইতে প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ-প্রয়াগে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে গমন করেন এবং ত্রিবেণী হইতে সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সে দুর্গের চিহ্ন এখনও আছে; উহাকে কাউগাছির গড় বলে। শ্যামনগর ষ্টেসনের প্লাটফরমের কিছু পূর্ব্বে ঐ গড়ের খাদ এখনও দেখা যায়। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে বড় বড় ফটক ছিল। সে ফটকের ভিতর দিয়া হাতী অনায়াসে চলিয়া যাইত। এইখান হইতে মহারাজা চিত্রসেন রাঢ়ে বর্গীদের উপর খুব উৎপাত করিতেন ও তাহাদের তাড়াইয়া দিতেন। বর্গীরা গঙ্গা পার হইতে পারে নাই। এখন যেখানে হুগলীর পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে অতি সরু থাকায় পার হইয়া বর্গীরা একবার গরিফার হাতিবাগানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়া দক্ষিণ মুখে আসিতেছিল। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজারা আতপুরে থাকিতেন, সেখানে তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাটী ছিল। তাঁহারা মাঠে পগার কাটিয়া, তাহার উপর পাকাটী বিছাইয়া, তাহার উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বর্গীরা টের পায় নাই, এখানে গর্ত্ত আছে। যেমন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিবে, অমনি গর্ত্তে পড়িয়া ঘোড়ার পা খোঁড়া হইয়া গেল। তারপর তাহারা আর এ পারে আসিবার চেষ্টা করে নাই।

চিত্রসেন রাজার মাণিক্যচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার বাড়ীও গুপ্তিপাড়ায় ছিল। কারণ, প্রেম-ভক্তি দেবী যখন চিত্রসেন রাজাকে স্বপ্নে নানা তীর্থ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি গুপ্তিপাড়ার উপর হইতে মাণিক্যচন্দ্র ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,—তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিও। বড় রাজার দেওয়ান হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মাণিক্যচন্দ্রের সে সকলই ছিল। বাণেশ্বর বলিয়াছেন,—তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন।

তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ;—নিজেও গদ্য-পদ্য লিখিতেন এবং অন্যে গদ্য-পদ্য লিখিলে তাহার গুণদোষের বিচার করিতে পারিতেন এবং তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন।

তিনি খুব যোদ্ধা ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিহৃত বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যখন ধনু হইতে বাণ ছাড়িতেন অথবা তরবারি চালাইতেন, তখন শত্রুর মুণ্ডে পৃথিবী ছাইয়া যাইত। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান—ইঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি মন্দির দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজের প্রকাণ্ড জমীদারী তিনি নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারিতেন। তিনি যাহার উপর সুনজর করিতেন, সে অট্টালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে হাতী বাঁধা থাকিত। একজন কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

রে বিদ্যা বিবিধাঃ কলাশ্চঃ সকলাঃ সঙ্গীতনৃত্যাদয়ো
রে বৈদগ্ধ্যবিলাস দেবি কবিতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ।
ব্রূত ব্রূত কথং কুতঃ ক নু ভবেদ্বিশ্রান্তিলেশোঽদ্য বঃ
শ্রীমান্ বিজ্ঞশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে মাণিক্যচন্দ্রো ন চেৎ॥

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহারাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পড়িয়া শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাণেশ্বর সকল সময়ই ইংরেজদের সহায়তা করিতেন। ইংরেজরা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্প দিন পরে তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তিনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

একবার কোম্পানীর বহর কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিল। সে দিন একটা যোগ ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সকলেই স্নান করিতে উৎসুক ; কিন্তু কোম্পানীর হুকুম হইল—বহর যতক্ষণ না চলিয়া যায়, ততক্ষণ কেহ জলে নামিতে পারিবে না। জগন্নাথ দেখিলেন,—তাহা হইলে যোগ বহিয়া যায়, লোকের স্নান করা হয় না। তিনি অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন,—বহর বরং একটু পরে যাইবে। ইহাদের যোগ বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। অধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন,—আমরা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ব্যবস্থা পাইয়াছি। তখন জগন্নাথ হুকুম দিলেন, 'তোমরা সব গঙ্গায় নাব'। কাজেই বহর ঘণ্টা দুই আটকাইয়া রহিল। বাণেশ্বর মরিলে কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং ইংরেজ কোম্পানীও তাঁহাকে খুব খাতির করিতেন।

বাণেশ্বর বলিতেছেন,—কলিযুগের যখন ৪৮৪৩ বৎসর এবং শকাব্দ ১৬৬৪ অর্থাৎ

খ্রীঃ ১৭৪২, সেই সময় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রাজা সাহুর সৈন্যগণ বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িল। রাজা সাহু শিবাজীর পৌত্র। খ্রীঃ ১৬৮৯ সালে আওরঙ্গজীব শিবাজীর ছেলে শম্ভুজীকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার জিব কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করেন। সেই সময়ে শম্ভুজীর পুত্র ছোট শিবাজীকে আপনার রঙ্গমহলে আটক করিয়া রাখেন। শিবাজীর বয়স তখন অতি অল্প। আওরঙ্গজীব বড় শিবাজী ও শম্ভুজীকে চোট্টা বা চোর বলিতেন; এই জন্য ছোট শিবাজীকে তিনি সাহু বা সাধু বলিতেন। এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা—শিবাজীর পৌত্র সাহু নামেই চলিয়া গেলেন। মহারাষ্ট্র এই সময় নামে রাজা সাহুর অধীন হইলেও কাজে অনেগুকলি রাজত্ব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম—তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (পন্থপ্রধান) পেশোয়া, রাজার সব ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং মালোয়ার সুবেদারী বাদশার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সিন্ধিয়া, হোলকার ও উদোজী পোয়ারকে ভাগ করিয়া দেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কুন্দেরাও ধাবাড়ে প্রায় সমস্ত গুজরাটই দখল করিয়া লন। কিন্তু পেশোয়া লড়াই করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন। বন্দোবস্ত হয় যে, গুজরাটের অর্দ্ধেক পেশোয়ার ও অর্দ্ধেক কুন্দেরাও ধাবাড়ের ছেলের হইবে। কুন্দেরাও-এর ছেলে তখন খুব ছোট; কাজেই পিলেজি গুইকোয়াড় তাঁহার অভিভাবক হইলেন। ছেলেটী অল্পদিনেই মারা গেল। পিলেজির বংশ এখনও গুজরাটের অর্দ্ধেক ভোগ করিতেছেন। নাগপুরের ভোঁসলা রাজা সাহুর এক বংশের লোক এবং রাজা সাহুকে কিছু মানিয়াও চলিতেন। বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামা তাঁহারই কীর্ত্তি। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা সাহুর উপর দোষ দিলেও, নাগপুরের রাজা যে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার কারণ—ইহা সকলেই জানে। মহারাষ্ট্র ভাষায় ঘোড়সোয়ার সৈন্যকে বারগির বলে; সেই জন্য তাহাদের বাঙ্গালা আক্রমণকে বারগির হাঙ্গামা বলে। বাঙ্গালায় আমরা উহাদের বর্গী বলি। সুতরাং 'বারগির' কথার শেষ র-টী বাঙ্গালায় সম্বন্ধের চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বাণেশ্বর বর্গীর হাঙ্গামার কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে। লোকে বলে,—সংস্কৃতে ইতিহাস নাই; আছে কি না, তাহা এই নমুনা হইতেও বুঝা যাইবে।*

বর্গীরা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই, যাহারা দীন—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। সমস্ত ধন হরণ করে। সাধ্বী

* এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। সেখানে প্রবন্ধটীর এই স্থানে একটী পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই পাদটীকাটী এখানে তুলিয়া দিলাম: "শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৫শ ভাগে 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ' নামক প্রবন্ধে বাণেশ্বর-লিখিত সংস্কৃত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রবাসীতে (১৩৩৮—১ম খণ্ড) 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।"—সম্পাদক—।

স্ত্রাদিগকে লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাদের প্রধান বল—ছোট ছোট ঘোড়া। তাহাদের বেগ অপরিসীম।

বর্গীদের এরূপ স্বভাব-চরিত্র দেশময় রাষ্ট্র ছিল। তাহারাই আবার মিলিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের রোধ করা অতি কঠিন। তাহাদের সৈন্য সাগরের মত। এই কথা ভাবিয়া গৌড়ের প্রজারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যেহেতু তাহারা স্বভাবতঃই ভীরু এবং অল্পেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল—কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়; কোথায় থাকা যায়, কি উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে! হা দেবতা! তুমি এ কি অতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিলে, মনে হইল যেন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গণ্ডশৈল-সকল খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতেছে। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিতেছে; মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তাহাতে দশদিক পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের মধ্যে অন্য শব্দ গ্রহণের অবসরও দিতেছে না।

সকলেই পলায়নপর। কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ হাতীতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে। যানবাহন দিনরাত চলিতেছে। উটগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই; যেন দশদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান ভরিয়া দিতেছে। অথচ যাহারা পলাইতেছে, তাহারা দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের ধনজন, ভার সব সঙ্গে রহিয়াছে। সুতরাং ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে। মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের ঘরের যত কিছু মূল্যবান বস্তু, সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ যাইতেছেন—তাঁহাদের কোলে চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা ঝোলান, পৃষ্ঠে সঞ্চিত নানাবিধ পুথির বিষম বোঝা;—দেহ এই প্রকার নানা ভারে পীড়িত, মনটীও এতদিনে সঞ্চিত পুথিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে এই চিন্তায় সন্তপ্ত। স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন;—কেহ বা গর্ভভারহেতু, কেহ বা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু মন্থরগমনা;—পথে এখানে কর্দ্দম, ওখানে কুশাঙ্কুর, সেখানে কণ্টক—এই ভয়ে পদে পদে শিহরিয়া উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সঙ্গের ছেলেপুলেরা যথাসময়ে পানাহার না পাওয়ায় কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাঁহারা নিজেরাও ব্যাকুল হইয়া অতি করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন,—তাঁহাদের মনে হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীই বর্গীপূর্ণ। এইরূপ নানাবিধ আর্ত্তনাদ ও বিলাপে সমগ্র পৃথিবী যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গার এ পারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া

যায়। যখন স্বয়ং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন 'অন্যে পরে কা কথা'।

আমাদের কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা লেখা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের জীবনচরিত লেখা। তিনি অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সে কালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চাকরী করিতেন না, মাইনে লইতেন না, কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না, তবে কথাই আছে—'অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ', সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন না একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত তাহার তেমনি বিদায়-আদায় বেশী হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্দ্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন।

তিনি অতি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে সোনা ও রূপার পূজার পাত্রে নানাবিধ পূজার উপকরণ সাজান থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কমল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচুকুন্দ, কুন্দ, করবীর, কাঞ্চন, পলাশ, কদম্ব, কহ্লার, রক্তপদ্ম, কঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া, মাধবী, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতী প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত; মন্দিরটী তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ্‌গুলু এবং নানা রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়া যাইত। পানিশঙ্খের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাজান থাকিত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিপ্পান্ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। সেই সকল ভোজ্য বস্তু দ্বারা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার অলঙ্কার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবমতে আচমন করিতেন। তাহার পর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরুপরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও বাহিরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাদিমাতৃকা, শ্রীকণ্ঠ, কেশব, কীর্ত্তি প্রভৃতি ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। তার পর পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিমন্ত্র পড়িয়া ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপা দিয়া 'মুদ্রারচিতমূর্ত্তিপঞ্জরকিরীটেন্দ্রিয়ব্যাপকন্যাসো ধ্যাত্বা' বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন।

চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নূতন প্রবাল, পদ্মরেখা, গোমেদ, হীরা, সবুজমণি, পুষ্পরাগ, নব্য ইন্দ্রনীলমণি, রূপা, মহামরকত, চিন্তামণি প্রভৃতি দিয়া মন্দিরের প্রাচীর তৈয়ারী হইয়াছে, এবং কল্পবল্লী দ্বারা কুঞ্জাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। সেখানে তাহার তোরণ, দ্বার

উজ্জ্বল এবং অদ্ভুত মহারত্নসমূহে প্রস্তুত। সে তোরণের মস্তক পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে মুক্তার আসন বিছান। তাহার উপর নানা মণিমাণিক্যযুক্ত কালীর মূর্ত্তি, তাহা হইতে আলোর ছটা বাহির হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন নূতন মেঘ হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে। দেবীমূর্ত্তি মুক্তাময় মঞ্চের উপর স্থাপিত; তাঁহার অঙ্গে নানা রত্নাদি নির্ম্মিত কেয়ূর, কঙ্কণ, কিরীট, হার, মঞ্জীর প্রভৃতি অলঙ্কার। তিনি দুইখানি স্বর্ণখচিত বিচিত্র প্রভাময় বস্ত্র এবং মনের মত সুন্দর ও স্বাদু ভোগরাগের দ্বারা দেবীকে পূজা করিলেন। তার পর পুরাণাগমপ্রোক্ত স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কবিদের রচিত এবং নিজেরও রচিত স্তোত্র পাঠ করিলেন। তার পর মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীতরুর পলাশ দিয়া জ্বালান অগ্নিতে ধূনা, চন্দন, ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুলু, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দেওয়ায় তাহার ধূমে চারি দিক ভরিয়া গিয়াছে। কোথাও রুদ্রাধ্যায় পাঠ হইতেছে, কোথাও ত্রিয়ম্বক-সূক্ত পাঠ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত গঙ্গাজল ঢালিয়া শিবের স্নান হইতেছে, কোথাও নারায়ণস্তব, কোথাও রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়া হইতেছে, কোথাও গণেশের স্তব পড়া হইতেছে, কোথাও পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব-রচিত মহিম্নঃস্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে নীলকণ্ঠ-স্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও শৈলপুত্রী-মাহাত্ম্য সপ্তশতী পাঠ হইতেছে। সেখানে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত পুরুষার্থের চরম উৎকর্ষরূপ মহামন্দিরের মধ্যে অবস্থিত প্রসন্নমূর্ত্তি লিঙ্গময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গুরুর চরণে নমস্কার করিয়া গঙ্গা নামে গোরুটীকে ডাকিলেন। গঙ্গাও তাঁহার ডাক শুনিবামাত্র মহাহর্ষভরে অনেক পক্ক ফল আহারের লোভে রাজার দিকে দৌড়িয়া আসিল। কামধেনুও বুঝি কল্পবৃক্ষের কাছে এরূপ ছুটিয়া আসে না। নানারূপ ফলে গঙ্গার তৃপ্তি সাধন করিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পুচ্ছ দ্বারা নিজের সমস্ত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া তাহার আরতি করিলেন। অবশেষে তাহাকে রাশীকৃত উত্তম ভোজ্য দ্রব্য দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, বন্ধু-বান্ধব সমেত আহার করিতে বসিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা একরকম বাঙ্গালার মালিক হইয়া উঠিলেন। সে সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা ইংরেজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরেজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা দেশের কর্ত্তা হইলেন বটে; কিন্তু আইন-মত তাঁহারা কেহই নহেন। দিল্লীর বাদশাহ্ ভারতের সম্রাট; মীরজাফর বাঙ্গালার সুবেদার; রাজা দুর্লভরাম বাঙ্গালার দেওয়ান। অথচ ইংরেজ নহিলে বাঙ্গালা বেহারের কোন কাজই হয় না। ১৭৬৫ অব্দে এ রকম বে-আইনী অনেকটা উঠিয়া গেল। ইংরেজরা সেই বৎসর দিল্লীর বাদশাহের নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইলেন। দুর্লভরাম এবং তাহার বংশের দেওয়ানী লোপ হইল। কিন্তু ইংরেজরাও দেওয়ানী করিতে পারেন

না ; কাজেই মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সীতাব রায়কে নায়েব দেওয়ান রাখিয়া বাঙ্গালা বেহারের কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংরেজের মনঃপূত হইল না। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন—আমি দেওয়ান হইয়া দাঁড়াইতে চাই। সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরি গেল। কোম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ানী লইলে দেওয়ানী মকদ্দমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল, সেই মতে কাজ চলিতে লাগিল। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম্ম কি, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তৌলবট পাইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—কোড চাই, সংহিতা চাই। তখন ইংরেজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না; মুসলমানদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে জানে। সুতরাং বাঙ্গালী বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন হেষ্টিংস এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম; তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ীর দুই পণ্ডিত—একজনের নাম রামগোপাল তর্ক-পঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিঙ্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগার জনে একত্র হইয়া, দেওয়ানী আদালতের বহুদিনের নজীর দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম—বিবাদার্ণবসেতু। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া উহা পারসীতে তর্জ্জমা করাইয়া লন এবং হ্যালহেড নামক একজন ইংরেজকে দিয়া সেই পারসী হইতে ইংরেজীতে তর্জ্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয়—হ্যাল্‌হেড্‌স্ জেণ্টুল। পণ্ডিত মহাশয়েরা যত দিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটী করিয়া টাকা পাইতেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা সকলেই যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটী করিয়া টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা তাঁহাদের বাড়ীতে টোল থাকা পর্য্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন।

এই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। তারপর সার উইলিয়ম জোন্‌স্ আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া বিবাদভঙ্গার্ণব নামে একটী নূতন কোড তৈয়ারী করিয়া লন।

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজের হাতে হিন্দু ল'এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নামে অনেক উদ্ভট শ্লোক চলিত আছে। উদ্ভটসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েকটী সংগ্রহ করিয়াছি। নীচে সেগুলি তাহাদের প্রাসঙ্গিক ঘটনার সঙ্গে তুলিয়া দিলাম।

১। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকটী পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া দেখেন যে, সেখানে গঙ্গায় স্রোতঃ কমিয়া গিয়াছে। তখন বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—

সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিজবেন হিমাচলাৎ।
ইহ হি মান্দ্যমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্বিরহাদিব জাহ্নবী॥

২। একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে লইয়া ৺কালী-পূজার পূর্ব্বে ৺কালীদেবীকে দর্শন করিতে যান। কুম্ভকার সেখানে উপস্থিত ছিল। মহারাজ তাহাকে ও দেবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া বলিলেন,—"কিমদ্ভুতম্।" তখন বাণেশ্বর বলিলেন,—

শিবস্য নিন্দয়া হি যাঽত্যজদ্ বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥

ইহা শুনিয়া রামপ্রসাদ সেন বাণেশ্বরকে ঠকাইবার জন্য কহিলেন,—

মহাযুদ্ধমধ্যে সদানন্দরূপা-
পদস্পর্শমাত্রাচ্ছবোঽভূন্মহেশঃ।
শিবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচি-
চ্ছিবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচিৎ॥

৩। মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে বড়ই ধুমধাম হইয়াছিল। দানসাগর হইবে বলিয়া হাতী, ঘোড়া প্রভৃতিকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনা হইয়াছিল। হাতীগুলি শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাণেশ্বর বলিলেন,—

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্ব্বংসহা কম্পতে
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্।

অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুঃস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনো নরপতে হস্ত্যুত্তমাস্তাবকাঃ ॥

৪। বাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া বৰ্দ্ধমানরাজের শরণাগত হন। কিন্তু সেখান হইতে পুনর্ব্বার কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসেন। কৃষ্ণচন্দ্র দেখিবামাত্র তামাশা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।" ইহা শুনিয়া বাণেশ্বর বলিলেন,—

চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়ং
আর্দ্রীভূতা নয়নসলিলৈর্ভ্রাম্যতে দৈন্যদণ্ডৈঃ।
আশাকুম্ভাঃ কতি কতি কৃতাশ্ছেদিতাঃ কর্ম্মসূত্রৈ-
র্জাত্যা বিপ্রঃ পুনরহমহো কুম্ভকারোঽস্মি বৃত্ত্যা ॥

৫। একবার বাণেশ্বর বৰ্দ্ধমানের মহারাজের নিকট ছুটি লইয়া গুপ্তিপাড়ায় আসেন। বৰ্দ্ধমানে ফিরিলে মহারাজ তাঁহার পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনার দারিদ্র্য বর্ণনা করিতেছেন,—

লজ্জা মানসুতা মমাস্ত বনিতা ভিক্ষাঽপরা দৈন্যজা
তাতৈশ্বর্য্যবিগর্ব্বিতা বলবতী ভিক্ষা প্রগল্‌ভাঽভবৎ।
সা লজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়া শোকেন মানো মৃতো
ভিক্ষা দৈন্যসুতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাপি মাং মুঞ্চতি ॥

৬। বৰ্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরে যাইলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিতেছেন,—

ন ভালে সিন্দূরং ন চ নয়নয়োরঞ্জনরসো
ন গাত্রে স্নেহাদির্ন চ খদিররাগোঽধরপুটে।
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদম্ভোরুহদৃশো-
লুঠত্যগ্রে বাহোর্বিগতকলহো লোহবলয়ঃ ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য

বাঙ্গালা ভাষার নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কার অমূল্য, এবং তাঁহার বিচারও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কতকগুলি নিজস্ব আবিষ্কার ও অভিমতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। একদিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং অন্যদিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালী—মাতৃভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচয় সে সময়ে ইঁহাদের কাহারও ছিল না। প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাঁহার মাতৃভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় একজন পথিকৃৎ ছিলেন, এবং এই প্রবন্ধগুলিতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।—সম্পাদক—।

বাঙ্গালার সাহিত্য *

বর্ত্তমান শতাব্দীর

ইদানীং ইংরেজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নূতন ধর্ম্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই, অথচ আমাদের মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আর একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় সেই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজী শিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গালার সমাজে উন্নতি অধিক ও সাহিত্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব। বঙ্গীয় সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে আরও অনেক কথা বলিতে হয়। কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিরূপে লোকের মন পূর্ব্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার

* বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। ঐ বৎসরই 'বঙ্গদর্শন' পত্রের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবন্ধটী ছাপা হয়, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে পুনর্মুদ্রিত হয় ('বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৮।')। 'বর্ত্তমান শতাব্দীর' অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটীতে অনেক লেখক ও তাঁহাদের রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনার সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় আছে। সুপরিচিতদের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন বোধে পাদটীকায় কেবল অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিতদের পরিচায়িকা হিসাবে দুই একটী কথা বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধটীকে আধুনিক কালে বাঙ্গালী লেখকের হাতে ইংরেজ যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম সম্পূর্ণ ও সার্থক আলোচনা বলিতে পারা যায়। সেইজন্য এই প্রবন্ধটীর একটী বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যতদূর জানা যায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে কেবলমাত্র আর দুইজন লেখক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন—Ar Cy Dae অর্থাৎ R. C. D. বা রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) মহাশয় ইংরেজীতে 'The Literature of Bengal...From the earliest times to the present day with copious extracts from the best writers' গ্রন্থে (২১০ পৃঃ, ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ), এবং রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় (১৮৩১-৯৪) বাঙ্গালাতে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (১ম ভাগ, ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ, এবং ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে ১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ)।—সম্পাদক—।

মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ, মারামারি, লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেড়ার সর্দ্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তের কিরূপ অবস্থা তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরাণীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরাণী ও বেরুকজীদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরাণীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশসকলে সুতরাং গোলযোগ চলিতেছে, ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর পেশোর প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমানশাসন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুতে আমীরদিগের রাজ্য এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। সর্‌হিন্দ প্রদেশে একজন ইংরেজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার জন্য এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন, এবং মুসলমানের ন্যায় বহুসংখ্যক মুসলমান উপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানা-প্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই; যে প্রতাপে তাঁহারা একদিন সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই; হিংসা দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে: সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাঁহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাঁহাদের নিকট হইতে অগাধ টাকা লইতেছে; দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, আজিও সম্ভ্রম আছে। কিন্তু বাদশাহ নিজে বন্দী, শত্রুরা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার দিনের অন্ন কে যোগায়—তাহারও ঠিক নাই। পেরো নামক সিন্ধিয়ার একজন ফরাসিস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারও শমরুর মত কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কি না কে বলিতে পারে? অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি নিজ প্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া বাস করেন; সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বার-

দোয়ারী নামক অভিষেকস্থানও বিদ্রোহীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাঁহার রাজ্যে ওমরাহগণ, করদরাজাগণ, জায়গীর-দার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে। বিনাযুদ্ধে কেহই খাজানা দেয় না, প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরেজেরা আরও অধিক কিছু আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ উপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্য ভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজাগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারও দক্ষিণে গোন্দয়ানায় বড় বড় ডাকাইতের দল তৈয়ারী হইতেছে। ইহারা এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উলট পালট করিয়া দিবে। সিন্ধিয়া ও হোলকার বড় শান্তিপ্রিয় নহেন। তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাঁহারা জিত হন, উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরেজ ও মহারাষ্ট্রীদিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালন পালন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীরা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই। উহারা যে যাহার আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রু নিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীদিগের মধ্যে বড় রাজা আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীজিবায় যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বময় কর্ত্তা, উন্মত্ত যশোবন্ত রায় যেখানকার শাসনকর্ত্তা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কুসংস্কারাপন্ন অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে? মহারাষ্ট্ররাজ্যের দক্ষিণে ইংরেজরাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটীশ রাজত্বের প্রথম অংশে যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; তাহাতে আবার যখন টীপু তৃতীয় বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়া-ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহীসুরে গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়া দেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব ছিল সত্য, কিন্তু মাদ্রাজে যে সকল ইংরেজ কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের দেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরেজনাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয় প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে কখন মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর।

এরূপ অরাজক সময়ে যখন কালি কি হইবে কেহই বলিতে পারে না, যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি, যখন কাহার প্রাণ, মান, ধন রক্ষা হয় না, দুষ্টের দমন

ও শিষ্টের পালন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাশালী একজনও লোক সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না, তখন কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে; তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে? যখন ভয়েই লোকে অভিভূত, তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, কে লিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্যলোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি ভোগ করিতেছিল। এটী লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি তখন বাঙ্গালা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাঙ্গালার গবর্ণরের কর্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-করকবলিত ছিল। উড়িষ্যায় করদ ও মিত্ররাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠপাট করিত। বীরভূম, বরাহভুম, সবেমাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছার তখনও ইংরেজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা (ব্রহ্মদেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ভূটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজকতায় ভুগিতেছিল। ভূটানে সুবেদারেরা তংশো পেন্‌লো, পেরো পেন্‌লো প্রভৃতি সকলে আপন আপন ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও মুসলমানেরা ভিন্ন আর কেহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেই আসে নাই, তথাপি বাঙ্গালার সীমা প্রদেশে শান্তি সুখ একেবারে ছিল না। আর বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। Double Government এর সময়ে রণদুর্ম্মদ ইংরেজগণ কাহাকেও মানিত না; তাহারা না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। Double Governmentএর সময় যেমন ছিল, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরেজেরা তিন চারি বৎসর থাকিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙ্গালী প্রিয়পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের মুণ্ড পাত করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সালে তাহার চুড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা কিছু ছিল কর্ণোয়ালিস প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীতে তাহাও গেল। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; মুসলমান গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় জমীদার ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই ৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্ণমেণ্টেরও

শেষ হইয়াছিল। নবাব বহু লক্ষ টাকা পেন্সন পাইয়া উপপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজ প্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড় বড় জমীদারগণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। মীরকাসিম অনেকগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছিলেন। ইজারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্ত্তা বলিয়া বহুকাল আদর ও ভক্তি মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজা ছিল, তাহাদিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, ইহার সঙ্গত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে। ইহার আসল নাম চিরঅস্থায়ী বন্দোবস্ত, কারণ ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে আমার জমীদারী স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদার গোষ্ঠীর শেষ হইল। বড় বড় রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা না দিতে পারায় জমীদারীচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নীলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? মাজিষ্ট্রেটের প্রিয় মুহুরী—জাতিতে নাপিত, Foreign Department এর নায়েব—জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের কেরাণী গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমীদারের কর্ম্মচারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দূরস্থ জমীদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমীদারী খাজানার দায়ে নীলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইলেন। একস্থানে এমন হইয়াছে যে জমীদারের খাজানা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকাডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমীদারী কিনিয়া লইলেন। একস্থানে একজন ডাকাইতের সর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের খাজানা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমীদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমীদার হইতে লাগিল। একজনের লাঠির জোর থাকিলে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে কাহারও রক্ষা থাকিত না। যাহারা সাহিত্য-সংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাঁহারা তাহাদের স্থানপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা আর এক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন, শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল।

মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার ভিন্ন বাঙ্গালার আর এক শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোরতর অত্যাচারের সময়, ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত তবে সে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। অত্যাচারী ইংরেজগণও ধার্ম্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে আদর করিত। লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের হিন্দুসমাজের আর্য্যজাতির

চুড়া বলিয়া জানিত। তাঁহারাও আজিকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় লোভী ক্ষমতাপ্রত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধর্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান ছিলেন, তাঁহাদের সাহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের এই সাহসের সূক্ষ্ম হেতুও ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই ৬০।৭০ জন ছাত্র থাকিত। ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ ও গুরুকার্য্যে আত্মসমর্পণেও কৃতসঙ্কল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গোঁসাই ভট্টাচার্য্য বলরামশ্চ শঙ্করঃ মাণিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ইংরেজ যথার্থ বিচার করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্য্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহাদের উপর এত কার্য্যভার পড়িয়াছিল যে তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই কি পরিণাম হইল। ১৭৯৩ সালে হুকুম হইল, আইন হইল যে, ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্ব্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড়মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড়মানুষের সভাশোভাবিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্য্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তর-ভোগীদিগের লিখিত; সুতরাং আর নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে, আইন করায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির পর সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন, সকলেই জানে যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট; তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, তাহার পর আরও নিকৃষ্ট। শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে'র ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন যে, ভট্টাচার্য্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্য্যদিগের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিন শক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ক্রমে ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নূতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হন। Double Government এর সময়েই ৬৫ হইতে ৭২এর মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রাম বসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইঁহাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন, তাঁহার নাম হরু ঠাকুর; ইনি কবির দল সৃষ্টি করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ অবতার জমীদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপস্থিত মত গান বাঁধিতেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার অরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন বাঙ্গালায় সৃষ্টি, বাঙ্গালীর গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্ত্তনরচয়িতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি; বোধ হয় আপনারা আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে বিদেশীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ান্‌দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ান্‌দিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েল্‌স্‌লি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল। তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টর ও কেরী †, আর একজন

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ১৫নং পুস্তিকায় উইলিয়ম কেরীর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঐ পুস্তিকাতেই হেনরি পিট্‌স্‌ ফরস্টারেরও উল্লেখ আছে। ফরস্টার একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধানের প্রথম ভাগ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে গ্রন্থের নাম এবং লেখকের নাম ও পরিচয় এইরূপ ছাপা হয়: **A/Vocabulary,/ in two parts,/English and Bongalee,/and vice versa. By H. P. Forster,/Senior Merchant on the Bongal Establishment.**/দ্বিতীয় ভাগের (১৮০২ খ্রীঃঅঃ) আখ্যাপত্রে **English and Bongalee**-র জায়গায় **Bongalee and English,** এই পরিবর্ত্তনটুকু ছাড়া আর সব একই রূপ ছাপা হয়।—সম্পাদক—।

জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয় *। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই একজন বাঙ্গালী এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। 'কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র'† ও প্রতাপাদিত্য চরিত্র'†† বাঙ্গালীর লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।

এইরূপে বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। সাহেবেরা নিজজাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায়সহকারে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোক কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল, ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গঙ্গার দুই ধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল। বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্ব্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব সকল হৃদ্গত করিত। ক্রমে এই সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল। ক্রমে ব্রিটীশদিগের প্রতাপও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আমরা এই

* 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২ খ্রীঃ অঃ), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮ খ্রীঃ অঃ), 'রাজাবলি' (১৮০৮ খ্রীঃ অঃ), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনাকাল ১৮১৩ খ্রীঃ অঃ, প্রকাশকাল ১৮৩৩ খ্রীঃ অঃ), 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের জীবনকথা (১৭৬২ – ১৮১৯ খ্রীঃ অঃ) ও তাঁহার কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৩নং পুস্তিকায়। মৃত্যুঞ্জয় 'জাতিতে উড়িয়া' ছিলেন কি না সে বিষয়েও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ৯-১২)।—সম্পাদক—।

† কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বৃত্তান্ত অবলম্বনে 'শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং' 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থখানি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়।—সম্পাদক—।

†† যশোহরের ভুইয়াঁ প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে রামরাম বসু (১৭৫৭—১৮১৩ খ্রীঃ অঃ) কর্ত্তৃক রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থখানি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহার আখ্যাপত্রে বাঙ্গালায় এইরূপ লিখিত ছিল: 'রাজা প্রতাপাদিত্য—/চরিত্র—/যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে—/একব্বর বাদসাহের আমলে—/রামরাম বসুর রচিত—/শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০১—/' এই বইখানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ।—সম্পাদক—।

সময়ের নাম transition period বা পরিবর্ত্তনসময় বলিব। যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন [১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে], সেইদিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। এই পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনসময়ের যে যে দোষ গুণ তাহা আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না ; এখন আর ঠিক পরিবর্ত্তনসময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরেজেরা এই জন্য অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্ত্তনসময়ে বহুসংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়। যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের জনকয়েকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙ্গালীরই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ইনি ইংরেজী ও বাঙ্গালায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম স্থাপনকর্ত্তা, ইনি সর্ব্বপ্রথম সমাজসংস্কারক, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইঁহার ক্ষমতা অপার, ইঁহার বিদ্যা অগাধ, ইঁহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী লেখক। ইঁহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য বাঙ্গালীর অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর †—বাঙ্গালায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গালা

† 'জ্ঞানান্বেষণ' (প্রথম প্রকাশ, ১৮ই জুন,১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ), 'সম্বাদ ভাস্কর' (প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'সম্বাদ রসরাজ, (প্রথম প্রকাশ, ২৯এ নভেম্বর, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'হিন্দুরত্নকমলাকর' (প্রথম প্রকাশ, ২৪এ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রের প্রকৃত পরিচালক ও সম্পাদক এবং কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখক ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (ভট্টাচার্য্য) (১৭৯৯-১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ) সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৮নং পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইনিই 'গুড়গুড়ে ভট্‌চাজ' নামে পরিচিত ছিলেন।—সম্পাদক—।

গণের একজন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের—তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের—ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক ['সংবাদ প্রভাকর'], নানা রসপরিপূর্ণ কবিতা লেখায় চমৎকারশক্তিবিশিষ্ট। কিন্তু ইঁহার আর এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না; এজন্য লেখকদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তিও প্রায় লোপ হয়। ইনি অল্পবয়স্ক বিদ্বান বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখন কোন দেশে কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেষ্টর। পরিবর্ত্তনসময়ের মূর্ত্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর কয়জনের তাহা আছে? ইনি যাহাতে ইংরেজী ভাব দেশীয় লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টাই করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্কলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্র করিলে একটী পুস্তকালয় হয়। ইঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' একখানি Cyclopedia; বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের মন্ত্র। ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার 'বিবিধার্থসঙ্গ্রহ' বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এজন্য আমরা দুঃখিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন একজন লোক বা একটী সোসাইটি দ্বারা হয় নাই।

পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক*; ইঁহার পুস্তকাবলী

* 'আরব্য উপন্যাস' (৩ খণ্ড, ১২৫৬-৫৭ বঙ্গাব্দ), 'নরনারী' (১৮৫২ খ্রীঃ অঃ), 'বত্রিশ সিংহাসন' (হিন্দী হইতে অনুবাদিত, ১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ), 'পারস্য উপন্যাস' (১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (৩ ভাগ, ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ অঃ), 'ইতিহাস-সার' (১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক নীলমণি বসাকের (১৮০৮?—১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ) জীবনকথা ও কৃতির বিবরণ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ২৭নং পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক—।

অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা। যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না, সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা আছে তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'নরনারী' আজিও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি কে [প্যারীচাঁদ মিত্র] আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই; কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকার লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তনসময়ের ইনিও একজন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে মহামতি বীম্‌স বলিয়াছেন: "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit, spirit and clever touches of nature."

হুতোম পেঁচাও [কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'] এই পরিবর্ত্তন-সময়ের একটী মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে। হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

ইঁহাদের পর সংস্কৃত কালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, * তারাশঙ্কর [বাণভট্ট-রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র ভাবানুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন], বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন † প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক

---

* মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় (১৮১৭-৫৮ খ্রীঃ অঃ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কবি। বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে ইঁহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক ইঁহার রচনাটী বাঙ্গালা ভাষায় একটী সারগর্ভ ও উপাদেয় প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ১৩নং পুস্তিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। 'শিশুশিক্ষা' (তিন ভাগ) পুস্তকের লেখক হিসাবেও মদনমোহন বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালার সমাজে স্মরণীয় হইয়া আছেন। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতাটী ইঁহারই রচনা।—সম্পাদক—।

† একাধারে পণ্ডিত ও সাহিত্যিক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় (১৮২২-৮৬ খ্রীঃ অঃ) 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ) নামক প্রথম উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা সামাজিক নাটকের রচয়িতা হিসাবে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ব্যতীত ইনি আরও নাটক ও প্রহসন লিখিয়াছিলেন। কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও ইনি করিয়াছেন। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি ইঁহার কিরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ইঁহার একটী বক্তৃতায়। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৫নং পুস্তিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তিকাকারে মুদ্রিত রামনারায়ণের এই 'প্রকাশ্য বক্তৃতা'টীর কিয়দংশ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।—সম্পাদক—।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরেজী ভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালীকে উপহার দিতেন। ইঁহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানাকারণে বাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্ব্বাগ্রণী, এমন কি পরিবর্ত্তনসময়ের প্রধান নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত। ইনি যে বাঙ্গালীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন। ইঁহার 'কথামালা' [ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ] ও 'চরিতাবলী'র [জুলাই, ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ] ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাব, নির্ভীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

পরিবর্ত্তনসময়ের লোকে যে শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রধান। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হইতে তত্ত্ববোধের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী' নামক পত্রিকা প্রচার হয়।* শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' তখন এখনকার মত একটীমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয় ভাব প্রচারের মিসনরি ছিল। উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা 'তত্ত্ববোধিনী'র আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরেজী ভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার 'চারুপাঠ,' 'ধর্ম্মনীতি,' 'বাহ্যবস্তু' ['বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'] প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই সকল গ্রন্থপাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

---

* ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার চার বৎসর পরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট (বাঙ্গালা ১২৫০ সালের ১লা ভাদ্র) তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র রূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক—।

এই সময় কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা, বিশেষ পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায়, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনসময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নামকীর্ত্তন করিলাম। ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরেজী ভাব বাঙ্গালীকে বুঝান; ইংরেজী ভাব বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করান। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কার্য্যে এত খেপিয়াছিলেন যে, একজন অতি সুশিক্ষিত যুবক—তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, এবং ইংরেজী বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন—রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদী, ভদ্রলোক যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "গোরু খাবি," "গোরু খাবি?" তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "ওরা ত খাবে না জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ ideaটা আর অত shocking হইবে না।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ ইয়ুরোপীয় ভাব সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিতেন। পরিবর্ত্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে স্থূলতঃ পরিবর্ত্তনসময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দু কালেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাবের প্রচার, ও সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক এই সকলের ফল কি হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে; পরিবর্ত্তনসময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়; আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফল। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্ত্তন কি আর কখন হইয়াছিল? তাঁহারা যে সমাজ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? অদ্যকার যুবকগণ এই পরিবর্ত্তনসময়ের দরুণ যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোন দেশে কোন কালে কোন যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ইয়ুরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৪ সালে রণদুর্ম্মদ ওসমান আলি মহম্মদ নূতন রোম দখল করিয়া কাইসরের উত্তরাধিকারিগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জ্জাকে মস্‌জীদ করিল, সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিস-সাগরপারস্থ. স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ইয়ুরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতন ভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের

মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃ-প্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি? প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালীর সম্মুখে আপনাদের গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ; তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে। দেখ দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি। এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে? এক দেশে আর এক দেশের সাহিত্য প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গত শতাব্দীতে এত কাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্য-রাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই সকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভাল করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের যদি চারি পাঁচ-খানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা "মাষ্টারপিস" পড়ি, তাহা হইলে দশ বৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখন একেবারে এক অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই; আর এই সাহিত্য লইয়া স্বায়ত্ত করিতে পারে, ইয়ং বেঙ্গল ভিন্ন এমন জাতিও আর কখন হয় নাই। আর এই সকল নানাদেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিনয়ে ইয়ং বেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয় আর কোন দেশের লোকের কখন এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমীদারের অত্যাচার নাই। কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে দেশ শাসন, শান্তি-রক্ষা, বিচারকার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হেতু কত কত মহা প্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইংরেজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ মাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশে মাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই স্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ, সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। অতি নিভৃত জঙ্গল মধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে বাঙ্গালী ইয়ং বেঙ্গল এমন সুবিধার কি কার্য্য করিতেছেন।

তাঁহারা নূতন সাহিত্য গঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোতঃ কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। 'তিলোত্তমা' ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিশ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি, তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। আমাদিগের এই বালসাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে। এটী শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে। যখন আট বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল*, তখন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে। তাহার আট বৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরও গর্ব্ব করিব আশ্চর্য্য কি? ভারতীয় আর্য্যভাষা-সমূহের ঔপমিতব্যাকরণকার মহামতি বীমস্ সাহেব দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনান্তে বলিয়াছেন—"That the Bengalees possess the power, as well as, the will to establish a national literature of a very sound and good character cannot be denied." আরও 'পুষ্পাঞ্জলি'প্রণেতা, চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ফল কথা সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসর মধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং এই সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্ত্তে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে।

আমার বোধ হয় সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি। আমি নিম্নে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি। যাঁহারা এই দশ বৎসর মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া তরলমতি বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরেজী বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহতী শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের

* শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবত এখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ) পুস্তকখানির উল্লেখ করিয়াছেন।—সম্পাদক—।

কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়দিগকে নানাপ্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে সকল মহোদয়গণ বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব বিষ্ণু ও দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে "আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদি-দশদিক্-পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরও একটী কারণ আছে। আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের কার্য্যের সহিত পরিচিতও নহি; আর আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার 'তিলোত্তমা' কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, না হয় বলি উহা উন্মাদের কাব্য? তাঁহার 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' ['ব্রজাঙ্গনা'?] গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশদেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটীকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটী সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন। আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যু হেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য। তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ একখানি রত্ন বা এক একটী রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি ['একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'] আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি

অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন, তাঁহার 'কবিতাবলী' অতুল্য পদার্থ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিত পথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার 'বৃত্রসংহার' স্বদেশহিতৈষায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, 'বৃত্রসংহারে' মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের 'মেঘনাদ' অপেক্ষা তাঁহার 'বৃত্রসংহার' কোন কোন অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা বঙ্গবাসীর অধিকতর আদরের জিনিস, উহাতে মাইকেলের উদ্দামকল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রথিত। হেমচন্দ্রের 'বৃত্র' ও 'কবিতাবলী' বহুকাল বাঙ্গালার প্রধান পুস্তকমধ্যে গণ্য থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই। হেমচন্দ্র ইংরেজী উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাঙ্গালায় করিতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, বোধ হয় অনেক স্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার 'গঙ্গার উৎপত্তি' উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ।

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল, ইঁহার 'পদ্মিনী' উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, স্বাধীনতার মোহিনী শক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না, কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে ইনি 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার মত পরিষ্কার ইংরেজীতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল অথচ সম্যক সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন, ইঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' বীররস-পূর্ণ কবিতামালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রাণী ভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়প্রস্তরে চিরঅঙ্কিত থাকিবে।

ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের হাতের তৈয়ারী; ইঁহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, এত আর কাহার উপর পারেন নাই। সমাজচরিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয়। ইঁহার 'সধবার একাদশী' ও 'জামাই-বারিক' সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজে দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যতদূর সম্ভব, ইনি ততদূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইঁহার 'লীলাবতী' অপূর্ব্ব পদার্থ। ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া

অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেন, দীনবন্ধু সে সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়। তাঁহার নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ, তাঁহার অটল ও নিমে দত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার 'নীলদর্পণে' সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয় নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু। ইঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর,' 'রজনী,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক একখানি এক এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটী উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখান এবং আরও সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান। তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্ম্মপথে মতিমান। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয় যুবককে যে সকল শিক্ষা দিত, আজ এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়। তাঁহার কমলাকান্ত আর কেহ নহে, একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুদ্গীরণমাত্র। তিনি "এস এস বঁধু এস," এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানারসপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমরা, ললিত-লবঙ্গ-লতা। এমন কি তাঁহার রূপসী, হীরা, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতি-শিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, উহার রুচি অতি চমৎকার। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা করিলে তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কেহ কখন করে নাই। ইহাতেও বঙ্কিমবাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ করতঃ সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখনকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিমবাবুর নিকট যত ঋণী এত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে। এই প্রাচীন বয়সে নানারূপ শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালী যে ইংরেজী শিক্ষায় কি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী যে চিন্তাশীলতায় সুরুচিশীলতায় কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ

প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিমবাবু দেশের উপকারার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে যত সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'আর্য্যদর্শন' কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালীদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যদর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবৃত্তি উদ্দীপনের জন্য নানা প্রকার যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদক মিল ও ম্যাটসিনির জীবনচরিত লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইয়ুরোপের দুইজন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় দ্বিতীয় সাময়িক পত্রিকা 'বান্ধব,' ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে পত্রিকাসম্পাদন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজীতে যাহাকে learned man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্নবাবু এই সকল learned লোকের অগ্রণী; তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জ্বলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগিগণকে আমরা বিশেষ জানি না, যাহা জানি তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে কালীপ্রসন্নবাবুর সহযোগিগণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর একখানি সাময়িক পত্র 'ভারতী,'* এখানি যোড়াসাঁকস্থ ঠাকুরপরিবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকী পড়ে না। সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু 'ভারতী'র বাকী নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহার নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। 'স্বপ্নপ্রয়াণে' ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারও সহকারী কে কে আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে†

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদনায় 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (শ্রাবণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যতীত তাঁহার অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবীও ছিলেন।—সম্পাদক—।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটক' ও 'সরোজিনী' যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী নাটক' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক—।

'সরোজিনী,' 'পুরুবিক্রম,' 'বাল্মীকিপ্রতিভা' দশ বারখানি সুরুচিসঙ্গত সুললিত পাঠ্য উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্পক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

* শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চারি বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলী' তুলনারহিত : তাঁহার 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' দেশভ্রমণ বিষয়ে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সকল প্রবন্ধগুলিই সুপাঠ্য। তিনি অল্প বয়সে যেরূপ মানসিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে পরে তাঁহার দ্বারা যে সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয় [১৬ই ফাল্গুন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ] দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মোহিত হইয়াছিলাম।

* শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা; তিনি অতিশয় সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না। তাঁহার স্বদেশানুরাগ তদীয় 'দীপনির্ব্বাণ' গ্রন্থে সম্যক বিকসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে চিত্তের প্রসাদলাভ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্য এই শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন রমণীগণ যে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন ও ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ আশা করা যাইতে পারে। দেবী স্বর্ণকুমারী নিজেই বোধ হয় অনতিদূর ভবিষ্যৎকাল মধ্যে বঙ্গের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণের মধ্যে মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইবেন।

---

* তারকাচিহ্নিত প্যারাগ্রাফগুলি 'বঙ্গদর্শন' এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজ নামে প্রকাশিত মুদ্রণে নাই। বাঙ্গালা ১২৯৩ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত কতিপয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া প্রকাশিত করেন [সাবিত্রী/অর্থাৎ/বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে/পঠিত-প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে/পুরস্কার-প্রাপ্ত নারী-রচনা।/সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে/শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/পিপেল্‌স্ লাইব্রেরী,/৭৮নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।/আশ্বিন, ১২৯৩ সাল।/কেবল তাহাতেই এই তারকাচিহ্নিত অংশগুলি পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশক এই সম্বন্ধে 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন : ' "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" যে বৎসরে লিখিত হয়, তাহার পর এই কয় বৎসরের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহাদের পুস্তক-সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। এবং বক্তৃতাকালে বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ও প্রথম শ্রেণীর কবি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে উল্লেখ করিতে ভুল হওয়ায় এবারে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। আর, এই প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময়ে বঙ্গদর্শনের ডান হস্ত ছিলেন ; ইহার লেখকগণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি যে নিজ প্রশংসায় বিরত হইয়াছেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।' শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবৎকালে যখন এই গ্রন্থে তাঁহার এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রকাশকের অনুরোধে এই অংশ কয়টী তাঁহার নিজকৃত সংযোজন, এবং তাহা না হইলে ইহাতে তাঁহার অনুমোদন ছিল। এই সম্ভাবনার কথা বিচার করিয়া আমরা এই অংশগুলি তারকাচিহ্নিত করিয়া মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক—।

বঙ্গদর্শনে যাহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন ['প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস', ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ]। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ; ইংরেজী, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলীপরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী 'সাধারণীর' সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, গ্রাবু প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটী মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা। তাঁহার লিখিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন। বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু। * চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিবিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজী ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইয়ুরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্য্যদর্শনের আর একজন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইঁহার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় †, ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ইঁহার 'কল্পতরু' ও 'ভারত-উদ্ধার' না পড়িয়াছে বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ইঁহার 'ভারত-উদ্ধার' নামক mock heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে 'পঞ্চানন্দ' নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর কয়েকটী লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন ††, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ং বেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র

* এই প্রবন্ধটী বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের তৎকালীন সম্পাদক (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এখানে পাদটীকায় এই মন্তব্য করেন: 'প্রস্তাবলেখকও বটে। সঃ।'—সম্পাদক—।

† মুদ্রিত পাঠে 'ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়'।—সম্পাদক—।

†† উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫—১৩০২ বঙ্গাব্দ) বাঙ্গালা নাটকে সর্ব্বপ্রথম 'রোমহর্ষক উদ্দীপনা' ও দেশ-প্রেমের উন্মাদনা প্রবর্ত্তন করিয়া এক ধরণের নূতনত্ব আমদানী করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহার রচিত দুইখানি নাটকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইখানি নাটক 'শরৎ-সরোজিনী' (প্রথম সং ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ)। উপেন্দ্রনাথের তৃতীয় নাটক 'দাদা ও আমি' প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা ১২৯৫ সালে,

দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ লিখিতেছেন। যতদূর আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালায় একখানি অপূর্ব্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ ভাষাকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার অসীম মতলবের শেষ নাই। তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। আর সম্প্রতি কয়েকটী যুবক ‘কল্পনা’ নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, [কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা], ইনি তিন চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ‘যোগেশ’ নামক অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নর্ম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘নির্ব্বাসিতের বিলাপ’ একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা কাব্য। তাঁহার ‘পুষ্পমালা’য় বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।

মিষ্টার আর. সি. দত্ত [রমেশচন্দ্র দত্ত] চারি পাঁচখানি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজনমনোরম।

* শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর নাটকগুলিও † অতি সুপাঠ্য। এই সকল নাটক পাঠে রুচি মার্জ্জিত হয়, সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং অন্তঃকরণে নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয়।

সাবিত্রী লাইব্রেরীতে প্রদত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণের কয়েক বছর পরে। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাইবে শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩য় সংস্করণ, পৃ ২৬৯-৭৫)। উপেন্দ্রনাথ দাস ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে’র ডিরেক্টরও ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—লিখিত ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৫-৭৮) উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিলিবে।—সম্পাদক—।

† মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খ্রীঃ অঃ) ‘রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস’ (১৮৬৭ খ্রীঃ অঃ), ‘প্রণয়পরীক্ষা নাটক’ (১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ), ‘হরিশ্চন্দ্র নাটক’ (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ), প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। গীতিকার হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ ভাবে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার ‘দিনের দিন সবে দীন’ হয়ে পরাধীন গানটী স্বাদেশিকতার উদ্দীপক হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে স্মরণীয় হইয়া আছে।—সম্পাদক—।

আর দুইখানি গ্রন্থের কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই। একখানি 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়', * আর একখানি 'স্বর্ণলতা'†। 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র গ্রন্থকার সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উঁহার নরনারী চরিত্রগুলিও উত্তম। 'স্বর্ণলতা' ইংরেজীতে যাহাকে নবেল বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম নবেল। বাঙ্গালী সমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।

* শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যগুলি অতি সুন্দর। এত মিষ্ট কবিতা আমি কখন পড়ি নাই। তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' [১ম সং ১২৭৬ বঙ্গাব্দ] প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর পাঠ করা উচিত। উহা পাঠ করিলে পুরুষেরও মন গলিয়া যায়। রমণীর মন অতি রমণীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তাঁহার 'সারদামঙ্গল' [১ম সং ১২৮৬ বঙ্গাব্দ] রমণীয় সৌন্দর্য্যের উদ্দাম বিকাশ।

হরলাল রায়ের 'হেমলতা'†† বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উহাতে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়।

* 'উদাসিনী' নামে বাঙ্গালায় একখানি মিষ্ট, সুরস, করুণরসপূর্ণ কাব্য আছে। গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা মিলনের সুখভোগে অকৃতকার্য্য হইয়া যোগী ও যোগিণী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নাম দেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছি†††।

আমরা এই বঙ্গীয় লেখক সমালোচনার সর্ব্বশেষে 'পুষ্পাঞ্জলি'র সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। 'পুষ্পাঞ্জলি' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা

* 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' যশোহরের প্রতাপাদিত্যের জীবনকথা অবলম্বনে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত ও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কল্পনোজ্জ্বল বর্ণনায় পরিপূর্ণ বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম আদি ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গবাসী পত্রিকা কর্তৃক ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ অঃ ১৯০৮) প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক—।

† তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩–৯১ খ্রীঃ অঃ) কর্তৃক রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম ছিল না।—সম্পাদক—।

†† হরলাল রায়-লিখিত 'হেমলতা' নাটক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। "জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল হরলাল রায়ের 'হেমলতা নাটক'এ।...দেশের পরাধীনতার বেদনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে।" (শ্রীসুকুমার সেন-লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৫৪)। 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এই নাটকখানির সমালোচনা করা হয় (মাঘ, ১২৮০)। হরলাল রায় আরও কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন।—সম্পাদক—।

††† ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উদাসিনী' কাব্যগ্রন্থের লেখক জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮ খ্রীঃ অঃ)। মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে (বাঙ্গালা ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংস্করণ পৃঃ ৬৯-৭০) লিখিয়াছেন: "৺ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ.। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল।...উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে [জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১] যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।"—সম্পাদক—।

সংস্কৃতানুকরণ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কথক সমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা কিছু মহীয়ান ছিল, সে সমুদয়ের সারসংগ্রহ, অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গবাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। 'পুষ্পাঞ্জলি' একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেববাবুর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' † বাঙ্গালায় ইংরেজীওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর অধিক লোকের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে চিহ্নিত সিবিল সার্ব্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুল মাষ্টার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরেজী লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরেজী পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরেজী লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ 'ভারতী'তে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাঙ্গালায় লিখিত, তাঁহার মন বাঙ্গালার জন্য আকুল। তিনি সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে যখন বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন সকল ব্যবসায়ী লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন সাহিত্যের যে মহতী শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনও একটী কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহারই অন্য ব্যবসায় অছে। কেহ চাকুরী করেন, কেহ জমীদার, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লিখেন। অতএব সকলেই amateur, কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে সাহিত্য একটী ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই। এখনও শুদ্ধ সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বোধ হয় রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাভ আছে, আজিও একজন ভাল গ্রাজুয়েট গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট

† "সফলস্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুইটী উপাখ্যান লইয়া 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম উপাখ্যান এবং দ্বিতীয় উপাখ্যানের কিয়দংশ 'রোমান্‌স্ অব হিস্টরী' নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে গৃহীত।—সম্পাদক—।

শিক্ষিত লোক সাহিত্যব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইয়ুরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্যব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুসী ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে; কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কি করিতে হইবে? কোন ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি কতক কতক বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে, এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে এরূপ বহুসংখ্যক লোক থাকে, যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, ব্যঙ্গপ্রিয় সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহুসংখ্যক লাইব্রেরী থাকে, যাহাতে সকল প্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এবিষয় আমরা এক পরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্য্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুরপরিবারও তেমনি এই নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্যব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে, এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে। আমাদের দেশে যে কোন নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে; ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্যসংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় বড় কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরেজী আমাদের bread winning language, আমাদের ইংরেজী পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরেজী পড়ার দরুণ আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনও অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য্যভাষা কোন বাঙ্গালী অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না; সুতরাং সংস্কৃত পাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্রব্যবসায়ী একদল লেখক চাই, তাহা হইলে আমরা অল্প দিনে পৃথিবীর আর সমস্ত সাহিত্যকে কাণা করিয়া দিতে পারিব, সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব। যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে

হইয়াছে, অন্যদেশে তাহা দুই শত বৎসরে হয় না। আর বিশ বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে, নিশ্চয়; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক, ইঁহাদের বয়োবৃদ্ধিসহকারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িক পত্রিকাগণ প্রতিবৎসরই দুই একটী করিয়া লেখক তৈয়ারি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে; এই সকল লেখক যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য সর্ব্বিসে না গিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পৃথিবীমধ্যে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে বলেন বঙ্গভাষার অবস্থা বড় হীন; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলীমধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিন মাসে পাঁচ ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজিষ্টরি হয়, যখন এক কলিকাতায় পাঁচ শত প্রেস অনবরত চলিতেছে, যখন উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলেই বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতিশুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যদ্বাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটী গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে, আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

বঙ্গদর্শন
ফাল্গুন, ১২৮৭

বাঙ্গালা ভাষা

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে গেলে প্রথমতঃ রচনাপ্রণালী লইয়া বড়ই গোল বাধে। একদল, জনমেজয় যেমন সর্প দেখিলেই আহুতি দিতেন, সেইরূপ পারসী কথা দেখিলেই তাহাকে তাঁহারা* আহুতি দেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত কথার প্রতি সেইরূপ সদয়। কেহ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার কথা দেখিলেই চটিয়া উঠেন, প্রবন্ধের মধ্যে হাজার ভাল জিনিস থাকুক, আর পড়েন না। আবার কেহ আছেন, যেই দেখিলেন, দুই পাঁচটী সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, অমনি সে গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরীব দাঁড়াই কোথা? আমরা ইংরেজী পড়ি, আমাদের অর্দ্ধেক ভাবনা ইংরেজীতে। আমরা কলম ধরিলেই ইংরেজী কথায় ইংরেজী ভাব আইসে। সংস্কৃত আমরা যা পড়ি, তাতে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। বাঙ্গালার বিদ্যা বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', আর বঙ্কিমবাবুর নবেল কয়খানি। তাতেও ত কুলায় না; নূতন কথা গড়ি, এমন ক্ষমতাও নাই; তবে আমাদের কি হইবে? হয় কলম ছাড়িতে হয়, না হয়, যেরূপে পারি, মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতে হয়। নিজের কথায় নিজের ভাব আমি ব্যক্ত করিব, তাহাতে অন্যের কথা কহার স্বত্ব কতদূর আছে, জানি না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই দলের লোক দুই দিক্ হইতে কুঠার লইয়া তাড়া করেন। সুতরাং এক এক সময়ে বোধ হয় " * * * তত্র মৌনং হি শোভতে", কিন্তু আবার যখন অঙ্গুলী-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না বিশেষ এই যে যখন কর্ত্তব্যবোধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন পাঁচ জনের কথায় তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। যে কোন ভাষাই হউক, যে কোন রচনাপ্রণালীতেই হউক, যদি দুটা ভাল কথা বলিতে পারি, পাঁচ জনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিব কেন?

তবে ভাল কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি, তাহা হইলে পাঁচ জনের গালা-গালি দিবার বাস্তবিক অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ কথাটা ভাল কি মন্দ, সে দিকে লক্ষ্যও করেন না। নাই করুন, কথাটা ভাল করিয়া বলা হইয়াছে কি না, তাহাও দেখেন না। দেখেন কেবল লেখার

* মুদ্রিত পাঠে 'তাহার'।—সম্পাদক—।

মধ্যে বড় বড় সংস্কৃত কথা আছে কি পারসী ও ইংরেজী শব্দ আছে। মারামারি করেন কেবল তাহাই লইয়া। সুতরাং আমার মত ক্ষুদ্র লেখকবর্গের সেই বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও গোলযোগ। যখন দুই দল দুই দিক ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন, তখন উভয় দলের মনরক্ষা করা অসম্ভব। অথচ যে দলের মনরক্ষা না হইবে, তিনিই কুঠার উত্তোলন করিয়া লেখকের প্রতি ধাবমান হইবেন। এ অবস্থায় লেখকবেচারা বিষম সমস্যায় পড়িয়া যায়।

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না? এ সঙ্কট হইতে কি পরিত্রাণের উপায় নাই? বঙ্গীয় লেখককুল কি এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন? তাঁহারা কি কূলে উঠিতে পারিবেন না? সমালোচকদিগের এই বিষম রোগের কি উপশম হইবে না? উপশম নাই হউক, ইংরেজীতে বলে রোগের নির্ণয় অর্দ্ধেক উপশম। এ রোগের কারণ নির্ণয়ের কি কিছু চেষ্টাও হইবে না?

অনেকগুলি সুচিকিৎসকের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া আমরা ইহার কতক কারণ ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি বলিতে পারি না, কতক অনুভব করিয়াছি। যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এ স্থলে কুঠারের ভয় করিলে চলিবে না। যদি আর কেহ অন্য হেতু প্রদর্শন করিতে পারেন, নিরতিশয় আনন্দ সহকারে শ্রবণ করিব।

কথাটী এই যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজী পড়িয়াছেন না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে, তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

এখন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃ-ভাষায় জ্ঞান সুদূরপরাহত হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালা তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বুঝিল, আর কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে? সে ত দেশীয় ভাষা নহে। সে অনুবাদকদিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্টভোজনে জাতিপাতের ভয় করে, অথচ লেখকমহাশয়েরা তাহা-দিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন। এই গেল এক দলের কথা :—

আবার যখন অনুবাদকদিগের এইরূপ দীর্ঘছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্দের" নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরেজী পড়া অপেক্ষা বাঙ্গালা পড়ায় অভিধানের অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাঙ্গালা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন,

তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃতের সং পর্য্যন্ত শুনিলে চটিয়া উঠেন। এমন কি, ইঁহারা সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরেজী শব্দ, পারসী শব্দ ও দেশীয় শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃত শব্দ প্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না। এই গেল আর এক দলের কথা। সুতরাং এই উভয় দল যে পরস্পরবিরোধী হইবেন, এবং বঙ্গীয় লেখকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, আপত্তি কি?

আমরা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা এ পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ইতিহাস দ্বারা এইটী সমর্থন করিব।

সকলেই জানেন, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল। ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। কৃত্তিবাস, কাশীদাশ অনুবাদ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে দু পাঁচটী অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও উহা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। গদ্য না থাকিলেও ভদ্র সমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে, তাহাকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহে। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দু শব্দ মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহুসংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দু ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালীওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা, তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।

ইংরেজেরা এ দেশ দখল করিয়া ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বহুসংখ্যক আদালত স্থাপন করায় এবং আদালতে উর্দ্দ ভাষা প্রচলিত রাখায় বাঙ্গালাময় পারসী শব্দের কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল মাত্র। সাহেবেরা পারসী শিখিতেন, বাঙ্গালা শিখিতেন। দেশীয়েরা দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন। সুতরাং ইংরেজী কথা বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। যাঁহারা ইংরেজী শিখিতেন বা ইংরেজের সহিত অধিক মিশিতেন, দেশের মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকিত না।

কথক মহাশয়েরা বহুকালাবধি বাঙ্গালায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা

সংস্কৃতব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল জমকাল বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ভাষার অনুসরণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল, তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাঙ্গালায় একঘরে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন কি, দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত, কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতাসহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা যে সকল অপ্রচলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারই তর্জ্জমা আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি-পরিবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। যিনি 'কাদম্বরী' তর্জ্জমা করিয়াছিলেন [তারাশঙ্কর তর্করত্ন], তিনি লিখিলেন, "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" আমরা পূর্ব্বে যে তিন ভাষার উল্লেখ করিয়াছি, ইহার সহিত তাহার একটীরও সম্পর্ক নাই।

এ ত গেল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ। ইংরেজী হইতে অনুবাদ একবার দেখুন। "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরতবিনির্গতজলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটী প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।" * ইংরেজী পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'জীবনচরিত' পুস্তকের (১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ) "সর আইজাক নিউটন" শীর্ষক রচনা হইতে উদ্ধৃত।—সম্পাদক—।

এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ক্রমেই সাধারণের দুর্ব্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। অথচ এডুকেশন ডেস্প্যাচের কল্যাণে সমস্ত বঙ্গবাসী বালক এই প্রকারের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজীওয়ালারাও লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গালায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজীওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজীতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। "তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা-নিঃসারিণী, লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃপ্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয়া পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ-সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।"* এ ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্ত্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্ত্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণীর পরিবর্ত্তে আবর্ত্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত

* এই দীর্ঘ বাক্যটি অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম ভাগের (১৮৭০ খ্রীঃ অঃ) উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত।—সম্পাদক—।

অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দুই পাঁচ জন হয় একখানি অভিধান, না হয় এক জন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।

এই সকল কারণ বশতঃ বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা শিখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটীকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহুসংখ্যক সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।

গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতীকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালার বহুল চর্চ্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত প্রমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংরেজীর অতিরিক্ত চর্চ্চা হওয়ায় বহুসংখ্যক ইংরেজী শব্দ ও ভাব বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার যো নাই।

ভট্টাচার্য্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা বাঙ্গালা নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মত লেখকের গতি কি? হয়, ইংরেজী, পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতময় যে ভাষায় ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তা চলে, সেই ভাষায় লেখা, না হয় যাহার যেমন ভাষা যোগায়, সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরীব লোকের যথেষ্ট উপকার করা হয়। যত দিন না বলিতে পারেন, তত দিন কুঠার আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

বঙ্গদর্শন
শ্রাবণ, ১২৮৮

গ্রাডুএট

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইঁহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইয়াছে; একটী মুগ্ধবোধ-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটী হাইলি-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। এক প্যাটেণ্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; অপর প্যাটেণ্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জ্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জ্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী, সংস্কৃত পার্সি ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেণ্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদর্শিতার নামও নাই। উদাহরণ দেখুন,—সংস্কৃত-ব্যাকরণ-কারেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, পদরাশিকে দুই ভাগে ভিন্ন বিভক্ত করা যায় না। সেই জন্য তাঁহারা লিখিলেন—পদ দুই প্রকার—সুবন্ত ও তিঙন্ত। তাঁহাদের সংস্কার 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত', বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা; তাঁহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন; কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণকে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এ সকল স্থলে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক্। তাঁহারা দেখিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভক্তি দিতে হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন ইংরেজী

ব্যাকরণকারেরা parts of speech দেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে দুই দিতে হইবে। নৈলে বাহাদুরী হয় না, বই বিক্রী হয় না; কিন্তু দুই রকম ব্যাকরণ হইতে দুই রকম নিয়ম চুরি করিয়া নিজের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। আবার দেখুন সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, কারক স্বতন্ত্র জিনিস। কারক অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তি দুইটী স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র; ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না; কিন্তু ইংরেজীতে Caseএর লক্ষণ অন্যরূপ; নাউনের কণ্ডিশন্ দেখাইয়া দিলে Case হয়; সুতরাং Caseএ ও কারকে আকাশ পাতাল তফাত। ইংরেজীতে পসেসিভ্ কেস্, সংস্কৃতে উহা কারক নহে; কিন্তু অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইংরেজীতে বিভক্তি বলিয়া জিনিস এক। পসেসিভের আপষ্টফি এস্ আছে, আর বহুবচনে কিছু পরিবর্ত্তন আছে; সুতরাং কর্ম্মবাচ্যস্থলে ইংরেজীতে মোটামুটি কর্ত্তাকে নমিনেটিভ কেসই বলে; কিন্তু সংস্কৃতে কর্ম্মবাচ্যের সব্জেক্টকে ঐরূপে কর্ত্তাকারক বলিলে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা দুই চারি খান্ ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে, কর্ত্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা,—'ছাগলে পাতা খায়'; করণকারকেও অধিকরণ কারক হয়; যথা 'ছুরিতে কাটে' 'মুখে খায়' ইত্যাদি। এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালীশুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিভক্তির আকার লইয়াই কত গোলযোগ আছে। কেহ লিখিলেন, বিভক্তির আকার এইরূপ :—

প্রথমা	ঃ				রা	
দ্বিতীয়া	কে	রে	য়	তে	দিগকে	দের
তৃতীয়া	দ্বারা				দিগের	দ্বারা
	দিয়া	এ	য়		দিগকে	দিয়া
চতুর্থী	কে				দিগকে	
পঞ্চমী	হইতে				দিগের	হইতে
	থেকে				দিগের	থেকে

ইত্যাদি। কেহ বা প্রথমার বিসর্গের পরিবর্ত্তে ফাঁক দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে যেমন বিভক্তির রূপগুলি আছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ থাকা চাই, নইলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি 'দ্বারা' 'দিয়া' বিভক্তি হইল কিরূপে? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না। 'আমাদিগের দ্বারা' 'আমার দ্বারা' দিব্য সম্বন্ধ পদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব উহা বিভক্তি? 'ছুরি দিয়া কাটিবে' এ স্থলে 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া; কর্ম্ম 'ছুরি'; কি বলিয়া 'দিয়া' কে করণের বিভক্তি বলিব? অথচ সকল ব্যাকরণেই দেখি 'দিয়া' করণের বিভক্তি। কেমন করিয়া বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তাহার পর আবার 'দিগকে' বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু 'দিগকে' কি আমরা কখনও ব্যবহার করি? পশ্চিম রাঢ়ে 'দিগ্‌গে' একটা কথা আছে বটে; আমাদেরও পুরাণ দলিলাদিতে 'আমার দিগরের' দেখিতে পাই বটে; কিন্তু 'দিগকে' কখনও দেখিতে পাই না, কখনও বলিও না। যখন 'আমার দিগরকে' ব্যবহার করিত, তখন 'দিগর' বিভক্তি ছিল না। 'দিগর' পারস্য শব্দ—অর্থ গণ। যদি বিভক্তি বলিতে হয়, যেটুকু জমাট বাঁধে, সেইটুকু 'দের'। বিভক্তি বলিতে গেলে 'দের'কেই বলিতে হয়। কিন্তু সে 'দের' কর্ম্মের বিভক্তি, সম্বন্ধের বিভক্তি, অধিকরণেরও বিভক্তি।

অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাঙ্গালায়ও সম্প্রদান কারক নাই। কিন্তু মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্টই হউক, আর হাইলি প্যাটেণ্টই হউক, উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই এক খানি ব্যাকরণে "ধোপাকে কাপড় দিলাম" সম্প্রদান কারকের উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' যে সম্প্রদান হয় না, আর তা লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কারেরা অনেক মাথা কুটাকুটি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শোনেই বা কে আর পড়েই বা কে। বাঙ্গালা ব্যাকরণকার দেখিলেন, দান ক্রিয়ার কর্ম্মকেই সম্প্রদান বলে; সুতরাং রজক কেন সম্প্রদান হইবে না? সংস্কৃতওয়ালারা বলেন, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূল ব্যাপারকে দান বলে; রজককে যে বস্ত্র দেওয়া গেল, তাহাতে স্বস্বত্বেরও ধ্বংস হইল না, পরস্বত্বেরও উৎপত্তি হইল না; তবে রজককে বস্ত্র দান করা হইল কিরূপে, রজকই বা সম্প্রদান হইল কিরূপে?

তার পর সন্ধি—বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ—'অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়—আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়'। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে 'রাম আইস' এ স্থলে 'রামাইস' কেন হইবে না, 'তখন অবিনাশ বলিল' 'তখনাবিনাশ বলিল' কেন হইল না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর। সংস্কৃত ব্যাকরণে পদান্ত সন্ধি আছে; সুতরাং কোন কোন ব্যাকরণকার সংজ্ঞাপ্রকরণের পরেই সন্ধি আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় পদান্ত

সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে; থাকিলেই "পাঁচ পণ বিচালি কিনিলাম, তথাপ্যাকচালাখানা বাঁধা হইল না" এইরূপ প্রয়োগ হইবে। বাস্তবিকও বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমে সন্ধি দেওয়া কেবল চিন্তাশূন্যতার পরিচয়। সংস্কৃতে লিখিত কাশ্মীরী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটী সূত্র "সন্ধিঃ পদেষু" "ন বাক্যেষু"। কাশ্মীরীদের যে সুবুদ্ধিটুকু আছে, বাঙ্গালীর সেটুকু নাই; অনেক ব্যাকরণে "পদের অন্তে স্থিত নকারের পর ল থাকিলে নকারের স্থলে ল হয় এবং অনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়"; যথা,—"বিদ্বাল্লিঁখতি" এইরূপ সূত্র ও পদ আছে। আবার "পদের অন্তস্থিত একার অথবা ওকারের পর অকার থাকিলে অকারের লোপ হয় ও লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে"। বলুন দেখি এসকল ব্যাকরণকারকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়!

কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে 'যদ্যপি' 'অদ্যাপি' 'অতএব' 'ইতস্ততঃ' ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এস্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে এরূপ স্থলই ত অতি অল্প; তার পর সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙ্গিবার জন্য ইচ্ছাও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই। আর যদি ঐ কটা সংস্কৃত শব্দের জন্যই ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি শিখিতে হয়, তাহা হইলে অমন অনেক জমাট বাঁধা ইংরেজী শব্দ আমরা বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার জন্যও ত সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন, যথা,—'মানোয়ারি গোরা'। এইরূপ পার্সী শব্দেরও করিতে হয়, যথা,—'সিরাজ উদ্দৌলা' 'নিজাম উল্মুলুক' ইত্যাদি। হিন্দী শব্দেরও করিতে হয়; ফরাসী শব্দেরও দিতে হয়।

বাঙ্গালায় সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না; যথা,—'রেল ওয়ে' 'কমল আঁখি' 'জ্যাকেট আস্তেন' 'নিলাম ইস্তাহার' 'বাঙ্গালা ইতিহাস' 'সংস্কৃত অভিধান' 'বাঙ্গালা অভিধান' 'তুমি আমি' ইত্যাদি। তবে যে সকল সমাস-করা পদ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি থাকে; যথা 'মহাশয়' 'দেবালয়' 'বিদ্যালয়' 'কুশাসন' ইত্যাদি। তবেই নিজ বাঙ্গালা ভাষায় সমাসেই হউক আর অসমাসেই হউক, সন্ধির দরকার নাই। তবে সন্ধির আর এক দরকার হইতে পারে কৃতে ও তদ্ধিতে; এখানেও সেই কথা; যে সকল শব্দ সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি আছে, নিজ বাঙ্গালায় নাই। তদ্ধিত যথা,—'বাড়ী-ওয়ালা' 'ঘড়ী-ওয়ালা'; কৃৎ যথা,—'দেওন' 'লওন' 'লইয়া' 'যাইয়া' ইত্যাদি। সুতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে একেবারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র

শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন।

সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাঙ্গালায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে, যে সংস্কৃত ব্যাকরণ একবারেই ছাড়িয়া দিবার যো নাই। আমরা একথা স্বীকার করি না। লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি কিছু বেশী হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'তেল' শব্দ সংস্কৃতে 'তৈল', প্রাকৃতে 'তেল্ল', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তেল'। আমরা যদি 'তেল' লিখি, চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন? যদি অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যবস্থা শুনি, তাহা হইলে 'তৈল' শব্দ প্রয়োগ করিলেই অপ্রযুক্তত্ব দোষ আসিয়া পড়িবে। 'কাজ' শব্দ প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন; এখনকার পণ্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত 'কার্য্য' শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া 'কায' অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন দেখি 'জ' শুদ্ধ না 'য' শুদ্ধ। আমরা ছেলেদের যাদু বলিয়া আদর করিয়া থাকি; পণ্ডিতদিগের সংস্কার উহা যাদব শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা 'যাদু' লিখিয়া থাকেন; কিন্তু যাদব শব্দ হইতে ছেলেদের আদর অর্থ আসে কেমন করিয়া? আসিবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই। যদুবংশে উৎপন্ন বলিলে যদি আদর হয়, তবে রঘুবংশে উৎপন্ন বলিলে আদর হইবে না কেন? বাস্তবিক 'জাদু' শব্দটী 'যাদব' হইতে উৎপন্ন নহে: সংস্কৃতে ছেলেদের আদর করার জন্য 'জাত' একটী শব্দ আছে, প্রাকৃতে উহা 'জাদ' হয়, তাহা হইতেই বাঙ্গালায় 'জাদু' হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ য দিয়া 'যাদু' লিখিলে খাঁটি ভুল হইয়া যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতমূলক দুটী শব্দ একই অর্থে বাঙ্গালায় চলিত আছে, আমরা লিখিবার সময় সংস্কৃতমূলক শব্দটী ব্যবহার করি, আর কথা কহিবার সময় প্রাকৃতমূলক শব্দটী ব্যবহার করি—'অদ্য'—'আজ', 'কল্য'—'কাল'; কেন 'আজ' 'কাল' লিখিলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না? আমরা ত দেখি অর্থের কোন ব্যত্যয়ই হয় না; তবে কেন সাধ করিয়া চলিত শব্দ ত্যাগ করি, আর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলেদের মানের বইএর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিই। গোড়ায় ত সেই আহাম্মুকি করি, আবার শেষ রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সন্ধির সূত্র মুখস্থ করিয়া মরি।

শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটী কৌতুকের কথা মনে পড়িয়া গেল। এক জন সুবুদ্ধি বাঙ্গালা-ব্যাকরণকার প্রাতিপদিকের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলেও বিকৃত হয় না, আর এক জাতীয় শব্দ বিকৃত হয়; যাহারা বিকৃত হয় না, সংস্কৃতে তাহাদের অব্যয় বলে, সেইজন্য যাহারা বিকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে সংস্কৃতে, না আছে বাঙ্গালায়। যদি বা সংস্কৃতে

ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও উহার অর্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা কোন-ক্রমেই হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বিভক্তিতে বাঙ্গালা শব্দের কোন বিকারই হয় না, সেগুলিও তবে অব্যয় হইয়া যাউক। বাস্তবিক বাঙ্গালায় তিন চারিটী বই বিভক্তি নাই। তাহার মধ্যে আবার 'এ' বিভক্তিটী সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মত প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন কি? ইংরেজীতে বিভক্তি দুটী বই নাই, বাঙ্গালায় চার পাঁচটী আছে, সুতরাং বিভক্তিটা একেবারে লোপ করিলে চলিবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ, তখন ও দুটা বাল্যকাল হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার 'মিশ্র ক্রিয়া'। তাঁহারা বলেন 'আহার করা', 'প্রচার করা' এ সকল 'মিশ্র ক্রিয়া', অর্থাৎ ক্রিয়াটার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া; দুইএ মিশিয়াছে বলিয়া উহার নাম 'মিশ্র ক্রিয়া'। পাণিনির চৌদ্দপুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি 'আহার করা' ক্রিয়া না হয়, তবে 'অন্ন আহার করিতেছেন' এস্থলে 'অন্ন' কর্ম্মকারক কিরূপে হইবে? সুতরাং 'মিশ্র ক্রিয়া' অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'করে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'আহার', 'অন্ন' ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না; 'অন্ন' পদটী 'আহার' এই কৃদন্ত পদের কর্ম্ম। সংস্কৃতে যেমন কৃদন্ত পদের কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, বাঙ্গালায় সেরূপ কৃদন্ত পদের কর্ম্মের রূপান্তর হয় না। কিন্তু পণ্ডিত-মানীরা বাঙ্গালার শক্তি যে সংস্কৃতের শক্তি হইতে বিভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন না, সুতরাং 'আহার' এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় নাই দেখিয়া 'আহার'টাকে শুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দুই এক জন বাঙ্গালা লেখক এরূপ স্থলে 'অন্নের আহার করিতেছেন' এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা আছে। "আহার করিতেছেন" বা "অন্ন আহার করিতেছেন" ইহা ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'তিনি খাইতে বসিয়াছেন' বা "তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন"। কিন্তু আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহা লিখিতে চাহি না। "Familiarity breeds contempt", কিন্তু এই contempt সম্পূর্ণ অমূলক; উহাদের দ্বারা ভাষার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে না। উহাতে একার্থ-বোধক বহুতর শব্দ ভাষায় জমিয়া যাইতেছে, বহুতর ভাব সংগৃহীত হইবার পথে কণ্টক হইতেছে। বালকেরা নিরর্থক কতকগুলা শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটী অধ্যায় আছে; কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে এ অধ্যায়টী নহিলে চলে না, কারণ তাহাতে সবর্ণ ও অসবর্ণ ভেদের প্রয়োজন; সেই জন্য বোপদেব বর্ণের উচ্চারণস্থান দিয়া বলিলেন "এষাং যো যেন সমঃ স তস্য তত্র ততঃ"। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে কোথায়ও সবর্ণ শব্দেরও প্রয়োগ দেখি না। অথচ উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে মুগ্ধবোধকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে; মুগ্ধবোধে স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণের, অন্তঃস্থ স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ সকল না থাকিলে এ অধ্যায়ই হয় না। মুগ্ধবোধকার, কেন অমুক শব্দ অমুক স্থান হইতে উচ্চারিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যান নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ-কারেরা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময়ে অনেক কৌতুককর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন, শ ষ স এবং হ উষ্মবর্ণ, কারণ এই সকল বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখ দিয়া **গরম বাতাস** নির্গত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ, কারণ উহারা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহাদেরও যে উচ্চারণস্থান, উহাদেরও সেই উচ্চারণস্থান। "অযোগবাহ" শব্দের পাণিনি ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রয়োগ নাই। 'অযোগ' অর্থাৎ শিবসূত্রসমূহে যোগ নাই, অথচ 'বাহ' অর্থাৎ ব্যাকরণের কার্য্যনির্ব্বাহক, পাণিনির এই অর্থ। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা বলি বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ অধ্যায়টী রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সপ্তমবর্ষীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টী অতি কষ্টে মুখস্থ করে; কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটা প্রয়োগও পায় না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের আর একটা বিস্মোল্লায় গলদের কথা বলি—তাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতেছি; কিন্তু লক্ষণ লেখেন "যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ"; অর্থাৎ সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দ ব্যবহার করেন; কিন্তু লক্ষণ দেন ইংরেজী গ্রামারের। সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদন্তে শব্দা অনেন" অর্থাৎ "ইটিমলোজি—ডেরিভেশন্"। বাস্তবিকই মুগ্ধবোধাদিতে পদটী তৈয়ার করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যাকরণের কার্য্য; ইংরেজীতে যাকে Syntax বলে, সে সম্বন্ধে ব্যাকরণকারেরা বড় ব্যস্ত নহেন। ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—অর্থোগ্রাফি, ইটিমলোজি, সিণ্ট্যাক্স, পংচুয়েসন্ এবং প্রসডি, সময়ে সময়ে উহাতে Figures of Speech এবং "Composition"ও থাকে; সংস্কৃতে কিন্তু Orthographyর জন্য শিক্ষা নামে শাস্ত্র, Syntax এর জন্য বাদার্থ, "Prosody"র জন্য ছন্দঃ শাস্ত্র, Figures of Speech এর জন্য অলঙ্কার শাস্ত্র আছে; Punctuation ও Compositionএর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র

নাই। ব্যাকরণ শুদ্ধ Etymology মাত্র; সেই ব্যাকরণকে Grammarএর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কি না, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে। অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণকারের এবিষয়ে উদ্বোধ হইয়াছে; এজন্য তাঁহারা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব', 'বাঙ্গালা ভাষাবোধ' প্রভৃতি নাম দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার কতকগুলি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম; বারান্তরে বিস্তারিত বর্ণনার বাসনা রহিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১ম সংখ্যা, ১৩০৮

ব্যাকরণব্যবসায়ী না হইলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজ মাতৃভাষার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অনন্যসাধারণ ও সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল তাহার প্রমাণ উপরের প্রবন্ধটীতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব একটা প্রকৃতি যে আছে এবং তাহা সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি হইতে পৃথক, এই সহজ জ্ঞানটুকু অনেকেরই মনে উদিত হয় নাই—বিশেষতঃ সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিতজনের। বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে এইরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় আমরা রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণে পাই এবং তাহার পরে অন্য দুই একজন বাঙ্গালী ব্যাকরণকারও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের সাধু ভাষায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত কতগুলি প্রয়োগ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং যে সময় এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছিল তখনকার দিনে ইহার দ্বারা অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় Common sense বা সহজ বুদ্ধি দ্বারা যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এখনও দুর্লভ।—সম্পাদক—।

সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ *

আজ আমাদের অতি শুভদিন। আজ বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। এই সম্মিলন ছয়বার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল বারই মফঃস্বলে—সদরে, কলিকাতায় এই প্রথম। সম্মিলনের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদিগের এবার যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, এত উদ্যম ও অধ্যবসায় পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। এই বিশাল সভাগৃহে, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় জীবন কাটাইতেছেন, যাঁহারা সেই সাহিত্য সেবায় বিপুল যশোলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহারা নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা ভাষা হইতে নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে উপহার দিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষা হইতে নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষার কাব্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য রচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, যাঁহারা নানা মাসিকপত্র লিখিয়া, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমাজস্থ কি ইতর, কি ভদ্র, সকল লোককেই শিক্ষা ও আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা গদ্যে, পদ্যে, গানে, গীতে, দেশস্থ লোকদিগকে মোহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এখানে দেখিতে পাইতেছি।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে : "জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—বঙ্গ-বিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্ট ভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলন-সাধন এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউন-হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পরিষৎ-পরিচয়' পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)। রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব অনুযায়ী বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্বে

এ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শুভ সম্বৎসর। ভারতবর্ষে, আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে, বাঙ্গালা ভাষার স্থান অতি উচ্চ হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে ইহার গৌরব তত বিস্তৃত হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুসংখ্যক পুস্তক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইলেও ইয়ুরোপ অঞ্চলে বঙ্গীয় লেখকগণের কৃতিত্ব কেহ এ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এবৎসর শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইয়ুরোপ তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছেন [১৯১৩ খ্রীঃ অঃ]। তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব স্বীকারই করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় লেখকগণের সেজন্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

৬ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাঙ্গালা সাহিত্য

আমাদের এ বৎসরের উদ্যোগ আরও শুভফল প্রসব করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতে অনেক টাকা খরচ করিয়া আসিতেছেন। সভা করিয়া, সমিতি করিয়া, সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়া, উপাধি দানে ভূষিত করিয়া, তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এবার স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল —আমাদের পরমভক্তিভাজন রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিনিধি, সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সম্মিলনের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া, সম্মিলনের—বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালীদিগের যে উপকার সাধন করিলেন, বঙ্গবাসী তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

লর্ড কারমাইকেল ও বাঙ্গালা সাহিত্য

লর্ড ক্লাইব ও লর্ড হেষ্টিংস বাঙ্গালা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাহার পর প্রায় সকল বঙ্গেশ্বরই ইংরেজীতে বাঙ্গালীর সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু আমাদের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সাহেব শত শত গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বাঙ্গালীর প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন ও

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ২৭–২৯ চৈত্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্মিলনে যে-অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩২১) ছাপা হয়। এই সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সেই অভিভাষণটী 'মানসী' পত্রিকায় ছাপা হয় (বৈশাখ, ১৩২১)। এই সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিভাষণও 'মানসী' পত্রিকার ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমরা এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণটী মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার ইতিহাস এবং এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালপর্য্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার তথ্যভূয়িষ্ঠ আলোচনা হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিভাষণটীর বিশেষ মূল্য আছে। এই অভিভাষণটী আধুনিক পাঠকের পক্ষে আরও উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে আমরা [ ] বন্ধনীর মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান তারিখ দিলাম। 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধটী অনেক বিষয়ে পরস্পরের পরিপূরক।—সম্পাদক—।

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। সেদিন অধ্যাপক-মণ্ডলীর উপাধি বিতরণে তিনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি বাঙ্গালা ভাষাতেও সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাসনকর্ত্তার এইরূপ বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ সাহিত্য-সম্মিলনের আর একটী শুভফল।

এরূপ সভায় সমাগত সভ্যমণ্ডলীর অভ্যর্থনার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইতাম। যাঁহারা সভাসমিতিতে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন, সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে যাঁহারা চিরাভ্যস্ত, সভাসমিতি সংগঠন করিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, এরূপ কোন বিখ্যাত বাগ্মীর হস্তে এ ভার ন্যস্ত হইলে, আমার মনে বিশেষ তৃপ্তি হইত। যাঁহারা আমায় এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং আমি সেজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে, তাঁহাদের কাজ মনের মত না হওয়ায় শেষে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। আমার ভয় হয়, পাছে আমার দোষে তাঁহাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয়। আমার ভয় হয়, পাছে আমার ত্রুটিতে তাঁহাদের সঙ্কল্পিত ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

এবার কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য বড়ই অল্প। মফঃস্বলে সাহিত্য-সম্মিলন হইলে অভ্যর্থনা-সমিতি হন গৃহস্থ, নিমন্ত্রিত সভ্যমণ্ডলী হন অতিথি। সুতরাং অতিথিকে যেরূপ সম্মান করা উচিত গৃহস্থকে তাহা বিশেষরূপে করিতে হয়। এবার কলিকাতায় অধিবেশন হওয়ায়, কে গৃহস্থ, কে অতিথি, চিনিয়া উঠা ভার হইয়াছে। কে এমন বঙ্গবাসী আছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়, কলিকাতার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই? সুতরাং কলিকাতায় সকল বঙ্গবাসীই গৃহস্থ, সকল বঙ্গবাসীই অতিথি। অতএব অভ্যর্থনা-সমিতির কোন ত্রুটি হইলে, সকলেকেই সেটী আপনার ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

উপস্থিত সম্মিলনের বিশেষত্ব

এইরূপ পরস্পর ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আপনারা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি হয়, বাঙ্গালা সাহিত্য যাহাতে সৎপথে চলিতে পারে, বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা যাহাতে দেশের লোকের মনে উদার ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মসম্মান ও আত্মজ্ঞান জন্মে, যাহাতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে দেশের ধনাগম হয়, যাহাতে দেশের যে সকল কলঙ্ক আছে, সে সকল দূর হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করুন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি

দেশের লোককে ভাল ও মন্দ পথে লইয়া যাইবার বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষমতা প্রভূত। সেকালে ভাট ও চারণেরা রবাব ও বীণায় গান করিয়া রাজপুতদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিত। সাহিত্যের প্রভাবে, বক্তৃতার প্রভাবে, বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষীয় এমন কি সমস্ত এসিয়ার লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া

গিয়াছিল। দেশীয় সাহিত্য লোককে যে পথে চালায় লোকে সেই পথে চলে। আপনারা সেই সর্ব্বশক্তিমান সাহিত্যকে হাতে পাইয়াছেন। আপনারা এই সাহিত্যের দ্বারা দেশের যাহাতে ধনাগম হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, আত্মসম্মান রক্ষা হয় ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ জগৎটাকে কিছুই নয় বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যে এ দিকে দৃষ্টি একেবারেই ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টি জীবনের ওপারে কেবল পরলোকের দিকেই ছিল, তখন কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি হয় নাই। জীবিকা উপার্জ্জন, প্রাণধারণ এত কঠিন ব্যাপার হয় নাই। তাঁহাদের দিনে তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা শোভা পাইয়াছে।

ইহকাল ও পরকাল উভয় দিকে

তাঁহারা ভিক্ষা পাইতেন; লোকের ছিল, তাহারা ভিক্ষা দিত। সাহিত্যসেবিগণ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। কিন্তু এখন জগতের গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে, এখন ভিক্ষা পাওয়া যায় না। ভিক্ষায় আত্মসম্মান রক্ষা হয় না। তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা আপনারা বঙ্গবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে "পরিশ্রমের মাহাত্ম্য" (Dignity of labour) শিক্ষা দিউন। ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত করুন। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশবাসীকে যে পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে আপনারা তাঁহাদিগকে কতকটা নিবৃত্ত করুন, তাঁহারা পরকাল পরকাল করিয়া লোককে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন, আপনারা তাঁহাদিগকে ইহকালের কথাও স্মরণ করাইয়া দিন। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিন যে, ইহকাল ও পরকালের পরস্পর সংস্রব ও সম্পর্ক অতি নিকট ও অতি ঘনিষ্ঠ। যখন ইহকালে থাকিয়াই পরকালের চেষ্টা করিতে হইবে, তখন ইহকালকে একেবারে উপেক্ষা করা কোন মতে উচিত নয়, আপনাদের সাহিত্যে যেন এ উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতি ও নিমন্ত্রিতবর্গ

অদ্যকার সমাগমে ২৪ পরগণা ও কলিকাতার লোক গৃহস্থ আর যত বাঙ্গালী সকলেই অতিথি। বাঙ্গালী বলিতে গেলে আগে কলিকাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং এবার গৃহস্থ ও অতিথির লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। তথাপি চিরন্তন প্রথা অনুসারে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। বলিতে হইবে আমরা তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা এস। আমরা বলিতে গেলে কলিকাতার লেখকমণ্ডলী ও ২৪ পরগণার লেখকমণ্ডলী। কলিকাতার কথা পরে বলিব, সূচিকটাহের ন্যায় আগে ২৪ পরগণার কথাটা বলিয়া রাখি। অনেকের সংস্কার যে

চব্বিশ পরগণা ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে

২৪ পরগণা অল্পদিন পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। এ অল্পদিন বলিতে গৃহস্থের অল্পদিন বুঝায় না, ভূতত্ত্ববিদের অল্পদিন বুঝায়। বাঙ্গালার অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা ২৪ পরগণা যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ২৪ পরগণা জেলাকে 'বুড়নিয়ার দেশ' বলিত অর্থাৎ

বর্ষাকালে উহা জলে বুড়িয়া যাইত। এখন বুড়নিয়ার দেশ আছে, কিন্তু তাহা ২৪ পরগণা হইতে কিছু দূরে। বুড়িয়া যাইত বলিয়া যে দেশে লোক ছিল না বা সাহিত্যচর্চ্চা হইত না, এমন নয়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ২৪ পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পুথিপাঁজি লিখিতেন, ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তমলুক বন্দর লোপ হইলে পিছলদা ও ছত্রভোগ সমুদ্রযাত্রীদিগের প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইত। গঙ্গার ধারে যে সকল গণ্ড-গ্রাম ছিল, তথায় যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম্ম ও সাহিত্যচর্চ্চা হইত। খড়দহ গ্রাম বহুদিন হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সমাজস্থান ছিল। মাইনগর ও জাগুলিতে কায়স্থদিগের বড় বড় সমাজ ছিল। কুমারহট্ট বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থান ছিল। খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত যে কাটি-গঙ্গা আছে, তাহা যখন কাটা হয় নাই, তখন অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, গাঁড়ুলে, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, চাণক, খড়দহ, শুকচরপানিহাটী, কামারহাটী, এড়েঁদহ, বরাহনগর, চিৎপুর, কলিকাতা, ধলণ্ড, কালিঘাট, চূড়াঘাট, জয়ধুলি, ধলস্থান, বারুইপুর, ছত্রভোগ ও পিছলদা এই সকল গণ্ডগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের বৃদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরীর বাড়ী কুমারহট্টে। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি ভাই কুমারহট্ট হইতে যাইয়া নবদ্বীপে টোল করিয়াছিলেন। পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত চৈতন্যদেবের একজন প্রধান সেবক। বরাহনগরের ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন। তেমন সরস, সুমধুর ও তানলয়বিশুদ্ধ পদ্যানুবাদ, বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত আর কখনও হয় নাই।

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে

ইহার কিছুদিন পরেই ২৪ পরগণার পূর্ব্বাঞ্চলে কতকগুলি মুসলমান পীর ও ফকিরের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বহুসংখ্যক ভিক্ষুহীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লন। পূর্ব্বে যে বালাণ্ডা পরগণার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে এক্ষণে আর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় না, সব মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যে মাদুর বোনা বালাণ্ডা পরগণার প্রধান সম্পত্তি, সে মাদুর এখন মুসলমানেই বোনে। যে সুন্দরবন এককালে কালু রায় ও দক্ষিণ রায় নামক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষের লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন তাহা বনবিবি ও সা জঙ্গুলীর লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। বড়গাজী, বড়পীর, পীর গোরাচাঁদ প্রাচীন বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধাচার্য্যদিগের স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং মুসলমানী বাঙ্গালায় আপন আপন পীরত্বের কিচ্ছা লিখিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বনবিবির জহুরানামা অতি আশ্চর্য্য। বনবিবি ও তাঁহার ভাই সা জঙ্গুলী আল্লার দরবার হইতে

বনবিবির জহুরানামা

আসিয়া মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপর হুকুম থাকে যে, তাঁহারা সুন্দরবন দখল করিবেন। সুন্দরবন তখন দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব। তিনি বড়ই পরাক্রান্ত দেবতা। জলে তিনি কুমীরে চড়িয়া বেড়ান, ডাঙ্গায় তিনি বাঘে চড়িয়া বেড়ান। বাঘ ও কুমীর তাঁহার বাহনও বটে, সেনাও বটে। ফকিরেরা তাঁহার সহিত লড়াই করেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাই বনবিবির ও সা জঙ্গুলীর আবির্ভাব। ইঁহারা মদিনা হইতে ভাঙ্গড়ে উপস্থিত হইলে ভাঙ্গড়ের বড় গাজী তাঁহাদিগকে দক্ষিণ রায়ের পরাক্রমের কথা কহিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ রায়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া 'যুদ্ধ দাও' বলিয়া বসিলেন। দক্ষিণ রায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার মা নারায়ণী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই কত্তে যাবে। হারলে বড়ই লজ্জা, জিৎলে নাম নাই। তুমি থাক, আমি লড়াইয়ে যাই।" নারায়ণীতে ও বনবিবিতে সাতদিন লড়াই হইল। কাহারও জয় পরাজয় হয় না। এমন সময় একদিক হইতে বিষ্ণু ও অন্য দিক হইতে আল্লা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধি হইয়া গেল। বনবিবি সমস্ত সুন্দরবনের বাদশাহ হইলেন। দক্ষিণ রায় আঠার ভাঁটির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ আঠারটী ভাটায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অধিকার পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বনবিবির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইল। সা জঙ্গুলী এবং অন্যান্য পীরেরা বনবিবির অধীনে সুন্দরবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পীর গোরাচাঁদের পুথি

পীর গোরাচাঁদ কোথা হইতে আসিলেন, জানা যায় না। তবে তিনি চন্দ্রকেতু রাজা ও তাঁহার তিন পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া ও তাঁহাদের বধসাধন করিয়া অনেকটা দেশ দখল করিয়া লইলেন। হাড়োয়া গ্রামে তাঁহার আস্তানা আছে। সেখানে এখনও মেলা হইয়া থাকে। পীর গোরাচাঁদ এখন হিন্দু ও মুসলমান সকলের আরাধ্য দেবতা, কারণ তিনি মুস্কিলে আসান করিয়া থাকেন। অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে যে, ফকীরেরা এখনও "পীর গোরাচাঁদ মুস্কিলে আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা করে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালায় সের সাহের আবির্ভাব হয়। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমানভাবে দেখিতেন। আপনারা অনেকেই যবন হরিদাসের বৈষ্ণব হইবার কথা শুনিয়াছেন। আরও শুনিয়াছেন যে, রামচন্দ্র খাঁ, হরিদাস বৈষ্ণব হওয়ায়, তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল। সে সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। রামচন্দ্র খাঁর বাড়ী ২৪ পরগণার উত্তর সীমার নিকটে। উহাকে কাগজপুকুর বলে। রাম খাঁর পুত্র ভুবনেশ্বর কবিকণ্ঠাভরণ সের সাহের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সের সাহ ক্রমে যখন বিহার, অযোধ্যা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা দখল করিয়া বাদশাহ হইলেন, তখন এই সকল দেশে ভুবনেশ্বর সের সাহকে দিয়া অনেক গ্রাম ও ভূমি

ব্রাহ্মণদিগকে দান করাইয়াছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণ সের'সাহের সহিত নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তকের বলে তিনি এক অতি প্রকাণ্ড Encyclopaedia আরম্ভ করেন। সংস্কৃতে আঠারটী বিদ্যা আছে। তিনি সেই আঠারটী বিদ্যারই এক একটী Encyclopaedia লিখিবার চেষ্টা করেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের গ্রন্থ নেপালে ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লণ্ডন নগরে আছে। এই দুই গ্রন্থে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যত লোক সঙ্গীত ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এরূপ Encyclopaedia লেখার কথা মনে হইলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল পাঠানের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে চব্বিশ পরগণায় বিশেষ কোন উৎপাত ঘটে নাই। কারণ শেষ পাঠান সুলতান দায়ূদের প্রধান কর্ম্মচারী বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়া আপন জায়গীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার জায়গীর যমুনা হইতে সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমস্ত চব্বিশ পরগণা, যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ এই জায়গীরের অধীন ছিল। বিক্রমাদিত্য যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন ২৪ পরগণায় শান্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া বাদশাহকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুরী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রের উপকূলভাগ দখল করিয়া লইলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার সময় সংস্কৃত-সাহিত্যের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় কুশদহ পরগণায় একজন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণসিদ্ধান্ত কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য নানারূপ কৌশলে তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোন সমকালীন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক খবর পর্টুগীজ মিশনারীদিগের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে পাটনা নগরে বিজ্জলদেব নামে একজন চৌহান রাজা ছিলেন। তিনি জগমোহন নামে একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের একখানি Gazetteer প্রস্তুত করেন। উহার নাম 'দেশাবলী বিবৃতি'। উহাতে প্রতাপাদিত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, সমস্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য অনেকবার মোগল সৈন্য পরাজিত করিলে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর আমেরের রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্য বন্দী হন। তাঁহাকে খাঁচায় পুরিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যে সকল লোকের সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করেন,

প্রতাপাদিত্য

তাঁহাদের একজনকে ২৪টী পরগণা দেওয়া হয়। সেই জন্য এ অঞ্চলের নাম ২৪ পরগণা হইয়াছে। বিজ্জলদেবের পুস্তকে টাকী ও কুশদহের অনেক বর্ণন আছে। টাকীর চৌধুরীরা চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লন এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। এ অঞ্চলে তখন অনেক সিদ্ধ পুরুষের বাস ছিল, তাহার মধ্যে কুশদহের কৃষ্ণসিদ্ধান্ত ও গুণানন্দ প্রধান। ইঁহারা উভয়েই কালীভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণসিদ্ধান্ত প্রতাপাদিত্যের গুরু ছিলেন ও গুণানন্দ তাঁহার স্থাপিত যশোরেশ্বরীর পুরোহিত ছিলেন। টাকীর চৌধুরীদের আদিপুরুষ দুর্লভ গুহ। তাঁহার পুত্রের নাম ভবানীদাস গুহ। ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র ছিল।

এই সময়ে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েরা তাঁহাদের আদি নিবাস নিমতা হইতে বড়িষায় গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিমতানিবাসী কায়স্থ কবি কৃষ্ণরামও বড়িষায় যান। সেখানে দক্ষিণ রায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেন। তিনি বলেন, "মাধবাচার্য্য আমার মঙ্গল লিখিয়াছে: কিন্তু সে মঙ্গল আমার পছন্দ হয় নাই, সে ইতিউতি করিয়া বই সারিয়াছে। তুই ভাল করিয়া আমার মঙ্গল লেখ, তোর মঙ্গল গাহিবার সময় যে মন দিয়া না শুনিবে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে। আর তুই যদি না লিখিস তাহা হইলে তোকেও বাঘে খাইয়া ফেলিবে"। রায় মহাশয়ের ভয়ে কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'রায়মঙ্গল'খানি বেশ বই। রায়মঙ্গল লিখিতে তাঁহার হাত বেশ পাকিয়া যায। তাহার পর তিনি 'কালিকামঙ্গল' লেখেন। কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের গল্প। বিদ্যাসুন্দরের গল্প লইয়া অনেকেই কালিকামঙ্গল গান করিয়াছেন। কিন্তু কালিকামঙ্গলের আদি কবি কৃষ্ণরাম। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হইবার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল লিখিত হয়। বাঁকুড়া হইতে কালিকামঙ্গলের এক পুথি পাওয়া গিয়াছে। সেখানি ইং ১৭৫৩ সালে হাটখোলায় এক সওদাগরের গদিতে উহার দোতলা ঘরে নকল করা হয়। দক্ষিণা একজোড়া কাপড় ও দুটী টাকা। ইহার পর বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি ১৭৩১ সালে কলিকাতায় বসিয়া প্রাকৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ করেন। ১৭৫৩ সালে হালি-সহর নিবাসী কবি রামপ্রসাদ সেনের অন্নদামঙ্গল রচিত হয়। ঠিক এই সময় আবার ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ও রচিত হয়। ভারতচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে মূলাজোড়ে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, তাঁহার গ্রন্থ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে লিখিত হয় বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কতকগুলি সুপণ্ডিত দাক্ষিণাত্য বৈদিক দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া ২৪ পরগণায় বাস করেন। রাজপুর, হরিনাভি মজিলপুর তাঁহাদের আদিস্থান। সেখান হইতে তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণে অনেক গ্রামে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন

করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেলে একজন পাশ্চাত্য বৈদিক ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী ভাটপাড়ার ঠাকুরগোষ্ঠী হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হয়। দেশের বাণিজ্য সমস্তই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশের শিল্পও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে কলিকাতা বঙ্গদেশের, এমন কি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ২৪ পরগণার ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত। সুতরাং ২৪ পরগণার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কলিকাতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি ২৪ পরগণার অনেক প্রধান প্রধান লেখক ও পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া উহার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের জীবনচরিত লিখিতে গেলে, এমন কি নাম উল্লেখ করিতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমরা এইস্থলে কয়েকজন মাত্র প্রধান লেখকের বৃত্তান্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

প্রথম রামনারায়ণ তর্করত্ন। ইঁহার নিবাস হরিনাভি। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক লেখেন। তাহার মধ্যে কয়েকখানি সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত নাটকের যাহা দোষগুণ, সমস্তই তাহাতে বর্ত্তিয়াছে। এখানে তাহার সবিস্তার সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে যে দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' [১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ] হাস্যরসের নাটক; রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে যে বহুবিবাহপ্রথা চলিতেছিল, ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার দোষ দেখাইতে গিয়া এই গ্রন্থে তৎকালে যে সকল বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য টিকি ও দীর্ঘ ফোঁটার জোরে জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহাদের প্রতিও যথেষ্ট কটাক্ষ করা হইয়াছে। ঘটক মহাশয়েরা শত মুখে পরের বংশাবলী বর্ণনা করিতেন। একেবারে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বর ও কন্যা পর্য্যন্ত উভয় কুলের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু নিজের পিতার নাম করিতে বলিলে মাথা চুলকাইতেন। বলিতেন, "কি জানেন, পরের বাপ, যা হয় তাই একটা বলিয়া দিলাম। কিন্তু নিজের বাপের বেলা কি সে রকম করা যায়?" কুলীন মহাশয়েরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়াও কেবল পূর্ব্বপুরুষেরা কেহই কুল ভাঙ্গেন নাই, এই গুণে সর্ব্বত্র সমাদর পাইতেন, ও শত শত বিবাহ করিতেন। এই নাটকে একজন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের গল্প আছে। তাঁহার নাম অভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উপাধি লইয়া অভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে তাঁহার বিদ্যার দৌড় অত্যন্ত অধিক। তিনি বলেন,

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কন শুন সমাচার॥

দ্রৌপদী কান্দিয়া কহে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
অধিকার করিলেক রাজত্ব লঙ্কার॥

পণ্ডিত মহাশয় হাস্যরসের বর্ণনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, উপরিলিখিত ঘটনা হইতে তাহার অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার 'নবনাটক'খানিও [১৮৬৬ খ্রীঃ অঃ] বর্ত্তমান সমাজের চিত্র। এখানিতে কিন্তু হাস্যরসের নামও নাই। প্রেম ও শোকের উচ্ছ্বাসে ইহা পরিপূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয় অনেকদিন স্বর্গস্থ হইয়াছেন। লোকের রুচি ফিরিয়াছে। তাঁহার নাটকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু যে কেহ তাঁহার নাটক পড়িবে, সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার মত অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। অধ্যাপনা-কালে ইংরেজী শিখিয়া তিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস তর্জ্জমা করিয়াছিলেন; অনেকগুলি সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সোমপ্রকাশে'ই তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। সোমপ্রকাশ নূতন ধরণের সংবাদপত্র। ইহাতে ইংরেজী সংবাদ-পত্রের ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করেন [নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ]। পরে উহার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। সোমপ্রকাশের সংস্কৃতবহুল ভাষা সেকালের লোক অত্যন্ত পছন্দ করিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও নিজেই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে তিনি 'কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। সে মাসিক পত্রেরও যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। মুঙ্গের ও জামালপুরের কেরাণী মহাশয়েরা সেই মাসিকপত্রে লিখিতেন ও যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পেন্সন লইয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিনি খুব হিসাব করিয়া চলিতেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রাখিয়া ধনে মানে বিভূষিত হইয়া পরলোকগমন করেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংবাদপত্রসমূহের তিনিই আদি।

প্রায় তিন শত বৎসর পুর্ব্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটী কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঘোষাল মহাশয় বহুদিন যাবৎ প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্য লাভ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার আর কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটী তোমায় দিয়া

বঙ্কিমবাবু

গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিবে।” ঘোষাল মহাশয় কহিলেন, “আমার দিনই চলে না, কি করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব।” তিনি কহিলেন, “আমি আসা পর্য্যন্ত যেরূপে পার চালাও, আমি আসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।” কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একখানি তালুক লিখিয়া দিয়া গেলেন। ঘোষাল মহাশয়েরা বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভীমেলে দুইজন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুইটী কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাইদিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোকগমন করিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল তাহারই বংশে বঙ্কিমবাবুর জন্ম। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাধাবল্লভের সেবায়েৎ এবং নবাবী ও ইংরেজী আমলে রাজসরকারে চাকরী করেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সর্ব্বপ্রথম যে চারিজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী প্রদান করেন, তাহার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর পিতা একজন। বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর প্রথম বৎসরের প্রথম বি, এ। কলেজ ছাড়িয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীতে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি আই ই উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইয়ুরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরেজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার ‘সংবাদ প্রভাকর’ সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিনজন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নবেলগুলি বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার মধ্যে দুই একখানি ইংরেজীর ছায়া লইয়া লিখিত হইলেও অধিকাংশই বঙ্কিমবাবুর নিজের। বঙ্কিমবাবুর নবেল হইতে বাঙ্গালার কি প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্য, “Knowledge filtered down” করিবার জন্য ‘বঙ্গদর্শন’ নামে মাসিকপত্র বাহির করেন। তাহার কথা কিছু বলিব। তিনি ৪ বৎসর মাত্র এই মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। এবং এই চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনই বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ মাসিক পত্র হইয়া আজিও রহিয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ নিজে লিখিতেন তাহা নহে, তিনি অনেককে লিখিতে শিখাইতেন। ইউনিভার্সিটীর অনেক গ্রাজুয়েট তখন বঙ্গদর্শনে লিখিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যে বাঙ্গালা

লিখিতে গেলে দুইটী জিনিসের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়—Clearness ও Perspicuity। পুঁটুলীপাকান লেখা তিনি একেবারে দেখিতে পারিতেন না। যাহা বলিবার আছে একেবারে সোজাসুজি বল। তোমার লেখা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথা ঘামাইতে হইবে কেন? এই চারি বৎসরের পর বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকে। তারপর তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদকের ভার লইয়া ৪।৫ বৎসর বঙ্গদর্শন চালান*। এ কয়েক বৎসরও বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের প্রধান লেখক। কিন্তু এবার তিনি একটু সুর ফিরাইয়াছিলেন। এবার তিনি নবেলে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মকে আবার বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। তাহাতে আবার দুই দল হয়। একদল একেবারে পুরাণ সব ফিরাইয়া আনিতে চান; আর একদল বলেন, না বাপু তাহা হইবে না। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দুয়ানী করিতে গেলে আর চলিবে না। কিন্তু হিন্দুয়ানীটা ফিরাইয়া আনা চাই। বঙ্কিমবাবু এই শেষোক্ত দলের কর্ত্তা ছিলেন। সেই জন্য আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে 'প্রচার' নামক আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন [শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ]। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু আমাদের এখানে থামিতে হইবে, কারণ পুঁথি বাড়িয়া যায়।

২৪ পরগণার কথা এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু কলিকাতার কথা সবিস্তার বলিতে গেলে অনেক Volume লিখিতে হয়; সুতরাং ছাঁটিয়া বাছিয়া কেবল মোটা কথা বলিয়াই শেষ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা গঙ্গাতীরে একখানি গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাসও অনেক ছিল, এমন কি উহা ব্রাহ্মণসমাজও ছিল। রাজা তোডরমল কলিকাতা নামে একটী পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার প্রধান নগর বলিয়াছেন কলিকাতা। সুতরাং তাঁহার সময় কলিকাতা শুদ্ধ যে গণ্ডগ্রাম ছিল তাহা নহে, একটী পরগণার মাথা হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৯২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা তিনটী গ্রাম কিনিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত। কিনিবার ছয় বৎসরের মধ্যেই কোম্পানী কলিকাতায় একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। গঙ্গার ধার হইতে সেই কেল্লা লালদিঘী পর্য্যন্ত বিস্তৃত

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী সুধা'র ভূমিকায় (পৃঃ ১৫–১৬) বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইতোবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটী ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল।...১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি [সঞ্জীবচন্দ্র] আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন।"—সম্পাদক—।

ছিল। এখন সে কেল্লার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে উইলসন সাহেব তাহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। কোম্পানীর আমলেও কলিকাতায় বাঘ আসিত। এক ব্রাহ্মণ বাঘের ভয়ে রাত্রিতে এক সোণারবেণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার জ্ঞাতি গোত্রেরা তাঁহাকে জাতিতে লইলেন না। তাঁহার বংশধরেরা আজিও সোণারবেণের ব্রাহ্মণ হইয়া রহিয়াছেন। আমি একথা ওই ব্রাহ্মণের প্রপৌত্রের নিকট শুনিয়াছি। গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটীতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত বসতি ছিল। তাহার পূর্ব্বে কোথাও চাষ হইত। কিন্তু অধিকাংশ ছিল বন এবং জল। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতা কেমন করিয়া সমস্ত বঙ্গের ও ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হইল, সে কথা সকলেই জানেন, তাহার পুনরুক্তি বৃথা। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, জলাভূমির মধ্যস্থলে একটী পুকুর কাটিয়া সেই মাটী দিয়া তাহার চারিপাশের জমী উঁচু করিয়া, সেই উঁচু জমীর উপর সকলে বাস করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালেও কলিকাতার অনেক জায়গায় মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে চাষ হইত। ক্রমে কলিকাতা নগর এই তিনটী গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া চারি দিকেই অনেক দূর অবধি গিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে লণ্ডন ছাড়া এত বড় সহর আর নাই। এবং এসিয়াখণ্ডেও পিকিন ছাড়া এত বড় সহর আর নাই। আমরা এ সহরের ইতিহাস প্রদানে অক্ষম। তবে এখানে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু দিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ বাঙ্গালায় 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ করেন। সে অনুবাদখানি আমি পড়িয়াছি; তাহার ভাষা এবং ছন্দ অতি সুন্দর। কবিবর রামপ্রসাদ কলিকাতায় কোন সওদাগরের বাড়ী চাকুরী করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে হিসাব রাখিতে হইত। তিনি কিন্তু হিসাবের খাতার চারিপাশে কালীবিষয়ক গান লিখিয়া রাখিতেন। একদিন সওদাগর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাই তিনি অতি দুঃখে লিখিয়াছেন—

যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম
দেশ বিদেশে,
তখন ভাইবন্ধু দারা সুত
সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন নাই
আমায় দেখে সবাই রোষে।

রামপ্রসাদের কালীবিষয়ক কবিতাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগে। ভিখারীরা যখন দ্বিপ্রহর বেলায় রামপ্রসাদী সুরে কালীবিষয়ক গান করে, তখন দারুণ গ্রীষ্মেও শরীর জুড়াইয়া যায়। রামপ্রসাদের পর কলিকাতায় দিনকতক সাহিত্য যেন চুপচাপ হইয়া যায়।

ইংরেজেরা তখন দেশের প্রকৃত রাজা হইয়াছেন, কিন্তু স্বহস্তে দেশপালনের ভার লন নাই। সে সময়টাকে অরাজকতা বলা যায় না বটে, কিন্তু সেটা বড় ভীষণ সময়। দেশে শান্তি ত একেবারেই ছিল না, চুরিডাকাতিও যথেষ্ট ছিল। ক্রমে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় শান্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কবিওয়ালার দল কবি গাইতে আরম্ভ করিলেন। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির কবির লড়াই লোকে হা করিয়া শুনিত। উভয় পক্ষেরই গোঁড়া ছিল। হারজিৎ কবির যত হোক না হোক, গোঁড়াদেরই হইত। গোঁড়ারা বহু দূর হইতে কবি শুনিতে আসিত এবং হারজিৎ হইলে অপর পক্ষকে খুব টিট্‌কারী দিত। কবি হইতে ক্রমে হাফ আখড়াই, তাহার পর সখের যাত্রা, তারপর পেশাদারী যাত্রা, তারপর সখের থিয়েটার, তারপর পেশাদারী থিয়েটার হইয়াছে। উত্তরোত্তর কাব্যাংশে শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে। অনেকে কবিওয়ালাদের নাম শুনিলেই নাক সিঁটকাইয়া বলেন যে, উহারা কেবল খেউড় গাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক সময় উহাদের গানে যথেষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পাইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাফ আখড়াই-এর দল বড় প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা গান বাঁধিত, গান গাইত ও কতকটা কবির দলের মত ছিল। তাহার পর সখের যাত্রার আরম্ভ হয়। আমরা বালককালে প্রথম সখের যাত্রার গল্প শুনিয়াছি। কলিকাতার বাবুরা অনেকে একত্র হইয়া একটা সখের যাত্রার দল করিয়াছিলেন, ইহার বড় জাঁকজমক ছিল। যাত্রার দলের ছেলেরা কিন্তু প্রায়ই মাহিনা পাইত। যাত্রার মাঝে মাঝে সং হইত। প্রথম সং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার। বিচারের বিষয় এটা—"কামিনী কি যামিনী?" এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় নস্য লইয়া দীর্ঘ টিকি নাড়িয়া বলিলেন "এটা কামিনী," আর একজন বলিলেন "এটা যামিনী।" ক্রমে এক হাতে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনে আসরের দুই কোণে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে আসরের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়া ঝুটাপুটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের রাজপরিবর্ত্তন ঘটে। অন্যান্য দেশে রাজবিপ্লবে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ও হাঙ্গাম হুজ্জুত হয়, এদেশে ততদূর ঘটে নাই। ইংরেজেরা এই ৪০ বৎসরের ভিতর ধীরে ধীরে প্রথমতঃ সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যের ভার, তাহার পর রাজস্বের ভার, তাহার পর দেওয়ানীর ভার, তাহার পর ফৌজদারীর ভার, তাহার পর পুলিশের ভার গ্রহণ করেন। লড়াই ঝগড়া হয় নাই বলিলেই হয়; তথাপি রাজপরিবর্ত্তন হইলেই লোকের মনে একটা ত্রাস হয়। সে ত্রাসের সময় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেই পারে না। সে সময় যাঁহারা রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য করেন, যাঁহারা সামাজিক শাসন করেন, তাঁহাদেরই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক হয়। তাই আমরা এই ৪০ বৎসরের মধ্যে বড় বড় লেখক, কবি, গ্রন্থকার দেখিতে পাই না। এসময়কার বড় বড় লোক মহারাজা নন্দকুমার, মহারাজা নবকৃষ্ণ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নীলমণি

ঠাকুর, রাজা গোকুল ঘোষাল। ইঁহারা ইংরেজের চাকুরী করিয়া অথবা ইংরেজের সহিত কারবার করিয়া প্রভূত ধন, মান, পসার ও প্রতিপত্তি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্তের পরও দেশে ঠিক শান্তি স্থাপিত হয় নাই, লোকের মনের ত্রাস যায় নাই। কারণ তখনও চুরি ডাকাতি বড়ই অধিক হইত। কিন্তু তথাপি কলিকাতায় বিশেষ গোলযোগ ছিল না। এবং কলিকাতা হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। সূক্ষ্ম ইতিহাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। ইঁহার নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। ইনি চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র। কিন্তু ইনি আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন এবং অনেক ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরেজী ভাষা শিখিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি ইঁহার আস্থা কমিয়া যায়। ইনি বেদান্ত ও উপনিষদের ধর্ম্ম যথার্থ হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গালায় গদ্য রচনার সূত্রপাত করেন। ইনিই প্রথম বলেন যে গবর্ণমেণ্ট দেশের লোককে সংস্কৃত বা আরবী শিক্ষা না দিয়া ইংরেজী শিক্ষা দিন। ১৮১৭ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট যখন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন ইনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন ['অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল,' ১৮২২ খ্রীঃ অঃ] এবং বাঙ্গালায় একখানি ব্যাকরণ লিখেন *। ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থাকিলেও এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে [১৮২৮ খ্রীঃ অঃ] হিন্দুরা ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে এক ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন [১৮৩০ খ্রীঃ অঃ]। সভায় রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। নৈহাটীনিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বাঞ্চলে নিমন্ত্রণে গিয়া একটী পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ শিশুকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং তাহাকে ব্যাকরণ সাহিত্য ও ন্যায় শিক্ষা দেন। সেই বালকই পরিণামে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। নৈহাটী হইতে আসিয়া তিনি দিনকতক রামমোহন রায়ের নিকট চাকুরী করেন। পরে সে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মসভার লেখক হন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিলে গৌরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার তাহার জবাব দিতেন। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইত লোকে আগ্রহ সহকারে সেইগুলিই পাঠ করিত। কেহ বা রামমোহনের জয় দিত, কেহ বা গৌরীশঙ্করের জয় দিত। বলিতে গেলে বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রন্থের এই উৎপত্তি। গৌরীশঙ্কর 'সংবাদ ভাস্কর' নামে একখানি খবরের কাগজ বাহির করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার দেখাদেখি 'সংবাদ প্রভাকর' বলিয়া

* রামমোহন রায়-প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজীতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, তারপর বাঙ্গালাতে ('গৌড়ীয় ব্যাকরণ') ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।—সম্পাদক—।

এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান পুরুষের নামোল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের প্রতিভা শুদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দুসমাজের আরও নানা ব্যাপারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন যে সকল ব্যক্তির নাম করিতেছি, সাহিত্যই ইঁহাদের মহারথ এবং ইঁহারাই সাহিত্যের মহারথী। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত এই মহারথিকুলের সর্ব্বপ্রথম। ইনি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার নিবাস চুপী। ইনি বহুদিন কলিকাতায় বাস করেন এবং জীবনের শেষাংশে গঙ্গাতীরে বালি গ্রামে বাস করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহুকাল বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের স্কুলপাঠ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল পুস্তকের বিষয় তিনি অধিকাংশই ইংরেজী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও লোকে তাঁহাকে এই সকল প্রবন্ধের জন্য অধিক চেনে এবং তাঁহাকে মান্য করে, কিন্তু এগুলি তাঁহার প্রধান কার্য্য নহে। যে গ্রন্থের জন্য তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহার নাম "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" [১ম ভাগ ১৮৭০ খ্রীঃ অঃ, ২য় ভাগ ১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ]। ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত কি ইংরেজী, কি জার্ম্মান, কি ফ্রেঞ্চ, কি লাটিন, কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থেও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক সম্প্রদায় আছে মোটামুটী তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা প্রণালী ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন তিনি উইলসন সাহেবের Hindu Sects নামক গ্রন্থ হইতে সকল কথাই লইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। উইলসনের Hindu Sectsএ যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা তাঁহার পুস্তকে আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি উইলসনের Hindu Sects হইতে কিছুই লন নাই। তৎকালে কলিকাতায় একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ ব্যক্তি কলিকাতায় কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি উড়িয়া, কি মাড়োয়ারী সকল জাতিরই সহিত বেশ মিলিতে পারিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তাহাদের নিগূঢ় খবরগুলি আনিয়া দিতে পারিতেন। তিনিই উইলসন সাহেবেরও মুরুব্বি, তিনিই অক্ষয়কুমার দত্তেরও মুরুব্বি। সুতরাং দুইখানি পুস্তকের অনেক কথা একই রূপে লিখিত হইয়াছে। আমাকে যাঁহারা বলিয়াছেন, এই ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু স্কুলের ছাত্র। তিনি প্রথম হইতেই ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিবাস সাগরদাঁড়ী। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। মধুসূদন হিন্দুস্কুলে পড়িতে পড়িতেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ

করেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ও বড়ই একগুঁইয়া ছিলেন। তিনি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে কলিকাতা হইতে পলাইয়া মান্দ্রাজে গিয়া এক ফিরিঙ্গী রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং সকল ভাষা হইতেই ভাল ভাল ভাব বাছিয়া লইয়া আপনার কবিতার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়ে যে কেহ পদ্য লিখিত, মিল করিয়া লিখিত। মাইকেল বলেন এরূপ মিল করিয়া লিখিতে গেলে ভাব প্রকাশের অসুবিধা হয়। তাই তিনি মিলের বন্ধন কাটাইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে অনেকেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি কোন পণ্ডিত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যকে বিদ্রূপ করিবার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরী বধ' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা অনেকেরই মনে নাই। মাইকেলের মেঘনাদবধ এখন বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তখন নাটক লিখিতে গেলে সকলেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিত। মাইকেল ইহার বড় বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি নূতন ধরণে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লিখিলেন। পাইকপাড়া রাজবাটীর থিয়েটারে বিপুল আয়োজনের সহিত উহার অভিনয় হইল। অভিনয় খুব জমিয়া গেল। নাটকে সংস্কৃতের অনুকরণ এই হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

Michael Madhusudan Dutta was wayward as a son, wayward as a husband, wayward as a father, wayward as a student, but his waywardness in poetry alone payed.

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেলের কাব্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মাইকেলের কাব্যের সমালোচনা করেন। মাইকেলের কাব্য পড়িয়াই তাঁহার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার কবিতাবলী সকল বাঙ্গালীরই অতি আদরের জিনিস। বঙ্কিমবাবু তাঁহার বৃত্রসংহারের সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃত্রসংহার জনসমাজে বিশেষ আদর পায় নাই। তাঁহার দশমহাবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট কবিত্ব দেখাইয়াছেন। যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ।

হেমবাবুর ন্যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মহাকাব্য পদ্মিনী জনসমাজে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে।

ইঁহাদের পর আমাদের খ্যাতনামা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাবলী ও গীতাবলীর মধুর স্বরে ও মধুর ভাবে কেবল বঙ্গবাসী নয় সমস্ত জগতকে তিনি মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন ও তাঁহার সম্মুখে তাঁহার গুণগান করা প্রণালীবিরুদ্ধ বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও অধিক বলিতে পারিলাম না।

২৪ পরগণার কথা বলিতে গিয়া বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল বলিয়াছি। কলিকাতায় কত নভেল-লেখক ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রমেশ-বাবুর নাম না করিলে নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে। রমেশবাবু বঙ্গমাতার একটী কৃতী সন্তান। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া, এমন কি ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে, ইংরেজীতে দক্ষ ও বৃহস্পতি ছিলেন। রমেশবাবু নিজে সিবিল সার্ভিসে অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্যে যত প্রতিপত্তি, সাহিত্যে তত নহে। কি ইংরেজীতে কি বাঙ্গালাতে এই দুয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক নভেল-লেখকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি ঋগ্বেদের বাঙ্গালা তর্জ্জমা প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন *।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম নাটকগুলি সংস্কৃতের অনুকরণে লিখিত হইত, কিন্তু অভিনয় ইংরেজী ধরণেই হইত। কারণ সেকালে হিন্দুদের যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ছিল, যেরূপে সেই গৃহ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইত, তাহা এখনও লোকে জানে না। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সেকথা জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং থিয়েটারও ইংরেজী ধরণে হইত, অভিনয়ও ইংরেজী ধরণে হইত, পটপরিবর্ত্তনাদিও ইংরেজী ধরণে হইত। মাইকেলও ইংরেজী ধরণে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটারটা পুরা ইংরেজী ধরণের হইয়া গেল। প্রথম ২০।৩০ বৎসর থিয়েটার বড়লোকের বাড়ীতেই হইত। তাঁহারা যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন তাঁহারাই দেখিতে পাইতেন, অন্য কেহ পাইত না। ১৮৭১।১৮৭২ সালে পেশাদারী থিয়েটার আরম্ভ হয়। প্রথম পেশাদারী থিয়েটার এক ভদ্রলোকের দালানে হইয়াছিল, তারপর ইংরেজী ধরণে থিয়েটার গৃহ হইতে লাগিল। মাইকেলের পর প্রধান নাটক-লেখক দীনবন্ধু মিত্র। ইনি সামাজিক ব্যাপার লইয়াই নাটক লিখিতেন। সামাজিক ব্যাপারে ঠাট্টা করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম ছিল। যদিও সেই সময়ের ব্যাপারেই তাঁহার নাটকগুলি খাটে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে উহা চিরদিনই আমোদের বস্তু হইয়া থাকিবে। কারণ দীনবন্ধুবাবুর লেখা বড়ই সরল এবং তাঁহার ভাব বড়ই গভীর। সমাজের মধ্যে সেখানে যে দুর্নীতিটুকু ছিল, তিনি সেটুকু খুলিয়া দেখাইয়া দিতেন। আর লোকে হাসিয়া অস্থির হইত। তাঁহার নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, জামাইবারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো ইত্যাদির

* রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ঋগ্বেদ সংহিতার বাংলা অনুবাদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ রূপ 'বৃহৎ কার্য্যে' রমেশচন্দ্র যাঁহাদের নিকট 'সহায়তা প্রাপ্ত' হইয়াছিলেন, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তাঁহাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইঁহাদের মধ্যে 'সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন: "তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন. তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"—সম্পাদক—।

অভিনয় আজিও হয় এবং লোকেও এই সকল গ্রন্থ পড়িয়া বড়ই আনন্দ বোধ করে। প্রথমে ইংরেজী শিখিয়া, মদ খাইয়া, অখাদ্য খাইয়া যে সকল যুবক উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিত, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দীনবন্ধু মিত্র যে সধবার একাদশী লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হাস্যরসের নাটক আজিও বাঙ্গালায় হয় নাই। তাহারা কথায় কথায় Shakespeare quote করিত, Byron Quote করিত, কেহ হিতোপদেশ দিতে আসিলে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিত; কাহারও কথা শুনিত না, কাহাকেও মানিত না। কিন্তু তাহাদের পরিণাম অতি বিষম হইত। দীনবন্ধুবাবু সেইটী সধবার একাদশীতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর পর নাটককারদিগের মধ্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রধান। তিনি বহু গভীর ভাবের নাটক লিখিয়াছেন। তিনি অনেক বাঙ্গালা নভেল ও অনেক ইংরেজী নাটক অবলম্বনে বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর মাইকেল হইতেও বিভিন্ন। মাইকেলের লাইনে লাইনে অক্ষরগুলি মিলিত, ইঁহার তাহাও মিলিত না, কোন লাইনে ষোলটী অক্ষর কোনটীতে বা মোটে তিনটী। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারেরা যে শান্তিরস লইয়া নাটক লিখিতে একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে শান্তিরসকে তাঁহারা নাটক লিখিবার সময় কাব্যের নবরস হইতে একবারে ছাঁটিয়া দিয়া গিয়াছেন, গিরিশ সেই শান্তিরস লইয়া বুদ্ধদেব, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া বঙ্গসমাজকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতসেবকেরা এটীকে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া থাকেন। এই সকল নাটক সম্বন্ধে মতামত দুই প্রকার হইলেও তাঁহার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। সেগুলি অতি গভীর ভাবের সহিত লিখিত।

ইদানীং যাঁহারা সামাজিক নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলাল বসুর বিশেষ উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু অমৃতবাবু আমাদের মধ্যেই আছেন, সম্ভবতঃ এই সভাতেই উপস্থিত আছেন। জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ সাধ্যমত পরিহার করিতেছি, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব। এই কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম পরিহার করিতে পারিলে কি সুখের হইত। কিন্তু সে সুখে আমরা বঞ্চিত। তিনি গতবর্ষেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আজিকার সভায় উপস্থিত হইয়া আনন্দসম্মিলনে তিনি যোগ দিলেন না। নবদ্বীপের লোক হইলেও কলিকাতা তাঁহাকে ভুলিবে না! তিনিও অনেকগুলি নাটক লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি হাস্যরসের রচনায় দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাহিত্যে যে রসের ধারা আনিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন। তাঁহার স্বদেশভক্তিমূলক গানগুলিও দেশকে মাতাইয়াছে। অদ্য বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদের সম্মিলনে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি।

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের বড় চাকরী করিতেন। ইঁহাদের নাটকগুলি ভাল হইলেও থিয়েটার ও অভিনয়ে বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকায় একটু লম্বা হইয়াছে। সময়ে সময়ে একঘেয়ে হইয়া যায়, সময়ে সময়ে নরম হইয়া যায়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় একথাটা এর মুখে না দিয়া ওর মুখে দিলে ভাল হইত। গিরিশবাবু আর অমৃতবাবু দুজনেই থিয়েটারের লোক। নিজেই সাজেন, নিজেই থিয়েটার সাজান, নিজেই নাট্যাচার্য্য, নিজেই নট, নিজেই সূত্রধার, নিজেই কুশীলব। ইঁহাদের নাটক-গুলিতে ও সকল দোষ কিছুই নাই। ইঁহারা যাবজ্জীবন প্রেক্ষাগৃহে থাকিয়া প্রেক্ষকবর্গের গতিবিধি, মনের ভাব বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যাহা ভাল লাগে তাহাই দিতে শিখিয়াছেন। তবে এক মুস্কিল হইয়াছে; যাহারা পয়সা দেয় ইঁহাদের টান সেই দিকেই বেশী। পয়সা দেয় মুদী বাকালী, তাহারা চায় নাচ আর গান, সুতরাং ইঁহাদিগকেও গ্রন্থের মধ্যে নাচ ও গান অধিক দিতে হয়। যদি শিক্ষিতগণের সংখ্যা প্রেক্ষকগণের মধ্যে অধিক থাকিত, ইঁহাদের পুস্তক আরও ভাল হইতে পারিত। একজন নাটকলেখক একদিন আমার কাছে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাবজ্জীবন খাটিয়া নাটকের মর্ম্ম কতক জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিতে পারিলে কি হয়, আমরা মুদী বাকালীর জন্য লিখিব বই ত নয়। ভদ্রলোকের হয় পয়সা নাই, নয় তাঁহারা এবিষয়ের জন্য পয়সা খরচ করিতে রাজী নন।"

কলিকাতায় যে কয়জন লোক সাহিত্য-সেবায় অত্যন্ত বড় হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম। ইহা ছাড়া কলিকাতায় আর যে কত লোক আছেন, তার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই অল্প সময় মধ্যে তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। এরূপ নামোল্লেখের আরও দোষ আছে। অনেক সময়ে রামের নাম উল্লেখ করিয়া দেখি শ্যামের নাম না করিলে চলে না, আবার শ্যামের নাম করিয়া দেখি কৃষ্ণের নাম না করিলে চলে না। রাম শ্যাম কৃষ্ণ তিনজনের নাম করিলাম, নিজের কতকটা তৃপ্তি হইল, কিন্তু যাদু মাদু রাদুরও অনেকগুলি গোঁড়া আছেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "দেখলে, লোকটা কি একচোখো, রাম শ্যাম কৃষ্ণের নাম কল্লে, আর আমাদের যাদু মাদু রাদুর নাম কল্লে না। যাদু রাদু মাদুই কি কম।" তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে কোন গোল নাই, কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহাদের নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

কলিকাতা এতকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। আমাদের পরম ভক্তিভাজন রাজরাজেশ্বর আসিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের হিতার্থ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লী লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালার অনেকে দুঃখিত, কিন্তু আমি বলি ইহাতে আমাদের বাঙ্গালীর দুঃখ করিবার কিছু নাই, বরং আনন্দিত হইবার কথা;

কারণ বিশাল ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে কলিকাতার স্থান লণ্ডনের নীচেই। আর বিশাল এসিয়াখণ্ডের মধ্যে কলিকাতার স্থান Pekinএর নীচে। ভারতের রাজধানী উঠিয়া যাওয়ায় কলিকাতার কিছু ক্ষতি হয় নাই। রাজরাজেশ্বর স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, It is the premier city in India. যে কলিকাতা সেই কলিকাতাই রহিয়াছে ও রহিবে। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কলিকাতা যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, তাহা কিছু ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজধানী ছিল বলিয়াই হয় নাই। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজধানী উঠিয়া গেলে কলিকাতার কিছুই ক্ষতি নাই। বরং বাঙ্গালার রাজধানী ও বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া উহার উপর সকল বাঙ্গালীরই টান অধিক হইবে। সকল বাঙ্গালীই প্রাণপণে চেষ্টা করিবে কিসে কলিকাতার মান বজায় থাকে। দুই বাঙ্গালা এক হইয়া যাওয়ায় এই টান আরও বাড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর শুধু বাঙ্গালীরই ছিলেন না। তিনি বেহারী ও উড়িয়াদিগেরও লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। এখন বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালার একেশ্বর। আগে বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিলে বেহারীরা ও উড়িয়ারা বলিয়া উঠিত, আমাদের দিকে বঙ্গেশ্বরের দৃষ্টি নাই। এখন আর সে কথা কেহ বলিবে না। এখন বঙ্গেশ্বর জানেন বাঙ্গালীরাই আমার প্রজা। বাঙ্গালীরাও জানেন বঙ্গেশ্বরই আমাদের প্রভু। ভাগের প্রভু নহেন, পুরাই প্রভু।

এই ত আমাদের নিজের কথা বলিলাম। আমাদের যাহা পুঁজিপাটা ছিল, খুলিয়া বলিলাম ও খুলিয়া দেখাইলাম। আমরা সমস্ত বাঙ্গালীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, এই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারাও আগ্রহের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কে এ কথা একবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমী এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীন কালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটী অতিপ্রাচীন

সভ্যদেশ। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাঙ্গালা **Egypt** হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা **Nineva** ও **Babylon** হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু একথা স্থির, বাঙ্গালা নূতন দেশ নহে। যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গালাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটী ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা নানা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধ-বিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কি না জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত। ফা-হিয়ান তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তামা রপ্তানী হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামলজাতির একটী প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা

তামল ,জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়। এখনকার anthropologistরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ এখানে অতি অল্প দিনই আসিয়াছেন। এই কথায় অনেকেই অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গালীরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগকে আর্য্যজাতির বংশ বলিয়া গৌরব করে এবং আর্য্যদিগের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ত দেখা যায় যে, আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেমন নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের এক কোণে একটী ঢিল ফেলিয়া দিলে চারিদিকে আবর্ত্ত হইতে থাকে; প্রথম আবর্ত্ত যত উঁচু হয়, পরেরটী তাহা অপেক্ষা নীচু, তাহার পরেরটী তাহা অপেক্ষা নীচু, আর কোণে উপস্থিত হইবার সময় সে আবর্ত্ত অতি অল্পই দেখা যায়। সেইরূপ আর্য্য-আবর্ত্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি অনেক আর্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেকালে শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন খাওয়াইতে হইত; অর্থাৎ তিনি যেন শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপুরুষগণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতৃপুরুষগণকে যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া যাইতেছে, তিনি তাহা খাইতেছেন। এখনও অনেক দেশে জীবন্ত ব্রাহ্মণ দিয়াই শ্রাদ্ধ করে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ঐ কার্য্য দর্ভময় ব্রাহ্মণের করিতে হয়। অর্থাৎ এক গোছা কুশ লইয়া তাহাকে মানুষের আকার করিয়া গাঁথিতে হয়। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয় এবং পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত সকল জিনিস তাঁহাকে প্রদান করিতে হয়। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্ত্তের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিত তাহারা ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য হইত না। বেদে লেখা আছে, যদি কোন ব্রাহ্মণ মগধ দেশে বাস করেন তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট হইয়া যান। বাঙ্গালা ত আরও দূরে। এখানে বাস করিলে তিনি যে আরও নিকৃষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনৌজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেক বার

এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাঙ্গালা দেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিষ্ঠাদিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্ম্মের ভার দিতেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের প্রাণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশে। শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে নানাপ্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালায় পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নিজ বঙ্গে এবং পৌণ্ড্র-দেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট ক্ষৌম প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অন্য দুই একটী দেশেও রেশম ছিল, কিন্তু তাহা তত ভাল নহে। ঐ গ্রন্থেই আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে তুলার কাপড়ও বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

মগধসাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র প্রধান বন্দর ছিল। একটী ভরুকচ্ছ-ভরোচ ও আর একটী তমলুক। ভরুকচ্ছ হইতে আরব্সাগর পার হইয়া লোকে বাণিজ্য করিতে যাইত। এবং তমলুক হইতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইত। ভরুকচ্ছের সহিত আমাদের বড় সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বহুসংখ্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের দশ ভূমীশ্বর নামক গ্রন্থে লেখা আছে, তোমরা নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছ, কর্ম্ম কর, শীলব্রত লও, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিবে এ সকলে কিছু উপকার হইতেছে না। যখন পাটলীপুত্র হইতে কেহ সমুদ্রের পারে ব্যবসা করিতে যাইত, সে ঘোড়া গাড়ী উট বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল এ সকলে কোন কাজই হইবে না। সমুদ্রে উটও যাইবে না, ঘোড়াও যাইবে না, গাড়ীও যাইবে না। তখন নূতন প্রকার যানবাহনের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল শীলব্রতাদির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সমুদ্রযাত্রা সেকালে অভ্যস্ত ছিল। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তমলুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিতে লেখা আছে, উক্ত গ্রন্থের জনৈক রাজকুমার তমলুক হইতে জাহাজে গিয়া রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন* এবং তথায় রামেষু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ হয়। অতদিনের কথায় দরকার নাই; মুসলমান অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু পেনাঙ্ গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ বংশীদাস লিখিতেছেন যে, চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপেরও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ গেলে পর সমুদ্রে মহাঝড় উঠে। তাঁহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল। ঝড়ের মধ্যে তাহার একখানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হইল, ইহার কিছু উপায় কর। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলে সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন দূরে দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীন কালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি হইলেই দেশ সুভিক্ষ হয়। সুভিক্ষ হইলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিয়ান্ সাং বাঙ্গালার তিনটী নগরীতে দশ সহস্র সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দু ও জৈন ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কার্পাস তুলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গালা দেশ রেশমশিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। শণ, পাট, ধঞ্চে এখনও বাঙ্গালায় একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়াই ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মালয় উপদ্বীপ, পেনাঙ্ প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে তিনটী প্রধান বন্দর ছিল, মাদুরা, কলিঙ্গনগর ও তমলুক: এই তিনটীর মধ্যে তমলুক অধিক প্রসিদ্ধ। তমলুক হইতে নানাদিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোন দোষ নাই। যদি কোন দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা প্রাচীন কালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রভাবে জানিতে পারা

* মুদ্রিত পাঠ এইরূপ: "দশকুমারচরিতে লেখা আছে, তমলুক হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন"।—সম্পাদক—।

যায় যে, মগধদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কাম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক বার উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও আনামে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈব ধর্ম্মের প্রচার ছিল। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের Archaeological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেনাঙে এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে 'প্রা' বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকলে বলে মগধ হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গালা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালাই অগ্রণী ছিল। সুতরাং এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীন কালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব, এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ স্থাপন ত দূরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্যচর্চ্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবিগণ যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্পবাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ভিক্ষাজীবী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আমরা যেমন আছি তেমনই ভাল, সাহিত্যচর্চ্চায় কাজ নাই। এইবার বাঙ্গালার প্রাচীন বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চ্চার কথা কিঞ্চিৎ বলিব।

আবর্ত্তে আবর্ত্তে আর্য্যগণ অগ্রসর হইয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই এদেশীয়দিগের আচারব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য বিজ্ঞান তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদে যে খাঁটি আর্য্যদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণে এবং অন্য বেদে সে খাঁটিটুকু আর দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় যে আর কিছুর সঙ্গে যেন মিশিয়াছে। একটা মোটা কথা দেখুন; ঋগ্বেদে শূদ্রের কথা একটীবার মাত্র আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিতে শূদ্রেরা সমাজের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি লিখিয়াছেন সেই ঋষি মহিদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু নিজ গুণে ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হইয়া গিয়াছেন। যদি কেহ নিপুণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকলের চর্চ্চা করে, সেই দেখিতে পাইবে

যে ব্রাহ্মণে যে সকল নূতন জিনিস প্রবেশ করিয়াছে তাহা কতটা ঋগ্বেদের পরিণাম এবং কতটা বাহির হইতে আসিয়াছে। যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে তাহার কতটা পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে, কতটা বা পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছে। সেই খুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারিবে যে, আর্য্যেরা এতগুলি জিনিস ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন ও এতগুলি তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। এইরূপে আবার দ্বিতীয় আবর্ত্ত খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ও সূত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ হইতে সূত্রে বেশী কি আছে। সে বেশীর মধ্যে কোন্‌গুলি ব্রাহ্মণের পরিণাম, কোন্‌গুলি একেবারে নূতন। এই নূতন জিনিসগুলি কোথা হইতে আসিল? দেখা যায় যে অনেকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্যদিগের আনা নয়। এইরূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা যায় যে, আর্য্যদিগের উপর যেমন শূদ্রবর্ণ জুটিয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের উপর আর একটী বর্ণ জুটিয়াছিল, তাহাদের নাম অন্ত্যজ। আর্য্য অভিধানে যত শব্দ ছিল নূতন অভিধানেও অনেক শব্দ জুটিয়াছে। সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে সকল ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্য অভিধানে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এইরূপ আচারে বল, ব্যবহারে বল, উপাসনায় বল, দর্শনে বল, ধর্ম্মে বল, অধর্ম্মে বল, আহারে বল, অনেক নূতন নূতন জিনিস আসিয়া এই মিশ্রিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গালায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন দেখা যাইবে আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী।

এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর আরও অনেক জাতি বাঙ্গালায় আসিয়াছে। বাঙ্গালার ভাষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সিংহলের ভাষা বড় একটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এবং সিংহলী ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এই ভাষা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা কেমন ছিল, অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একার্য্য এখনও পুরাদস্তুর কেহ করেন নাই। সাহিত্য-সম্মিলন হইতে এই দুই ভাষার তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা একটু আধটু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা সংস্কৃতমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভাল করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

মধ্যে সিংহলে পালিভাষার বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। পালিভাষা সংস্কৃতমূলক। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যক। পালিমিশ্রিত সিংহলী ভাষায় কোন কাজ হইবে না। বাঙ্গালা দেশে আমরা আর এক ভাষার সন্ধান পাইয়াছি, উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র বুঝা যায়, আর কিছু

বোঝা যায় না। ক্রিয়াপদগুলি এক অদ্ভুত রকমের। এবং ইহার বিশেষ্য শব্দগুলিও এক অদ্ভুত রকমের। এ ভাষারও বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অতি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক idioms বাঙ্গালাতেই আছে, অন্য দেশে নাই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে যিনি আদি সেই লুই সিদ্ধাচার্য্যেরও গান পাইয়াছি। তিব্বতীয়েরা সিদ্ধাচার্য্যদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধাচার্য্যদিগকে আজও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। সহজিয়া ধর্ম্ম কি, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতাম যে সহজিয়া ধর্ম্ম চৈতন্য সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজিয়ার মত চৈতন্যদেবের প্রায় আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ লুই সিদ্ধাচার্য্যের গ্রন্থ ক্রমে দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিলে উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উহার সংস্কৃত টীকা লিখেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালা হইতে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করেন। সুতরাং তিনি একজন খুব বড় লোক ছিলেন। তিনি যখন লুইএর পুস্তকের টীকা করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তিনি লুইকে একজন পুরাতন ও বড়লোক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালায়ও লুইএর নাম একেবারে লোপ হয় নাই। ময়ূরভঞ্জে এবং পশ্চিমরাঢ়ে এখনও তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। দ্বারিক লুইএর নিজের চেলা। দ্বারিকেরও গান পাওয়া গিয়াছে এবং আরও অনেকগুলি প্রাচীন সহজিয়া কবির গান পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণাচার্য্য এই মতের একজন বড লেখক। তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় এই মতের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় তাঁহাকে কানু কহে। তাঁহার গানগুলি অতি সরস ও মিষ্ট। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে "কানু ছাড়া গীত নাই।" আমরা মনে করি এ কানু আমাদের কৃষ্ণ কানাই। যেহেতু এখন গান লিখিতে গেলেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাই লিখিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের এ প্রাদুর্ভাব চৈতন্যের পর; এ প্রবাদবাক্যটী কিন্তু তত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য আমি বিবেচনা করি এ কানু সেই প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণাচার্য্য বা কান্‌হ। সরোরুহপাদ বা সরহ সহজিয়া ধর্ম্মের আর একজন কবি। তাঁহার অনেকগুলি দোঁহাও পাইয়াছি। তিনি ব্রাহ্মণ মানেন না। জাতিভেদ মানেন না। ঈশ্বর মানেন না। ক্ষপণক ধর্ম্ম মানেন না। সৌগত মত মানেন না। তিনি বলেন, বুদ্ধদেব সহজিয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ও সহজিয়া মত গুরুর মুখ ভিন্ন জানা যায় না। তাঁহার মতে মানুষের মন সহজেই মুক্ত। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বদ্ধ না করিলে কে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে? অদ্বয়বজ্র

তাঁহার দোঁহাকোষের টীকা করিয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত রাজা রামপালের রাজত্বের ২৫ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামপালের রাজত্ব ৪২ বৎসর। ১০৬০ হইতে অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। অদ্বয়বজ্র তাঁহার পূর্ব্বে। সরোরুহ তাঁহারও পূর্ব্বে। সুতরাং বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকার বিস্তার হইবার তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে গান ও দোঁহা রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সময়ে আরও অনেক বাঙ্গালা গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত'। সুতরাং মহীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিস সেকালে ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। তাহার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সারনাথে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (১০২৬)। মহীপালের গীত আজিও পাওয়া যায় নাই। মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই রাজা ছিলেন। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর পরে ইঁহাদিগকে লইয়া আসা যায় না। বরং কিছু পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহাদের গীতগুলি যেমনটী লেখা হইয়াছিল তেমনটী পাই না। কারণ সেকালের লেখা পুথি পাওয়া যায় নাই। হয় যাহারা গায় তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, অথবা একালের পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; এমন কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তিযুক্ত শব্দ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সহজিয়া গীত গান ছড়া ও দোঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বদল হয় নাই। যে পুথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান অধিকারেরও পূর্ব্বের লেখা। পুথিগুলি পাকানো তালপাতায় লেখা; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত তারিখ-ওয়ালা পুথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা আছে। তাই মনে হয় যদি তিব্বতী ভাষার গ্রন্থ সব খোঁজা যায়, আরও অনেক বাঙ্গালা গানের তর্জ্জমা পাওয়া যাইবে। হয় ত তিব্বত দেশে এই সকল বাঙ্গালা গানের পুথিও আছে। সাহিত্য-সম্মিলনের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে এই সকল বিষয়ে অন্বেষণ হয় তাহার বিষয়ে চেষ্টা করা।

পালবংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রীঃ ৮০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা যে কেবল বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য নানাদেশে যাইত, তাহা নহে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও নানাদেশে যাইত। তিব্বতে তেঙ্গুর নামে ২৫২ Volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা। ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। তর্জ্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন্ দেশের লোক তাহার নাম, তর্জ্জমাকর্ত্তার

নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জ্জমাকর্ত্তা প্রায়ই দুইজন থাকিতেন। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর একজন তিব্বতীয়। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিক। এই তর্জ্জমা সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এই তেঙ্গুরের এখনও পুরা Catalogue হয় নাই। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু Catalogue হইয়াছে। সেই অল্প Catalogue মধ্যেই আমরা প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালীর নাম পাইয়াছি। এই ৫০ জনের মধ্যে বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্গদেব ধর্ম্মপালের সমকালীন। তাহা হইলেই বুঝা গেল বৃদ্ধকায়স্থ খ্রীঃ ৮০০ সালে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা অনেক কায়স্থ তেলী ও সাহাদিগের নাম পাইয়াছি। ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিব্বতীয়দিগের গুরু ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেও তাঁহারা সমস্ত তিব্বত দেশ নূতন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় মনে হয় নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরাণ কথা আছে। একটা কথা এই যে বাঙ্গালায় শান্তিপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হন। সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভূক্ষেত্র নেপালী, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান। শান্তির ভণিতাওয়ালা দুচারিটী গান পাওয়া গিয়াছে। সে শান্তিও সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। জানি না দুই শান্তি এক হইবে কি না। শান্তির গানগুলিতে ভাষার একটু বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার ক্রিয়া-বিভক্তির সহিত অন্য গানের ক্রিয়াবিভক্তি মিলে না।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজবিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বাঙ্গালা অক্ষরে পুথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারা বাঙ্গালীই ছিলেন। মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে করিয়া অনেক পুথি লইয়া যান। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস অন্বেষণ করিতে গেলে এই সকল পুথিই আমাদের প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে। নেপালের না কি জল হাওয়া ভাল, তাই সে সকল পুথি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, এখনও খুঁজিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

আমার বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আমি শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিব। এই মহাসভায় যাঁহারা অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহারা কে ও যাঁহারা অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই বা কে, তাহার পরিচয়

দেওয়া গেল। আবার বলি আমরা বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এককালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশস্থাপনে দক্ষিণ এসিয়ার মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালীরা বড় কম ছিল না। সেদিনও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙ্গালীরা মণিপুর আসাম, উড়িষ্যা ও বেহার চৈতন্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং রাজপুতানার সুদূর মরুস্থলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। অল্পদিন হইল বাঙ্গালীরা ইংরেজ রাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের ও ইংরেজ রাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহাদের যত্নে, অধ্যবসায়ে ও উদ্যমে বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্বোপরি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমন কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না। দেশের মধ্যে কত কাজ পড়িয়া আছে। সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের পিতা কোথায় রাজত্ব করিতেন এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার আমরা কিছুই জানি না। অশোকেরও পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতের একটী প্রধান নগর ছিল। কিন্তু তাহা বঙ্গের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার কিছুই জানি না। এই যে নাথেরা আবির্ভূত হইয়া নানা দিকে শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা জন্মিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানি না। এই যে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যেরা এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন কথা জানি না। এই যে ভারতবর্ষে, বিশেষ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কেমন করিয়া গিয়াছে? তাহাই খুঁজিতেছিলাম। শেষে অল্পায়াসেই বুঝা গেল বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও লোপ হয় নাই। কয়েকজন অনুসন্ধানকারীর চেষ্টায় এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাঙ্গালায় অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও চারিদিক ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব মাটীর উপরিভাগে পড়িয়া আছে। অনায়াসেই খুঁজিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু খুঁজিবার লোক কই? অনেকের আগ্রহ আছে

শক্তি নাই, অনেকের শক্তি আছে আগ্রহ নাই; অনেকে ঘরে বসিয়া কাজ করেন, বাহিরে ঘুরিতে পারেন না; অনেকে বাহিরে ঘুরিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের চোখ পরিস্ফুট হয় নাই। আবার একদল লোক আছেন, তাঁহারা কাজ করুন বা না করুন নিজের জয়ধ্বনি নিজে করিয়া লোকের কান কালা করিয়া দেন; বিদ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, বিদ্যার পুরস্কারগুলির দিকে লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন। একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন। ইতিহাস খুঁজিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পুরাতন জায়গা সকল খোঁড়া হইতেছে। পুরুষপুর, তক্ষশীলা, শ্রাবস্তী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কত গুঢ়তত্ত্ব বাহির হইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় এখনও এক কোদাল মাটীও উল্টান হয় নাই। সপ্তগ্রাম একটু আধটু খুঁড়িলে অনেক খবর পাওয়া যাইবে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণ, বিহার, বল্লালটিপি অনেক কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে। বলিবে এ সকল কথা অল্পদিনের; কিন্তু যাও না পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে, যাও না কর্ণসুবর্ণে। এ সকল জায়গা ত আধুনিক নহে, এ সকল খুড়িলে অনেক পুরাণ তত্ত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্যম কই, অধ্যবসায় কই? এইরূপ সম্মিলন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

তাই বলি, যখন আপনারা বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়াছেন, তখন যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের, বঙ্গীয় ইতিহাসের, বঙ্গীয় জীবনের গতি ফিরে, যাহাতে বাঙ্গালী উন্নতির পথে দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করুন।

৩৪ বৎসর পুর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা করিতে গিয়া আমি একবার বলিয়াছিলাম —

"আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতিশুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক, ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যদ্বাণী ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটী গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে, আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।"

এই ৩৪ বৎসরে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; সত্য সত্যই এই ৩৪ বৎসরের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী লোক আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সত্য সত্যই বাঙ্গালা ভাষার

অনেক গ্রন্থ নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া সভ্যজগতে বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি করিয়াছে। সত্য সত্যই বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি বাঙ্গালার কবিকে "Poet Laureate of Asia" বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার আদর বাড়াইয়াছেন। সুইডেনের পণ্ডিতবৃন্দ আমাদের কবিকে নোবেল প্রাইজ দিয়া এবং জগতের একজন প্রধান উপকারক বলিয়া স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অতি উন্নত স্থানে উঠাইয়া দিয়াছেন। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, একজন বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ বাহির করিয়া ফেলিবেন। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আবার একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে ও সেই ইতিহাস বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে লিখিবার উপযুক্ত হইয়াছে। তখন কে মনে করিয়াছিল যে, হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিত। সে ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, কিন্তু লিখিবার আর বিলম্বও নাই। তখন কে ভাবিয়াছিল যে বাঙ্গালীরা বড় বড় সভাসমিতি করিয়া সাহিত্যের চর্চ্চা করিবে, আপনাদের দেশের পুরাতন তত্ত্ব সকল বাহির করিবে, আপনাদের দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য প্রভৃতির মূলতত্ত্ব সকল খুঁজিয়া খুঁজিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া দিবে ও অতীতের ইতিহাসকে সাক্ষী করিয়া দ্রুতবেগে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে ধাবমান হইবে।

এই ৩৪ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তখন এমন একজনও লোক ছিলেন না, যিনি সাহিত্যমানের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তখনকার সাহিত্য-সরস্বতী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবকাশ-বিনোদিনী ছিলেন। এখন সেই সরস্বতী শত শত বঙ্গীয় লেখককে কেবল যে অন্নদান করিতেছেন এমন নহে, অনেককে প্রভূত ধনদান করিতেছেন এবং তাঁহাদের যশে জগৎ পুরিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য সত্য সত্যই মহা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমার ৩৪ বৎসর পূর্ব্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী সে বাণী এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বহুশত বৎসর ধরিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। বঙ্গীয় সাহিত্য আর শীঘ্র অধোগতি লাভ করিবে না। ক্রমে মনুষ্যজীবনের সকল বিভাগেই ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকিবে। ইংরেজ রাজের পরাক্রান্ত ভুজচ্ছায়ায় বাস করিয়া আমরা বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া কেবল সাহিত্যের ও জীবনের উন্নতি করিতে থাকিব, সেই উপলক্ষেই আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, এবং আমরা সাহিত্যের উন্নতি, বাঙ্গালী জীবনের উন্নতি ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য যত্নবান হইব। আমাদের এমন সুযোগ পূর্ব্বে কখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সুযোগের যতদূর সদ্ব্যবহার করিতে হয়, আমরা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

মানসী
বৈশাখ ও আষাঢ়, ১৩২১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ*

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" এই তিনটী শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। বঙ্গীয় অর্থ কি, সাহিত্য শব্দের অর্থ কি, পরিষৎ শব্দের অর্থ কি ও এই তিনটী জড়াইয়াই বা অর্থ কি ?

বঙ্গীয় শব্দের কি অর্থ, তাহা আমি জানি না, শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নাই। চলিত যে শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালা। বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলে বুঝিতে পারি, হয় বাঙ্গালা দেশের, না হয় বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য। কারণ, বাঙ্গালা শব্দে বাঙ্গালা দেশও বুঝাইতে পারে, ভাষাও বুঝাইতে পারে। বঙ্গীয় শব্দটী কিন্তু সেরূপ নহে, বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ও গকারের সঙ্গে যে অ-কার ছিল, তাহাকে লোপ করিয়া বঙ্গীয় শব্দ হইয়াছে। বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় সংস্কৃতে দেখি নাই। বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সব শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হইতে পারে। তাই বলিয়া আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কই, বাঙ্গালার ব্যাকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করি, বাঙ্গালার জন্য, বাঙ্গালা ভাষার উপকারার্থ বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিতে আমাদের কতদূর অধিকার আছে, জানি না। যদি সংস্কৃতের মত বাঙ্গালায় ঈয় প্রত্যয়ের পুরা মাত্রায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে খালীয়, নালীয়, রেলীয়, মেলীয়, ডেঙ্গীয়, গাছীয়, লতীয় প্রভৃতি কত কথাই আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। বঙ্গীয় কথাটা দোআঁস্‌লা হইয়া গিয়াছে। নামের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, এখন আর শুদ্ধ করার উপায় নাই। এই নাম ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ইহার আবার কত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে, এখন আর বদল করা পোষায় না। কিন্তু মানে ত একটা করিতে হইবে ? বঙ্গ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় কোন্ দেশ বুঝাইত ? অনেক সময় মনে হয়, সারা বাঙ্গালাই বুঝাইত। কিন্তু অনেকের মত যে, ও শব্দে শুধু পূর্ব্ববাঙ্গালাই বুঝাইত, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট। কালিদাস বঙ্গ শব্দে গঙ্গার দুই ধার বুঝিয়াছেন। লোকে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বলে, তখন এখনকার সমস্ত বাঙ্গালাই বুঝায়, কিন্তু বঙ্গাল শব্দ নিতান্ত নূতন নয়, দুচারখানি প্রাচীন পুঁথিতে এবং দুচারখানি শিলাপত্রে বঙ্গাল শব্দ দেখা গিয়াছে। যখন বঙ্গাল শব্দটা

---

* বাঙ্গালা ১৩২১ সালের ৩১এ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিংশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, সেইটী এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক—।

বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিয়া খুব চল্‌তি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব্ববাঙ্গালা বুঝায়। বল্লালসেনের রাজত্বে পাঁচটী ভাগ ছিল;—বঙ্গ, বাগড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা। এ বঙ্গ বলিতে গেলে পূর্ব্ববাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিন্তু কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালার নয়, সারা বাঙ্গালারই সাহিত্য-পরিষৎ। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় শব্দের অর্থ সারা বাঙ্গালা করিয়া লইতে হইবে। আর এই সারা বাঙ্গালা বলিতে বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও তাহার উপর সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুরের খানিকটা বুঝিতে হইবে। বাদ পড়িবে প্রায় সমস্ত দারজিলিঙ্গটা। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ এই হইল।

এখন সাহিত্য শব্দের অর্থ কি? সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত বটে, কিন্তু বড় বেশী পুরাণ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সহিত শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে; কিন্তু কিসের সহিত? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দে স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, এ সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার। যাঁহাদের হাতে ৬০।৭০ বৎসর আগে বাঙ্গালা ভাষার ভার পড়িয়াছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে সাহিত্য বই আর জানিতেন না; সুতরাং সাহিত্য শব্দটার অর্থ বাড়াইয়া লিটারেচার শব্দের সমান করিয়া তুলিয়াছেন। এখন লিটারেচার শব্দের অর্থ কি? লিটারেচার শব্দের প্রথম অর্থ ছিল—কাব্য, নাটক, অলঙ্কার; কিন্তু পরে দাঁড়াইয়াছে, যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই লিটারেচার। দিনকতক আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটারেচার শব্দের প্রয়োগ হইত না, এখন তাহাও হইতেছে। এখন গভর্মেণ্টের ফসলের রিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটারেচার পড়িতে হয়। জেলেদের মাছ ধরা সম্বন্ধেও এখন মস্ত লিটারেচার হইয়াছে। আমাদেরও এখানে সাহিত্য শব্দের এইরূপ মুলুক-জোড়া অর্থ লইতে হইবে। যদি ইহার অর্থ সঙ্কোচ করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। এ পরিষদে হেমবাবু, যতীন্দ্রবাবু, হীরেনবাবু, রামেন্দ্রবাবুর স্থান থাকে না। ইংরেজীতে লিটারেচার শব্দ যেমন, সংস্কৃতে সেইরূপ একটী শব্দ আছে। লিটারেচার অর্থ বরং সঙ্কুচিত, কিন্তু সে শব্দের সঙ্কোচ কোথাও নাই, সেই শব্দ 'বাঙ্ময়'। ইংরেজী লিটারেচার অর্থে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না; 'বাঙ্ময়' লেখাই হোক, না লেখাই হোক, সর্ব্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্‌ হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া বাঙ্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেখা ছড়াগুলি, মাঝিদের সারিগান এবং অনেক ধর্ম্মের

ছড়া ইত্যাদি জিনিসগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।

এখন পরিষৎ শব্দের অর্থ কি? পরি পূর্ব্বক ষদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া পরিষদ্ শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ চারিদিকে বেড়িয়া বসা। অতি পূর্ব্বকালে বেদের এক একটা শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে চরণ বলিত। এক এক জায়গায় এক এক চরণের যতগুলি লোক হইত, তাঁহাদের লইয়া এক একটী পরিষৎ হইত। কতগুলি লোক লইয়া পরিষৎ হইবে, তাহা ঠিক ছিল না। ক্রমে পরিষৎ শব্দ রাজসভায় উঠিল, সেখানে পরিষদে কতকগুলি মেম্বর হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে যাহারা রাজপরিষদে যায়, তাহারা পারিষদ হইল, ক্রমে পারিষদ শব্দে খোসামুদে বুঝাইতে লাগিল। পরিষৎ পারিষদ দুই শব্দই ক্রমে উঠিয়া গেল, ক্রমে সভা, সভ্য ও সদস্য শব্দ অধিক ব্যবহার হইতে লাগিল। পণ্ডিত লোকের সভাকে বরাবরই লোকে পরিষৎ বলিয়া আসিয়াছে। কালিদাসও বলিয়াছেন,—"অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" এইরূপ একরূপ কার্য্যে বা একরূপ লেখাপড়ায় বা একরূপ ব্যবসায়ে যাহারা দক্ষ, তাহাদের লইয়া ইয়ুরোপে যে সভা হইত, তাহার নাম ছিল ইউনিভারসিটি। তখন জুতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জুতা সেলাইওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, দরজীর ইউনিভারসিটি ছিল, ময়রার, ছাতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জেলের ইউনিভারসিটি ছিল। এখন অন্য ব্যবসায়ের ইউনিভারসিটির নাম হইয়াছে guild, ইউনিভারসিটি নামটা ক্লারিক অর্থাৎ লেখাপড়ার ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ শব্দটাও সেইরূপ বৈদিক চরণ ছাড়িয়া, রাজসভা ছাড়িয়া সাহিত্যেরই একচেটিয়া হইয়া যাইতেছে। দশ জনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষৎ হইবে, দুই জনে করিলে হইবে না।

তাহা হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শব্দে আমরা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালাদেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এখানে একটা কথা নূতন আছে, বাঙ্গালা-দেশবাসী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এই তিনটী শব্দের মধ্যে বাঙ্গালাদেশবাসী বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। কিন্তু ঐটী উহ্য না করিলে মানেই হয় না। কারণ, চীনের লোক দশ জনে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা সেই দশ জনকে কি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলিবেন? যদি চীন দেশের লোক কলিকাতা আসিয়া আপনাদের মেম্বর হয়, তাঁহাকে মেম্বর করিতে আপনাদের কোন আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গদেশবাসী বলিতে গেলে বঙ্গদেশবাসী খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদী, জৈন সব বুঝাইবে। সুতরাং ইহাদের বাঙ্ময় সব পরিষদের অধিকারে আসিবে। পৃথিবীর কিছুই বাকি থাকিবে না। কিন্তু এখনও সবাই আসে নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ—এমন কি, শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, একজন

মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য-পরিষদের মেম্বর হন, সেটী বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাঙ্গালার কোন কাজই হইতেছে না। অনেকে মনে করেন, মুসলমানেরা আরবী পারসী লইয়া থাকেন, বাঙ্গালার জন্য তাঁহাদের মায়া নাই, তাঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে। কিন্তু সে কথা ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক বাঙ্গালা বই তাঁহারা লিখিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় একটা নূতন ভাষা স্থষ্টি করিয়াছিলেন, নূতন অক্ষরের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। সে ভাষার নাম মুসলমানী বাঙ্গালা, ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের উর্দু। তাঁহারা যে বাঙ্গালা অক্ষর স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তার নাম ফুলনাগরী বা কাঠনাগরী, এখনও সিলেটের মুসলমানেরা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাঁহাদের যত কিছু বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সেই অক্ষরে লিখিয়া থাকেন। মুসলমানের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তাহা এক দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। কোন জাতি আপনার ব্যাকরণের বিভক্তিগুলি পরের ভাষা হইতে লয় না, কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত বিভক্তিগুলি দিয়াছেন। আমরা প্রথমার বহুবচনে যে "রা" বলি, সেটা আমরা মুসলমানদের নিকট পাইয়াছি। আমাদের 'দিগকে', 'দিগের', 'দের' প্রভৃতি বিভক্তিও পারসী হইতে লওয়া। স্থতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে গেলে মুসলমানের সহায়তা ভিন্ন হইতেই পারে না। আমাদের অভিধানের এক তৃতীয়াংশ কথা মুসলমানী। আমাদের দেশের জনকয়েক লেখক মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; স্থতরাং সংস্কৃত ছাড়া শব্দ ব্যবহার করিব না, পারসী শব্দ সব উঠাইয়া দিব। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পারসী শব্দ এখনও অবাধে চলিতেছে। আরও এক কথা, যদি আপনারা বাঙ্গালা-সাহিত্য-পরিষৎ নাম দিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে কতক পরিমাণে বাদ দিতে পারিতেন। যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে লইতেন, যাঁহারা না লিখেন, তাঁহাদিগকে লইতেন না। কিন্তু আপনারা নাম দিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাঙ্গালায় বসিয়া যাঁহারা ফার্সী, উর্দু ও মুসলমানী বাঙ্গালায় বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কি করিয়া? সেও ত বঙ্গীয় সাহিত্য!

আমার বোধ হয়, প্রথম হইতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার একটু সঙ্কোচ করিয়া লইলেই ভাল হইত। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করিবার সময় সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছিলেন যে, এসিয়ার চতুঃসীমার মধ্যে স্বভাবে যাহা স্থষ্টি করিয়াছে, অথবা মানুষে যাহা স্থষ্টি করিয়াছে, সমস্তই এ সভার অধিকারভুক্ত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত জিনিসই অধিকারভুক্ত হইবে, তবে এসিয়ার বাইরে নয়, এসিয়ার মধ্যেই চাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন তাঁহারা যদি

কখন দশ জন ফ্রেঞ্চ মেম্বর পান, সেই ফ্রেঞ্চ মেম্বরদের অনুরোধে সমস্ত ফরাসী সাহিত্য আসিয়া পড়িতে পারে। এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হয়। বাঙ্গালার বাহিরে যাবার বন্দোবস্তটা না করিলেই ভাল হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার যখন এত বড়, আশা যখন এত উচ্চ, দৌড় যখন এত দূর, তখন কোন্ কাজে ইহার বিশেষ অধিকার, তাহা বলা বড় কঠিন। যদি বলি, বিজ্ঞানেই অধিকার, তবে ভাষাতত্ত্বওয়ালারা চটিয়া যাইবেন। যদি বলি, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের উপরেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বেশী, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বলিবেন, আমাদের কথাটা সাহিত্য-পরিষদে উঠিবে না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, কোন বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বেশী অধিকার বা বিশেষ অধিকার, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আমার দরকার নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাণ্ড অধিকারের মধ্যে কোন্ বিশেষ বিষয়ে আমার দুটা কথা কহিবার অধিকার আছে, তাহারই কথা কহিব এবং স্থির করিলাম, সে কথাটী পুথি খোঁজা।

ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশী দিন হয় নাই। যাঁহারা বড় পুরাণ খবর জানেন, তাঁরা হয় ত বলিবেন যে, হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৯ সালে হুগলিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। সে সকল ত পুরাণের কথা; আসল কথা এই যে, ছাপাখানাটা ৬০।৭০ বৎসর হইল খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই একখানি পুথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাতের লেখা পুথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরেজী পড়াশুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল, লোকে আর পুথির তত আদর করিত না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্ব্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্র মাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—সেই দিন পুথিগুলিকে রৌদ্রে দিতেন। সমস্ত দিন নিজে পাহারা দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেইগুলিকে পেতেনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড় আদরের জিনিস পুথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র অল্প ইংরেজী লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল; পুথি-পাঁজির কোন ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জ্জনা রহিয়াছে। ছেঁড়া ময়লা কাল ন্যাকড়ায় জড়ান কতকগুলা কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয় ত রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে

সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল; সুবিধা পাইলেন ত একখানা পুথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সেদিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম;—দেখিলাম, একজনের বাড়ীর পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে। বাড়ীর গিন্নী মা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুথিগুলি বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ীর গিন্নীর মা সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুথির পাতা লইয়া কি করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।

এইরূপে চারিদিকে হাতের লেখা পুথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হয়, পঞ্জাবের সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুথি ছিল। তাঁহার পুত্র রাধাকিষণ লর্ড লরেন্সের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথিরক্ষার জন্য এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই সকল গভর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুথিরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট এই জন্য ২৪০০০৲ টাকা বৎসর বৎসর খরচ করেন। বাঙ্গালার ভাগে ৩২০০৲ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল গভর্মেণ্টই কিছু কিছু পান। পঞ্জাব গভর্মেণ্টের টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের টাকা অনেক দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে; একভাগ সংস্কৃত পুথির জন্য, আর একভাগ নাগরী পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্দ্রাজে ঐ টাকার এক অংশ আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টকে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে ঐ টাকায় পুথি খরিদ হয় ও ঐ পুথি দেকান কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা হয়। বাঙ্গালায় ঐ টাকা এসিয়াটিক সোসাইটীর হাতে দেওয়া হয়, তাঁহারা ঐ টাকা খরচের ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে পুথি খোঁজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০ পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ সংগ্রহ হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রথম ভার থাকে অপার্ট সাহেবের উপর। ইনি কোন্ পণ্ডিতের বাড়ী কি কি পুথি আছে, তাহারই তালিকা ছাপাইয়াছেন। তারপর হুল্‌চ্ সাহেব তিনখানি রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় নূতন পুথি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে কেনা পুথির একটী তালিকা আছে। তাহার মধ্যে ভাল ভাল পুথিগুলিতে ইতিহাসের কথা যাহা পাওয়া যায়, সব তুলিয়া দেওয়া হয়। হুল্‌চ সাহেবের পর

শেষগিরি শাস্ত্রী কিছুদিন এই কার্য্য করেন এবং তাঁহার রিপোর্টগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি যে কয়খানি পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়। এখন মহারাজ রাজশ্রী রঙ্গাচার্য্য রাও বাহাদুর এই কার্য্য করিতেছেন। তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে ১৩।১৪ ভলিউম বহি ছাপাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের টাকা দুই ভাগ হয়। এক ভাগের কর্ত্তা হন সার রামগোপাল ভাণ্ডারকর, আর এক ভাগের কর্ত্তা পিটারসন্ সাহেব। দুই জনেই ছয় ভলিউম করিয়া রিপোর্ট লেখেন, রিপোর্টের ভূমিকায় অনেক নূতন নূতন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হয়। জৈন-সাহিত্য এইখান হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে। ভাণ্ডারকর বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য অনেক। সার রামগোপাল এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কাজের ভার তাঁহার পুত্র শ্রীধর ভাণ্ডারকরের উপর অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রত্যেক রিপোর্টের সহিত কেনা পুথির একটী তালিকা দেওয়া থাকে এবং ভাল ভাল পুথি হইতে ইতিহাসের কথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

লাহোর, অযোধ্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কেবল কেনা পুথির তালিকা বাহির হয়। ঐ তালিকায় গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, লেখার সময় প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় খবর থাকে। উহার সঙ্গে রিপোর্ট আদি কিছুই থাকে না।

বাঙ্গালায় যে সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটী তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটীর পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরেজীতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচ বৎসর অন্তর একটী রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরেজীতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই।

ইহাতে একটু অসুবিধা হইত। পরের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা হইত, নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ একেবারে ছাপা হইত না। তাই সোসাইটী বলিয়া দিয়াছেন যে, যত দিন নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা না হইতেছে, তত দিন আর অন্য কোন কাজ হইবে না।

এতক্ষণ লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকা হইতে যে কাজ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহারই কথা বলিলাম। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, আলবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে। এ সকলই সংস্কৃত পুথি লইয়া, কেহ কেহ তাহার সহিত প্রাকৃতও যোগ করিতেছেন, কেহ বা কথিত ভাষার প্রাচীন পুথিও যোগ করিতেছেন। কথিত ভাষার

পুথি সংগ্রহের জন্য বড় একটা চেষ্টা হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে নাগরী-প্রচারিণী সভা লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিতেছেন এবং বৎসর বৎসর তাহার রিপোর্ট দিতেছেন।

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গভর্মেণ্ট ঐ বিষয়ে বন্দোবস্তের ভার এসিয়াটিক সোসাইটীর উপর দেন। সোসাইটী সে ভার আমার উপর দেন, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কার্য্য এখনও পুরাদস্তুর আরম্ভ হয় নাই।

ভাট-চারণের পুথি সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট নিজেই সে সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য কোন চলিত ভাষার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সেই সকল ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চলিত। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গভর্মেণ্টের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন আসামী পুথির জন্য বোম্বাই টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়; যেমন তেলেগু পুথির জন্য লাহোর টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়। যদি বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা পুথির জন্য টাকা খরচ না করেন, যদি আসামের জন্য আসাম গভর্মেণ্ট টাকা খরচ না করেন, তাহা হইলেও অন্যায় হয়। বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদেরও প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে।

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরেজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস

সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরেজী, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটী প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ; বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।'

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বেহার, আসাম, ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং

ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটী রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেনবাবু ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেনবাবুও আমার মত পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের

বদলে পুথি লইয়া আসিত, নগেনবাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভার্‌সিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটী তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পুর্ব্ববাঙ্গালায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশবাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশবাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশবাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটী লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটী যখন লিখিতেছি, তখন নগেনবাবু আমার নৈহাটীর বাড়ীতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটী লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া “Discovery of Living Buddhism in Bengal” নামে একটী ইংরেজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটী প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পুর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা

দেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটী সুফল হইয়াছে। ইংরেজী ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম "সুভাষিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটী নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—"দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"।

"সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব "সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"খানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা" নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়", উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম "চর্য্যাপদ"। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটী সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটী সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে "সুভাষিত-সংগ্রহ" ছাপাইয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষায় আটাশটী দোঁহা টীকাটিপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ঐ ভাষা একটী প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার দুই একটী দোঁহা এখানে দিতেছি।

গুরু উবএসো অমিঅ রস হবহিং ন পিঅ উজেহি।
বহু সহ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথউ তেহি।

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন অপভ্রংশ ভাষা, আর একবার বলিয়াছেন বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটী যে কি, তিনি স্থির করিয়া

উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈন প্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মারহাট্টাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। তিনি বলেন,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সাস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২।৩ শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশে" মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটী ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূরজমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে আছে। প্রফেসার বেণ্ডল দুই চারি জায়গায় ঐ তর্জ্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজী ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ

সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটী দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন। আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেত্রিশটী দোঁহা আছে, আর একখানিতে প্রায় একশতটী আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটী দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্‌দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্‌দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বর, ধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধারণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্ করে, কানে খুস্‌খুস্ করে ও লোককে ধাঁধাঁ দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন? ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার

শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমাৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন,—ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে,—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটী শিষ্য, সকলই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

এখানে পুঁথির একটী পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দুই এক, সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে?

সরোরুহপাদের শেষ দুইটী দোঁহা এই,—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদ্মরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅ চিত্ত তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিত্থা
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পর উআর।

অদ্বয় চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোঁহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকার মূল কথাগুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটী মুস্কিল আছে; সেটী এই যে, সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গালা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? সরোরুহবজ্রের দুইটা দোঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটী চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দের বাঙ্গালায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে।

সুইণা হ অবিদারঅরে নিঅমন তাহোরেঁ দোসে
গুরুবঅন বিহারেরেঁ থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥ ধ্রু॥
অকট হুঁ ভবই অণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা॥ ধ্রু॥
অদঅভুর ভব মোহারো দিসই পর অপ্যণা
এ জগ জলবিম্বকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥ ধ্রু॥
অমিয়া আছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পসর বস অপা
ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে মরে খাইব মই দুঠ কুণ্ডরাঁ॥ ধ্রু॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালি কিমো দুঠ্য বলন্দেঁ
একেলে জগ আলিঅ রে বিরহুঁঈ ছন্দেঁ॥ ধ্রু॥

হে মন! তোমার অবিদ্যা-দোষ হেতু এবং স্বপ্নেও লোভ থাকায় গুরুবচন ত্রৈলোক্য ছাইয়া ফেলিল, এখন তুমি কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? হুঙ্কার-বীজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, তুমি গগনে প্রবিষ্ট হইলে, এক্ষণে তোমার অবিদ্যা নাশ হইবে। তুমি বঙ্গদেশে স্ত্রীগ্রহণ করিলে, তোমার বিজ্ঞান পলাইয়া গেল। ভবের মোহ অদ্ভুত, যে হেতু তাহাতে আপন পর দেখা যায়। সহজমতে এ জগৎ জলবিম্বের ন্যায় এবং আত্মা শূন্যস্বরূপ। অমৃত আশে রে চিত্ত, তুই বিষ খাইতেছিস, তুই কর্ম্মের নিতান্ত বশ, তুই ঘরে পরে কি বুঝিলি, আমি দুষ্ট কুণ্ডকে মারিয়া খাইব। সরহ বলেন,—

রে গোয়ালিনী, দুষ্ট বলদ লইয়া আমি কি করিব? একলাই জগৎ বিনাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে ত্রিভুবনে বিহার করিব।

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল
সদগুর বঅনে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধহুরে নাহী
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাট অভঅ খান্ট বি বলআ
ভব উলোলেঁ ষঅ বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
কুল লই ঘরে সোন্তে উজাঅ
সরহ ভণই গণে পমাএঁ ॥ ধ্রু ॥

দেহ নৌকা, মন তাহার দাঁড়, সদ্‌গুরু-বচন এ নৌকার হাল হউক। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকাটীকে রক্ষা কর, পারে যাইবার অন্য উপায় নাই, অন্য নৌকায় যেমন গুণ টানিয়া যায়, এ নৌকা সেরূপ নহে। এ নৌকা ত্যাগ করিয়া সহজ পথে যাও, অন্য উপায়ে যাইবার জো নাই। পথে কোন ভয় নাই, বলদ দুটীও খাটিতে পারে। ভব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে, খরস্রোতে কুল উজাইয়া যাইতেছে। সরহ বলেন,—আমি প্রমাদ গণিতেছি।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ ধ্রু ॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅনেঁ নাহি বিশেষো ॥ ধ্রু ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস বসাণেরে কথা ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্‌পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ

এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম্ম স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকরগুপ্ত অনেক জিনিস লইয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রামপালদেবের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের এই কয়খানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা হইয়াছে—তত্ত্বদশক, যুগলদ্ধপ্রকাশ, মহাসুখপ্রকাশ, তত্ত্বপ্রকাশ, সেককার্য্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত সেকপ্রক্রিয়া, প্রজ্ঞোপায়, দয়াপঞ্চক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকারতত্ত্ব, মহাযানবিংশতি, দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা অর্থাৎ যে দোঁহাকোষের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অদ্বয়বজ্রকে তেঙ্গুরে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আচার্য্য, কোথাও অবধূত বলিয়াছে।

সরহপাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা আছে; যথা,—বুদ্ধকপালতন্ত্র-পঞ্জিকা, জ্ঞাণবতীনং, বুদ্ধকপালসাধনং, সর্ব্বভূতবলিবিধি, শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রম-প্রদ্যোতন।

এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-রচিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরেজী ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে, যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটী পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা। তারানাথ বলেন,—শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্ম্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটী সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। একদিন একটী নিবিড় বনের মধ্যে একটী সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটী মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই

শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—আমি উঁহারই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে এ কথাটী বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের গন্ধবেণেদের চারিটী আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটী রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতাশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। অনেক বড় বড় নগরে রাউতপাড়া নামে একটী পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল,—আপনি অচলসেনকে এত ভালবাসেন, ওর তরবারি ত কাঠের, ও কি করিয়া যুদ্ধ করিবে? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটী চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটী চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ারখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার সঙ্ঘে তাহার আর একটী নাম হইয়াছিল ভুসুকু, কারণ, ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটীং গতোপি তদেবেতি ভুসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভুসুকুনামখ্যাতিং সঙ্ঘেঽপি। অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটিতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যায়। শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে হইবে। নালন্দায় রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে

পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা সাজান হইত, সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল,—শান্তিদেব! তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করিতে লাগিল। শেষ তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটী কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিলেন,—"কিম্ আর্ষং পঠামি অথার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অথার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন,—এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন,—পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ। যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন;—

যদর্থবদ্ধধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছান্ত্যনুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা॥

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে আর্য্য পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অথার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অথার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্ব্বেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিন খানি অথার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি সুললিত, যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুর স্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতে॥

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটীতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই

তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও শান্তিদেব এক কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটী মাত্র পাতা, কিন্তু এখানি পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটী-নির্ম্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটী বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায়॥

আরও—

অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অঙ্কহেঠে কমল করি শয়ন অঙ্ক।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যহ স্বরকায় চ্ছাড়ি ন যাই
সো দুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি ধুরুন্তি যোগ।

এই পুস্তকের ভুসুকুও রাউত। শান্তিদেবও ভুসুকুও বটে, রাউতও বটে। আর বাস্তবিকও শান্তিদেব যখন অভিধর্ম্মের বই একখানি লিখিলেন, সূত্রান্তের বই একখানি লিখিলেন, শিক্ষার বই একখানি লিখিলেন, বিধির বই একখানি না লিখিলে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ পুরা হইল কই? শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটী গান আছে; সেটী এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥ ধ্রু॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ ধ্রু॥

ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে (চণ্ডালী) করিয়া লইলে।

সহজ-মতে তিনটী পথ আছে ;—অবধূতি, চণ্ডালী, ডোম্বি বা বঙ্গালী। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত ; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন, —রে ভুসুকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। জাহোর কোথা না জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, রাউত ভুসুকু ও শান্তিদেব বাঙ্গালী। রাউতের আর একটী গান এই ;—

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং (কং) রোড়োখাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝবি তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচি গন্ধনইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবণ্ডেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঁদ্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া
বালুআএলঁ সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা
রাউতু ভনই কট ভুসুকু ভনই কট সঅলা অইস সহার
জইতো মূঢ়া অছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে,

জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত বুলাইও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন,— কি আশ্চর্য্য। সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্‌গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু এক। তিনি মহাযান ও সহজযান, উভয় যানেরই লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ী বাঙ্গালায়ই ছিল। এখন তিনি কোন্ কালের লোক? প্রফেসর বেণ্ডল একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাসমুচ্চয় ইংরেজী সনের সপ্তম শতে লেখা হইয়াছিল। আবার বলিয়াছেন যে, না, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর ও তিব্বতের ক্রিদি সোঁসান রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে হুয়েনসাং তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত তিব্বত-রাজের রাজত্বকালে তাঁহার পুস্তক তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকগুলি তাহার পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল। সুতরাং ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটী দোঁহা আছে।

প্রথম দোঁহাটী এই ;—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই পরমথ পবিস
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জন লীন॥

২য়— আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিত মান বহন্তি
পক্কসিরি ফলঅ অলি জিম বাহেরিত ভুমযন্তি॥

৩য়— যোহি চিঅ রঅ ভুবিঅ ফুজ্জোহেসি হুউ
পোকৃঅর বীঅ সহাবসুহ নিঅ দেহ হি দিধউ॥

৩০শ— ওঁ বুঝিঅ বিরল সহজসুন কাহি বেঅ পুরাণ
তোপো তোসিঅ বিষয় বিরপ্য জগুরে অশেষ পরিমান॥

৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মন রঅন পিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজির নাহরে মরি বুওত পরমরো॥

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে।—

জো মন গোএর আলা জালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা॥ ধ্রু॥
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাকৃচিঅ জসু ণ সমায়॥ ধ্রু॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাকৃপথাতীত কাহিব কীস॥ ধ্রু॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল॥ ধ্রু॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ কিকসইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥ ধ্রু॥

যে সকল বিকল্পজাল মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাকৃ, চিত্ত সে সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিস বাকৃপথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইব? যে সে বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন,—কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়।

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহি সই করিব নিবাস।
যো মন গোঅর সো উআস॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না।
ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইঈলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মোহি অহি ন পই সই॥

আলি কালি এক করিয়া, অবধূতি-মার্গ রোধ করিয়া, চণ্ডালিমার্গে গিয়া কৃষ্ণাচার্য্য আনন্দিত হইলেন। ওহে কাহ্নু, তুমি কোথায় গিয়া বাস করিবে? যাহারা বড় যোগী, তাহারাও এ ধর্ম্মে উদাসীন। যে তিনটী তিনটীকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক দেখিতে গেলে তাহা ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় বুঝিলেই ভবচ্ছেদ হয়। যে যে

উৎপন্ন হয়, সেই সেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাদের আনাগোনা দেখিয়া কাহ্ণু আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, জিনপুর অতি নিকটেই আছে। তিনি বলিতেছেন,—এখানে মোহ প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পুর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুকহেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা না বলিলে আমার এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটী দিলাম ;—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কহি করিআই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ কারণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভনই লুই আমহে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইণ॥

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটী ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল; লুই বলেন,—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ অলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরে যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটী নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার

পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশিলা বিহার হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন রত্নকীর্ত্তি। রত্নকীর্ত্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেব ও লুই একই সময়ের লোক, বরং তিনি কিছু পূর্ব্বে হইতে পারেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

> সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাকৃচিঅ।
> বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে॥
> অলক্ষলখচিতা মহাসুহে।
> বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলেঁ॥
> কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখানে।
> অপইঠান মহাসুহলীনে দুলখ পরমনিবানে॥
> দুঃখেঁ দুঃখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
> স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী॥
> রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
> লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভুঅনেঁ লধা॥

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল গান পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে সুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত, কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটী কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম;—

> কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
> কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
> কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
> কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥

এ বাঙ্গালা কবিতাটী মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গালায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে

সঙ্কীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উঁহাকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্ননাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্ননাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কলচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে সকল ধর্ম্মের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। আবার ইদানীন্তন লোকে না বুঝিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা আরও পাকিয়া গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশি ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, তত দিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব না, আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না, আমাদের কোথায় কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না। কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না। কিন্তু এরূপ ধীরভাবে বহুদিন ধরিয়া পড়িবার লোক কই? যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াশুনাই করিতে পারে না, যাহাদের সে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু না বুঝিয়া না জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না।

পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। বাঙ্গালা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টী উপকার হইয়াছে ;—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কত দিকে কত দেশে কত রকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন,—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শুনে, অন্য কথা বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিস কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটীকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিসের ; যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১ম সংখ্যা, ১৩২১

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন*

আজ আমরা মহা সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শন ভালবাসেন, আজ তাঁহারা আমাদের এখানে আসেন নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গালাসাহিত্যসেবী, তাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমরা মন খুলিয়া কথা কহিতে পারি। এখানে সকলেই একব্যবসায়ী, সকলেরই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কি আছে? আছে পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, রচনা, জীবনচরিত, কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে আমরা এত দিন কি করিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা বিবরণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার কোথায় কি ভাল আছে ও কোথায় কি মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে মন্দটী ছাড়িয়া ভালটী লইতে পারিব এবং ভালকে আরও ভাল করিতে পারিব।

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খ্রীষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গালায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না

---

* বাঙ্গালা ১৩২১ সালের ২০-২২ চৈত্র মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখারও সভাপতি ছিলেন। মূল সভাপতি হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় যে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন, সেইটী 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র তৃতীয় সম্ভারে পুনর্মুদ্রিত হইবে। সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন/অষ্টম অধিবেশনের/কার্য্য-বিবরণ' হইতে সেই অভিভাষণটী আমরা এখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। —সম্পাদক—।

হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদ্‌লাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এই রূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাডিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গালাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভাল বাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গালা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গালা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটী সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে,

এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটীর পর একটী করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, "রাধামাধবোদয়"ই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গালা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটী সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরেজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটী বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গালা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরেজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরেজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল,

মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাঙ্গালায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাঙ্গালার যত বই অন্য ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষার হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গালা ভাষার জয় জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে? ঝোঁক যদি চুট্‌কীর উপর হয়, ক্রমে সে চুট্‌কীও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কী আরম্ভ হইয়াছিল; কেন না, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী—এই সব ত চুট্‌কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমার ভয় হয় পাছে বাঙ্গালার কাব্যটা চুট্‌কীতেই অবসান হইয়া যায়।

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ একে একে অস্তগত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার—লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চায় না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'খানিকে বাঙ্গালা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মত হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি, অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে জোগান দিতেছেন। এক একবার মনে হয় যেন, কিছুদিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভাল হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটী দোষ আছে—যখনকার

তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এ রকম ত চুটকীতে হয় না। তাই চুটকীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গালায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটী বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহা দ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ, মানুষ থাকিলেই তাঁহার 'সুবিধা', 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে—দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরও দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও

ভূদেববাবু এ বিষয়ে দু চারিটী রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ দুইই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু "বঙ্গদর্শনে" একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যে সব দোষগুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। "ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেন'।" —এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামী জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না?

বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম দেখাইয়া দিলাম। কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় কি অভাব আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কোন্ মন্দ জিনিস ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাল জিনিস আরও ভাল করিতে হইবে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কথা আছে —সেটা বাঙ্গালা ভাষার গতি।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গালা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা,

কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটী বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাত-কর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গালা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গালা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গালা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গালার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গালা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গালার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গালার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" দুটী একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না, "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গালাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না"; তাঁহারা বলেন, "কাটে না, ছি!

—ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়"; তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প"; তাঁহারা বলেন, "স্বকপোল-কল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল"; তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরেজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরেজী, ভাবেন ইংরেজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গালায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গালা হইয়া পড়ে। যথা—

"শিঙ্গিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল।"

"দেখিলাম গুরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর অধিক তুলিয়া ভিজা কম্বল ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙ্গালা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গালা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গালা আমরা মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গালা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গালা বলিব? তাহা হইলে ত এটী খাসা বাঙ্গালা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গালা বলিবেন?

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সব কথা ভদ্র লোকের কাছে কহিতে আমিরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে? সুতরাং এই সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? পোকায় ত কাটিবে?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গালা বই পোকাতেই কাটে।

এখন বাঙ্গালাকে এই সংস্কৃত ও ইংরেজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গালার মুসলমানেরা বাঙ্গালা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষায় সমস্যাটী এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটী সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গালায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গালা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেলওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই

বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গালার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গালায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গালায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাত্নঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গালায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না,—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর"। মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটী শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গালা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গালায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্

কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন
অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ

চণ্ডীদাস

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাঙ্গালার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাঙ্গালা নাই। মুসলমানদের বাঙ্গালায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসর মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি আর প্রকাণ্ড একটী ঢিবি এখনও বর্ত্তমান আছে; সেই স্থানটীর নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত করিয়া উত্তর-রাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন। ইহার পর বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণ-চত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্ম্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন; উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোঁড়।

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তর-রাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল

না, মহাযানও ছিল না; সবই সহজযান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে;—এক ভৈরব-ভৈরবী, আর এক নাঢ়ানাঢ়ী। প্রথমটী শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টী বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুইয়েরই এক—যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কি বলিব, জানি না; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্ত্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গণা যাইতেছে; কেবল যেন চামড়া দিয়া ঢাকা; পেটটী খোলে পড়িয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকুটুকাসনে বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া দুটী যোড় করিয়া, পাছার নীচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটী বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

> অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
> জ্ঞানযুক্তা বিজানীয়াদ্যোগিনী বীরনায়িকা॥
> অট্টহাসে চ যা (রজা) দেবী নায়কী সর্ব্বযোগিনী।
> তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবী মহাঘণ্টা কদম্বদ্রুমে॥
> তস্য দেবী সদাবীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
> কঙ্কালসুখমায়া সা সম্ভবন্তি মহাত্মনাম্॥
> মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানরন্ধ্রতোদ্গতম্।
> স্বধাতূঞ্ছিতবিজ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ॥

এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টী জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরাণ নাম। অনেকগুলি এখনও ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচেদির আসার পর হইতেই ইঁহারা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই সকল সহজিয়া হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ

হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটী রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার যো নাই। কাহ্নুপাদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরু বোধসে সীসা কাল"—অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ভণই কাহ্নু জিণরয়ণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা, ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রতিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্‌রে সদ্‌গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউড়ীপাদাঃ দূরে অদূরে বেত্যাদি।

সরহপাদ বলিতেছেন,—

সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই।
সুরঅকুমারী জিমহ পড়িজ্জই॥

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা,—ভ্রান্ত্যা যাবৎ সত্ত্বনিকায়ৈঃ স্থিতোঽপি সপরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অন্যসিদ্ধান্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌জনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি। যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ ত্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তন্ময়ি সাক্ষাদ্বদসি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরস্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছতি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা উচুঃ। ত্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ।

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালী দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই

পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রীসম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়ীও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশী দূরে নয়। তাঁহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরও একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণচক্রবর্ত্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্ত্তি হয়—খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটা ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটা ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন —ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—সে কি মা! তোমার আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন, —জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন—তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব। এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটীকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জন বাবু ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা "ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীম্।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইঁহাদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান সেই জন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এত ক্ষণ ত গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই,—চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটী এই,—এক দিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০৷২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো॥
কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস।
চাতকি পিয়াসী গ(ঘ)ন না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েস্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মঞ্চ পাতালপুর আবিঃর্ভূত পসু নর
মানিনীর না রহিল মান॥
গান সুনি পার্চ্ছার বেগম।
অস্থির হইল মন ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য॥

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
হরাম্বিতে হস্থি আনি পিঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায়।
কহিতে কহিতে প্রান আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রান একত্রে মীলায়॥ ১॥

সুন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালাঙ রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুয়াঁ[ে]র॥
আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি সত ডংসে গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে॥
এই করি আস মনে উর্ধ্বারিবে পতিত জনে
তবে সে দুল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ যায়
কে য়ার করিবে মোরে হীত॥
কান্দি কহে চণ্ডীদাস দস দসার আস
পূর্ণ কর রজককুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্য তবে প্রানে মরি॥ ২॥

সুন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত। সভাতে গাইলে গিত॥
মনের মরম করি সার। অনুরাগে কি করিলে ফুৎকার॥
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে। আসক আনলে পড়াইলে॥

বৈরি কাটে তোমার গায়। তুমি সে আনন্দ বাস তায়॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল॥
পরসিতে এ জনার মন। কতেক কর্য্যাছ কদর্থন॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে। তুরিতে পরান তেজ তবে॥ ৩

সুন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন॥
ছাড়ি পরিবার মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাসুলি বচন না কৈলে স্মঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত॥
আমা মুখ চাঞা গজপিষ্টে সুঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়ের স্বর দুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে॥
নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না সুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুন সন্ধান ঘাতে।
এ দুস্খ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনি সুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিকপতি॥ ৪॥

পার্চ্ছার বেগম কয়। সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলা বচন রাখ। রসিকমণ্ডল দেখ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহি এ বিনয় করি॥
জোড় করে কহি বানি। সুন নৃপচুড়ামণি॥
সুন রসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে॥

সে যামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তার দেহে
জাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ॥
রাজা হে জবন জাতি। কি জানে রসের গতি॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রান॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥ ৫॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু, না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে; রাণীকে রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায়; তাঁহার রাণীকে রাণীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মত একজন ধার্ম্মিক লোককে "চিত্রবধ" করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখনও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইঁহাকে পাতসাহ এবং রাজা এবং ইঁহার রাণীকে রাণী ও বেগম দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই

বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে,—"সঁ ১৪৪২ শাকে", উনি সেটীকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; এটী যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। আর তিন চারি জায়গায় এইরূপ সং—শক পাইয়াছি, সে সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক সামঞ্জস্যও হইয়াছে; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২-৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খ্রীঃ অঃ পাইয়াছেন এবং সেইটীই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন,—"১৩৮৫ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খ্রীঃ ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল যে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২ + ৭৮ = ১৫২০ খ্রীঃ অঃ হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে—শক, আর, ডি মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটী আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া

২ ৪ ৪ ১

বলা আছে, "শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রাম্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ও' লেখা ১৩৬০ খ্রীঃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ও' আছে; সুতরাং উহা খ্রীঃ ১৩৬০ বা তাহারও পূর্ব্বে

৬

লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে '৩' স্থানে 'ও' আছে, তাহা নহে। '৫' স্থানে

লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্ সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

১।	সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ—	১৩৪৫—১৩৫৮
২।	সেকেন্দর সাহ—	১৩৫৮—১৩৮৯
৩।	গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—	১৩৮৯—১৩৯৬
৪।	সহিকুদ্দিন হামজা সাহ—	১৩৯৬—১৪০৬
৫।	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়—	১৪০৬—১৪০৯

ইঁহাদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সেকালকার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।

আর এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটী গানের ভণিতায় "আদিচণ্ডীদাস" এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পং ৭৮৬ ও ৮১৫,—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানিল গান॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

গান দুইটীই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলী চণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটী পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও

আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটী ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক। যেন পুরাণ পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪ পৃঃ।	পদাবলী—১০১ পৃঃ।
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে	বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ইত্যাদি	চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥ ইত্যাদি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২য় সংখ্যা, ১৩২৬

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর *

মানুষ আপনার মনের ভাব কিরূপে বাহিরে প্রকাশ করে এবং যাহাতে সেইটী বহু দিন থাকে, তাহার চেষ্টা করে, তাহার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব। প্রথম প্রথম মানুষ কোন প্রধান ঘটনা দেখিলে তাহার ছবি আঁকিয়া রাখিত। পাথরে আঁকিয়া রাখিলে অনেক দিন থাকিবে, সেই জন্য পাথরেই আঁকিত। মিসর দেশে এইরূপ ছবি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ছবি আঁকাকে "হায়রোগ্লিফিক্" বলে।

ইহার পর আর এক রকমের ছবি হয়। সে ছবি কতকটা লেখার মত। একটা মাছ লিখিলে মাছ জাতিকে বুঝাইবে। তাহার পর বিশেষ বিশেষ মাছ লিখিতে হইলে বিশেষ বিশেষ দাগ লাগাইতে হইবে। এইরূপে পৃথিবীর সব জিনিসের একটা একটা ছবি আঁকিয়া লওয়ার নাম "পিক্‌চার রাইটিং" অথবা "ছবি-লেখা"। চীনদেশে এইরূপ লেখা চলতি আছে।

তাহার পর মেসোপটেমিয়ায় আর একরূপে লোকে মনের ভাব ও পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। তাহাদের একটা করিয়া তীরের আগার মত দাগ থাকিত।

* ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে (২৭এ চৈত্র, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় 'বাঙ্গালার লিপিকথা' বিষয়ে স্বরচিত একটী প্রবন্ধের প্রথম অংশ পাঠ করেন। ১৩ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত (১০ই বৈশাখ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) বিংশ বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটীর অবশিষ্ট অংশ আলোকচিত্রাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই প্রবন্ধটীই 'সপ্তবিংশ ভাগ সাহিত্য-

সেই তীরের আগা দুটা, তিনটা, চারটা করিয়া আঁকিয়া মনের ভাব বা পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। ইহার নাম "কিউনিফরম্" লেখা।

কিন্তু এখনও অক্ষর হয় নাই। একটী একটী শব্দ একটী একটী দাগ দিয়া প্রকাশ করার নাম অক্ষর। ইয়ুরোপীয়গণ বলেন, ফিনিসিয়া দেশের লোকেরা সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের সৃষ্টি করে। তাহাদের অক্ষর বাইশটী মাত্র। তাহাদের অক্ষরগুলির আকার বাহিরের বস্তুর সহিত মিলে—যেমন "অ্যালৃফা" বলিতে ষাঁড় বুঝায়। "অ্যালৃফা" অক্ষরটীতে একটা দাঁড়ির উপর দুই দিক হইতে দুইটা ট্যারচা দাঁড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিতে ঠিক ষাঁড়ের শিঙের মত হইয়াছে। "বেথ" অক্ষরটী ডালাখোলা একটী বাক্সের মত। বেথ শব্দের অর্থও বাক্স। এইরূপ বাইশটী অক্ষরই বাহিরের বাইশটী পদার্থের প্রথম অক্ষর লইয়া। বাস্তবিকই এরূপ করিলে শিখাইবারও সুবিধা হয়। আমরাও এককালে কয়ে করাত, খয়ে খরগোস, গয়ে গাধা, এইরূপ করিয়াই অক্ষর শিখিতাম। কিন্তু আমাদের ক-খয়ের সহিত করাত বা খরগোসের কোন সম্পর্কই ছিল না। ফিনিসিয়ানদের ঐরূপ আদি অক্ষর লইয়া বর্ণমালা। কিন্তু যে পদার্থের আদি অক্ষর, তাহার সহিত অক্ষরের আকার মেলে।

পারসী, আরবী, গ্রীক্, রোমান্, ইংলিশ, রুষিয়ান্ প্রভৃতি সকল বর্ণমালাই ফিনিসিয়া হইতে উৎপন্ন। আমাদেরও তাই। কিন্তু কিরূপে উৎপন্ন হইল? ২২টা হইতে ২৪টা, কি ২৬টা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, ৩০টা অবধি হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ হওয়া বিলক্ষণ কঠিন। আর এক কথা—আরব, পারস্য, গ্রীক্ ও লাটিন দেশ ফিনিসিয়ার কাছে; সুতরাং ফিনিসিয়া হইতে কিছু ধার করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক দূরে; কেমন করিয়া ধার লইল? এ সকল কথার মীমাংসা আমি এ প্রস্তাবে করিবার প্রয়োজন দেখি না। এ সম্বন্ধে বিউলার সাহেবের মত খুব চলিতেছে। সুতরাং দু চার কথায় তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

বিউলার সাহেব বলেন,—ফিনিসিয়ানদের প্রথমকার লেখা পাওয়া যায় না। মোয়াব্দের দেশে একখানা পাথরে একখানা শিলাপত্র আছে। সেই পত্রই ফিনিসীয় অক্ষরের সকলের চেয়ে পুরাণ। ব্যাবিলন দেশের বাট্খারার উপর কতকগুলি অক্ষর থাকিত। সেগুলি মোয়াব্দের অক্ষরের চেয়ে কিছু নূতন। বিউলার বলেন, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষরগুলি আরবদেশের দক্ষিণাংশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে

পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর" নামে প্রকাশিত' হয়। আমরা এখানে সেই প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল প্রবন্ধটী ভালো করিয়া পড়িতে হইলে চিত্রের সহায়তা অপেক্ষিত বলিয়া আমরা এই পুনর্মুদ্রণে মূল প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি দিলাম। হাফটোন ব্লক হইতে নুতন করিয়া ব্লক করিতে হইয়াছে বলিয়া চিত্রগুলি একটু অস্পষ্টই রহিয়া গেল। কতকগুলি চিত্র মূল প্রবন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট থাকায় সেগুলি বিশেষ কার্য্যকর হইবে না, কিন্তু প্রবন্ধটী সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য আমরা সেগুলিও দিলাম—বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পুথি বা লেখের আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।—সম্পাদক—।

সেখান থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে আসে। তখন লেখাটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আসিত। ভারতবর্ষে আসিয়া উহার দিক বদলাইয়া যায়। তখন বাঁ দিক হইতে ডান দিক যাইবার ব্যবস্থা হয়। বাইশটী হইতে পঞ্চাশটী অক্ষর করিতে গেলে কোনটীকে কাৎ করিতে হয়, কোনটীকে উলটাইয়া ফেলিতে হয়, কোনটীতে বিন্দু দিতে হয়, কোন জায়গায় বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

১ চিত্রে মোয়াবাইট, ফিনিসিয়ান ও আমাদের ব্রাহ্মী, এই তিনটী অক্ষরের ছবি দেওয়া হইল। ফিনিসীয় ও মোয়াবের অ-র একটা কোণ মাঝখানে কাটা। ব্রাহ্মীর 'অ' কোণের মাথার উপর দিয়া একটা খাড়া দাঁড়ি টানা। ফিনিসীয় ও মোয়াবের 'ব' একটা দাঁড়ির উপর অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া; ব্রাহ্মীর 'ব' ঠিক উলটাইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রের উপর একটা লম্বা দাঁড়ি দেওয়া। ১ম বাইশটী মাত্র অক্ষরের ছবি আছে। অপরগুলির ছবি দেওয়া হয় নাই। সেইগুলি দেখিলে উপরে যাহা লেখা আছে, তাহা ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

আমরা যাহাকে ব্রাহ্মী বলিলাম, তাহার অনেক নাম আছে;—কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন, কেহ কেহ ইণ্ডো-পালি বলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পুস্তকে ইহার নাম ব্রাহ্মী—আমাদের দেশের সকল অক্ষরের এই আদি। অশোক রাজার সময়ে প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা খুব চলতি ছিল, সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন। ইহা হইতেই আমাদের দেশের সকল অক্ষরের উৎপত্তি।

আমরা **২ চিত্রে** ব্রাহ্মী হইতে কেমন করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা মহাশয় তাঁহার প্রাচীন লিপিমালার দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল চিত্র দিয়াছেন, তাহারই একখানি হইতে আমরা এই চিত্রটী সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে পাঁচটী কলম আছে। প্রথম লতায় বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেওয়া আছে। এ অক্ষর এখন চলিতেছে। দ্বিতীয় লতায় অশোকের সময়ের অক্ষর আছে, তৃতীয়ে অশোকের ৪০০ শত বৎসর পরে কুষাণ রাজাদের যে অক্ষর ছিল, তাহাই আছে, চতুর্থে কুষাণদের ৩০০।৪০০ শত বৎসর পরে গুপ্তরাজাদের অক্ষর দেওয়া আছে। পঞ্চমে গুপ্ত রাজাদের ৩০০ শত বৎসর পরের অক্ষর দেওয়া আছে, তাহার পরে পুরাণ বাঙ্গালা দেওয়া আছে। ৩০০।৪০০ শত বৎসর অন্তর কেমন করিয়া অক্ষরগুলি আস্তে আস্তে বদলাইতেছে, এই চিত্রে তাহা বেশ অনুভব করা যায়। নীচ ও উপর হইতে দুইটী রেখা আসিয়া এক বিন্দুতে মিলিল; সেই বিন্দু হইতে খাড়া উপর নীচে দাঁড়ি টানিলে অশোকের 'অ' হইল। কুষাণের 'অ' নীচেকার রেখাটী একটু বাঁকা, উপরের রেখাটী একটু বড়, আর সব অশোকের 'অ'রই মত। গুপ্ত 'অ'কারে নীচেকার রেখাটী একেবারে বাঁকা এবং সে রেখার সহিত উপরের রেখা মিলে নাই। গুপ্ত অক্ষরের ৩০০ বৎসর পরে উপরের রেখার

সহিত খাড়া দাঁড়ির মিলনটা খুব বড় হইয়া গিয়াছে; যেন চৌকা হইয়া গিয়াছে। নীচের রেখাটী তাহার বাঁ দিকের কোণে বাঁকা হইয়া লাগিয়া আছে। তাহার পর আমাদের পুরাণ অ-কার, তাহার পর আমাদের এখনকার অ-কার।

হ্রস্ব 'ই' অশোক অক্ষরে তিনটী বিন্দু—উপরে একটী, নীচে দুইটী। কুষাণদের সময় প্রথম বিন্দুটী একটী রেখা হইয়া গিয়াছে; তাহার নীচে দুইটী বিন্দু। গুপ্ত অক্ষরেও ঠিক তাই, কেবল দাঁড়িটীর বাঁ দিক হইতে একটী রেখা বাঁকিয়া আসিয়া ডান দিকের বিন্দুতে মিশিয়াছে, আর বাঁ দিকের বিন্দু হইতে একটী রেখা ট্যারচা হইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। ইহার পর আবার দুইটী বিন্দুর মধ্যেও একটী রেখা হইয়াছে। তাহার পর এক টানে কলম না তুলিয়া সমস্ত অক্ষরটী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহার পর আমাদের এখনকার 'ই'—রেখাটীর মাথায় একটী চৈতন বাহির হইয়াছে।

হ্রস্ব 'উ' অশোক অক্ষরে উপর হইতে নীচে একটী দাঁড়ির তলা হইতে সমকোণ করিয়া একটী ছোট রেখা। কুষাণ অক্ষরে এই রেখাটী একটু বড়, গুপ্ত অক্ষরে ঐ রেখাটীর আবার একটী হুল নীচের দিকে বাহির হইয়াছে। তাহার পরের অক্ষরে সমকোণটী নাই। আর এখনকার বাঙ্গালায় দাঁড়িটীর মাথায় একটী মাত্রা আছে, আর একটী চৈতন আছে।

একার। অশোকের 'এ' একটী ত্রিভুজ। কোণটীর উপরে ডাহিন হইতে বাঁয়ে একটী রেখার উপরে আঁকা। কুষাণের 'এ' ঠিক ইহার উল্টা। গুপ্তদের 'এ' উপরে মাত্রা, তাহার ডান আগা হইতে সমকোণ করিয়া একটী দাঁড়ি নামিয়াছে। তাহার শেষ বিন্দু হইতে মাত্রার বাঁ দিকের বিন্দু পর্য্যন্ত একটী অল্প বাঁকা রেখা। গুপ্তদের পরে মাত্রার সহিত এই রেখার সম্বন্ধ একটু বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমাদের একারে সে সম্বন্ধ একেবারেই নাই।

'ও'। উপর হইতে নীচে একটী দাঁড়ি টানিয়া, তাহার সহিত সমকোণ করিয়া, উপরের বিন্দু হইতে বাঁ দিকে এবং নীচের বিন্দু হইতে ডান দিকে দুইটী ছোট ছোট রেখা টানিলে 'ও' হয়। কুষাণেও তাই। গুপ্ত অক্ষরে নীচে সমকোণ নাই এবং রেখাটীও সরল রেখা নয়। গুপ্তের পর নীচের সরল রেখাটী বেশ বাঁকিয়া গিয়াছে। আমাদের ওকারের উপর নীচ দুইই বাঁকিয়াছে।

'ক'। ডান হইতে বাঁয়ে একটী রেখার উপর তাহাকে সমকোণে ছেদ করিয়া উপর হইতে নীচে একটা দাঁড়ি টানিলে 'ক' হয়। কয়ের মধ্যবিন্দু হইতে চারি দিকে চারিটী রেখাই এক সমান। কুষাণদের সময় বাঁ হইতে ডান রেখাটী বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্ত অক্ষরেও রেখাটী বাঁকা ত আছেই, খাড়া রেখাটীরও তলাটা বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্তের পরে বাঁ দিকের বাঁকা দুটী রেখা জুড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর

আমাদের 'ক'। সেই জোড়াটী একটী ত্রিভুজ হইয়াছে, আর ডান দিকের রেখাটী একটী আঁকড়ি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ৫০টী বর্ণই কেমন করিয়া অশোক হইতে আমাদের বাঙ্গালা হইল, তাহা এই চিত্রে দেখান আছে।

বাঙ্গালা অক্ষরে যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গভূমীশ্বর রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুথি সকলের চেয়ে পুরাণ। এই পুথিখানি যশোহর জেলার ব্যাং নদীর ধারে লেখা হইবার ৭ বৎসরের মধ্যে ৭ বার পাঠ করা হয়। রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুথিখানি কালচক্রযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল পুথির টীকা। এই পুথিখানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মত। তালব্য 'শ'-টী বেশ দুপুঁটুলি। বর্গীয় 'জ' ঠিক আমাদের মত। 'ক' যদিও একেবারে তেকোণা নয়, কিন্তু প্রায়ই আমাদের মত; কেবল ডান দিকের কোণটী একটু বাঁকা। 'খ' প্রায়ই আমাদের মত, কেবল নীচের দিকে দুটী কোণ হয় নাই, একটা বাঁকা রেখা চলিয়া গিয়াছে। গ, ঘ, ঙ তিনই এখনকার মত। আমাদের ছাপার 'চ' উপর-নীচের একটা দাঁড়ির ডান দিকে একটা থলে, কিন্তু আমাদের হাতের লেখা 'চ' কখনই এরূপ ছিল না। দাঁড়িটা একটা বাঁকা রেখা, বাঁদিকে হেলা, থলেটাও সেই রকম। এ পুথির 'চ' ঠিক সেই রকম। দুটা 'চ' জুড়িয়া 'ছ' হয়, তবে এখনকার বাঙ্গালায় 'ছ'য়ের কোলের দিকে একটু টান থাকে; এখনও পাঠশালায় বলে "কোলটানা ছ"। বর্গীয় 'জ' ঠিক এখনকার মত। কেবল ডান দিকের রেখাটা মাত্রার নীচে থেকে না বেরিয়ে আরও খানিক নীচে থেকে বেরিয়েছে। কাঁধে বাড়ী 'ঝ' তখনও যেমন, এখনও তেমনি। বিশেষের মধ্যে এই, পালানের নীচের মুখটা জোড়া নয়। ট-য়ের চৈতন পর্য্যন্ত আছে, ঠিক এখনকার মত। তখনকার ঠ-য়ের মাত্রাও নাই, চৈতনও নাই। ড, ঢ, ণ ঠিক এখনকার মত।

৫ চিত্রে শেষ ছত্রে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি সব দেওয়া আছে। কিন্তু জানি না, কোন্ কারণে আগে প-বর্গ, তাহার পর ত-বর্গ দেওয়া আছে। অক্ষরগুলি প্রায় এখনকার মত, কেবল 'প'টীর নীচের মুখটা দাঁড়ির তলায় আসিয়া লাগিয়াছে। তাহার পর দন্ত্য 'স', তাহার পর আর একটী কি অক্ষর, তাহার পর 'য', পরে 'শ' ও তাহার পর 'ক্ষ'।

৪ চিত্রে স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'অ' 'আ' প্রায়ই এখনকার মত, কেবল নীচের দিকে বাঁহাতি একটা ট্যারচা টান আছে। 'ই', 'ঈ' একটু পুরাণ, দুটা গোল শূন্য, তাহার মাথায় একটা রেখা; একটু চৈতনও আছে। দীর্ঘ 'ঈ' ঠিক হ্রস্ব 'ই'র

মত, কেবল নীচের দিকে দেবনাগরী উকারের মত কি একটা লাগান আছে। তাহার পর ঋ ৠ ঠিক এখনকার মত, তাহার পর 'উ' 'ঊ'—দুইয়ের একটীরও চৈতন নাই; নীচের একটা টান দেখিয়া দীর্ঘ 'ঊ' চিনিয়া লইতে হয়। 'ঌ' 'ৡ' এখনকার মত নহে। 'এ' 'ঐ' ঠিক এখনকার মত। এ চিত্রে 'ও' 'ঔ' পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বর্ণমালাটী দিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য আমাদের কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় নাই।

এ পুথিখানি যশোহরে ১১ শতকের গোড়ায় লেখা; সুতরাং ইহার স্থান ও কাল একরূপ ঠিক আছে। তাই এখানির সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। অন্য পুথিতে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

৩ চিত্রে যতটুকু লেখা আছে, আমরা তাহা তুলিয়া দিতেছি। পাঠকগণ অক্ষর মিলাইয়া পড়িবেন।

প্রথম লাইন—"প্রভায়াং নানোপায়বৈনেয়মহোদ্দেশঃ চতুর্থঃ সমাপ্তঃ ॥ ॥ সমাপ্তেয়ং টীকা জ্ঞানপটলস্য ॥ ০ ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন প্রবরমণিগণং স্থাপিতং বুদ্ধমার্গে দত্তা প্রজ্ঞাভিষেকং

দ্বিতীয় লাইন—"ইহ যশসঃ শ্রীকলাপে নৃপস্য ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন ॥ ॥ প্রমুদিতমনসা শ্রীযশশ্চো ॥ ॥ দিতেন টীকাং শ্রীমূলত[ন্ত্রে] স্ফুটকুলিশপদান্বেষিকাং তন্ত্ররাজে······

তৃতীয় লাইন—"॥ ০ ॥ যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ তেষাং ॥ ০ ॥ চ যো নিরোধঃ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥ দেয়ধর্ম্মোহয়ং······

চতুর্থ লাইন—"···ঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ইতি মহারা ॥ ০ ॥ জাধিরাজশ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপদ্দীয় সম্বৎ ৩৯·········

পঞ্চম লাইন—"তে। মৃতয়া চুঞ্চুদুকয়া গৌর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাদায় পৃ-॥ - ॥ ষ্ট-য়েদমুদীরিতং। পূর্ব্বোত্তরে দিশো ॥ ০ ॥ ভাগে বেংগনগ্যাস্তথাকুলে পঞ্চত্বং ভাষিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি ॥"

এ পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে আছে। প্রায় এইরূপ অক্ষরে এসিয়াটিক সোসাইটীতে আরও একখানি পুথি আছে। সেখানিও বৌদ্ধপুথি; নাম "ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি"।

৬ চিত্রে তাহার প্রথম পাতাখানির নকল দেওয়া গেল। এই পুথিখানির ডান দিকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার 'ক' পূর্ব্বাপেক্ষা আরও তেকোণা হইয়াছে, কিন্তু এখনও বাঁ দিকে ঠিক দুইটী রেখার একটী কোণ হয় নাই। তালব্য 'শ'টী ঠিক দুপুঁটুলি। কেবল 'হ'টী ভয়ের মত। প্রথম লাইনটী লিখিয়া দিতেছি, দেখিয়া লইবেন,—

"ওঁ নমঃ শ্রীলোকনাথায় ॥ সংক্ষিপ্তব্যতিরেকানাং ব্যাপ্তিরন্বয়রূপিণী। সাধর্ম্মবতি দৃষ্টান্তে সত্ত্বে হেতোরিহোচ্যতে ॥ যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ সন্তশ্চামী ভাবা..."

ইহার মধ্যে "নমঃ শ্রীলোকনাথায়" ঠিক এখনকার মত। 'প'টী কেবল ঠিক টাঙ্গির মত নয়। টাঙ্গির মুখের নীচের রেখাটী যেন বাঁটের গোড়ায় গিয়া লাগিয়াছে। 'প'য়ে ও অন্তঃস্থ 'ব'য়ে ভেদ করা কঠিন। অন্তঃস্থ 'ব'য়ের পেটটী একটু ঝোলা, একটু মোটা, 'প'য়ের সেটী নাই। 'ধ'য়ের কাঁধে বাড়ীটী নাই; 'ধ'য়ের মাত্রাও নাই। 'ত'য়ের লেজটী এখনকার মত মাথায় উঠে নাই, যেন মাঝখানে কাটা পড়িয়াছে। আমরা মনে করি যে, এ পুথিখানিও যশোর অঞ্চলে হরিবর্ম্মদেবের সময় অথবা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে লেখা হইয়াছে।

৭ চিত্রে যে পুথিখানির শেষ পাতায় ফটোগ্রাফ্ দেওয়া হইল, সেখানি অভয়াকরগুপ্তের লেখা। অভয়াকরগুপ্তের উপাধি ছিল মহাপণ্ডিত। পুথিখানি বৌদ্ধপুথি। বৌদ্ধেরাও তান্ত্রিকদের মত নানা রকম 'মণ্ডল' আঁকিত। সেই মণ্ডল আঁকাকে সাহায্য করিবার জন্য ইহার উৎপত্তি। ইহার নাম "বজ্রাবলী-নাম-মণ্ডলোপায়িকা"। অভয়াকরগুপ্ত রামপালের রাজত্বে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা ১১ শতকের শেষে ও ১২ শতকের গোড়ায় বসাইয়া দিয়াছি। এই পুথির অক্ষরেও তেকোণা ভাবটা বেশী। 'ম' আর 'হ' প্রায় আমাদের মত হইয়া আসিয়াছে। তবে 'হ' এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই। একটু যেন দেবনাগরীর দিকে টান আছে। 'ত'য়ের লেজ যেরূপ জায়গায় কাটা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা একটু বাড়িয়া গিয়াছে। 'অ' এখন ঠিক বাঙ্গালা হইয়াছে, তবে অ-র বাঁ দিকে যেটুকু 'ত'য়ের মত, তাহার লেজ এখনও মাথায় উঠে নাই। হ্রস্ব 'ই'র চৈতনটী একটু একটু দেখা যায়। ৭ চিত্রের শেষ লাইনটী তুলিয়া দিলাম।

"গুলে বিশ্বমূর্ত্তেঃ ॥ ২৫০ ॥ মহাপণ্ডিতাভয়াকরগুপ্তরচিতা বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা সমাপ্তা ॥"

পুথিখানির অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, যেন অভয়াকরগুপ্তের সময়েই লেখা হইয়াছিল।

৮ চিত্রখানি অভয়াকরগুপ্তের লেখা আর একখানি পুথির শেষ পাতা। নকল করিয়াছেন ধনশ্রী মিত্র। নকলের তারিখ ১০৪৭ শকাব্দা অর্থাৎ ১১২৫ ইংরেজী। এই যে তারিখটী, ইহা পুথি লেখার তারিখ, রচনার তারিখ নয়। কারণ, ইহা ভণিতার পরে দেওয়া আছে। ভণিতার আগে তারিখ থাকিলে সেটা রচনার তারিখ হয়, আর পরে থাকিলে সেটা নকলের তারিখ হয়। নকলের তারিখ ও তাহার পরের অংশ তুলিয়া দিলাম।

"শকাব্দাঃ ১০৪৭ শকাব্দে রুদ্রং মিশ্রয়িত্বা ষষ্টিভাগেন শেষঃ প্রভবাদিজ্ঞাতব্যো

বহু্যন্ত্রন্তৌ প্রক্ষেপায়। যবৈষম সম্বৎসরে প্রভবাদিবর্ষাণি ৩৮ অলেখিয়ং শ্রীধনশ্রীমিত্রেনৈঃ (?)।"

৯ চিত্র চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্য্যাগীতির কয়েকখানি পাতার ফটো। এ পুথির অক্ষরগুলিও ১২ শতকের গোড়ার। ইহার 'প' অনেকটা এখনকার 'প'য়ের মত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ এখনকার 'প'য়ের টাঙ্গির মত যে মুখ আছে, তাহার নীচের রেখাটী 'প'য়ের দাঁড়িটার তলা পর্য্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যায়। তাহাতেই বোধ হয়, এটা ৩ ও ৭ চিত্রের চেয়ে কিছু নূতন। এ চিত্রের অন্তঃস্থ 'য' আগেকার চিত্রের 'প'য়ের মত। 'ষ'য়ের আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোণা অক্ষরেরই কোণগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোণা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'য়ের মাথায় একটু একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

বইখানিতে কতকগুলি বাঙ্গালা দেশের গান সংগ্রহ করা আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা দেওয়া আছে। প্রথম পাতার দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে, যেখানে একটা চৌকা ফাঁক আছে, তাহার পরে একটা 'স্ফুটং' শব্দ আছে। তাহার পর হইতে পড়ুন,—

দ্বিতীয় লাইন—"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ ০ ॥
দিট করিঅ মহাসু—

তৃতীয় লাইন— হ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ ধ্রু ॥
সঅল স[মা]হিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ ধ্রু ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের"

১০ চিত্র কাশ্মীরের দামোদর গুপ্তের লেখা "কুট্টনীমতের" শেষ পাতার ফটো। এ পাতায় আবার শেষ তিনটী ছত্র নেওয়ারী অক্ষরে লেখা। তাহাতে তারিখ দেওয়া আছে। নেওয়ারী তারিখ—ইংরেজীতে সে তারিখের অর্থ ১১৭২। সুতরাং পুথিখানি ১১৭২এর কিছু আগে লেখা হইয়াছিল। এর অক্ষরগুলি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট এবং বেশ ছাড়া ছাড়া, একেবারেই জড়ান নয়। দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে আছে,—"কৃতিরিয়ং ভট্টদামোদরগুপ্তস্য মহাকবেরিতি"।

১১ চিত্রে "হেবজ্রতন্ত্রটীকা" নামক একখানি পুথির আধখানি পাতের ফটোগ্রাফ্ দেওয়া আছে। এ পুথিখানি ইং ১১৯৮ সালে লেখা। ইহাতে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' ঠিক এখনকার বাঙ্গালার মত। 'অ' নাই। 'আ' ঠিক এখনকার মত, 'ই' একটু বিচিত্র। 'ই'য়ের মাথার দাঁড়িটী বাঁকিয়া গিয়াছে

এবং নীচে দুটীর বদলে একটী বড় শূন্য আছে। হ্রস্ব 'ই'র কোলে একটা টানা দিয়া 'ঈ' করা হইয়াছে। হ্রস্ব 'উ' ঠিক বাঙ্গালা 'ভ'য়ের মত। দীর্ঘ 'ঊ' তাহার কোলে একটা টানা। 'ই' 'ঈ', 'উ' 'ঊ' কাহারও মাথায় চৈতন নাই। 'ঋ' এখনকার 'ঋ'য়েরই মত, এখনকার 'ঋ' হইতে উহাকে তফাৎ করা কঠিন। হ্রস্ব 'ঋ'য়ের উপর একটা ঋফলা দিয়া দীর্ঘ 'ৠ' করা হইয়াছে। '৯'টী এখনকার '৯' খাড়া করিয়া দিলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। দীর্ঘ 'ৡ'ও তাই। এই আধখানি পাতায় যাহা আছে, পড়িতে কোন বাঙ্গালীর একটুও কষ্ট হইবে না। হেবজ্রতন্ত্রের 'প' চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মত।

১২ চিত্র "রামচরিত" কাব্যের শেষ পাতার ফটোগ্রাফ্। গ্রন্থকারের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী, নকল করিয়াছেন শীলচন্দ্র। ইহার 'প'ও চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও হেবজ্র-তন্ত্রটীকারই মত। হ্রস্ব 'ই' দুইটী পুঁটুলি ও তাহার পাশে একটা দাঁড়ি ও মাত্রা। শেষ অক্ষর কয়টী,—

"ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং নাম কাব্যং সমাপ্তমিতি। যথাদৃষ্টমিতি শ্রীশীলচন্দ্রস্য।"

১৩ চিত্র রামচরিতের টীকার শেষ পত্র। দ্বিতীয় সর্গের ৩৫ শ্লোকের টীকা ইহাতে শেষ হইয়াছে। ইহার পর আর টীকা পাওয়া যায় নাই। অক্ষর প্রায়ই মূলের মত, তবে মূল হইতে অনেকটা স্পষ্ট। ইংরেজী ১২ শতকের লেখা বলিয়া মনে হয়। শেষ তিনটী ছত্র লিখিয়া দিতেছি,—

"ইতীত্যাদি ইত্যনন্তরোদিতবিমর্দ্দব্যতিকরেণ যত্র সুবেলে বিবুধাদীনাং অঙ্গনানাং ভুজঙ্গাস্তে বানরাদয়ঃ কল্পয়া মদিরয়া উদ্দীপ্তত্বাৎ আপ্তো মারো মন্মথঃ তেন ধারিতং সুরতং যেষাং তে তাদৃশা অপি দুর্ম্মনায়িতাঃ। অন্যত্র—ইত্যনন্তরোদীরিততদ্বংশাবমানে সতি যস্মিন্ ভীমে তে সুভটা ভীমসহায়াঃ॥"

১৪ চিত্র দ্বাদশ শতকে স্থিরমতি পণ্ডিত তিব্বত হইতে পুথি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এখানি অনেক দিন নেপালে নেওয়ার রাজাদের গুরুর বাড়ীতে ছিল। নেপালের রাজার পুথিখানার অধ্যক্ষ এখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন। ইহার অক্ষরগুলি একটু বাঁকা ছাঁদের, একটু ট্যারচা ছাঁদের—অত্যন্ত পরিষ্কার। পুস্তক শেষ হইলে লেখা আছে,—

"সমাপ্তেয়ং দোহাকোষস্য পঞ্জিকা। গ্রংথপ্রমাণমষ্টশতমস্য কৃতিরিয়ং অদ্বয়বজ্র-পাদানামিতি। অস্তব্যস্তপদো ভাতি গ্রন্থোয়ং লেখদোষতঃ। তথাপি লিখ্যতেঽস্মাভিঃ গ্রন্থসংগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। দানপতিশ্রীস্থিরমতিপণ্ডিতস্য পুস্তকমিদং। লেখিক শ্রীউদয়ভদ্রেন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং॥"

১৫ চিত্রে যত দুর সম্ভব, ইহার একটী বর্ণমালা দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতদেশীয়

পণ্ডিতেরা আসিয়া জগদ্দল বিহারে থাকিতেন। জগদ্দল বিহার বরেন্দ্র-ভূমিরই কোন স্থানে ছিল। সুতরাং ইহার টান একটু উত্তর বাঙ্গালার মত হইবে। ইহার হ্রস্ব 'ই'তে মাত্রাও আছে, মাত্রার নীচে দুটী পুঁটুলিও আছে। দীর্ঘ 'ঈ'কারে 'ই'কারের উপর ডাইনে একটী দাঁড়ি আছে। 'খ' অনেকটা অকারের মত। 'ঘ' ঠিক চিরুণীর মত। 'ঘ'-য়ের কাঁধে একটা বাড়ী হইয়াছে। 'ড' প্রায় এখনকার মত হইয়াছে, কেবল লেজটী একটু কাটা। 'ফ' দেখিতে 'হ'য়ের মত হইলেও 'প'য়ের মাথা খুব ফাঁক করিয়া, তাহাতে একটা আঁকৃড়ি দিয়া হইয়াছে।

১৬ চিত্র—অপোহসিদ্ধি। এখানিও আমার পুথি। নেপালের পুথিশালার অধ্যক্ষ ৺বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর দান। ইহারও অক্ষরাদি দোঁহাকোষ-পঞ্জিকার মত, তবে ট্যারচা নয়। গ্রন্থকারের নাম মহাপণ্ডিত স্থবির রত্নকীর্ত্তি।

১৭ চিত্র—সুভাষিতসংগ্রহ। ইহাতে বৌদ্ধদের অনেক সুভাষিত অর্থাৎ ভাল কথা জড় করা আছে; কতক সংস্কৃতে এবং কতক বাঙ্গালায়। পুথিখানি বিদ্যাপতি দত্তের লেখা। তিনি নালন্দার পার্শ্বে বটগ্রামে বসিয়া পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি সরু সরু, কিন্তু বেশ স্পষ্ট। 'প' একেবারে বাঙ্গালা। 'ভ'ও অনেকটা বাঙ্গালা। 'ব'টী একেবারে তেকোণা। 'ধ'টী মাত্রাহীন 'ব'কারের মত, কাঁধে বাড়ী নাই। 'অ'কার ঠিক এখনকার মত। 'হ'টী এখনকার উল্টা 'ও'কারের মত।

এতক্ষণ আমরা যে সকল পুথির আলোচনা করিতেছিলাম, সবই মুসলমান রাজত্বের আগেকার। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর যে এত পুরাণ, তাহা কাহারও ধারণাই ছিল না। ইং ১৮৬৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেতুবন্ধের একখানি পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরের পুথি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, সে পুথিখানি ৬৩৬ বছরের পুরাণ। তাঁহার তারিখ ঠিক হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তিনিও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ সালে বেণ্ডল সাহেব ১১৯৮ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকার একটী পাতের আধখানির এক ফটোগ্রাফ বাহির করেন। পূর্ব্বে তাহার কথা বলা হইয়াছে। বাকিগুলি সব আমার বাহির করা। ইহার মধ্যে ১৩ শতকের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (১৮ চিত্র দেখ); তাহাতে শকাব্দার তারিখ দেওয়া আছে ১২১১। সেখানি লেখা পূর্ব্ববাঙ্গালায়। পুথিখানি বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষার পুথি। তখন পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা মধুসেন। উহার শেষে লেখা আছে,—"পরমেশ্বরপরমসৌগত-পরম-রাজাধিরাজশ্রীমদ্গৌড়েশ্বরমধুসেনদেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে . যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দী ২।" ইহার অক্ষর কতকটা পুরাণ ঢংএর। 'র'টী ঠিক তেকোণা, কিন্তু মাঝে ফাঁক নাই, একেব্যারে নিরেট। 'ধ' মাত্রাশূন্য, কাঁধে বাড়ী নাই। 'প'টী পুরাণ 'প'। 'জ'টীও বাঙ্গালা, 'ভ'টীও বাঙ্গালা, তবে দু'টীর একটীরও লেজ মাথায় ঠেকান নাই।

১৯ চিত্র—জীমূতবাহন দায়ভাগ লিখিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, দায়ভাগ ধর্ম্মরত্ন নামে একটী বড় নিবন্ধের অংশ মাত্র। সেই নিবন্ধের 'কালনির্ণয়' অংশটা 'ধর্ম্মরত্ন' নাম দিয়া ছাপান হইয়াছে। ইহার একখানি পুথিতে একটী তারিখ দেওয়া আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেটী নকলের তারিখ ভাবিয়া পুথিখানি ১৪১৭ শকে নকল করা হইয়াছে বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। সেটী ঘটকসিংহের ছেলের ঠিকুজীর তারিখ। সে কালের পণ্ডিতেরা পুথির গায়ে অনেক জিনিসই লিখিয়া রাখিতেন; ঠিকুজীও লিখিতেন; সুতরাং পুথিখানা ঠিকুজীর অনেক আগের লেখা। পুথিখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম দেওয়া আছে; নিজের জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন। ঘটকসিংহ তাঁহার নিকট পুথিখানি পাইয়াছিলেন। সুতরাং পুথিখানি হাত-বদল হইবার পর ঠিকুজীটা লেখা হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা ইহাকে ইং ১৪ শতকের পুথি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৪ শতকের পুথি বড় পাওয়া যায় না।

২০ চিত্র—এখানি 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা কুসুমাঞ্জলির টীকা—নাম 'কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ'। পুথিখানির শেষে অতি অস্পষ্ট একটী তারিখ আছে। তারিখটী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই; ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পুথিখানি ব্যবহার করেন, তাঁহারও নজরে তারিখটী পড়ে নাই। তারিখটী শকাব্দা ১৩৩২=ইং ১৪২০। সুতরাং ১৫ শতকের পুথি। কিন্তু পুথিখানির প্রথম ৯০ পাতা এক হাতের লেখা, বাকিটুকু আর এক হাতের লেখা। যেখানে দুই হাতের লেখা মিলিয়াছে, সেখানে প্রথমটার খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল—একখানি পুরাণ পুথি ছিল। তাহার অর্দ্ধেকটা হারাইয়া যায় এবং অপর অর্দ্ধেক আর একখানি পুথি হইতে লইয়া যুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম অর্দ্ধেকটা পুরাণ লেখা। তাতে সর্ব্বত্রই '৩' সংখ্যার জায়গায় '৩' আছে। এইরূপ '৩' এর জায়গায় '৩' লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০র মধ্যের পুথিতেই পাওয়া যায়। ১৩০০র পুর্ব্বেও এরূপ দেখা যায় নাই, পরেও অতি বিরল। সুতরাং এই কুসুমাঞ্জলি-টীকার পুথির প্রথম অংশটা ১৪ শতকের লেখা আমরা বলিতে পারি। ১৯ ও ২০ এই দুই চিত্রের অক্ষরগুলির সব ঠিক বাঙ্গালা; সব তেকোণা হইয়া গিয়াছে, বাঁকা রেখা নাই।

২১ চিত্র—সাহিত্য-পরিষদের কৃষ্ণকীর্ত্তন। উহার যে পাতে '৩' এর জায়গায় '৩' আছে, সেই পাতাটীর ফটোগ্রাফ্ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, এখানিও ১৪ শতকের লেখা। ইহারও অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও বড় বড়। সকলেই ইহার সহিত অন্য অন্য লেখার তুলনা করিতে পারেন।

২২ চিত্র। ২২এর পুথিখানি ১৪৯২ সম্বতে অর্থাৎ ইং ১৪৩৬ সালে বেণুগ্রামে নকল করা হয়। সুতরাং এখানি ইং ১৫শ শতকের লেখা। এখানি বৌদ্ধদের পুথি।

১। ফিনিসীয়, মোয়াবাইট ও ব্রাহ্মী।

২। ব্রাহ্মী হইতে বাংলা।

৩। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুঁথি।

৫। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুথির ব্যঞ্জন বর্ণ।

৬। ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি।

৭। বজ্রাবলী।

৮। কালচক্রাবতার।

৯। চর্যাগীতি।

১০। কুট্টনীমতম্। ইং ১১৭২।

১১। হেবজ্রতন্ত্রটীকা। ইং ১১৯৮।

২ রামচরিত মূল

১৩। রামচরিত টীকা

১৫। দোহাকোষের বর্ণমালা

১৪। দোহাকোষপঞ্জি।

১৬। অপোহসিদ্ধি।

১৭। সুভাষিতসংগ্রহ।

১১। জীমূতবাহনের ধর্মরত্ন।

২০। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। প্রথম অংশ।

২১। কৃষ্ণকীর্ত্তন।

২২। বোধিচর্য্যাবতার। ইং ১৪৩৬

২৩। কাশীদাসের আদিপর্ব্ব। বাং ৯৮৫

২৪। অঙ্গদরায়বার। বাং ১০৮০।

২৫। জৈমিনি ভারত। বাং ১১৭৫।

২৬। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের শিলাপত্র।

২৭। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি

২৮। বল্লালসেনের সীতাহাটী প্রশস্তি

২৯। বল্লভদেবের শিলাপত্র। ইং ৮৫

৩০। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রপত্র।

৩১। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন।

৩২। চট্টগ্রাম তাম্রশাসন। ইং ১২৪৩।

একজন কায়স্থ জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্য একজন ভিক্ষুকে দিয়া পুথিখানি নকল করাইয়াছেন এবং আর একজন ভিক্ষুকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছেন।

২৩ চিত্র—বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে অর্থাৎ ইং ১৫৭৮ সালের হাতের লেখা। এখানি কাশীদাসের আদিপর্ব্বের পুথি। অক্ষরগুলি মোটা মোটা, আর বেশ পরিষ্কার। পুথিখানি পরিষদের।

২৪ চিত্র—অঙ্গদ রায়বারের পুথি। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১০৮০ সাল, ইং ১৬৭৩। এখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি।

২৫ চিত্র—জৈমিনি ভারত। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১১৭৫, ইং ১৭৬৮। এই সকল পুথি নিপুণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ১১ শতক হইতে ১৮ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ দেখা যাইবে। ইহার ভিতর এমন একখানি পুথিও নাই, যাহা দেখিবামাত্র বাঙ্গালা পুথি বলিয়া মনে না হয়। বাঙ্গালা অক্ষরের একটা ছাঁদ আছে। সে ছাঁদ এই সব পুথিতেই আছে।

ইহার পর আমরা বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি শিলাপত্রের ফটো দেখাইব এবং তাহার অক্ষরের সহিত পুথির অক্ষর তুলনা করিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি।

২৬ চিত্র—হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ শিলাপত্রখানি তাহাতেই লাগান ছিল। যেটুকুর ফটো আছে, তাহার পাঠ,—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-

মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।

মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি-

বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

এ অক্ষরের ছাঁদই আর একরূপ, বাঙ্গালার মতই নয়। 'ভ'টী আমাদের 'ভ' ত নয়ই, দেবনাগরীর 'ভ'ও নয়। 'শ'টী একপুঁটুলি, অথবা উহার একটা তেকোণা নাক আছে। 'ক'র টানটা এখনও কুটিলের দিকেই। 'ও' একেবারে দেবনাগরী। 'চ'ও দেবনাগরী, দাঁড়ীটার বাম দিকে থলে। ইহার সঙ্গে ৩য় চিত্রের ফটো মিলাইলে দেখা যাইবে, দু'টাই যদিও এক সময়েরই লেখা, কিন্তু ইহাদের প্রভেদ কত—একটা খাঁটি নাগরী, আর একটী খাঁটি বাঙ্গালা।

২৭ চিত্র—বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দেবপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই শিলাপত্র। ইহারও অক্ষরগুলি নাগরী নাগরী বলিয়া মনে হয়। তবে কতকগুলি অক্ষর একেবারে বাঙ্গালা আছে—যেমন 'এ'কার, দন্ত্য 'স', 'ভ', 'ভু'। দ্বিতীয় শ্লোকটী এই,—

ওঁ নমঃ শিবায়। লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহম্
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরভ [য়া] স্থিত্বান্তরে কান্তয়োঃ
দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেহন্তরায়ঃ কৃতঃ॥

ঠিক এই সময়ের পুথির অক্ষর ৯ চিত্রে দেওয়া আছে। এই দুই রকম অক্ষর তুলনা করিয়া দেখুন।

২৮ চিত্র—বল্লালসেনের সীতাহাটী শিলাপত্র। প্রথম শ্লোকটী এই,—

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্বিধানবিলয়ন্নান্দীনিনাদার্শ্মিভি-
নির্মর্য্যাদ···দিশতু বঃ শ্রেয়োহর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমৈ···
···নাট্যারম্ভরয়ৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুবোধশ্রমঃ॥

ইহার সহিত কুট্টনীমতের (চিত্র ১০) তুলনা করুন।

২৯ চিত্র—বল্লভদেবের শিলাপত্র ১১০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ইং ১১৮৫র খোদাই। অক্ষরগুলি কতক বাঙ্গালা, কতক আর এক রকম। তাহার পর **৩০ চিত্র** লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘির তাম্রপত্র। এ দুইটী প্রায় একই সময়ের। ইহাদের সহিত ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রের তুলনা করুন। এই শিলাপত্র দু'খানির কতকটা পড়িয়া দিতেছি।

২৯শ চিত্র,— ··· ··· ··· ··· ···সূনুনা
অক্ষয়স্বর্গলাভায় জনন্যা জনকাজ্ঞয়া॥
এতস্যা ভক্তশালায়া নির্বাহার্থং মহাভুজঃ।
বিশালকীর্ত্তিশালিন্যাঃ শ্রীমান্ বল্লভদেবকঃ॥
শাকে নগনভোরুদ্রৈঃ সঙ্খ্যাতে চোত্তরায়নে।
শুভে শুভে ক্ষণে রাশৌ শস্তে ব্যস্ততমোগুণঃ॥

৩০ চিত্র—পং ২২। মণ্ডলে — শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী।

৩১ চিত্র—লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের শিলাপত্র। ইহারও ছাঁদ নাগরী, ঠিক বাঙ্গালা নয়। এখানি হয় ত ১৩ শতকে খোদাই হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজীর সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঁচিয়া ছিলেন না, তাঁহাদের মতে ইহা ১২ শতকেরও হইতে পারে। অনেক অক্ষর ঠিক বাঙ্গালা থাকিলেও, ইহার ছাঁদ নাগরী।

৩২ চিত্র—এখানির ছাঁদই বাঙ্গালার; শকাব্দ ১১৬৫ তে (ইং ১২৪৩) চট্টগ্রামে খোদাই করা। প্রথম শ্লোকটী এই,—

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫
দেবি প্রাতরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।
তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলা-
দালোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ॥

পুথি ও শিলাপত্রের লেখা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক দেশের একই সময়ের, পুথির অক্ষর একরূপ, আর শিলাপত্রের অক্ষর আর একরূপ। এইরূপ ১১ ও ১২ শতক চলিয়াছে। পুথিগুলি বৌদ্ধদের, শিলাপত্রগুলি ব্রাহ্মণদের। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অক্ষর ও ছাঁদ কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দুদের ঐ সময়ের পুথি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোক (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দু'য়ের লড়াইতে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধেরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরাও শেষে সেই অক্ষরেই পুথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর শিলাপত্র এই দেশের অক্ষরেই লেখা হইত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১ম সংখ্যা, ১৩২৭

ডাক ও খনা*

বাঙ্গালায় ডাক ও খনার বচন বলিয়া কতকগুলি চল্‌তি কথা আছে। কোন্‌টী ডাকের বচন, কোনটী খনার বচন ঠিক করিয়া লওয়া দুষ্কর। ভাষা দুয়েরই চাঁছা ছোলা পরিষ্কার। অল্প কথায় এত ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই সকল বচনে খুব অল্প কথায় অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছে। দুই চারিটী ডাকের বচন সকলেই জানে, সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব বচন একত্রে পাওয়া যায় না। এ সকল বচন যে কবে লেখা হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু ভাষা যেরূপ চোস্ত, বেশী দিনের বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশে লোকের ধারণা খনা বরাহমিহিরের পুত্রবধূ। বরাহমিহির ৪৭৬ খ্রীঃ সালে জন্মান এবং ২৩ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রধান বই লেখেন। তিনি আপনাকে আবন্তক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবন্তক বলিলে অবন্তী দেশের লোক বুঝায় অথবা এক জাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণ। তিনি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, শেষকালে গঙ্গাতীরে কান্যকুব্জে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম পৃথুযশ। তিনিও একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম বরাহমিহির। আমাদের খনার শ্বশুরের নাম বরাহ, স্বামীর নাম মিহির।

১। ব'লে গেছে বরাহের বৌ।

২। ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুনহ পতির পিতা।

খনা মিহিরের স্ত্রী ও বরাহের বৌ অর্থাৎ পুত্রবধূ। অবন্তীরবরাহ মিহিরের সহিত খনার সম্পর্কটা ঠিক নয়। তিনি বাঙ্গালা দেশেরই মেয়ে। তাহার প্রমাণ

শয়ন উত্থান পাশমোড়া।
তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া॥

---

* বাঙ্গালা ১৩৩০ সালে 'প্রাচী' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রায় সমগ্র প্রবন্ধটীই 'প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে 'ডাক ও খনার বচন' সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেন: "যেমন বৌদ্ধ সমাজে ডাকের বচনের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুসমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হইয়াছিল।...পরবর্ত্তী কালে ডাক ও খনার বচন যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভাষা হিসাবে তাহা তত প্রাচীন না হইলেও তাহাদের অনেকেরই কুর্‌ছিনামা মুসলমান আমলের পূর্ব্বে পৌছিবে।" ঐ বৎসরই 'প্রাচী' পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 'ডাক ও খনা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটীরও কিয়দংশ 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন

দুই ছেলের জন্মতিথি
অষ্টমী নবমী দুটি॥
পাগলা চৌদ্দ পাগলীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥
ইহাও যদি না কত্তে পারিস্।
ভগার খাতে ডুবে মরিস॥

ভগার খাত অর্থাৎ গঙ্গা। 'ভগীরথ খাতাবছিন্ন জল প্রবাহ' এ কথাটা বাঙ্গালা ছাড়া অন্য কোথাও প্রচলিত নাই। সুতরাং খনা বাঙ্গালীর মেয়ে, কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জ্যোতিষী আচার্য্যের স্ত্রী ও আচার্য্যের বৌ।

এই বচনগুলি বেশী দিনের যে পুরাণ নয় তাহার কারণ এই যে ইহাতে অনেকগুলি আরবী পারসী শব্দ আছে। তাহার প্রমাণ

দাতার নারিকেল, বকিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে বার মাস॥

'বকিল' শব্দটী আরবী।

আগে পুতে কলা।
বাগ বাগিচে ফলা॥

'বাগ বাগিচে' পারসী শব্দ।

খনা ডাকিয়ে বলে।
চিটা দিলে নারকেল মূলে॥
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥

'তাজা' শব্দটা পারসী।

বাঁশ বনের ধারে বুন্‌লে আলু
আলু হয় গাছ বেড়ালু॥

এ আলু আমাদের গোল আলু নয়, অন্য আলু, চুবড়ি আলু। কিন্তু 'আলু' শব্দটী পারসী।

শোন্‌রে মালি বলি তোরে।
কলম রো শাওনের ধারে॥

'কলম' শব্দটাই পারসী। 'কলম' করা মুসলমানেরাই হিন্দুদের শিখাইয়াছে। সংস্কৃতেও কলম শব্দ আছে। কিন্তু তাহার মানে 'ধানের গাছ'।

সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ডাক ও খনার বচন সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। আমরা এখানে সেই প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক—।

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ ॥ [রঘুবংশম্, ৪।৩৭]

এতক্ষণ যা বলা হইল তাহাতে বেশ বোঝা যাইবে যে খনা বাঙ্গালীর মেয়েও বটে আর মুসলমান আমলের মেয়েও বটে। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে, বৌদ্ধের নয়। নহিলে তিনি কেবল মাত্র হিন্দুর উপবাসের কথা লিখিতেন না।

ডাক

ডাকিনীর পুংলিঙ্গ ডাক। একথা আমি প্রথম নেপাল হইতে শুনিয়া আসি এবং বলি। সেখানে বলে বামাচারে যাহারা সিদ্ধ হয় তাহাদিগকে বীর বলে। বড় বড় বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক। তা' তিনি হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন। বৌদ্ধদের ভিতর ডাকার্ণব বলিয়া এক তন্ত্র আছে। বজ্রডাক তন্ত্র নামেও এক তন্ত্র আছে। ডাকার্ণবের মাঝে মাঝে সংস্কৃতের ভিতর চলিত ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে। আমি সেগুলি প্রায় সবই আমার "হাজার বছরের পুরাণ" বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মধ্যে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু সে ভাষাটা বাঙ্গালা একেবারেই নয়। কি ভাষা বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাষা-পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। মোনাহান সাহেব বলেন পুরাণ আসামী। গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন সেগুলি পঞ্জাব অঞ্চলের ভাষা। বাঙ্গালা নয় সেটা এক রকম স্থির।

আর এক ডাক আছেন, তিনি বৌদ্ধদের। বৌদ্ধদের হেরুক বলিয়া এক দেবতা আছেন। তিনি সকলের অপেক্ষা বড় দেবতা। তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহী। তিনি যখন বজ্রবারাহীর সঙ্গে যুগ্মনদ্ধ ভাবে থাকেন তখন তাঁহাকে ডাক বলে। বজ্রডাক হেরুকতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়। সে গান ও ছড়া পুরাণ বাঙ্গালা, বৌদ্ধ গান ও দোঁহার বাঙ্গালা। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডাকের বচন যতদূর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড় কিছু পাইলাম না। বরং যাহা পাইলাম তাহা হিন্দুর কথা।

১। অতিথি জনারে না বঞ্চিহ।
অতি উৎকট ব্রাহ্মণে না বলিহ ॥

২। সাত পাঁচ তিন জন।
তিন দুই যদি হয় ব্রাহ্মণ ॥

অর্থাৎ মধ্যস্থ করিতে হইলে সাত পাঁচ তিনজন লোক লইতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে অত লোকের দরকার নাই; দুই তিন জন লোক হইলেই যথেষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণ লইয়া মঙ্গল গাএ।
যাত্র গোতে আরু যাএ ॥
এ যাত্রায় যে জন যাএ।
দোলা ঘোড়া সেজন পাএ ॥

সুতরাং ব্রাহ্মণ মঙ্গল গাহিয়া দিলে শুভ যাত্রা।

গর্গ বলে ঘর ছাড়।
ভৃগু বলে সীমা এড় ॥
ভরদ্বাজ মুনি কএ।
শুভ ক্ষণে যাত্রা হএ ॥
ঠাঁই ফেলিয়া যাএ যবে।
বরাহের যাত্রা হয় তবে ॥

এই সকল ঋষিরা হিন্দুর, বৌদ্ধদের নহেন।

পরের বোল লাগা হয়।
শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণী লয় ॥
সিন্দকারে ওঠে কাস।
তাহার হয় জীবনের নাস ॥

এটাও হিন্দুরই কথা।

[যাঁহারা] মনে করেন খনা হিন্দু আমলের লোক, তাঁহাদের আমি মন দিয়া এই কয়টী ছত্র পড়িতে অনুরোধ করি।

তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পোঁত গুটি গুটি ॥
ঘন ঘন পুত না।
পোষের অধিক রেখো না ॥

খনার অন্য অন্য যে ছড়া আছে তাহার সহিত এই ছড়াকয়টীতে ভাষার কোনই গরমিল নাই। সেই ছোট ছোট কথায় ছোটছন্দে একটী পাকা উপদেশ। কিন্তু তামাক কি হিন্দু আমলে ছিল? উহা ত' আমেরিকা আবিষ্কারের পর টোব্যাগাদ্বীপে পাওয়া যায়; তাই উহার নাম হইয়াছে টোব্যাকো। টোব্যাকো হইতে আমরা 'তামাক' করিয়া লইয়াছি। উহা ত' আকবরের রাজ্যের শেসভাগে পর্ত্তুগীজরা আনিয়া আকবরকে উপহার দিয়াছিল। পর্ত্তুগীজরা যেমন করিয়া খাইত তেমনি গুড়গুড়ি, ফরাস, কল্কে সাজাইয়া তাহারা আকবরকে খাইতে বলিল। আকবরও নলটী মুখে লইয়া টানিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার হাকিম আসিয়া বলিল

"আজান জিনিস খাবেন না।"

আকবরের সময় দেশে তামাক একটু আধটু চলিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর আইন করিয়া তামাক খাওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরেরও পরে তামাকের চাষ আরম্ভ হয়। সুতরাং খনার এ বচনটীও কিছুতেই প্রাচীন হইতে পারে না। বলিবে খনার বচন সংগ্রহ মাত্র, উহাতে অনেক কালের অনেক জিনিস আছে। তাহা হইলে আমি নাচার।

আর একটা কথা, হিন্দুর নানা প্রকার সংস্কার আছে; তাহাতে জ্যোতিষের দরকারটা বড় বেশী। কিন্তু সেটা কি পাঠানদের সময় অত ছিল? সেটা যেন মোগল আমলেই বেশী হইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ই আরবী হইতে সংস্কৃতে ফলিত জ্যোতিষের অনেক বই তর্জ্জমা হয়। সে বইগুলিকে "তজিক" বলিত। "ইল্লাজ"ও বলিত। গণেশ দৈবজ্ঞ ও তাঁহার বংশধরেরা সেই আরবী জিনিসগুলি খুব ছড়াইয়া দেন। সে সময়ে বোধ হয় খনার জ্যোতিষের বচনগুলি অনেক তৈরী হয়। আমাদের দেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় সেই পুরাণ কালের জ্যোতিষই চলিতেছিল। গণেশ দৈবজ্ঞের ঢেউ যেন খনার বচনের মধ্যে অনেক প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ডাককে বৌদ্ধ যুগের লোক বলা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ডাক যে মুসলমান আমলের লোক তাহার প্রমাণ এই,

তকরার আগে পত্র লিখিব।
তবে আনিয়া সাক্ষী বোলাব॥

'তকরার' শব্দ পারসী।

মধ্যস্থ হইয়া হেমাতি বোঝে।
বলে ডাক সে নরকে মজে॥

'হেমাতি' পারসী শব্দ।

বস্তু লইয়া কর্জ্জ দিব।

'কর্জ্জ' পারসী শব্দ।

বিনি সাক্ষীতে না দিব খত।

'খত' পারসী শব্দ। এসব আদালতের শব্দ। সুতরাং মুসলমান রাজাদের সময়ই আমরা এসকল শব্দ পাইয়াছি।

বেগর চাষে দিত পান।

'বেগর' শব্দটী পারসী।

আদব নষ্ট নীচ গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে।

'আদব' শব্দটী পারসী।

এতগুলি আদালতের পারসী শব্দ যাহাতে আছে সে জিনিসটীকে প্রাচীন বলিতে ভরসা হয় না।

আমার এক একবার বোধ হয় ডাক পূর্ব্ব দেশের লোক। কারণ তিনি যে সকল ব্যঞ্জনের কথা বলিয়াছেন সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া যায়।

সকুতার পাতা কাসুন্দির ঝোলে।
তেলের উপর দিয়ে তোলে॥
পলুতা শাক রুহি মাছ।
বলে ডাক ব্যঞ্জনে সাজ॥

তিতো দিয়ে মাছ রান্না রাঢ়েও নাই, বাগড়ীতেও নাই।

মদ্‌গুর মাছ দাএ কুটিয়া।
হিঙ্গ আদা লবণ দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব॥

পশ্চিম বাঙ্গালায় মাগুর মাছের ঝোলই খায়। এইরূপ করিয়া মাগুর মাছ খায় না।

পোনা মাছ জামীরের রসে।
কাসুন্দি দিয়া যে জন পরশে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালায়।
আছুক মানবের দেবের লোভ যায়॥

নেবুর রস দিয়া পোনা মাছ খাওয়া পশ্চিমবঙ্গে নাই। কাসুন্দি বলিতে পশ্চিমবঙ্গে টক্‌ আচার বুঝায়। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে "আমকাসুন্দি" বলে। আমি প্রথম বুঝিতে পারি নাই যে ডাক নেবুর উপর আবার কাসুন্দি দেয় কেন। তাহার পর শুনিলাম বঙ্গদেশে কাসুন্দি বলে 'গোটা'কে অর্থাৎ কাঁচা আঁব কুটিয়া তাহার সহিত যে জিনিসটা মিশাইয়া পশ্চিমবঙ্গে কাসুন্দি করে সেইটাকেই পূর্ব্ববঙ্গে কাসুন্দি বলে। সেটা সরষের গুড়ার সঙ্গে নানারূপ মশলা মিশান। খাইতে অতি সুন্দর; পশ্চিমবঙ্গে তাহাকেই 'গোটা' বলে।

বড় ইচিলা দাএ কুটি।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥
উলটি পালটি দেহ পিট।
ইহ খাইলে বোজন দিট।

এই যে চিংড়ি মাছের বড়া বা চপ ইহা পশ্চিমবঙ্গে নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চিংড়ি মাছকে ইচা বা ইচিলা বলে।

যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে হইবে ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুর। তাও খুব পুরাণ নয়। মুসলমান আমলের বটে, কিন্তু কত পুরাণ বলা যায় না। বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরম্ভ; মোগল আমলে শেষ। খনার বচন

অধিকাংশই চাষের কথা এবং জ্যোতিষের কথা। 'গুপ্তপ্রেসের' পাঁজিতেই খনার বচনগুলি বেশ সংগ্রহ করা আছে। এত সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ডাকের বচন শুধু জ্যোতিষ ও চাষ লইয়া নয়। ইহাতে আরও অনেক কথা আছে। ছেলে মানুষ করা, গৃহিণীর দোষ, গৃহিণীর গুণ, সতীর লক্ষণ, অসতীর লক্ষণ, ব্যঞ্জন রাঁধা, বর্ষার লক্ষণ, ওষুধ এবং আরও অনেক কথা আছে। উপদেশ অনেক রকম আছে। ভাল লোক হইতে গেলে কি কি পরিহার করিতে হয় তাহার একটা তালিকা আছে।

পরিহর নারী যে স্বামী নাই।
পরিহর সেবক যার দুই গোঁসাই॥

* * *

পরিহর ধনী কুটুম্বের মুখ।
পরিহর ভোজনে বাসি সুপ॥
পরিহর দুই গ্রামে চাষ।
পরিহর যত্নে পরস্ত্রীর হাস॥

* * *

পরিহর বিনি কড়িতে হাট্।
পরিহর পুকুর পিছল ঘাট॥
পরিহর একলা চলিতে বাট্।
পরিহর শয়নে ভাঙ্গা খাট॥

* * *

পরিহর যত্নে পরের আশ।
পরিহর বিনি বলদে চাষ॥
পরিহর নালুচি যার মন।
পরিহর যত্নে খল ব্রাহ্মণ॥

ডাক চরিত নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একখানি পুথি আছে। তাহা হইতেই আমরা ডাকের বচন সংগ্রহ করিলাম। ঐ পুথিখানি ১০৯০ সালে লেখা।

প্রাচী
শ্রাবণ, ১৩৩০

গদ্যকাব্য

'বাল্মীকির জয়' বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক নূতন ধরণের গদ্যকাব্যের প্রবর্ত্তন করে। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ গদ্যকাব্যের রীতি ক্রমশঃ দেখা দেয়। প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানকে এইরূপ কল্পনোজ্জ্বল অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে একটী অভিনব ব্যাপার হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮৮ সালে 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তাহার একটী মনোজ্ঞ সমালোচনা করেন (আশ্বিন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি হরপ্রসাদ তাঁহার পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে শিরোভূষণ রূপে সাদরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই প্রশস্তি এখানে প্রকাশিত করিলাম। প্রস্তুত পুনর্মুদ্রণ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে করা হইয়াছে। এই বইয়ের একটী ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইয়াছিল (The Triumph of Valmiki/From the Bengali/of/H. P. Shastri, M. A./By/R. R. Sen, B. L./ Pleader, and Law Lecturer, Chittagong College/ Chittagong/1909)।—সম্পাদক—।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

বাল্মীকির জয়

(বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর লিখিত সমালোচন।)

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল [পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ], কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে, আমি নিশ্চিত জানি; কেন না, ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নভেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে, কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে; একটী সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নহে: নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of Species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces—Physical, Intellectual, and Moral." ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটী বিরাটমূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল, এই তিনটীই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমার মানবদেবী অপেক্ষা

আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায় ?

কথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই ? তিনটী force—physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইঁহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা মহার্ঘ করেন, আর এক জন কেবল দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectul, Moral ! দেখ Physical—আমাদের এই বাহু সম্পদ ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য ! এই অসংখ্য অজেয় সেনা। Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র ! ! আর Moral ? বুঝি শুধু খ্রীষ্টধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি ? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয় ? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে, সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি ? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Fraternity !" ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভালবাসিবে ; যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে, তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এ দেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া

বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলামোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চাণক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলেন; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্ব্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে "ভাই ভাই" পড়িব, সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, একচ্ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবারি একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের একচ্ছত্রাধীন সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তরভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর এক দল বলেন, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশুও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে **Physical, Intellectual** এবং **Moral** নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হউক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে, পুণ্যবান মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না। তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ কোন দিব্য লোকে বাস করেন। গ্রন্থের প্রথম দৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গালা ভাষায় এ দৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিল। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে

আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।"

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্যসাগরে অতুল—তাহা স্মরণ কর। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ। কুমারসম্ভবের কবি,—জগতের কবি-কুলের আদর্শ—অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতি-প্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া, পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধুয়া "ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!" গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন ছিল তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।"

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই" মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। "অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি, তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?"

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেনঃ—"বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এখন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? * * সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ", তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও ঐ মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব; পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?"

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, "কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম; তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল; আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম! কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল!"

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন, —আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাঁহার মার কাছ হইতে তাঁহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উঁহাকে কখন কাহাকেও দিব না।"

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন যে, গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য—নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন বিদ্যাবল ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্ত সিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং—ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান "ব্রাহ্মণত্ব"। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর লইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন ঃ—

"তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।"

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌর জগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা—কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক দিন কাঁদিয়াছিলেন, "সব হইল—কিন্তু সুখ কই?" বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, "সব হইল, কিন্তু সুখ কই?" সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয়-স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর

উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছু দূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায—ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তারপর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি,—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মীকি-প্রতিভা" পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না।* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—এক দল যজ্ঞ করিতে দিবে, আর এক দল দিবে না। দুই দলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদবিসম্বাদ মিটিয়া গেল—**বাল্মীকির জয়** হইল।

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে, "সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

* 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়, এবং ১৬ই ফাল্গুন "বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা" উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। "রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী [হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা] সরস্বতী সাজিয়াছিলেন—...।" "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪৩), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৮) অভিনয়দর্শকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন।" (শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্র-জীবনী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮)।—সম্পাদক—।

তখন তিন জন ঋষি রামায়ণের "plot" নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "রামকে ধার্ম্মিক কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।"

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল—নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাটমূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন, বাল্মীকে! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়!"

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর, তাঁহারা বলিবেন যে, এ কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল, নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা সৃষ্টি হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত, তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্যস্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমময় ষ্টীমের কল, বাষ্পীয় পোত, রথ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে

কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি, এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাটদর্শন, —যাহা দেখ, সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা, এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণ-প্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন। পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে, সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিক শক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্পবয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

বাল্মীকির জয়

১

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ়নীল—বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছ পালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজরঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ: যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই প্রকাণ্ড চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার* সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এক দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূডা; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারি দিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্যদিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা, সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা,

* পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূম ও ধূলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে, তাহার নাম ধুন্ধুলা।

আবার পরক্ষণেই গভীর খড; তাহার তলা কোথায়?—দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে, একটী ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল—সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

২

মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়; যাহাদের পিতা মাতা মরে, তাহারা বলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু বেদমতে তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য্য করিয়া যান, তাঁহারা ঋভু* হন। ইঁহারা কোথায় থাকেন! কি করেন? কে বলিতে পারে! ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোন সুখময়ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিল। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্রজ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়†, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে! কিন্তু সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র

* যে মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হন, বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

† পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িরা টিব্যা বলে।

অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত—মহামোহ-নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ—স্বপ্নবৎ—অৰ্দ্ধচেতন, অৰ্দ্ধ-অচেতনবৎ—মোহময়, সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থমধুরসঙ্গীতধ্বনিবৎ, কাণে কি জানি কি নিলীন হয়, সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না, কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল। কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিন জনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিন জনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতের চূড়া, যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের নাম লোপ হইবে না।

৩

প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ, ষষ্টিসহস্রশিষ্যপরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি উপদেশ দিতেছিলেন। কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়, নির্ণয়, ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্ত্তবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন; কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন; শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্ম্মও শিক্ষা দিতেছেন; এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইল। গীতধ্বনি বশিষ্ঠেরও কাণে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন, ঋভুগণ আসিয়াছেন; অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া, ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তি-নিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েক জন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে আসিয়া বসিলেন। এমন সময়ে আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কাণে গেল। সৈন্যগণ যে যে ভাবে ছিল, সে

সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ, সুখ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গাড়িয়াছে, তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে, তাহার অর্দ্ধেকেই শেষ হইল, আর যে গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে এক টিব্যায় উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয়, বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারি দিকে হৈ হৈ রৈঃ রৈঃ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষিগণ কে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সঙ্কেতমত শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যেভাবে ছিল, চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী টিব্যায় আরোহণ করিলেন।

৪

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পুরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে—এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

পৃথিবী শুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই!

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল ভাই ভাই। যেন মোহিনীতে তাহাদের ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। একজন পণ্ডিত, একজন দিগ্বিজয়ী, আর একজন দস্যু, সবারই মনের বিরোধী ভাব যেন মুহূর্ত্তের জন্য তিরোহিত হইল। সবারই হৃদয় যেন একতানমনপ্রাণে বলিয়া উঠিল—ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৫

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটী ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনি উন্মত্ত যে, বেগবান্ চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র ভাবনার ত কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময় তেমনিই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্লানি। হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!!

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে; দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন ছিল তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল ; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি এতক্ষণ একদৃষ্টে ছায়াপথের দিকে হা করিয়া চাহিয়াছিলেন ; ঋভুরা চলিয়া গেলে হতাশ হইয়া পড়িলেন ; তখনও সে সুর কাণে বাজিতেছে, যেন বলিতেছে, ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যে চিন্তা তাঁহারা এতক্ষণ টেরও পান নাই, তাহা উদ্দাম-রূপে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বাল্যের, যৌবনের, প্রাচীন, নবীন, স্বার্থপর, অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধিভাবমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এমন ক্ষমতা রহিল না যে উঠিয়া কোথাও যান। অথচ কাণে বাজিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৭

বশিষ্ঠের একবার মনে হইতেছে, বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমনি কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? আবার কাণে বাজিতেছে—সেই সুর —সেই ভাই ভাই। আবার ভাবিতেছেন, সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ", তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারি না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন? আহা, কি গান! কি ভাব! পারিব কি? আর কি দেখিতে পাইব? এবার দেখিতে পাইলে আমরাও সেই ভাই ভাই করিয়া জবাব দিব। সম্বল বুদ্ধি আর শাস্ত্র। পারিব বই কি! কাণে বাজিল ভাই ভাই ভাই।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, এঁরাই ঋভু! কি গান! কি মূর্ত্তি! আমার কি সৌভাগ্য! হবে না কেন? আমায়ও একদিন ঐরূপ মাতিতে হইবে। পারিব বোধ হয়। একবার ঋভুদের সঙ্গে জবাব করিব। অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ

গাওয়াইতে পারি, তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই? এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না। হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পলায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই ভাই ভাই। বাল্মীকির নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবিলেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরও নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।

৮

তাঁহারা কতক্ষণ অন্তরের গোলমালে ব্যাপৃত ছিলেন, কে বলিতে পারে? কতক্ষণ ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাবৃষ্টি হইতেছিল, কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন, সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ-আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে, নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে, তিন জনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে।

তুমুল-ভাব-ঝটিকার অন্তে বশিষ্ঠের মনে শান্তি ও সুখ দৃষ্ট হইল। তিনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই ভাই স্থাপন করিবেন, এই আশায়, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গর্ব্বপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি। বাকীটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।

বাল্মীকির শান্তি রহিল না, সুখ রহিল না, দারুণ অনুতাপ তাঁহার সর্ব্বস্ব হইল।

তিনি দস্যুদলের দিকেও গেলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি উদ্দেশে নিবিড় গহনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ মহাহৃষ্টচিত্তে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জশরীর বিশালবক্ষাঃ বিশ্বামিত্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অবতরণ করিতেছেন, অমনি সসম্ভ্রমে যোগবলে তাঁহার নিকটে আসিয়া দুই জনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন, পদভরে পর্ব্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে, সম্মুখস্থিত উপল সকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথপ্রদান করিতেছে। প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেছে ও ছায়াদানে তাঁহাদিগের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সুহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী সকল সুমধুর গীতে তাঁহাদিগের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে, লতাসমূহ বৃক্ষোপরি হইতে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প বিকিরণ করিতেছে। কলকলনাদিনী নির্ঝরিণীগণ প্রতিপদে তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পথমার্জ্জনা করিতেছে। বনতলস্থ কোমলকায় গুল্মসমূহ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যময় পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঁহাদিগের শরীরে চামরব্যজন করিতেছে। অতি দুর্গম দুরারোহ সানুসমূহেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন। পশ্চাৎভাগে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, নিম্নে তৃণাচ্ছাদিত সুনীল সমতলভূমি, মধ্যস্থলে তীব্র তেজোময় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। উভয়েই পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ডকায়। বোধ হইতে লাগিল যেন সৌর-কর-প্রতিফলিত অতএব তীব্রোজ্জ্বল তুষারশিখরদ্বয় স্বস্থানবিচ্যুত হইয়া সমানগতিতে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে।

প্রথম সাক্ষাতে বন্দনাদির পর বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়া-পরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহাকন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ, বহুদিবসাবধি আমি শ্রুত আছি, আপনি ভুবনবিজয়ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়া-কলাপে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ভবাদৃশ বীরজনের অদ্ভুতচরিত্রসম্বন্ধীয় সংবাদও লইতে পারি নাই। অদ্য পরমসৌভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহপ্রদর্শন করিয়া স্বকীয় দিগ্বিজয়ব্যাপারের অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

বশিষ্ঠের জীমূতমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে নিলীন হইবার পূর্ব্বেই রাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র ভীষণকোদণ্ডটঙ্কারের ন্যায় স্পষ্ট অথচ দ্রুত, গম্ভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে, মাদৃশ দীনজনের চরিতজ্ঞানে ভবাদৃশ মহাশয়ের কৌতূহল নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব নিজমুখে নিজকীর্ত্তি বর্ণনে প্রত্যবায়সত্ত্বেও আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিব।"

"সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি উপায়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ীর পক্ষে ভেদ ও দণ্ডই প্রশস্ত। এই জন্য আমি ঐ উপায়দ্বয়ই অবলম্বন করিয়া এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাষ্ট্র, মৎস্য, মগধ, বিদর্ভাদি দেশসমূহ স্বয়ং অক্ষৌহিণীমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে

হস্তগত করিয়া অদ্য হিমালয়দ্বারে শিবিরসংস্থাপন করিয়াছি। পূর্ব্বাঞ্চলে চীন, হুন, সান, মান, শ্যাম, মগ, নাগাদি রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গকে প্রেরণ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, আরব, পারস, ম্লেচ্ছ, কিরাতাদি জাতিসমূহকে উচ্ছৃঙ্খল করিবার মানসে নবনবতি অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছি। সকল স্থান হইতেই সুসমাচার আসিয়াছে। হিমালয়জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।”

বশিষ্ঠ বলিলেন, “মহারাজের দিগ্বিজয়কাহিনী শ্রবণে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী। আপনার পক্ষে ভুবনবিজয় অসম্ভাবিত নহে; কিন্তু আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় ভঞ্জন করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব।”

বিশ্বামিত্র। দীনের প্রতি এরূপ আদেশ অন্য কেহ করিলে উপহাস বলিয়া বোধ করিতাম, কিন্তু ভবাদৃশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইতে উপহাস সম্ভাবিত নহে, অতএব আজ্ঞা করুন, দাস হইতে যদি আপনার কোন কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, দাস করিতে প্রস্তুত আছে।

বশিষ্ঠ। আমার প্রথম সন্দেহ এই যে, দিগ্বিজয়ের ফলোপধায়িতা কি?

বিশ্বামিত্র। মহাশয় এমন আজ্ঞা করিবেন না। দিগ্বিজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে এক জন রাজা হন, এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে ঐক্য সংস্থাপিত হয়।

বশিষ্ঠ। আমার বোধ হয়, দিগ্বিজয়ে জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া ঐক্যসম্ভাবনা সুদূরপরাহত করে। বিজিত জাতিদিগের মধ্যেও জেতার অনুগ্রহতারতম্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমার মন্তব্য এই যে, দিগ্বিজয়ে কি জাতিসমূহমধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎপন্ন হয়? সকলে ভাই ভাই হয়?

বিশ্বামিত্র। আমার সংস্কার এই, দিগ্বিজয়ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায়; সমস্ত প্রজাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে। গত রজনীর ঘটনায় আমার এই সংস্কার আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। আমাকে দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য স্থাপনে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ। এইটী আপনার ভ্রম। ঋভুগণ সময়ে সময়ে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাকে উৎসাহিত করিতে আসেন নাই। আর এক কথা, আপনি দিগ্বিজয় করিয়া মনুষ্যের শরীরই জয় করিলেন, তাহাদিগের মনের উপর আপনার প্রভুত্ব কি?

বিশ্বামিত্র। মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ হইতে দিব না।

বশিষ্ঠ। তাহার নাম দমন, পালন নহে, তাহাকে ভ্রাতৃভাব বলে না। মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হইতেই পারে না।

বিশ্বামিত্র। প্রথম বলে শাসন অভ্যস্ত হইলে যখন সকলেরই সমান দশা হয়, তখন সকলেই ভাই ভাই হইয়া যায়।

বশিষ্ঠ। সে ভাই ভাই নয়, সে রুদ্ধ অগ্নির ধূমোদ্গম মাত্র। সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দেশ জ্বলিয়া উঠে। এবং সেই অগ্নিশিখায়ই দিগ্বিজয়ীর আহুতি হয়।

বিশ্বা। আপনি মনে করিবেন না, (দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া) এই হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।

বশিষ্ঠ। যদি ধনুর্ব্বাণদ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে হইল, তবে তাহাকে কি ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে?

বিশ্বা। মানিলাম, পারে না। কিন্তু দিগ্বিজয়ভিন্ন ভ্রাতৃভাবের অন্য উপায় আপনি দেখাইতে পারেন?

বশিষ্ঠ। না পারিলে এত কথা বলিব কেন?

বিশ্বা। দেখা যাউক, আপনার কমণ্ডলুমধ্যে কি উপায় আছে।

বশিষ্ঠ। উপায় এই: বলে মানুষের মিল করান যায় না। মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জন্য চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ দুই মানুষকে এক করা কাহারও সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। নীচজাতির যাহাতে স্বাধীনচিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বা। জন পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণে মিলে পৃথিবীর লোকের স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিবেন?

বশিষ্ঠ। বুদ্ধিবলে কি না হয়? আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একবারে গ্রন্থাদিপাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। এইরূপে একপুরুষে না পারি, অন্ততঃ দশপুরুষেও মনুষ্যে মনুষ্যে দূরে থাকুক, মনুষ্যে পশুতেও ভ্রাতৃভাব জন্মাইয়া দিব।

বিশ্বা। মানুষ পশুবৎ হইবে, কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাব!!! এই ভ্রাতৃভাব কেন? ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য? দিগ্বিজয়ে একজন রাজার অধীনে থাকে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের অধীন হইতে হইবে। আপনি মনে করিয়াছেন, তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? আপনাদের পরম শত্রু আকাশ আছে, দেখিতেছেন না? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীন চিন্তা যে আপনিই উদ্বেল হইয়া উঠে।

বশিষ্ঠ। আমরা তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব। আকাশের তারার সহিত

মনুষ্য-অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব। অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীনচিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারও এক পাও যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।

বিশ্বা। হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎ বশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বিটলামিতে কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে? আমি বেশ বলিতে পারি, বিশ্বামিত্রের দলের কাহাকেও আপনি ভুলাইতে পারিবেন না।

বিশ্বামিত্রের কটূক্তিতে বশিষ্ঠের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে উহা শমিত করিলেন। ক্রোধোদ্রেক হইতে ক্রোধশান্তি পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র কূটতর্কে এবং শ্লেষোক্তিতে বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং তিনিও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না।

নিঃশব্দে কিয়দ্দূর অবতরণ করিলে, বিশ্বামিত্র দূরে আপন শিবির দেখিতে পাইলেন। তখন একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, দাসের শিবিরে আতিথ্যগ্রহণ করিলে দাস কৃতকৃতার্থ হইবে।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ জাঁকসহকারে যে সমস্ত অপার রত্নরাশি নানা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখাইলেন এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন শাল, তাল, তমাল, পিয়াসাল, হিন্তাল, বক, বকুল প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতাগুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দূর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ; কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি খাদ্যজন্তুর

দিকে তাকাইতেছেও না। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা তাঁহাদের পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাত্মন্, বুদ্ধিবলে বন্যজন্তু বশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানুষ বশ করিতে পারিবেন না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহারা স্থানমাহাত্ম্যে বশ হইয়াছে; আমাদের বুদ্ধিবলে নহে।"

কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই এ দৃশ্যের পরিবর্তন হইল, হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানা প্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল কে যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও শাদা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে শাদা, কোথাও নীল, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে নীল, কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে রাঙ্গা, কোথাও সবুজ, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া আর এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে। যে স্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সে স্থলে উপলে সে দোষ পুরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারি পার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প, তাহার বাতাসে চার দিক্ ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গালিচা—ঠিক মধ্যস্থলে, প্রকাণ্ড সরোবর, মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি, তলাপর্য্যন্ত মার্ব্বল পাথরে বাঁধান, জল এমনি স্বচ্ছ, তলার মার্ব্বল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত-মর্ম্মরের সেতু। সেতুর মরকতময় রেলের উপর নানা মণিনির্ম্মিত বিচিত্র দাঁড়; তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী এবং বিচিত্র পক্ষপুচ্ছধারী ময়ূরময়ূরীগণ গান ও নৃত্য দ্বারা অভ্যাগত রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে। সরোবরের স্বচ্ছজলে লাল, নীল, পীত, হরিত, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রঙের মৎস্যসমূহ সন্তরণ করিতেছে। সরোবরের ওপাশেও গালিচা। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দ্বার কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। দ্বারে খোদিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা—

"স্বাগতং গাধিকুলতিলকস্য বিশ্বামিত্রস্য।"

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও তিনি এরূপ অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। হীরা, মতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্ম্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারি দিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে আর ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এরূপ একুশটী দেয়ালে একুশটী যুদ্ধকাহিনী লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে এবং তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাততঃ মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার

করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী। তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটী দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকে দিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না দিলে অতিথির অবমাননা হয়, সেটা স্মরণ রাখিবেন, আপনারা সমাজের ব্যবস্থাপক।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "বলে বা কৌশলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, অতএব আপনাকে এরূপ অসৎ অভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।"

বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। অপহরণ করার অপরাধ বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর নহে" বলিয়াই আপন লোকজনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এদিকে অতিথি সর্ব্বদেবময়,—ওদিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ, বশিষ্ঠ মহাবিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপহরণ করিবার উদ্যোগ করিল, ধেনু কাতর নয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "কি করি বৎসে, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমিই ইহার প্রমাণ।" বলিবামাত্র নন্দিনী হুঙ্কার ছাড়িলেন, হুঙ্কারশব্দে আকাশ-পাতাল ফাটিয়া গেল। আর অগণিতসংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিয়াই ভাবিলেন যে, পারদাদি জাতিকে তাঁহার সেনানীরা আজিও বলে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, বশিষ্ঠ বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন। জানিলেন, বুদ্ধিবলে মানুষও আয়ত্ত করা যায়।

৩

ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল। এক দিকে ক্ষত্রিয় সেনা, আর এক দিকে যবনসেনা, মধ্যস্থলে নন্দিনী। পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা

করিতেছেন তাহারা কোনমতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ—ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি, দীর্ঘ দীর্ঘ বর্শা, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনুক, টঙ্কারে টঙ্কারে মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যের অভিনেতা, ব্রাহ্মণ পক্ষে অভিনেতা কেহই নাই, বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, বলিলেন, পুত্রগণ, শিষ্যগণ, ক্ষত্রিয়ের যাহাই হউক, "ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা," ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলি রক্তে কর্দ্দম হইল। এক দুই করিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্রের শত শত সৈন্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক নিহত হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক এক আঘাতে শত শত যবনের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রয়াস বৃথা, নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিতেছে, তাঁহার নিজের রণদুর্ম্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্রউদ্গমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, "গোরু মেরে ফেল।" গোরু এখনও ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত হয় নাই। উহারা দূর হইতে নারাচবল্লমাদি ক্ষেপ করিয়া গোরুর প্রাণ সংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশপথে উত্থিত হইল। শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না লজ্জিত হয়, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো; তাহার উপর আবার শ্বেতপদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন, "রে মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোর সাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস্। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব।" বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিলেন, সরস্বতী আবার ধেনুমূর্ত্তি ধারণকরতঃ বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বায়ুতে মিশিয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দর দর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্ব্বপ্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, হিংসায় বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন, সৈন্যসামন্তকে আপন আপন বাড়ী যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন—

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং"

বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা, আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দিন, মাস, বৎসর কাটাইয়া দিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল বিশ্বামিত্রপক্ষীয়েরা তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

এদিকে বিশ্বামিত্র একবারে ঘোরতর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই বল এক করিবেন এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন। এই তাঁহার মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ের এক অতি নিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম স্থানে গমন করতঃ, একেবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে, এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্দ্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্দ্ধদানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃক্‌পাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোটরগত হইল, নাসিকার মধ্য-অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড় কেবল চর্ম্মমাত্রে আচ্ছাদিত হইল। কেশরাশি বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদ-নখ বর্দ্ধিত হইয়া শিকড়ের মত মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না। ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ দেখে আর ধীরভাবে দূর দিয়া চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখন বোধ হইত সমস্ত জগৎ বিশ্বসংসার পরমাণু হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল। তাঁহার তেজে, পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষে নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ অন্তরের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন, কতকগুলি পরমাসুন্দরী—যুবতী, অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বললালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইতেছে, কেহ শরীরের অর্দ্ধ অংশে বসনত্যাগ করিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে! কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে, কটাক্ষ কখন কোমল, কখন চঞ্চল, কখন ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখন অলস, কখন বিদ্যুৎবৎ, কখন চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারও বেণী বদ্ধ, কাহারও এলো, কাহারও অলক কুঞ্চিত, কাহারও বায়ুভরে দোলায়মান। আর সকলেই নানা হাব ভাব বিকাশ করিয়া,

কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনাদের আলস, মদনভাব প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বামিত্র দেখিলেন। তাঁহার অন্তরদাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটি সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে, বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্য্যসমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে, যাইতে, যাইতে, যাইতে সূর্য্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেইখানে ভয়ঙ্কর সর্প শতসহস্র তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন—ভয়ানক কাণ্ড, নানা-প্রকার ভীষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে। কাহারও মুখ শূকরের মত, সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গল। কেহ ভীষণ পিশাচ, মাথার উপর চোখ, অর্দ্ধেক শরীর হাতে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া চারিদিকে আহারসামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাইতেছে, অমনি উদরসাৎ করিতেছে। কাহারও দন্ত শূকরের ন্যায়, কাহারও হস্তীর ন্যায়, কাহারও মাথা পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায়, কাহারও কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোন স্ত্রী-পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয় পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় বৃহৎ, আবার কাল। কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানা রঙ্গে ভয়ঙ্কর। যখন এই ভয়ানক সৈন্য সেনাপতির আদেশে বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করিল, তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত হইয়া গেল। কাহার পদ ভগ্ন হইল, কাহার প্রাণনাশ হইল, কাহার মস্তক ক্ষত হইল। স্তনবতীর স্তনভার খসিয়া গিয়া তাহার শরীর হাল্‌কা হইল। এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে গেল, ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এই ভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া পিশাচসেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড় পরাক্রমশালী—তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও; এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর, পিশাচ, দৈত্য, দানব, আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে, অসংখ্য সমৃদ্ধ রাজ্য চারিদিকে রহিয়াছে,—সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর, পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা। উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুল রাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। যতদিন

তুমি রাজ্যে স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের রক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার? নন্দিনী দিতে পার? বিদ্যা দিতে পার? সরস্বতী দিতে পার?" "না, পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি। নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না," বলিয়া বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২

এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত একবিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার কর্ণকুহর হইতে জাঁতার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার খুলি অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে বুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপালক পালিকা বিদীর্ণ করিয়া সেই পথে বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শতসহস্র অনবরত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনা গেল—

ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ ॥

বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মস্তকাস্থি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল, সতেজ ও কান্তিপুষ্টি হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, 'ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্রদর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা ত ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট, বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

৩

বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য

ব্রহ্মর্ষিদিগকে মহাসভায় আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশপথে সভা হইল, বোধ হইল, আকাশপথে শত শত সূর্য্যের উদয় হইয়াছে; সভায় এক জন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, কোন ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষিই অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, আপনি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায়, দিবেন। তখন সূর্য্য-বিনিন্দিত প্রভারাশি বিস্তার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্যরশ্মিরথে আরোহণ করিয়া হিমালয়ের সেই নিভৃত গুহায় আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তৃপ্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব।" "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মত ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার সূর্য্য-রশ্মিরথে আরোহণ করতঃ ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন; এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল, সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোন বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার নিজে যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদ্গণের অনুরোধে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জকান্তি ঋষিগণ কেহ সূর্য্য-রশ্মিরথে, কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতাগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন; এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদ্গণ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ উপযুক্ত, যেরূপ তপস্বী, মহাপুরুষ, তুমি ত ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকি কি রহিল? ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট, অনেক ব্রত নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা, তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

বি। আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না, তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা কর না কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ আর আমরা

তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি উপাধি দিলাম। তুমি জান, ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয় শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহ, রাজর্ষি সম্ভ্রমসূচক পদক গ্রহণ কর।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণ, তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।" বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেমন, বলিয়াছিলাম ত, ব্রাহ্মণত্ব এখনও পায় নাই, তাহাতেই এই।" ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে, আশ্চর্য্য কি? যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে? এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর, ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও?"

বিশ্বামিত্র। "ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল কর, আমি তোমাদের সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড-পর্য্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্ব্বোন্নত শিখরদেশে আরোহণ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

১

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোন পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।

যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, সেই দিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে

পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিতে হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে শত-সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুলফ-বিলম্বিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটভার। সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল উল্কাপাতবৎ বোধ করিতে লাগিল। রজনী গাঢ়ান্ধকার হইলে বশিষ্ঠ আপন আশ্রমে নির্জ্জনে নিজমন্ত্রসাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহসা আকাশে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যে হৃদয় মহারণে অটল, ব্রহ্মর্ষিসভায় অক্ষুব্ধ, সে হৃদয় অকস্মাৎ ভীতভীত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কাবণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ, অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয় সৌর-জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর-জগৎ হইতে সৌর-জগৎ, তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনন্ত, অনাদি, গাঢ়, সুগম্ভীর, অকূল, অতল, অলঙ্ঘ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর গ্রহনক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল। আলোকও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র মানুষবলে উঠিতেছেন না, তিনি যোগবলে উঠিতেছেন। সুতরাং এই কল্পনারও অগম্য ভীষণ স্থানে তাঁহার ভীতি-সঞ্চার হইল না। বহুদূর এই অগাধ অনন্তমধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্ত্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই তাঁহার গন্তব্য নীহারিকা বোধ হওয়ায় তাহার সম্মুখে অবিদূরে আপন গতি রোধ করিলেন।

২

বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন, অগাধ, অনন্ত, শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তুসমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোন নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া এক স্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতসংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন।

প্রত্যেক নীহারিকা আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব্ব খর্ব্ব, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল, ততই পরমাণুসমূহ নিকটবর্ত্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্দ্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্তগর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটি ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া বশিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌর-জগতের সূর্য্য উত্তম হইয়াছে। কোটি কল্পেও এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না।

৩

কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত পদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক," অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক," অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা-যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড় হইল, সূর্য্য কোটি গুণে বড়। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।

৪

তৃণ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ, যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি হইল; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ, তখন এখানে ছিল

না—তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না; বিচিত্র পক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এই-ই অধিক। বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ—বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি—যে তৃণ দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়িত, তাহা গোলাব। বায়ু ধুপ-ধুনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না—বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে এবং ইহার পরও সহস্র সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, কাহারও কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্দ্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ী ঘর দ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্ব্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য্য উত্তাপ, এ জন্য সমস্ত রাস্তার উপর আচ্ছাদন দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম, রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে ভাবসৌন্দর্য্যের জন্য বড়ই পাগল, এই জন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বদা পর্ব্বতের শিখরাগ্র হইতে সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়া দিলেন।

৫

আর মনুষ্য—নূতন জগতে নূতন মনুষ্য হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষুলজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্যদেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তিদেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহাদ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কাল কুৎসিত দুই একটা কদাচ কখন

মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলে, সেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উন্নতিপথে ধাবমান। নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, কখন পর্ব্বতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখন নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখন আকাশপথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি, সমাজোন্নতি, মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই; কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনোমিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিন বৎসরকাল পুনর্ম্মিলনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কেহ অন্যের সহবাস করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না; লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল; চৌর্য্যাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোন প্রকার রাজা, সেনাপতি, কিছুরই ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম্ম হইল।

উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। যে সকল কারণ থাকায় পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারও ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে জন্ম দুই প্রকার;—পুনরাবর্ত্তন জন্ম আর নূতন জন্ম। নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখিত ছিল, রোজ সেই কয়টী করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্ত্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত, বলা যায় না।

৬

ও দিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গল মধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন, ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন

না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু-পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুল্কাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে একদিন এক ক্রৌঞ্চমিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া আসিতেছে। এ একবার উলটিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উলটিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে। বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্বকথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটী পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূতলে লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ব্যাধে দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন; নির্ঝরমধ্য হইতে একটী কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে। তাহার কান্তি অপ্সরাবিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, মন্দ ও হৃদয়-মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু-পক্ষিগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমলহৃদয় দেখি নাই, এই জন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে। তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণাগ্রহণ করিলেন, বীণা তাঁহার হাতেই রহিল, সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট, সর্ব্বদা শোণিতস্রোতপ্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজকসময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবনসাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজসাম্রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের সর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটি প্রধান জাতি ছিল। যবন, ম্লেচ্ছ, হূনাদি জাতির রাজ্য, বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে, কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই, তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেড়ারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি সর্ব্বপ্রধান লুঠেড়া দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই, তাহারা গুহক নামক চণ্ডালকে কর্ত্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অগ্য শতদ্রুসঙ্গম, পরশ্ব সরযূতীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময়ে লুঠেড়ার দল দেখিলে কলির একাকার বলিয়া বোধ হইত, বড বড় দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায়, এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধুমধামে বাস, এক নরহত্যা ও দেশলুণ্ঠনকার্য্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেবেরও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলেও হইত। যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত। তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটী করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেড়াদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেড়ারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবলপরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রীহরণ, পরধনঅপহরণ, পরদেশলুণ্ঠন, পরপীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরকে যন্ত্রণাপ্রদান তাঁহার প্রধান আমোদ। তাঁহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষে ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া এক জন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বানররাজ্যস্থ সুগ্রীবের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য খরদূষণ নামক নিষ্ঠুর ও অবিমৃষ্যকারী সেনাপতিদ্বয়কে দণ্ডকারণ্যে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

বানরদিগের দেশে বালী রাজা নিজবিরুদ্ধপক্ষকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেন। বড় বড় লোকালয় সকল বালীর অনুচরবর্গের অত্যাচারে জন শূন্য ভয়ঙ্কর মরুর ন্যায় হইয়াছিল। ঐ যে "দণ্ডকারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" শুনা যায়, উহা এককালে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বালী রাজার অত্যাচারে নির্জ্জন অরণ্য, সিংহব্যাঘ্রাদিনিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই দল, দুই দলই বা বলি কেন? সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তবে এই সমস্ত স্ব স্ব প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম—ক্ষত্রিয়ের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পরশুরাম সকলেরই উপর চটা, তিনি সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথামত কাজ না করাতে আবার ক্ষত্রিয় প্রবল হইয়াছে, অতএব তাঁহার ইচ্ছা দুয়েরই মূলোচ্ছেদ হয়। তিনি একাই এক সহস্র। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যে যোগ দেন না। তাঁহার মত যাহারা ক্ষত্রিয়ান্তক, তাহারা যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে। ব্রাহ্মণদিগের অপর দলের অধিনায়ক বশিষ্ঠ, তিনিও আপন দলের সর্ব্বময় প্রভু নহেন। তবে তাঁহার দলে তাঁহার কতকটা প্রভুত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এক দল বশিষ্ঠের নিকট নানা প্রকারে বাধ্য, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে যাহাতে মিল থাকে, তাহার জন্য যত্নবান্। এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান। আর এক দল পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তক সেইরূপ ব্রাহ্মণান্তক। বিশ্বামিত্রবংশ ইহাদের সর্ব্বপ্রধান। বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকল দলই পরস্পর অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণও দিতে পারে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণকে আহ্বান করিতেন কখন কিন্তু করিতেন না। প্রয়োজন হইলে পরপক্ষপীড়নের জন্য দস্যুদল আহ্বান করিতে কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট হইত না, সামান্য কারণে বিবাদ হইয়া দেশকে দেশ ছারখার হইয়া যাইত। অধিক উদাহরণ দিতে হইবে না, একদিন বিশ্বামিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে এক জন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত, কশাঘাত করিলেন, তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া কর্ণে গলা সীসা ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বহুসংখ্যক কুকুর আনিয়া তাহাকে এই সকল কুকুর সমভিব্যাহারে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের নাম করিল। ভরদ্বাজ ঋষি বহুসংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যমুনা হইতে অল্প দূরে বাস করেন, তিনি এক প্রকাণ্ড জঙ্গলখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কিন্তু তিনি বশিষ্ঠ বা পরশুরাম কোন দলেই নহেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে থাকিবে, তিনি পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন; কিন্তু তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে। মন্ত্রী যন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের মুখে ভরদ্বাজের নাম শুনিয়া উহাকে ভরদ্বাজের গুপ্তচর

মনে করিয়া আরও যন্ত্রণা দিয়া উহার প্রাণবধ করিলেন, এবং কুড়িদল দস্যু সংগ্রহ করতঃ পরদিন ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের চারিদিকে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য যোগবলে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু অসংখ্যপ্রাণি-সমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।

এদিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগকরতঃ লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয়জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক একটী অমূল্য ধন, এক এক বিন্দুতে শত অত্যাচার শমিত হয়। এই ভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্য্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করিবেন জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতিদূরে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইল;—প্রথম ডাকাইতির মত চীৎকার, তাহার পর আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল। বাল্মীকি আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম্ম ছাড়।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ। তুমি নিজের জন্য কাঁদ, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি একবার পরের জন্য কাঁদ দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে; তাহাতে আবার যদি তোমার কান্নার গভীর সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে আরও কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যুদলপতি একটু গলিলেন, গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নিজের দল থামিল। কিন্তু তাঁহার দলে যে ম্লেচ্ছ, যবন, বানর ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন। একে রাক্ষস, তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে? তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন, ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি

কষ্টে শিবিরমধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন, বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল। মানবদুঃখবর্ণনায় পূর্ণ হইল। হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঋভুদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে যেমন বলিতেছে "ভাই রে, যা করেছিস্ করেছিস্, আর করিস্ নে। দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্? সকলেই মানুষ তো? তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়; কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হ'স্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্। আহা! একবার মনে কর দেখি রে, তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দেখি রে, তোর নিজের ছেলের ও রকম হ'লে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর গুরো! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন, পর কেহ নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর আর মানুষে ভেদ কি? সবাই মিল, সবাই মিল, একতান একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন দুই থাকে?" গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে? হীনকবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে?

গানের ফল এই হইল, সকলে দস্যু-বেশ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি; তোমরাও যাহা, আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও, সুখী হইবে।"

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকাণা, কাহারও অগ্নিতে গাত্র দগ্ধ হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে

কাঁকে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইল, রাজবংশ রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং অরাজক রাজ্যে বাস করা অবিধেয় ভাবিয়া যাহার যেখানে আত্মীয় আছে, সে তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের কীর্ত্তি দেখ;" বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই অনুতাপে পাপবোধে বিষণ্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বাল্মীকি বলিলেন, 'যাও, উহাদের ফিরাইয়া লইয়া এস।" সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগরবাসিগণ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্টলোকে সত্যকথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল; বাল্মীকি যে দস্যু নন, তাহা উহারা জানিবে কি প্রকারে?

যাহা হউক, বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন, এবারও আপন গানে। বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল; উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায়, এ জন্য উহারা বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহক চণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ, যবন, বানর, রাক্ষস একত্র সুখে বাস করিতে লাগিল, আর দস্যুবৃত্তির নামও করিত না। পরদেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছা দূরীভূত হইল। কিন্তু অন্য কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে, উহারা পরাক্রমসহকারে সে উপদ্রব নিবারণ করিত; সুতরাং পৃথিবীমধ্যে একটী শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু যে এক হইয়া থাকিবে, বাল্মীকির মনে বিশ্বাস হইল না। বাল্মীকি প্রতিমাসে এক একবার গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, আর অপর সময় আপন হৃদয়ের আদেশমত গান করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে ও অপত্যনির্ব্বিশেষে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে, একটুকুও নষ্ট না হয়, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহার নিজের কি! যত দিন সৃষ্টিউৎসাহে ছিলেন, নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। যখন মানুষের সঙ্গ না পায়, যখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্য মানুষ ক্ষেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ, প্রধান

মহারাজা, বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককত্ব বুঝিতে পারিলেন। সব হইল, কিন্তু সুখ কই? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিস্থ মানুষের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু যাহাদের সঙ্গে চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, যাহারা তাঁহার নিজসুখদুঃখ বুঝে, তাহারা কই? ইহারা ত সুখী, বিশ্বামিত্র ত মানুষ। দুঃখ ভোগ ত তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে, তাঁহার মুখপানে তাকায়, এমন লোক কই? তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষ তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কান্যকুব্জ নগরটী উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে ত শত্রু-ভয় নাই, নগরে গড় প্রাচীর কিছুই রহিল না। সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জ নগরে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, দেখিলেন এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে যত সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না। একবার ইচ্ছা হইল পৃথিবীতে থাকি। আবার সেখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল, তিনি স্বজনবর্গকে আপন সৃষ্টিতে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। সমস্ত কান্যকুব্জ নগর শুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উড্ডীয়মান নগরমধ্যে নানারূপ সুন্দর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখ রূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, গলা ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবী-বায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবী-বায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ, আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে যাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন?" -ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি যে তপের বলে সৃষ্টি করিয়াছ, সে কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে, তোমার আর তপোবল নাই যে তুমি কোন নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে। আমি তোমায় বলি, তুমি এখনও স্থির হও, বুঝিয়া চল।" "পাষণ্ড, যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমায় বল কি না বুঝিয়া চল, এই দেখ নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব" বলিয়া বিশ্বামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্যকুব্জ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, তাহা হইলে নিজ সৃষ্টিই নাশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর

ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২

বিশ্বামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। আবার ব্রহ্মা আসিলে বলিলেন, "আমার বায়ু শূন্যপথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সে তপোবল তোমার নাই, আর তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই।" বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক, নূতন কার্য্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে গদা তুলিলেন। গদা একবার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার মহাবেগে গদা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এইজন্য লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নীহারিকারূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকাসমূহ যে যে দিক হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া গেল। যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্ররাশিতে ভরা ভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মনুষ্যের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব আবার অগঠিতপদার্থরাশি মধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড় পর্ব্বত, সৌধপ্রাকাররাজপথসমেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিতপদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজবন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোট বড় ছিল না, যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।

৩

আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্চ্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্যমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার

মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বড় ভালবাসিতেন, এই জন্যই বারম্বার তিরস্কৃত হইয়াও উঁহার নিকট বারম্বার যাইতেন এবং উঁহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য বারবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন, বায়ু অভাবে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের প্রাণনাশ হয়। এজন্য নিজে পৃথিবী-বায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণবিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য-পথে মূর্চ্ছিতভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্ত বমন হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

সপ্তম খণ্ড

১

আজি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত। আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া প্রাণী থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই ব্রাহ্মণাদি জাতি থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টি রক্ষা হইবে।

আজি কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বৎসরব্যাপী। কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ শক্রতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়াও উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণ ও বালী রাজাকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেকদিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থদ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদ-হূনাদি জাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয় অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্ম্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন

সামান্য কার্য্যসাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ, এমন কি প্রাণনাশ করিতে এতটুকু সঙ্কোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন গলে? গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই। তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খরদূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়লোক রাজনীতিজ্ঞ দয়ামায়া একেবারে শূন্য, দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। শেষ বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন, বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত কর। অধ্বর্য্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে, যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোতঃ চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিকদল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে, যে প্রয়োজন হইলে একেবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন; শেষে নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন, এজন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহাগোলযোগ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল? উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে অশুচি বিবেচনা করিয়া স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি হইবে ভয়ে সকলেই ভীত হইল। সকলেই জানিল, শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে। একবার ভাবিলেন, আমি কোথায়? একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল; আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন, কোথায় যাইতেছি? একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন, আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন,

তাহা ত গিয়াছে। তখন ভাবিলেন, যদি পৃথিবীতে থাকিতাম,—আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম,—কেন বড় হইতে গিয়াছিলাম—কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম—কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম—কেন সব হারাইলাম। এখন কোথায় যাইতেছি জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে, বলিতেছে মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন আর মনের ভিতরতলায় যে মন আছে, সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

৩

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, একটী প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন, কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি করুণস্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন তোরা দেখ্, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ্ রে নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে। দেখ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ দেখি রে তোরা সামান্য সুখে দুঃখে পাগল। দেখ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব দেখি, বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট। যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব দেখি তোদের কি হইয়াছে। তখন

মনে কর দেখি, তোদের কি হইবে। ঐ দেখ, ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর, তোরা স্থির হয়ে থাক্। জীবন দিনকত বই নয়।

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির সকরুণ বীণাঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্র-শস্ত্র, বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝঙ্কার দূরস্থ সঙ্গীত ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জনগণমধ্যে ব্রহ্মমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়ন-জলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড়করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।" বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায়?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি" বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে। আর এক জন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই। যে ভাবে এক দিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই, সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করতঃ বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন। বলিলেন, "ভাই রে, আজি তোয় আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামন হইলি। আয়, দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই। আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়নজল প্রথম পড়িল। জানিলাম, ব্রাহ্মণ "বড়ই দয়ালু।" আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটূক্তিই বলিয়াছি, তোমায় কারাগারে

শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। তোমার করুণা অপার।” ব্রহ্মা বলিলেন, “বৎস, তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে স্বষ্টিকর্ত্তার ক্ষমাগুণ বৃথামাত্র।”

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি করিতে আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহক চণ্ডাল ভয়ানক সমর আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে উর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থআহৃত অগাধ সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন আর যাহাকে পাইতেছেন, গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর কিছু জ্ঞান নাই। শেষ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।” বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।” বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আজি তোমারই জয়।” চারিদিক হইতে “জয় বাল্মীকির জয়” ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—“জয় বাল্মীকির জয়। জয় বাল্মীকির জয়।” দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, “জয় বাল্মীকির জয়।”

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিয়া গেল। মনে মনে সবারই ভরসা রহিল যে, অরাজক শেষ হইল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াই রাজ্য ত্যাগ করিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কনোজরাজ্য গ্রহণ করিল।

ব্রহ্মা যাইবার সময় ঋষিত্রয়কে বলিয়া গেলেন, সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপনমানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম খণ্ড

১

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি তিন জনে রাম-অবতারের যাটিহাজারবৎসরপূর্ব্বে রাম কি করিবেন, তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন। এ ত শুদ্ধ রামায়ণের রচনা-কৌশলনির্ণয় নহে, ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের যুক্তি; বিশ্বামিত্র নানাবিধ দশাবিপর্য্যয়ের পর মনুষ্যশক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহার যে ভাই ভাই করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রবলই আছে। কৌশাম্বীক্ষেত্রের ব্যাপারে বশিষ্ঠের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, বুদ্ধিবলে নরজাতির কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যেরও ঐক্যসম্পাদন হইতে পারে না। কৌশাম্বীক্ষেত্রে বাল্মীকি যেরূপ বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, হৃদয়ই ঐক্যবন্ধনের অমোঘ নিদান। তাঁহারা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, এই ঐক্যবন্ধনে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই বিষয়ে প্রাণপণে বাল্মীকির সহায়তা করাই তাঁহাদের নিজ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। অতএব বাল্মীকির হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিশ্বামিত্রের রাজনীতিজ্ঞতা একত্র হইয়া জগতের ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল।

সকলে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, যদিও আপাততঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে মিল হইয়া গেল, যদিও বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মিত্রতা হওয়ায়, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়ায়, এ উভয় জাতির আর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা রহিল না, তথাপি অনেকেরই মনে এই সকল ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে। যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য স্থির হইল, রাম প্রথম আসিয়া এই দুই জাতি একত্র করিবেন। তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলারাজের কন্যা বিবাহ করিবেন ও গুহকচণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিবেন। পরশুরামের নাশ করিবেন। নাশে বাল্মীকি একান্ত অসম্মত। এ জন্য স্থির হইল, পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিবেন। এইরূপ আর্য্যসমাজ একত্র করিয়া অনার্য্যসমাজ একত্র করিতে যাইবেন। বানরদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক দলের সহিত মিলিয়া অধার্ম্মিক দলের বধ করিবেন। আবার এত প্রাণি-হিংসায় বাল্মীকি অসম্মত হইলেন, শেষ শুদ্ধ বালীমাত্র বধ করিবেন, স্থির হইল। তাহার পর অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন। এত রাক্ষসবধেও বাল্মীকি আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। কারণ, রাক্ষসেরা সকলেই অত্যাচারী আর উহাদের সংশোধনও অসম্ভব। তাহার পর রামচন্দ্র নিজভ্রাতৃবর্গের সাহায্যে পারদাদি রাজ্যেও শান্তিস্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। স্থির হইলে বাল্মীকির উপর এই সমস্ত বৃত্তান্ত লইয়া নবরস-গ্রথিত মহাকাব্য রচনার ভার হইল।

ভার দিবার সময় বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম যেন ধার্ম্মিকচূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।

বাল্মীকি বলিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না; বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্রবর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটী মনুষ্য-চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন,—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ভার প্রাপ্ত হইয়া বাল্মীকি অসাধারণ প্রতিভাবলে রামায়ণ রচনা করিয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে শুনাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা বাল্মীকিকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

ভগবান ভূতভাবন নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালন করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় শান্তিস্থাপন করিলেন। তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল। যে সকল স্থান বিজন অরণ্য ছিল, তাহা সমৃদ্ধ নগররূপে পরিণত হইতে লাগিল। নদী সকল বাণিজ্য ও বিলাসপোতে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দস্যুতস্করাদির নাম লোপ হইতে লাগিল। মারীভয়, সংক্রামকপীড়া, অকালমরণ প্রভৃতি লোকে বিস্মৃত হইয়া গেল। নৃত্যবাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চ্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল। নানাবিধ শিল্পকার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর দেখিবে—অভ্রভেদী সৌধশিখরে সৌরকর প্রতিফলিত হইতেছে। যে দিকে গমন কর শ্রুতিমধুর গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে। সর্ব্বত্রই যূথি, জাতি, মল্লিকা, মালতী, বক, কুরুবক, নবমল্লিকা, কাষ্ঠমল্লিকা, নাগকেশর, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোভিত উদ্যানরাজি

ও ইন্দীবর, কোকনদ, পুণ্ডরীক, কুমুদ, কহ্লার-সমূহ সুবাসিত সরসীসমূহে নাসিকার তৃপ্তি-সাধন করিতে লাগিল। সর্ব্বদা সুবৃষ্টিতে দীন-দরিদ্রজনগণেরও দুঃখ বা কষ্ট কিছুমাত্র রহিল না। লোকসংখ্যা চারিদিক হইতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বশিষ্ঠের সুশিক্ষায় লোকের মন উন্নত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্রের রাজনীতিচাতুর্য্যে ও ব্যবস্থাপ্রণয়নপারিপাট্যে দেশে বিবাদকলহাদি একেবারে শেষ হইয়া গেল। বাল্মীকিরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বীণায় বিরতি রহিল না। তিনি সমস্ত পৃথিবীময় প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার বীণায় গুণ-গুণ ঝঙ্কার দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই নগরবাসীরা দলে দলে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয়। তাঁহার গানের ভাব ও স্বর ক্রমেই গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র এক স্বর—ভাই ভাই ভাই, আমরা সবাই ভাই।

কিন্তু এখনও বাল্মীকির মন স্পষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যথার্থ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার দারুণ সন্দেহ।

৩

এইরূপে সুখস্বচ্ছন্দে বৎসর কাটিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর, তাহার পর বৎসর, অযুত বৎসর কাটিয়া গেল। রামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ প্রতিগমনের কাল উপস্থিত। লক্ষ্মণবর্জ্জন করিয়া শোকে সন্তাপে রামচন্দ্র সরযূজলে ঝাঁপ দিবেন সংকল্প করিয়া সরযূর বামতীরে প্রকাণ্ড সভা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, রাক্ষস ও বানরাদি সকলে সভা পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আজি রামায়ণ প্রচারের জন্য বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন। তখন বাল্মীকি সুশিক্ষিত শিষ্য কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে করুণবীণাঝঙ্কারে গান আরম্ভ করিলেন।

বাল্মীকি বীণা বাজাইতেছেন। কুশ লব গাইতেছে। শ্রোতৃবর্গ একেবারে জ্ঞানান্তরশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গানে কাঁদিলে কাঁদিতেছে, গানে হাসিলে হাসিতেছে, আনন্দিত হইলে আনন্দিত হইতেছে। পূর্ব্বলীলা স্মরণ হওয়ায় রামচন্দ্রও কখন হর্ষিত, কখন দুঃখিত, কখন রোরুদ্যমান হইতেছেন। আবার পূর্ব্বাবস্থা নবীভূত হইয়া শোক ও মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাল্মীকির আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

এমন সময়ে সহসা ছায়াপথদ্বার দ্বিধা বিভক্ত হইল। আর বাল্মীকির মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঋভুগণ কুশলবের সহিত একস্বরে একতানে রামায়ণ গাণ করিতে করিতে নামিতেছেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের গান ও স্বর আরও মিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদের মুখে গান শ্রবণ করিয়া প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ

এক দিন আশা করিয়াছিলেন, একবার ঋভুগণের সহিত সমস্বরে গান গান। আজি আনন্দে তাঁহাদের কণ্ঠভেদ করিয়া রামায়ণ বাহির হইতে লাগিল। ঋভুগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া গাইতেছেন, রামচন্দ্রও হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে যোগ দিলেন। যদি ব্রহ্মা সে সময়ে উপস্থিত না হইতেন, বোধ হয় এ নৃত্যের বিরাম হইত না।

৪

ব্রহ্মা আসিয়াও একবার এই প্রেমদশায় উন্মত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নররূপী ভূতভাবনের ভাবে তিনি যে চঞ্চল হইবেন, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তিনি কষ্টে সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া, সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়া পার্থিব দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তনুত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে তিরোহিত হইলেন। প্রাচীনবয়া প্রজাবৃন্দ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া ঋভুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঋভুগণ মহা সমাদরে গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ নূতন ঋভুদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও পরম প্রেমভরে আবার সেই গান ধরিলেন—যে গানে একদিন ঋষিত্রয়ের মনে বৈদ্যুতী সঞ্চালন করিয়াছিলেন।

৫

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া সপ্তর্ষিগণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ সরযূজলে মৃন্ময় দেহত্যাগ করতঃ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া প্রত্যহ জগতের কার্য্যপর্য্যালোচনার্থ উদয় হইতে লাগিলেন।

৬

বিশ্বামিত্রও দেহত্যাগ করিয়া ঋভুগণের এক জন প্রধান নেতা হইলেন। এখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, পার্থিব সাম্রাজ্য অসার, হৃদয়োন্নতিই সারাৎসার।

৭

বাল্মীকিকে স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারাপ্লুতনয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম; আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব মানুষকে

সমান সুখী করিতে না পারিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনও মানুষের অভিমান আছে। এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মন্। যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা রাখিব দয়াময়! আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল, প্রভু—

বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির ভাবে ব্রহ্মার চিত্ত অস্থির হইল। এ দিকে বাল্মীকির মস্তকে ঋভুগণ-হস্তমুক্ত পুষ্পসমূহ পড়িতে লাগিল।

৮

ব্রহ্মা বলিলেন, "নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ কর।" বাল্মীকি দেখিলেন, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুঃ শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেকবাহু, অনেকউদর, অনেকবক্ত্র, অনেকনেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশিসূর্য্যনেত্র, দীপ্তহুতাশবক্ত্র, শরীরপ্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-ব্রহ্মাদি সকলে—মানব-জীবজন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বিরাট মূর্ত্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ ত তুচ্ছ পদার্থ। দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকে! তুমি দেখ, সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়"!

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

['বাল্মীকির জয়' গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে একক। এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা সমসাময়িক বাঙ্গালী পাঠকের মনে ইহার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল তাহা মুদ্রিত পুস্তকের পরিশিষ্ট রূপে, শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুসরণ করিয়াই, এই সঙ্গে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। এই পরিশিষ্টে দুইটী ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। সাহিত্য ও অন্য নানা বিষয়ে তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমীক্ষার অন্যতম প্রধান প্রকাশক্ষেত্র Calcutta Review পত্রিকাতে প্রবন্ধ দুইটী যথাক্রমে ১৮৮২ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই দুইটীর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটীতে লেখকের নাম নাই, এবং ইহা পুস্তক-সমালোচনা রূপে 'সম্পাদকীয়-পর্য্যায়ে'র রচনা। দ্বিতীয় প্রবন্ধটী পরলোকগত মনীষী ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত The Neo-Romantic Movement in Literature শীর্ষক রচনার তৃতীয় অধ্যায় (The Neo-Romantic Movement in Bengali Literature) হইতে উদ্ধৃত।—সম্পাদক—।]

In a recent number of this *Review* we had the pleasure to introduce Mr. Sastri to our readers as the author of an exceedingly useful and interesting work entitled *Bharat Mahila.* Mr. Sastri's new work, *Valmikir Jaya,* is one of an entirely different description. *Bharat Mahila* is of the nature of a digest, or compilation, prepared with considerable erudition and critical acumen. *Valmikir Jaya* is of the nature of a poem, and as such it furnishes a clearer and more conclusive test of the author's mental powers than *Bharat Mahila.* One autumn evening just at the point of time when the Satyayuga was passing away, and the Tretayuga was coming in, the skies presented a wonderful spectacle. Breaking through the vast milky expanse over head and illumining by their heavenly brightness the infinite space around, there descended on the high summits of the Himalayas a countless host of Ribhus or spirits of departed ancestors, who sang a song of universal brotherhood, which entranced the Universe, but which only three men understood. These three were Vasistha, Viswamitra and Valmiki, who felt profoundly stirred by the spirit of the song

and resolved to establish Universal brotherhood among men. Vasistha proposed to do this by his intellectual power over the different castes into which Hindu society was divided ; Viswamitra by establishing a military sovereignty over the whole race of man. In a conflict which soon broke out between these two men, Viswamitra's military power gave way before Vasistha's spiritual or intellectual power ; whereupon Viswamitra resolved to usurp the superior spiritual power of the Brahmin. With this object in view he entered upon a course of spiritual meditation, combined with physical austerities, which enabled him in the end to defy even Brahma, and to create by spiritual force an entirely new world, with a new solar system in which order and harmony reigned supreme. But Viswamitra himself felt solitary and miserable in his newly created world, and so he resolved to take up and place therein the great city of Kanauj, the capital of his terrestrial empire wherein lived all his friends and relatives. But the attempt proved unsuccessful, because the spiritual power acquired by him had been fully spent in the creation of the new world ; his new world was therefore resolved back into its original nebulae and he himself, deprived of his spiritual power and half stupefied with grief, fell whirling down upon a grand ceremonial altar where Vasistha was about to perform a great sacrifice and around which were ranged two hostile parties representing respectively the sacerdotal and warrior classes armed to the teeth and ready to close in deadly conflict, but exhorted all the while by the humane Valmiki and his humanised fraternity to forget all class-interests and love each other as brothers. The song prevailed, all hearts were melted ; Vasishtha and Viswamitra embraced each other and Valmiki ; a strong wave of brotherly feeling swayed the vast multitude ; the gods who had assembled there blessed every body, and went back to their abodes well pleased at the fraternal union, effected by Valmiki's song of universal brotherhood.

Such is, in a few words, the plot of this poem. It is written in prose, but it is not on that account the less a poem. Its object, as may be seen from the brief summary given above, is to prove that social order can not be created and maintained by mere physical force, nor even by intellectual force and that moral force is alone competent to do this. We are not quite sure whether this is a complete solution of the question of social organization but this we can say that Mr. Sastri's method of solution, so far as it goes, is not

correct. If his Viswamitra and Vasistha are respectively intended to represent physical form and intellectual form, they are both failures Viswamitra creates his typical world not by means of physical power but by spiritual power and thus we find no experiment of harmonious social organization effected by the exercise of mere physical power. If Viswamitra had established a vast military empire like that of the Romans in the ancient world or like that of Napoleon Bonaparte in the modern ; and if that empire had been found crumbling to pieces through the action of the dissolving forces which are inherent in purely military organizations, we should have had in him a true representative of the idea which he is intended to personify. But he does not do that and the experiment of a harmonious social organization effected by physical power remains therefore unperformed. Vasistha, again, does not represent intellectual power, but priestcraft or sacerdotal cunning ; and, as regards social organization, we do not even find him making an attempt in that direction. We do not know of any instances in history of attempts made by individuals or communities to construct societies upon a purely intellectual basis. But a man of strong imaginative power like Mr. Sastri could have easily gathered materials for an intellectual experiment from such facts as the Puritanic regime in England, (which laid an interdict upon the fine arts and the sports and amusements of the people), the scholasticism of the Middle ages, and the merciless intellectualism of the Convention. But though defective and even incorrect in procedure, Mr. Sastri is really grand in his execution. His sentiments are pure and elevated, his scenes are full of the greatest loftiness of the earth and the skies, his style is cast in the high heroic mould, his imagination soars above the greatest heights of the earth and the heavens. His Viswamitra, apparently his most favourite creation, is a grand colossal figure, a wonderful monument of imaginative power in modern Bengali literature. Mr. Sastri is really a poet and an ornament of his country's literature.

Continuing the thread of his narrative, Mr. Sastri gives in his concluding chapter a brief view of the moral plan of Valmiki's Ramayan. The poet is represented as giving the following account of what he intends doing in his great epic :—

আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না, বীরও করিব না, রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্রবর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ

পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা ও আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটী মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

The reader will find in this a happy coincidence with the view which we have ourselves taken of the Ramayan in our notice of Babu Raj Krishna Roy's Bengali metrical version of that poem in the last number of this Review.

Calcutta Review, CXLVIII, 1882

II

We have, in the endeavour to give a connected account of the Neo-Hindu movement, passed over two remarkable works, one of them of monumental grandeur, in the neo-romantic literature of Bengal. The Valmikir Jaya, or the three Forces, physical, intellectual and moral, of Pandit Haraprasada Shastri, and the Sarada-Mangala of Babu Beharilala Chakravarti, represent a real advance in method and design upon the transfiguration of subjective egoism with which Babu Rabindranath Tagore's lyrics are replete. What predominates in these two works, the one a prose rhapsody, the other a phantasmagory in verse, is the mythopoeia, both the transfiguration and criticism being subordinated to the central myth. Generically speaking, we may call this the mythopoeic method of poetic interpretation, of which the fundamental design is a phantom-like succession of majestic shapes and images, stalking figures, allegories, and symbols, rolling on in one vast, surging, dream-like movement, "*tumultuosissimamente.*" Goethe's phantasmagory of Helena, De Quincey's Dream-fugue, many of Richter's rhapsodies in his Fruit, Flower and Thorn pieces, as also in his recreations under the Cranium of a Giantess, Shelley's Witch of Atlas, Sensitive Plant and to a great extent, his Alastor and Epipsychidion, and Byron's Dream, are glorious examples of this mythopoeic method of poetic interpretation. There are endless varieties of this method, according as the two constituent elements, the phantasm and the movement, vary in character, and according as there is more or less of transfiguration and criticism. For example, the Valmikir Jaya is instinct with the profoundest criticism of life and society, and of schemes of regeneration of humanity, the myth being grouped round a central idea,

or regulative conception. On the other hand, the Sarada-Mangala, which may be described as a Bengali version of a phantasmagory that should combine the two visions Alastor and Epipsychidion in one, revels in an intoxication of emotional transfiguration. With regard to the movement, the Valmikir Jaya is more processional, the Sarada-Mangala more billowy. Similarly, the phantasms, visions, or images have a definite sculptural cast in the one, and an indefinite musical billowiness in the other. We have said that the mythopoeic method is an advance upon a method of mere transfiguration, such as natural magic or the transfiguration of subjective egoism. This is because creative or constructive imagination is more elaborative, and has greater complexity of organization, than mere emotional exaltation, however intense. As a result, a deeper criticism of life, a higher regulative conception, is usually present in the former than in the latter. Indeed the central idea of Valmikir Jaya, which is very inadequately expressed by describing it as the eternal triumph of moral over intellectual and physical force, has alike moral profundity and universal applicability. It is not, however, the criticism of life and society, but the mythopoeia, the phantasmal succession, that constitutes the essence of this sublime rhapsody. For we must say at once that it is the most glorious phantasmagory in literature known to us. Goethe's Helena with its weird uncertain movement, mingling the antique with the mediaeval, the classical with the romantic, displays a fine critical insight ; but it pales before the Valmikir Jaya, not only in moral profundity, but also a grandeur of design, a sense of primitive elemental freedom, and an intoxication of the creative imagination. De Quincey's Dream-fugue, strangely mingling the sepulchral passion of deliverance from sudden death with the jubilant salvation of Christendom from that apocalyptic dragon, the first Napoleon, and symbolically with the Resurrection of Christ, strains after a profound spiritual significance ; but it pales before the Valmikir Jaya, in internal and organic connectedness, if not in the weird sublimity of the phantom-like procession. Richter's Dream of the dead Christ is morally profond, and grotesquely imaginative ; but it pales before the Valmikir Jaya in magnitude and breadth of canvas and dramatic intensity of life and passion. The Bengali phantasmagory is sublime, not with the sublimity of Ossa and Olympus, but with that of the Himalayan range. Viswamitra, with his creation of a Universe and his fall, forms the Everest,—the descent of the celestial Ribhus from beyond the Milky Way upon

the mountain summits the Kinchinjanga, and the vision of the *Virata Murti*, or the Universe-body of Vishnu, the Dhawalagiri, of this majestic range. The transfiguration here of the India of the Ramayana period (though not in the neo-Hindu interest) would compare favourably with that of the India of the Mahabharata epoch in the Raivataka fragment, both bearing marks of the illumination in the motto of fraternity or universal brotherhood, and it may be safely said that Viswamitra and Krishna, with the two visions of the *Virata Murti*, are the sublimest conceptions to which the neo-romantic movement in Bengal has given birth. And this leads us to remark that the neo-oriental material of the Purans lends itself with peculiar ease to neo-romantic treatment. In the classical epos of Michael Madhusudan Dutt and Hem Chandra Banerji, we observe no special advantage that the poets derive from the nature of the neo-oriental traditions they work up ; but this is at once perceived when neo-romantic treatment is applied to the neo-oriental material. This is easily intelligible *a priori*, when we consider the element that is common to the three transitional stages, the neo-oriental, the neo-classical and the neo-romantic.

Calcutta Review, CLXXXIII, 1891

ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম

হরপ্রসাদ মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক ও Indologist অর্থাৎ প্রাচীনভারতবিদ্যাবিদ্ ছিলেন বলিয়াই, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বাহিরে (এবং বাঙ্গালা দেশেও), প্রখ্যাত ছিলেন। প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রপট্ট, মুদ্রা এবং সংস্কৃত ও অন্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির সাহায্যে ভারতের ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে তিনি লক্ষণীয় দান রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গবেষণাত্মক বহু প্রবন্ধ তিনি ইংরেজীতে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত হরপ্রসাদের History of India ও 'ভারত-বর্ষের ইতিহাস'—ইহার প্রকাশনের সময় হইতে বহু বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও প্রামাণিক ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি জনসাধারণের উপযোগী করিয়া লেখা, এবং তাঁহার এই ঐতিহাসিক রচনাগুলি তথ্য ও সাহিত্যরস উভয়ের সমাবেশে বাঙ্গালা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ্ বলিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে।

ইতিহাস বলিলে সাধারণতঃ আমরা সন-তারিখ বা বর্ষ-দিনাঙ্কের কঙ্কাল বুঝিয়া থাকি। কিন্তু মাত্র সেই কঙ্কাল লইয়া ইতিহাস নহে। তাহার উপরে রক্ত মাংস স্নায়ু ত্বক্ কেশ ইত্যাদি সংযোজন করিয়া তবেই কোনও একটী দেশের বা সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ বাহ্য পরিচয় হয়। কিন্তু যে দেশ ও যে যুগের কথা লইয়া ইতিহাস, সেই দেশের ও সেই যুগের মানুষের পরিচয়—সে কিভাবে জীবন যাপন করিয়াছে, কি করিয়াছে না করিয়াছে, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও আচরণ কি ছিল, এই সমস্ত না জানিলে, এক কথায়, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি না জানিলে, ইতিহাস প্রাণবন্ত হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, এই প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক বিচার ও সংস্থা-পনার দৃষ্টিই ছিল। তিনি "পাথুরে' প্রমাণ" (এই উক্তিটী তাঁহারই) নিজে নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিলেও, ইহার প্রতি তাঁহার সমগ্র আস্থা ছিল না—পাথুরে' প্রমাণেই তাঁহার বিচার পর্য্যবসিত হইত না। নীরস ইতিহাসের মধ্যে সংস্কৃতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সজীব ও সরস করিবার কলা তাঁহার আয়ত্তে ছিল। এক দিকে যেমন তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনাতে ইহা প্রকট হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার নূতন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও দেখা দিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি এইজন্য বাঙ্গালা প্রবন্ধসাহিত্যে চিরকাল তাহাদের সজীবতা ও সর-সতা লইয়া পাঠকসমাজকে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই দান করিবে।—সম্পাদক—।

আমাদের গৌরবের দুই সময়

উপক্রমণিকা

সময়তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল

যে দিন হইতে সর উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা ইয়ুরোপে প্রচারিত হইল, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্টা হইতেছে *। সর উইলিয়ম জোন্স নিজে, উইল্‌সন্, কোলব্রুক, ম্যাক্স মুলর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষগণনা, কেহ পুরাণ, কেহ ভোজপ্রবন্ধ, কেহ বা তাম্রফলকাদি লইয়া এই সময়তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। আজি এক জন মহামহোপাধ্যায় "অমোঘযুক্তি" "অভ্রান্ততর্ক" এবং "অকাট্য প্রমাণ" বলে "এ বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না, ইহাতে কোনরূপ ভ্রম নাই", এইরূপ জোরে জোরে লিখিয়া এক পূর্ণ তালিকা দিয়া গেলেন; কালি আর এক জন উঠিয়া সেই অমোঘযুক্তি, অভ্রান্ততর্ক ও অকাট্য প্রমাণবলে সেইরূপ জোর জোর কথায় তাহার সব উল্টাইয়া দিলেন। অথচ উভয়েরই যুক্তি এক, প্রমাণ এক ও তর্ক এক। এইরূপ ৭০।৮০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কত মত যে প্রচারিত হইল, বলা যায় না। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে না, দিগ্‌গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হইবে না। গ্রীক সময়তালিকা নির্ণয়চেষ্টা ২০০০ বৎসর পরে বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়-চেষ্টাও বৃথা

ইঁহাদের মধ্যে এক দল আর দিন, মাস, বৎসর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন না, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার পরে বা পূর্ব্বে নির্ণয় করিবার জন্য মাত্র প্রয়াস

---

* ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভগবদ্গীতা'র প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন Charles Wilkins। ইহাই ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ। ইহার কিছু পরে 'মনুসংহিতা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক Sir William Jones। তাঁহারই উদ্যোগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'এসিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি ছিলেন ইহার প্রথম সভাপতি। Sir William Jones কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকখানি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।—সম্পাদক—।

পান। ইঁহাদের দ্বারা কতক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইঁহাদেরও নির্ণয়প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া এক জন বলিলেন, "কালিদাস ভবভূতির পর।" কালি আর এক জন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন—"ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনুকর্ত্তা।" কে সত্য, কে মিথ্যা, জানিবার কোন উপায় নাই। অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন, সেও স্বীকার, মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে, তেমনি দর্শনেও। আমি গৌতম-স্থত্রে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম—গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধ-স্থত্রে ন্যায়শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি প্রাচীন স্থত্রসমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় কিরূপে হইবে?

মতোন্নতি—পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয় সম্ভব নহে

আর এক দল একটু ঘুরাইয়া বলেন যে, গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় না হউক, মনুষ্যের মানসিক উন্নতি, মতের উন্নতি লইয়া কতকটা সময়তালিকা নির্ণয় হইতে পারে। তাঁহারা ইয়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন। ভারতবর্ষে সেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সময়তালিকা উদ্ধার সম্ভব, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইয়ুরোপের নিয়ম ভারতবর্ষে খাটিবে কি?

এইরূপ নির্ণয়চেষ্টায় কি উপকার দর্শিয়াছে

এইরূপে প্রায় ১০০ এক শত বৎসর পৃথিবীশুদ্ধ লোক সময়তালিকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না, কিন্তু বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, একেবারে নির্গুণ ও নিষ্প্রয়োজন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয়-প্রস্তাবে অনেক নূতন সংবাদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ না পাওয়া গেলেও প্রচুর শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ সময়-নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহাতে সুধাময় ফল উৎপাদন করিয়াছে।

আমরা জানিয়াছি, আমাদের দুইটী গৌরবের দিন ছিল

এই সমস্ত নূতন খবর ও পুরাতন যাহা ছিল, একত্র সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের মনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত। সমাজের গতি, রীতি-নীতি কোন্ পথে চলিয়া আসিয়াছে। বরাবর কোন একটা সময়তালিকা ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা কোন কালেই একেবারে বন্ধ ছিল না, ইহাদের বুদ্ধির চালনা কখন রহিত হয় নাই। হয় দর্শন, নয় স্মৃতি, না হয় পুরাণ-কিছু

না হয়, কাব্য, ব্যাকরণ, গণিত বরাবর রচিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল দুই সময়ে এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হয়। ঐ দুইটীই ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমাদের গৌরবের দিন। একটী হিন্দুস্থানের, আর একটী দক্ষিণের। একটীতে মৌলিকতা পরিপূর্ণ; অপরটীতে প্রকৃষ্টরূপ চর্চ্চা মাত্র, মূলের দোহাই অধিক, কিন্তু মৌলিকতারও কমি নাই। একটীর প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ কম্পিত হয়, আর একটীর প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতিমাত্রে পর্য্যবসিত। একটীর চরম ফল উন্নতি, আর একটীর ফল অধোগতি। তথাপি প্রথমটী দ্বিতীয়টীর মূল, প্রথমটী না হইলে দ্বিতীয়টীর নামও শুনিতে পাইতাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তবে কিরূপে ফল দুই প্রকার হইল? উত্তর, সমাজের অবস্থায়। কতকটা দৈবই বল, আর অদৃষ্টই বল, আর অনুল্লঙ্ঘনীয় সামাজিক নিয়মই বল, একটী হইতে সুধাময়, অপরটী হইতে বিষময় ফল জন্মিয়াছে। প্রথমটী প্রবল অর্থাৎ সামাজিক উন্নতিই মূল, পরমার্থ তত প্রবল নহে। অপরটীতে হাই চর্চ্চ টোরি মত; উন্নতির গন্ধও নাই। সবই পরমার্থ, ইহলোকের নামও নাই।

এই দুইটী সময়ের বিশদ সবিস্তার বর্ণনা প্রদান করিলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের দুইটী অতি জটিল অংশ পরিষ্কার হইতে পারে। যে আর্য্য আর্য্য করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্য্য নাম বঙ্গীয় যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই আর্য্যগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং যে গৌরব তাঁহাদের উপর দিয়া আমরা তাহার অংশ আদায় করি, সে গৌরবের তাঁহারা কত দূর অধিকারী ছিলেন, জানা যাইতে পারে। কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তমরূপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। বিপদের সময় নহিলে মনুষ্যের কত ক্ষমতা, জানিতে পারা যায় না।—সে কত দূর কাজ করিতে পারে, কত দূর চিন্তা করিতে পারে, কত দূর সহ্য করিতে পারে, বলা যায় না। জাতীয় স্বভাবও ঠিক সেইরূপ।

সম্ভবতঃ এই দুইটী বুদ্ধিবিপ্লবের একটী যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯০০ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া ৪০০ বৎসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটী খ্রীষ্ট-জন্মের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের পুনঃসংস্কার করে। প্রথমটীতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টীতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রথমটীর প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়; দ্বিতীয়টীতে এক জাতির একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, অথচ দুইটীতেই আমাদিগের সমান গৌরব। আমাদের সমান সম্মান। প্রথম বিপ্লবের কথা অনেকে বলিয়াছেন, এ জন্য এখানে সংক্ষেপে মাত্র বলিব। দ্বিতীয়টীর বর্ণনার বিস্তার আবশ্যক, যেহেতু সে কথার এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বিপ্লবের প্রাধান্য ও প্রয়োজন

প্রথম বিপ্লবটী ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উহার প্রভাব অসীম, বহুকালস্থায়ী ও জগদ্ব্যাপী। উহার প্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে। তিন সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি উহার শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ভারতচরিত্রে অনেক মলা পড়িয়াছে, অনেক উন্নতিও হইয়াছে। (অনেকে যে বলেন, কেবল অধঃপাতে গিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না) কিন্তু আদত আজিও ঠিক আছে। উপরি-উক্ত বিপ্লবে আমাদিগকে যাহা করিয়াছে, আমরা আজিও তাহাই আছি। ভারতচরিত্রে, ভারত অদৃষ্টে সেই সময়ে যে শিল পড়িয়াছে, সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ ভারত নয়, এসিয়াও এই বিপ্লবের ফলভাগী। এসিয়ার অদৃষ্টও উহা হইতে ফিরিয়াছে, এসিয়ার সভ্যতাও ঐ বিপ্লবের ফল। এসিয়ার দুরবস্থাও ইহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। এমন কি, এই তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ইয়ুরোপও অনেক অংশে উহার নিকট ঋণী এবং এই যে উনবিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া ইয়ুরোপ এত জাঁক করেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী উন্নতির অন্যতম উদ্দীপন-কারণ নহে? যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে গ্রীক বিদ্যার প্রথম প্রচারে ও প্রথম আলোচনায় একটী প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার, সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনাও তত দূর হোক আর নাই হোক, ইয়ুরোপীয় উন্নতিকে দ্রুত গতি প্রদান করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত বিজ্ঞান, সংস্কৃত দর্শনও উপরি-উক্ত বিপ্লব হইতে উৎপন্ন। অতএব সেই বিপ্লবের নিকট পৃথিবীশুদ্ধ ঋণী, এ জন্য উহার কারণ, স্থিতি, উৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

বিপ্লবের পূর্ব্বতন অবস্থা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খ্রীষ্টের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে তাহার আগে আর্য্যসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, জানা উচিত। জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই নাই। কেবল অনুমান মাত্র। অনুমানে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি পঞ্জাবে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়গত বিভিন্নতা ছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। কেহ পুরোহিত ছিলেন, কেহ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কেহ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন, কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন। প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য। আধিপত্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইল। আর্য্যভূমি

যাগযজ্ঞময় হইয়া উঠিল। রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয়, সোমযাগ, শ্যেনযাগ, কারীরযাগ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুরোহিতেরা ক্রমে এক দল, ক্রমে এক জাতি, ক্রমে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রাজারা কেবল যুদ্ধের সময় প্রাণ দিবার জন্য রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন দেশ অধিকার আবশ্যক হইল। আর্য্যগণ পঞ্জাবসীমা অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলেন। দিনকতক শতানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল। শেষ তাহারও পূর্ব্বপারে আর্য্যগণের বাস হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ মিথিলার পূর্ব্বে যে কখনও আসেন নাই, তাহা এক প্রকার স্থিরই। কারণ, ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুনা যায় না। ব্রাহ্মণেরা এই নূতন দেশে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জ্জিত; তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের একটী কারণ। ব্রাহ্মণেরা যেমন একটী দল—জাতি হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নূতন দেশে তাহাই হইলেন। আর্য্যগণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইল। পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্ট বিশ্ অর্থাৎ প্রজা। তাহার নীচে পরাজিত অনার্য্যগণ ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হিন্দুস্থানেই হয়। পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি না, সন্দেহ। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, আর্য্যগণ প্রথমে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন, তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন। পঞ্জাবেও বোধ হয়, তাহাই হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে হিন্দুস্থানে হয়, তাহার আর এক কারণ এই, মনুর বর্ণ-ধর্ম্মগ্রন্থে (মনুসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য অধিক। আমরা যে অনার্য্যদিগের নাম করিলাম, তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বিরোধী ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম ছিল, রাজ্যশাসনপ্রণালী ছিল, সভ্যতা ছিল। তাহাদিগের দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই অনার্য্যজাতির সম্পর্কই উপরি-উক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণ-দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি অনুসারে অনেকে পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য উপাধ্যায় হইতে লাগিলেন। ঋষি মুনি হইতে লাগিলেন। আর এক দল ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মনুতে ব্রাহ্মণদিগকে কৃষি-বাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে; যিনি যে ব্যবসায়ই করুন, সকলেই স্বজাতির প্রাধান্য-রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ। বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয়গণের ত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হইবার কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রকাণ্ড দল হইল। অপর দিকে হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, উৎপীড়িত অনার্য্যগণ, আর এক দল একেবারেই আর্য্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্। বিশেষ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অভক্তি।

বিপ্লবের কারণ

ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ও অনার্য্য সভ্যতার সম্পর্ক, এই দুইটাই উপরি-উক্ত মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। ঋষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শাসন ছিল না, সেও একটী কারণ। ঋষিরা আপন আপন তপোবনে আপন আপন মতানুযায়ী উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপরে কাহারও তত্ত্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে স্বজাতিদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্যভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন। জাবালি মুনি যে উপদেশ দিতেন, তাহা একপ্রকার চার্ব্বাক্‌দর্শন বলিলেও হয়। বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত, রাম পরশুরামের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণাদিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধাই ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই দুই একটী বিষয় ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। সুতরাং তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট হইত। কেবল যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে থাকিত। জনক রাজা তাহাও করিতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং সকল কার্য্য করিতেন, তিনি নিজে ঋষিদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতেন। এইরূপ অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাজর্ষিও ছিল। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি ভিন্ন সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। অনার্য্যগণ যাহারা নূতন অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই আর্য্যদিগের দলে ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশ শূদ্র নামে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অনেকে বনদুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গমধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। শূদ্রদিগের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জাজ্জ্বল্যমান ছিল। উহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে, এমন কি, সমস্ত আর্য্যজাতিদিগকে ঘৃণা করিত। উহারা স্বতন্ত্র আইনে শাসিত হইত। এমন কি, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজিও শূদ্রেরা আমাদের আইন অনুসারে চলে না। দায়ভাগে শূদ্রের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীণেরা অনেকেই অবসর প্রতীক্ষায় ছিল। যে সকল অনার্য্যেরা অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিত না। তাহারা আপন ধর্ম্মে রত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মকর্ম্মের নানা ব্যাঘাত করিত এবং উপহাসাদি করিত। প্রতি বনে, প্রতি পর্ব্বতে প্রতি দুর্গে অনার্য্যদিগের যেরূপ সমাজনিয়ম, তাহাতে বৃহৎ রাজ্যস্থাপন এক প্রকার অসম্ভব। আর্য্যভূমি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রায় দেখা যায়, ক্ষুদ্র রাজ্যে সভ্যতা ও সুনিয়ম প্রবেশ করিলে শীঘ্র শীঘ্রই তাহার উন্নতিলাভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের প্রকৃতি

এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে চিন্তা প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। তাহাতে আবার দুই সভ্য জাতির বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস। তুলনা-সামগ্রী লোকের চক্ষে

দুই বেলা। এইখানে অনার্য্যগণ আমাদের অপেক্ষা ভাল, এইখানে মন্দ। এই এই স্থলে আমাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই এই স্থলে আমাদের নিয়ম অনার্য্যগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লোকের মানসিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বৈরীভাব হেতু সেই পরিবর্ত্ত সত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুস্থানের আর্য্যগণ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা আর্য্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত ভাল জানি না, কেবল নানা শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া অনুমান করি মাত্র। কিন্তু অনার্য্য সমাজের কোন সম্বাদই জানি না; জানিবার উপায়ও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, দুই জাতির সংঘর্ষে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরিবর্ত্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। সে কাণ্ড পরে লিখিব। এখন সেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত, অধ্যাপক ও অন্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয়, সংক্ষেপে সমস্ত আর্য্য এবং অনার্য্য সমাজ কি আকার ধারণ করে, তাহাই লিখিতেছি। এক জন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—সভ্যতার লক্ষণ দেওয়া বড় কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, সভ্যতার দুই মূর্ত্তি আছে;—(১) আন্তরিক, (২) বাহ্যিক। উপরি-উক্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লবে দুই মূর্ত্তিরই উন্নতি হয়।

(১) মানসিকবৃত্তির উন্নতি দুই প্রকার;—(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতি।

(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ আছে। সময়তালিকামাত্রেই দর্শনগুলিকে এই বিপ্লবকালে রচিত স্থির করা হইয়াছে। এই কয় শতাব্দীতে উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংগ্রহ। যুগপৎ সমস্ত হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয়। আজি এক জন জগৎ শূন্যময় বলিলেন, কালি আর এক জন বলিলেন,—ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র সত্য। পরশ্ব এক জন প্রত্যক্ষবাদ সৃষ্টি করিলেন। আজি এক জন বলিলেন,—চক্ষের জ্যোতিঃ পদার্থে পড়িয়া পদার্থের উপলব্ধি হয়। কালি আর এক জন ঠিক বিপরীত মত চালাইয়া দিলেন। এক অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব প্রমাণ হইল, আর এক অঞ্চলে আত্মা অনিত্য বলিয়া দেহের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন। একেবারে শত শত মতের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের সংগ্রহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণপক্ষীয়দিগের মত ছয় জনে সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই ষড়দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; গোতমাদি নিজে সংগ্রহকার মাত্র। তাঁহাদের নিজের মতও তাঁহাদের পুস্তকে অনেক আছে। বিশেষ অনেক চলিত মতের তাঁহারা সমালোচনা করিয়া সমুদায় পুস্তকে এরূপ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিলেন যে, পরবর্ত্তী লোকে জানিল যে, ঐ সকল মত তাঁহাদের নিজেরই। তাঁহারা নানা মতের সমালোচনা

করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সকল গ্রন্থেই সকল মতের খণ্ডনমুণ্ডন দেখিতে পাই। সুতরাং তাহা দেখিয়া সাংখ্য ন্যায়ের 'পর বা ন্যায় সাংখ্যের পর এরূপ বিবেচনা হইতে পারে না। এমন হইতে পারে, ন্যায়সূত্রকার মিথিলায় বসিয়া বুদ্ধির নিত্যতা খণ্ডন করিলেন। সাংখ্যসূত্রকার পঞ্জাবে বসিয়া বুদ্ধিনিত্যতার উপর সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। বুদ্ধিনিত্যতা মত তাঁহাদের কাহারই নিজের নয়। অথচ তৎকালে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ সংগ্রহ হইল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধ মতে কয়খানি দর্শনসংগ্রহ ছিল* ও তাহাদের কি প্রকার ভাব, জানিবার উপায় নাই। অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন করিলে অনেক দূর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দর্শন আজিও মুদ্রিত হয় নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায়, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর না করা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন নির্ণয়ের উপায়। তোমরা যত দূর স্বাধীনভাবে চিন্তা কর না, বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই ব্রাহ্মণেরা তোমাকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইবে। নচেৎ তোমাকে নাস্তিক বলিয়া বাহির করিয়া দিবে, মনু এ বিষয়ের সাক্ষী।

যোঽবমন্যেত তে মূলে (শ্রুতিস্মৃতী) হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

(যে কেহ হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল শ্রুতি ও স্মৃতিকে অপমান করিবে, সে নাস্তিক, বেদনিন্দক। তাহাকে সাধুরা সমাজচ্যুত করিবেন।) বেদের বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক ও সাধুদিগের বহিষ্কার্য্য হইল। নচেৎ সকল মতেই ধর্ম্ম। এক্ষণে প্রমাণ হইল, ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌দর্শনের মূল উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন এই কালের।

(খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমাজের হৃদয়বৃত্তির উন্নতি বর্ণন করিতে গেলে "পুথি বেড়ে যায়।" এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, এই কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি যাহা ছিল, তাহা যাগ-যজ্ঞ লইয়া এবং নারাশংস, পুরাকল্প প্রভৃতি পুরাণ ও গল্প লইয়া ব্যস্ত থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হয়, তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুত্রের পিতামাতার প্রতি, গৃহস্থের অতিথির প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিষ্যের গুরুর প্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার করিতে শিখে। এমন কি, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মনুষ্যের প্রতি, তেমনি পশু-পক্ষীর প্রতি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যাহা আজিও কোন ধর্ম্মে কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, সেই সর্ব্বভূত প্রতি দয়া প্রচার হয় এবং কার্য্যে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের

নিজের স্বার্থরক্ষার্থ উহার অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন। সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অধিক যে, সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হয়। তাঁহাদের বিরোধীরা সর্ব্বভূতে দয়া যেমন মুখে প্রচার করিতেন, বিশেষ নিয়মও তেমনি অবজ্ঞা করিতেন। সুতরাং বাক্য ও কার্য্য উভয় প্রকারেই তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, অবশিষ্ট মনুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিতেন, শূদ্রদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণিহিংসা করিতেন। তাঁহাদের বিরোধীরা সর্ব্বমনুষ্যকে সমানাধিকার প্রদান করেন ও অহিংসা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত আন্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই হৃদয়বৃত্তিগত উন্নতি বিশেষ দৃষ্ট হয়,—সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যত দিন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রচার না হয়, তত দিন বলা যায় না, সে উন্নতি কত দূর দাঁড়াইয়াছিল। মনু এক স্থানে লিখিয়াছেন, যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়াও যদি লোকে সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জ্জব, দশধা ধর্ম্ম আচরণ করে, তবে সে স্বর্গলাভ করিবে অর্থাৎ তিনি সমাজধর্ম্মকে পারত্রিক ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) বাহ্যিক উন্নতি সমাজবন্ধনকে বলা যায়। এই সময়ে আইনের * সৃষ্টি হয়। রাজনীতি, দণ্ডনীতির সৃষ্টি হয়, ঋণাদান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের সৃষ্টি হয়। সমাজ আইনতন্ত্র হয়—আইনই প্রবল, আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ, রাজা নহেন। রাজার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তাঁহাকে আইনমতে চলিতে হইবে, নচেৎ নরকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট নাই, প্রত্যুত দোষ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু তাহারই পরে লেখা আছে, অমুক অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক অমুক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সুতরাং যদিও প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করুন, আর না করুন, তাঁহারা অত্যচারী রাজাকে অধিক দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধদিগের রাজ্যশাসনের বিষয় ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধসমাজ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। এক জন ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবিদ্ বলেন,—আর্য্যজাতির রাজ্যশাসন অতি প্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। কি গ্রীস্, কি জর্ম্মনি, কি হিন্দুস্থান, সর্ব্বত্র একজন রাজা, তাঁহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড় লোক, তাহার নীচে আর্য্যজাতীয় সাধারণ লোক, তাহার নীচে দাস (আর্য্য ও অনার্য্য)। দাস ভিন্ন সকলেরই রাজ্যমধ্যে কথা থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্যস্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণসমাজে ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধসমাজে বোধ হয়

* আমাদের স্মৃতিতে পারত্রিক ধর্ম্ম (Religion), লৌকিক ধর্ম্ম (Morals) ও দণ্ডনীত্যাদি তিনই উক্ত হইয়াছে। আধুনিক সভ্য সমাজে তিনটীর জন্য তিন প্রকার শাস্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্ম্মের উপদেশ আছে; লৌকিক ধর্ম্ম ও দণ্ডনীত্যাদি এই সময়েই রচিত।

গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ঐহিক ক্ষমতা গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত ছিলেন না; কিন্তু বৌদ্ধদিগের কথা আজি আমরা কিছু বলিলাম না।

সামাজিক ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। মন্বাদি গ্রন্থে জলপাত্র, ভোজনপাত্র, আহারীয় দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দূর উন্নতি হইয়াছিল। খাদখননাদি কার্য্য, পথনির্ম্মাণ ধর্ম্মকর্ম্মমধ্যে গণিত থাকায় রাজার আর পবলিক ওয়ার্কস্ বলিয়া একটী সর্ব্বভুক্ ডিপার্টমেণ্ট রাখিতে হইত না। এ বিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে তদানীন্তন হিন্দুস্থান সমাজকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লব উপলক্ষে সে সকলই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই লিখিত পুস্তক আছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ হইতে আমরা কল্প, গৃহ্য প্রভৃতি সূত্র পাই। উহা পারত্রিক ধর্ম্মে, যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দনাদিবিধানে নিযুক্ত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড় দর্শন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাই। ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারায় স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায়ে পুস্তক লেখা হইয়াছিল, বলিতে সাহস করা যায়। আয়ুর্ব্বেদ, অশ্বশাস্ত্র, হস্তিশাস্ত্র, কৌটিল্য, কামন্দকীয় মূলস্বরূপ রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্র উঁহাদের দ্বারাই রচিত হয়। অর্থাৎ এই কালীন ব্যবসায়ীদিগের রচিত গ্রন্থাদি পরসময়ে সংগৃহীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণের দুই একখানি গ্রন্থ এই কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্মণপক্ষীয় ক্ষত্রিয় হইতে আমরা মোক্ষশাস্ত্র প্রাপ্ত হই। জনক রাজা উহার অধ্যাপক। ব্রাহ্মণবিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমরা বৌদ্ধাদিশাস্ত্র প্রাপ্ত হই। অনার্য্যদিগের রচিত কোন পুস্তক আমরা পাই নাই। পূর্ব্বাঞ্চলীয় অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণ-বিরোধী মতপ্রচার বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। এমন কি, বোধ হয়, অনার্য্য-সম্পর্ক ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইত কি না, সন্দেহ। এতৎকালীন অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মকেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত করে। ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে উহাদের দেবতাদিগকে বৈদিক দেবতার সহিত একাকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিবিপ্লবের ফল—পূর্ব্বপ্রস্তাবের সংক্ষিপ্তার্থ

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা, উহার কারণ, প্রকৃতি এবং উহা দ্বারা আন্তরিক ও বাহ্যিক যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের একত্র বাস বিপ্লবের কারণ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিবাদ তাহার উদ্দীপক। বিপ্লবকালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই আমরা গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সময়ে দর্শনের সৃষ্টি, আইনের সৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষণে উহার ফলগুলি একটু বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিব।

প্রথম ফল যাগযজ্ঞের বিরল প্রচার

বিপ্লবের পূর্ব্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নামক বেদের অংশগুলি নানারূপ যজ্ঞকাণ্ডের নিয়মে পরিপূর্ণ। উহাতে মাসব্যাপী, বৎসরব্যাপী, দ্বাদশবৎসরব্যাপী বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল ছাপা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, জগতের যাবতীয় দ্রব্যই যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে দেখিয়াছি, ইন্দুরমাটীও কাজে লাগিয়াছে। বিপ্লবের পর যাগযজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। ইহার পর আর অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের নাম বড় একটা শুনিতে পাই না। যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাজপেয়াদি যজ্ঞ হইয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর যজ্ঞ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যজ্ঞতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই যে, ব্রাহ্মণকালে যজ্ঞ ভিন্ন মুক্তি ও ভূতিলাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সময় জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য মুক্তিপ্রদায়ক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যাগ-যজ্ঞের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞের অসংখ্য পশুবধ দেখিয়া শুদ্ধোদন রাজার পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায়, এই দুইটী মতের প্রচার করেন। উহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আমরা দেখিতে পাই, উপনিষৎসমূহেও ঐ দুই মত আছে। সুতরাং বোধ হয়, উহারা এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নূতন মতের অন্যতম। পূর্ব্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব ঐ মতদ্বয়ের প্রচার করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল; তাঁহার মত সেখানে সাদরে গৃহীত হয়। দেখিতে দেখিতে মিথিল, মগধ, কোশল, কাশী প্রভৃতি স্থানের

রাজারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই ধর্ম্মেরই শ্রীবৃদ্ধি। রাজদরবারের লোক রাজার অনুগমন করে; ছোট লোকের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহারা কিছুই বুঝে না, তাহারাও প্রায় রাজারই পশ্চাদ্‌গামী হয়। এইরূপ নূতন ধর্ম্ম অবলম্বিত হইলে, কেবল প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত পুরোহিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। সৌভাগ্যক্রমে মগধ, মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভালরূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথাকার পুরোহিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই উপশমিত হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইল, বৌদ্ধধর্ম্মের জয় জয়কার হইল। *

বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত একটী কথা

অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবামাত্র দেশের সকল লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়। এই একটী সম্পূর্ণ ভ্রম। অশোক রাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ বৌদ্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কোন স্থান হইতেই ব্রাহ্মণ নির্ম্মূল হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী রাজারা উক্ত মত অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছিল। বস্তুতঃ যেমন হিন্দু মুসলমান, তেমনি বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সকল দেশে, সকল নগরেই বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা এখন যেমন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করেন, বৌদ্ধদিগকেও সেইরূপ করিতেন। বিশেষের মধ্যে, এই চৈতন্যসম্প্রদায় কখন রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, বৌদ্ধেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি যে উপরি-উক্ত বিপ্লবের একটী সুধাময় ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মগধসাম্রাজ্যের উৎপত্তি

বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমন কি, এক মিথিলা ও মগধেই দশ পনর জন রাজার নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তার পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস জানি না। সেকেন্দরের আক্রমণকালে শুনিতে পাই, মহানন্দ নামে এক জন নন্দবংশীয় ভূপাল প্রাচী রাজ্যের

* অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না, তিনিও গৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা। কারণ, অশোক রাজার পুর্ব্বে আমরা বৌদ্ধদের কথা বড় একটা শুনিতে পাই না। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হয়।

সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, তেমনই আছে। সেকেন্দর এক জনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এক জনকে জুয়াচুরি করিয়া হাত করিলেন, আর এক জন আপনি শরণাগত হইল। অথচ সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল এক রাজার অধীন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী ছিলেন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সন্ধি হয়, মিল হয়; শেষ দিলসের রাষ্ট্রসমবায়ের * ন্যায় ঐ সন্ধিতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজারা শূদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, পুরাণে লিখিত আছে। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হওয়া হেতুকই পরস্পর একতাপাশে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। রাজকীয় একতার ফল মগধসাম্রাজ্য, আর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতার ফল বৌদ্ধধর্ম্ম।

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান উপকার হইয়াছে। বিদেশীয় হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য-বিস্তার। এতদ্ভিন্ন আরও একটী আছে। সেইটী আমরা প্রথমে বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র উপায়। আবার অনেকে আছেন, তাঁহাদের মতে বৃহৎ সাম্রাজ্যই উন্নতির হেতু। দুই মতেই আংশিক সত্য উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অসভ্য অবস্থায় ভাল। উহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতা-বিস্তার হয়; সাক্ষী গ্রীস ও ইতালী। কিন্তু সভ্যতা, উন্নতি একবার বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্যই সুবিধা। রোম ও চীন এই দুই সাম্রাজ্যই প্রাচীন সভ্যতা বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছে। মগধসাম্রাজ্যের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্য রাজ্য করতলস্থ করিয়া মগধের উৎপত্তি। যত দিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল, তত দিন প্রজাবর্গের সুখ ছিল। মাগধেরা রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করিত, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় স্থাপন করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত। মগধের দ্বারা কি উপকার হইয়াছিল, মগধের ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিলেই জানা যাইবে। এক জন ইতিহাসবিদ্ লিখিয়াছেন, পরাক্রান্ত রাজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষ সুখী; তাহার কারণ, ইংরেজ পরাক্রমশালী। মোগল সাম্রাজ্যে যে ভারতের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার কারণ, মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল। মগধের রাজ্যে যে ভারতের এত গৌরব হয়, তাহারও কারণ, মগধ পরাক্রমশালী। বর্ম্মার মগেরা ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী

* **Delian Confederation. [Confederacy of Delos, c 478 B. C.]**

হিন্দুরা মগধের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধের হস্তগত ছিল। ইংরেজ, মুসলমান ও মাগধে প্রভেদ এই, ইংরেজ মুসলমান বিদেশী, মাগধ এদেশী। এই জন্য আমাদের চক্ষে মগধের এত মান। হিন্দুদিগের সময় মগধের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। যদিও হইয়া থাকে, মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই।

গ্রীক হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার

পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একবার দারা সব্‌তাস্প আর একবার সেকেন্দরের করতলস্থ হইল। সেকেন্দরের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন। পুরুরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও সেকেন্দরের কিছু করিতে পারিলেন না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মগধ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেকেন্দর তাহাতে ভীত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদলে প্রভুদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইল। মগধ গর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। কিন্তু অল্পদিনমধ্যেই সিলিউকস্ আবার অসংখ্য গ্রীক সৈন্য. লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার মগধ হইতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার পর চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া আর বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়া যায় না। যত দিন মগধের এতটুকু বিক্রম ছিল, তত দিন কেহ ভারতবর্ষে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। সলিমান পর্ব্বতের ওপারে ভীমবলী পারদ রাজ্য ছিল। কই, পারদীয়ানরা ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া ও মিশরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় নাই, এবং প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল, তাহার কারণ পুর্ব্বোক্ত বুদ্ধিবিপ্লব, বৌদ্ধধর্ম্ম ও মগধ সাম্রাজ্য।

দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার

অশোক রাজা দক্ষিণদেশীয় লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েন। তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাই অধিক হয়। তাহার কারণ, বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-স্থাপনেরও চেষ্টা পাইত; শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ফুরাইতে না ফুরাইতে যতি হইলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাবের আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না।

মঠের সৃষ্টি

মঠের সৃষ্টি বিপ্লবের একটী কুফল। বৌদ্ধেরা সর্ব্বপ্রথমে মঠের সৃষ্টি করেন। বুদ্ধের সখা পাটলীপুত্ররাজ স্বীয় রাজধানীতে প্রথম মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মঠের ইতিহাস পরে বর্ণনীয়।

উপরি-উল্লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তার্থ

আমরা বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ দশায় দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিষয়ের কয়েকটী কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ দশায় দেখা গেল, সমাজ পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুইটী পরিস্কৃত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিক ব্রাহ্মণবিরোধী, অনার্য্যপ্রধান। পশ্চিমদিক আর্য্যপ্রধান, ব্রাহ্মণশাসিত। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, সাধারণের জন্য এক সেট নূতন স্মৃতিপুস্তক হইয়াছে। স্মৃতি প্রায় বেদের তর্জ্জমা মাত্র, ভাষা নূতন। স্মৃতির ভাষা আর বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল স্মৃতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌদ্ধগ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক, দেশীয় চলিত ভাষার উদ্ধৃত কথা অধিক। ব্রাহ্মণবিরোধিগণের মধ্যে এক জন দলপতি পাইলেন, তাঁহার নামে তাঁহাদের নাম হইল। ব্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম্ম কাহাকেও দিতেন না, উহারা সকলকেই সমানরূপে স্বধর্ম্ম দান করিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে এ কারণ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল; ব্রাহ্মণবিরোধিগণ আবালবৃদ্ধবনিতা একদল হইল, ইহাদের রাজ্যশাসনক্ষমতা অধিক হইল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকে পলাইয়া দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রয় করিলেন, অনেকে কথঞ্চিৎ স্বধর্ম্ম লইয়া দেশে রহিলেন। বন্যজাতীয়দিগকে ক্ষত্রিয়ত্ব দিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের সহিত আপনার ধর্ম্ম মিশাইয়া আর এক নূতন আধিপত্যের, নূতন সভ্যতার এবং নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মালব গুজরাটের পূর্ব্বাংশে, রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির উৎপত্তি, নাগকুল অগ্নিকুলের উৎপত্তি ও পৌরাণিকতা ও বর্ত্তমান সভ্যতার উৎপত্তি। ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষিত করিবার প্রণালী অতি চমৎকার। আমরা জানি, হিন্দুধর্ম্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন,—হিন্দুরা সাঁওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দু করিয়া লইতেছে। এক জন ব্রাহ্মণ একটী গ্রামে গেল; সেখানে পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিল, সাঁওতালেরা তাহার কাছে পীড়ার ঔষধ প্রভৃতি লইতে আসিল; ক্রমে কালীপূজা করিতে শিখিল; রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিল, তাহারা হিন্দু হইল। পাদরীরা তাহাদের আর কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ সাঁওতালের ব্রাহ্মণ বলিয়া নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইল। দাক্ষিণাত্যে প্রায় এইরূপই ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শূদ্র ও অন্ত্যজ লোকই অধিক। এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার হইল।

বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগ্যের আধিক্য। ঐহিক বিষয়ে ইঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এ জগত ত মায়া, ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা এ জন্মের পর; সুতরাং এ জন্মের কাজে তত মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। সকলেই পরকালের জন্য

অধিক চিন্তিত। কেহ প্রমাণ-প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগমের চেষ্টা করিতেছেন। কেহ প্রকৃতিপুরুষের সূক্ষ্মতম বিবেকখ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়া দুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কেহ জড় জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে করিয়া ব্রহ্ম ও আমি এক, এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বীরাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু রোধ করতঃ আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ঐহিকের উপর বিষয়ী লোকেরও বাসনা অল্প। বৌদ্ধদিগের ত ভিক্ষু নামে এক দল লোক শুদ্ধ পারত্রিক চিন্তার জন্য স্বতন্ত্র থাকিত। বিপ্লবের পূর্ব্বে ঐহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই যতি। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনিও যতি, যিনি গৃহস্থ, তিনিও যতি। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, তিন আশ্রম না কাটাইয়া যতি হইতে পারিবেন না। শেষ দেখি বৌদ্ধেরা বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অনার্য্যদিগকে বৌদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা মালবকেন্দ্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল পৌরাণিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল। ইহার পর হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নূতন আর্য্যগণ আসিয়া মিলিতে লাগিল। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে বড় ঘৃণা করিত। অনার্য্যগণ একেবারে বৌদ্ধ হইল না। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশে আজিও অনার্য্যধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যে সকল জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে, অথচ ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানে না, তাহারাই অনার্য্যধর্ম্মাবলম্বী। যেমন আমাদের দেশে ডোম, পোদ ইত্যাদি। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, তথাপি ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব আজিও কমে নাই। প্রতি বৎসর কয়েক দিন ধরিয়া উহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির হইবার যো থাকে না। একবার রাজা বাহির হইয়াছিলেন। বিচারে তিনি দণ্ডনীয় হন। এইরূপে বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ অবস্থায় তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট হইল,—অনার্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদিগের নূতন ধর্ম্ম; তাহাদের ঐক্য অধিক, তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। অনার্য্য প্রায়ই পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছে।

বঙ্গদর্শন
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪

---

* দক্ষিণেও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকল দেশেই ছিল। যে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষমতা অধিক, সেইখানেই ইলোরের মন্দির আছে।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

অবতারণা

অশোক রাজার সময়ে—মৌর্য্যবংশের অধিকারকালে—মগধসাম্রাজ্যের উন্নতির মুখে—খ্রীষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বৎসর পুর্ব্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে—যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ঐ অল্পসংখ্যক হীনবল, বীর্য্যহীন, বিচারপরাজিত ব্রাহ্মণগণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন, আবার তাঁহাদিগেরই গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত হইবে। বোধ হয়, কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই, সেই শক্তি ছিল ; যে শক্তিবলে ইহুদীরা আজিও ইহুদী আছে—গৈবীরেরা আজিও গৈবীর আছে—সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটী স্বশ্রেণীহিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (Patriotism) বলিয়া একটী শক্তি জন্মিতেছে, তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য একটী প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহঙ্কার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকাল আছে। এই কয়টী শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দ্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহাতে বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহু শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কি উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাই দেখান যাইবে।

ধর্ম্মপ্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে—গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে—যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত সকল চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণিহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়—তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানতঃ তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দল মঠে থাকিত, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত এবং বুদ্ধত্বলাভের জন্য ধ্যানধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হত, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোন মতবিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড় বড় রাজারা ধর্ম্মমত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদিগের নাম শ্রাবক। একজন শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যাহারা শুনে; কিন্তু বাস্তবিক শ্রু ধাতু ণিচ্-প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা শুনে, তাহাদিগকে শ্রোতা বলে ও যাহারা শুনায়, তাহারাই শ্রাবক। * এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে, লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির জন্য, নির্ব্বাণের জন্য চেষ্টা করুক, কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যেটুকু ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্য্যন্ত; সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ, উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত, ধর্ম্মোন্নতির জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মপ্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্ম্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ, তাহারা বৈদিকক্রিয়াসক্ত; স্ত্রী ও শূদ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈদিকক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড় একটা যাগযজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

---

* কনিংহাম যেরূপ বলেন, যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মঙ্ক, যতি বা মোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কিরূপে?

ব্রাহ্মণদিগের উপায়

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, সেই ধর্ম্মেরই গর্ব্ব অধিক। একে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক, এমন নহে—যে কোন জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে।* সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্ম্মে আসিয়া পড়িল। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান; ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন; তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই—সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; অনার্য্যদিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করতঃ দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবতা-উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন—তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোন জীব-পদার্থ নাই। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য্যগতিকে সাকার-উপাসক হইলেন। তাঁহাদের মত হইল,

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারে না, অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

অন্ত্যজ বর্ণ

অনার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই—কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ণ পাঁচটী—এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্য্যায়করূপে ব্যবহৃত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই, এক দল শূদ্রের

* বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপালি শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপালি যদিও শূদ্র, তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বৌদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসভা হয়, বুদ্ধ উপালির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, উপালিই বিনয়ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়ধর্ম্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপালি ধর্ম্মভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর করিয়াছিলেন।

জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন, আর এক দলের করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায়—তাহারা সৎশূদ্র, যাহাদের না যায়, তাহারা অন্ত্যজ। আহীরি গোয়ালা সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদ্গোপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ, দুলে প্রভৃতি ছোট লোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

জাত্যভিমান

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যভিমান জন্মে। এক জন দুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, সেও বলিল, মুচি মুসলমান হইতে দুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংস্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে।

কোথায় অনার্য্যদীক্ষা আরম্ভ হয়

অনার্য্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ-রাজবারায় হয়। দক্ষিণ-রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটী রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে, সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ)। তাহাতে বোধ হয়, প্রথম অনার্য্য-প্রবেশ এইখানেই ঘটে। দক্ষিণ-রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এইস্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ, এখনও দেখা যায়, শৈবদিগের একটী প্রধান দুর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করাইবা মাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণদিগের উৎসব

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যত সুবিধা, বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের বারোটী সংস্কার আছে। একটী ছেলে হইলে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্য্যন্ত লোকে বারো বার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারোটী সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কি না সন্দেহ। শেষ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে এক বুদ্ধের উপাসনা মাত্র—হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা দেশভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে দেবতা চায়, সে সেই দেবতা উপাসনা করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন :—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল, বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা করিল—অথচ ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্র মান্য হইল। উপরি-উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে, ইতর লোককে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য বাহ্যিক যে সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক।

ভক্তিশাস্ত্র

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোককে মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভের উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের সময়ে জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না হয় নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শাণ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় না দেখিয়া এই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। এই ভক্তি কাহাকে বলে, শাণ্ডিল্যের প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোন দেবতায় পরম অনুরাগই ভক্তি—সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্য্যগণ মোহিত হন এমন নহে—ভক্তিতে অনেক খাঁটি বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্যনিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমরাই বলিতেছি, এমন নহে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটককার তাঁহার আশ্চর্য্য রূপক গ্রন্থে চার্ব্বাক, মহামোহ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্ম্মবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয়, তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে, আশ্চর্য্য কি?

বেদীতে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার

হিন্দুরা প্রচারকার্য্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিত। হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণে পাই যে, নৈমিষারণ্য বা আর কোন স্থানে পরাশর বা অন্য কোন ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণপ্রচারকার্য্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণপাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন, দান কর! ব্রাহ্মণ বলিলেন, দান করিয়া বলিরাজার সর্ব্বস্ব গেল, শেষ আত্মদেহ পর্য্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন, সত্য কথা কও। ব্রাহ্মণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির একটী অর্দ্ধমিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরকদর্শন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণপ্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্য্যদক্ষতা এবং অনুরাগ

উপরি-উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরাণপ্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর একটী কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্ম্মের প্রচারসময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উহারা প্রাণপণে ধর্ম্মপ্রচারচেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণপণে ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্ম্মার্থ উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য্য হইল, তখন আর ধর্ম্মপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্য্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে ব্রাহ্মণদিগের বড় সুবিধা—তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। এক জন ব্রাহ্মণ যদি একটী গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং এক দিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম, আর দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শ্রমণের হীনবল হইবার আর একটী কারণ

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ, ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে সকল লোক ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন সকল লোক বাছিয়া বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ যাহারা কার্য্যক্ষম, তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই সকল প্রচারকেরা বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যেও অনেক অগষ্টিন্, স্কোয়ার্টজ, ডফ সাহেব ছিল। ইঁহারা বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয়

ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। 'বীল সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মনাশের অপর কারণ

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার যখন আরম্ভ হয়, তখন যে উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল, এমন নহে। প্রথম বিপ্লবসময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ বৌদ্ধশত্রু আর এক দল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক এক জন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্ম্মী বলিয়া আপনদলের অনেক লোককে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বৌদ্ধসমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্ব্বলতার আর একটী কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর এক দোষ করিতেন, তাঁহারা দলাদলি বড় ভালবাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না, সবই উহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ; হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপাসক পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিক সূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সেটী ছিল না। "তুমি লবণ খাইবে, আমি খাইব না।" এই লইয়া উহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। ইয়ুরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রটেষ্টাণ্টেরা ফি হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চর্চ্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। এক জন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের শেষ দশা অন্তর্জ্জগতে

কনিংহাম বলেন, সেকেন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই, অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফা হিয়ানের সময় শুনিতে পাই, দুইই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান। হুয়েন সাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কনিংহাম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারের পোষণ হইত, সে সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমিদারী প্রভৃতি

ছিল, তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারের বৌদ্ধদিগের দার্শনিক মতের তর্ক-বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেইখানে শঙ্করাচার্য্য-শিষ্যেরা শুদ্ধাদ্বৈতমতানুযায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচারসময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচারকালে তাহারও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয়, তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ১৫ শতাব্দীতে যে নানা প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, ঐ সময়ে উহার যা কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারি শত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

বাহ্যজগতে

অন্তর্জ্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্যজগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচারসময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক। কনিংহামের 'এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া'য় দেখি, ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক। বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে এক জন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেলখণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শঙ্করচার্য্যের সময়ে একজনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই। বৌদ্ধেরা এ দেশে না থাকুক, আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের আচার আমাদের নিত্যকর্ম্মমধ্যে নিত্যই দেখিতে পাই।

বঙ্গদর্শন
শ্রাবণ, ১২৮৪

কুশীনগর

কুশীনগর কোথায়? যে স্থানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করেন, যে স্থানে অশীতিপর বৃদ্ধ শাক্যসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্যে শয়ান তদীয় মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যমণ্ডলী অবিরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করতঃ জগৎ অন্ধকারময় বোধ করিয়াছিল, সে কুশীনগর কোথায়? যেস্থানে অশোকরাজ ৺গুরুদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তিস্মরণার্থ প্রকাণ্ড নির্ব্বাণ-স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত সংখ্যক তীর্থযাত্রাভিলাষী ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ করিত, সে কুশীনগর কোথায়?

ভগবান শাক্যসিংহ আপনার নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় সন্নিহিত জানিয়া বৈশালী নগর হইতে উত্তর-পশ্চিমে কপিলবাস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া শেষবারের জন্য বৈশালীনগর দর্শন করিলেন। তখন এ ভক্ত-ভবন আর দেখিতে পাইব না ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। যে স্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল পরবর্ত্তী ভক্তগণ তথায়ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে স্থানই বা কোথায়? তথা হইতে অর্হৎ বোধিসত্ত্ব প্রত্যেকবুদ্ধ ও ভিক্ষুগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে নানা সদুপদেশ প্রদান করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার রোগযাতনা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল; তিনি কুশীনগর সন্নিহিত প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে শয়ন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি নির্ব্বাণ-নগরীতে অধিষ্ঠান করিলেন। কিন্তু সে কুশীনগর কোথায়?

এখন সে পুণ্যভূমি নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত ভারত পরিদর্শনকারী কেহই জানে না কোথায় ভারতের গৌরবরবির শেষ সমাধিস্থান অবস্থিত ছিল। সিংহল, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তাতার, চীন প্রভৃতি দেশদেশান্তরস্থ সৌগতগণ কোথায় আসিয়া তাহাদের ইষ্টদেবের চরম মন্দির সন্দর্শনে আপনাদিগকে পূত মনে করিত, এখন সেই স্থান জগতের কেহই জানে না। তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্তূপ এককালে ১৭৭ ফুট উচ্চ ছিল, এখন তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না। কতক ভগ্ন

হইয়া গিয়াছে, কতক মাটীতে প্রোত হইয়াছে, কতক বন ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ভয়াল ভল্লুক ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকল তাহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে।

কিন্তু তাহাই বা কোথায়? কেহই ত জানে না। সংস্কৃত সাহিত্য এত প্রকাণ্ড, তাহাতে ত কুশীনগরের কোন ঠিকানাই পাওয়া যায় না। পালি সাহিত্য এত বিস্তৃত, কিন্তু সিংহল, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বতের পালিগ্রন্থেও ত তাহার ঠিকানা মিলিল না। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ, প্রত্নতত্ত্বান্বেষী মনীষিগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কালের অনন্ত স্রোতে বুঝি নির্ব্বাণ-নগরীর স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে; আর সে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় নাই।

এমন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত স্তানিস্লা জুলিএন চীনদেশে হুয়েন সাঙ নামক ভারতপরিদর্শনকারী একজন অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম শুনিতে পাইলেন। আরও শুনিলেন যে হুয়েন সাঙ তাঁহার ভারত-পরিভ্রমণ বিষয়ে এক প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলের কতক উদ্ধার সাধন হইতে পারে। ভরসায় উদ্যমশীল ফরাসী পণ্ডিত চীন ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ভাষায় ৪০০ এরও অধিক অসংযুক্ত অক্ষর, যাহার প্রত্যেক অক্ষর এক একটী কথার সঙ্গে সমান, যাহার বর্ণপরিচয় দৃষ্টেই শিক্ষার্থিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, স্তানিস্লা জুলিএন সেই ভাষা অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অভিলষিত হুয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ-বিবরণ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন।

যেমন তিমিরাচ্ছন্ন গিরিগুহাগর্ভে সৌরকর প্রবেশ করিয়া তাহাকে আলোকিত করে, এই নূতন গ্রন্থের আলোকে সেইরূপ নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। সহসা ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়া গেলে যেমন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অনুমানগম্য মৃত্তিকান্তর সকল মানবনয়নের পরীক্ষোপযোগী হয়, সেইরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশে ভারত ইতিহাসের অনেক দুর্বোধ দুর্জ্ঞেয় অনুমানেরও অগম্য বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। পণ্ডিতগণ, ঐতিহাসিকগণ, প্রত্নতত্ত্বান্বেষিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

হুয়েন সাঙ একজন অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ ছিল না। আসিতে হইলে তাতার ও আফগানিস্থান বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। বৌদ্ধভিক্ষু গুরুদেবের লীলাভূমি পরিদর্শনার্থ ভারতীয় মনীষিগণের নিকট সূত্ত, বিনয়, অভিধর্ম্ম, প্রভৃতি মহাবৈপুল্যযুক্ত মহাযান গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ মহোৎসুক্যময় অন্তঃকরণে ঘোরবিপদসঙ্কুল, অজ্ঞাত, দুর্গম, অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও বর্ব্বর জাতিগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ভীষণ পথের পথিক হইলেন। কত শত নদ-নদী পর্ব্বত-কন্দর লঙ্ঘন করিয়া কত কত রাজ্য মহারাজ্য সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্বীয়

লব্ধ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহু বৎসর অবস্থান করিয়া হৃদয় ভরিয়া আপনার অভিলাষ পূরণ করতঃ আবার স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহার পক্ষে পুণ্য ভূমি, তাঁহার পক্ষে উহা স্বর্গ বা স্বর্গ হইতেও মনোরম। তিনি উহাকে ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন এবং উহার ঘটনাবলী ও মানচিত্র হৃদয়াকাশে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা ভক্তিভাবে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। যেখানে যে কয়দিন ছিলেন, যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নিকটে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন, নিকটে যে সকল স্থানে বড় বড় মনীষিগণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, এ সমস্তই তাঁহার ভ্রমণবিবরণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় যে পথে গিয়াছিলেন, যত পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অদ্ভুত গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রচার হইবা মাত্র ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া বসিলেন। স্থিরযৌবনা ভারতললামভূতা বারাণসী, গয়া ও মথুরা খুঁজিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু অন্য অন্য যে সকল স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু গমন করিয়াছিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। পরিব্রাজকের মাপ চৈনিক মাপ; তাহাকে ভারতীয় সর্ব্বে বিভাগের মাইলে পরিণত করিতে হইল; কত "লি"তে মাইল হইবে তাহা লইয়া কত গোলমাল হইল; শেষ স্থির হইল যে ৬ লিতে এক মাইল হয়।

কিন্তু তথাপি পরিব্রাজকের দূরতার সহিত মানচিত্রের দূরতা কিছুতেই মিল হয় না। পরিব্রাজক যে স্থান গয়া হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, সে স্থানে নগরী না হইয়া হ্রদ হইল; যেখানে পর্ব্বতগুহা পাইবার কথা, সেখানে নদীগর্ভ লক্ষিত হইল; যে স্থানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাইবার কথা, সে স্থানে শ্যামল শস্য-পূর্ণ ধান্যক্ষেত্র লক্ষিত হইল। তখন পণ্ডিতগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা পরীক্ষার্থ স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া পরিব্রাজক-প্রদর্শিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন যে মানচিত্রের দূরতার সহিত পরিব্রাজকের দূরতা অনেক বিভিন্ন হইবে। মানচিত্রের দূরতা সরল রেখায় মাপিতে হয়। কিন্তু পর্য্যটন করিতে গেলে ত পথ ধরিয়া যাইতে হইবে; পথ ত প্রায় ঠিক সরল রৈখিক আকারে নির্ম্মিত হয় না। সুতরাং মানচিত্রের মাপে ও পর্য্যটনের মাপে অনেকটা বিভিন্নতা আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। তাহার পর পথ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; যে পথে পরিব্রাজক পর্য্যটন করিয়া গিয়াছিলেন, সে পথ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার পুস্তক হইতে আবিষ্কারের পথ হইল বটে; কিন্তু যত সহজে আবিষ্কারের কথা ছিল তাহা হইল না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পর্য্যটনার্থ

বদ্ধপরিকর হইলেন। এই পর্য্যটক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে আলেকজাণ্ডার কনিংহাম সাহেব প্রধান। তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে হুয়েন সাঙ প্রদর্শিত প্রদেশসমূহের পুনরাবিষ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কনিংহাম যে সকল স্থান আবিষ্কার করিলেন, তাহা যে ঠিক হইল একথা তিনিও বলিতে পারিলেন না। সুতরাং মৃত্তিকাখনন করতঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক হইল। তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত ঔদার্য্য সহকারে কনিংহাম সাহেবের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আর্কিওলজিকাল সর্ব্বে নামক বিভাগের সৃষ্টি করিলেন। প্রাচীন স্থানসমূহের অনুসন্ধান, প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির পুনরুদ্ধার, ভগ্নপ্রায় প্রাচীন অট্টালিকাদির পুনঃসংস্কার ঐ বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, এবং আলেকজাণ্ডার কনিংহাম সাহেব উহার ডাইরেক্টর হইলেন। তখন দস্তুরমত অন্বেষণ আরম্ভ হইল। কনিংহাম সাহেব নিজে যেমন এবিষয়ে উদ্যমশীল, তাঁহার সহকারীরাও সেইরূপ উদ্যমশীল। তিনি উৎসাহদান, প্রশংসা ও পারিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা আপনার তেজে ও উদ্যমে সহকারিবর্গকে তেজস্বী ও উদ্যমাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন। এই সকল উদ্যমশীল পরিব্রাজক পণ্ডিতগণের যত্নে পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়বলে অনেক স্থলে ভারতের লুপ্তকীর্ত্তি সকল পুনরুদ্ধার হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে। যতগুলি গুপ্তস্থান আবিষ্কৃত ও যতগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কুশীনগর একটী প্রধান স্থান এবং তথাকার নির্ব্বাণ-স্তূপ ও নির্ব্বাণ-প্রতিমা প্রধান কীর্ত্তি।

কুশীনগর কুশীনগর নাম শুনা যাইত, কিন্তু কোথায় কেহ জানিত না। হুয়েন সাঙের পুস্তকে তিনি কোথা হইতে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত আছে। তিনি পিপ্পলবন নামক একটী স্থান হইতে কুশীনগরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুশীনগরও যেমন অজ্ঞাত, পিপ্পলবনও তেমনি অজ্ঞাত স্থান। পিপ্পলবনে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে অনোমা নদী—বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান—পার হইতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরকোশলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎপ্রবাহের মধ্যে কোন্‌টী অনোমা তাহা কেহই জানে না। কালক্রমে নদীর নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অনোমা নদী পার হইবার পূর্ব্বে হুয়েন সাঙ রামগ্রাম নামক পুণ্য-তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন; রামগ্রামেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। রামগ্রামে আসিবার পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবাস্তু নগর দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু কই সে স্থানেরই বা নাম কে জানে? কপিলবাস্তু যাইবার সময় চীনদেশীয় পরিব্রাজক শ্রাবস্তীতে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই শ্রাবস্তী ভগবানের প্রিয়স্থান। এই খানেই অনাথপিণ্ডদ নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ একজন ধনী ব্যক্তি বুদ্ধদেবের বাসার্থ জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া দেন। উদ্যানটী তখন শ্রাবস্তীর কোন রাজকুমারের সম্পত্তি

ছিল। রাজকুমার বলিলেন, আমার উদ্যান আবরণ করিতে হইলে যত স্বর্ণমুদ্রা আবশ্যক, যদি তত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পার তবে তোমায় আমি আমার বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি। অনাথপিণ্ডদ ঠিক তাহাই করিলেন। একটী একটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা বিছাইয়া উদ্যানটী মুড়িয়া দিলেন। রাজকুমার মুদ্রাগুলি লইয়া উদ্যানটী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু হায়, সেই শ্রাবস্তীই কোথায় কে জানে। তাহারও নাম লোপ হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষবাসিগণ অনাথপিণ্ডদের নামও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এই ত শ্রাবস্তী হইতে কুশীনগর পর্য্যন্ত ৮।১০টী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্রের নাম হইল, ইহার একটীও লোকে জানে না।

কিন্তু এইবার আমরা বোধ হয় এই ঘোর অন্ধকারে একটু আলোক পাইব, এই অগাধ সমুদ্রের কূল কিনারা পাইব। হুয়েন সাঙ শ্রাবস্তী যাইবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক বিধর্ম্মিপরিবৃত সরযূতীরবর্ত্তী অযোধ্যা নামক নগরে বাস করিয়াছিলেন। অযোধ্যার নাম ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই, পারিবেও না। কবিগুরু বাল্মীকির প্রতিভাবলে ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট অযোধ্যা আপনার জন্মভূমি অপেক্ষা আদরের স্থান। এই স্থানে তাহাদের জীবনের আদর্শস্বরূপ লঙ্কাবিজয়ী রক্ষঃকুলবিমর্দ্দী রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুয়েন সাঙ-এর অযোধ্যা এই অযোধ্যা, এবং তাঁহার বিধর্ম্মিগণ আমরা অর্থাৎ হিন্দুগণ।

এখন আমাদিগকে এই অযোধ্যা হইতে আবার ফিরিয়া শ্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, রামগ্রাম, অনোমা, পিপ্পলবন হইয়া কুশীনগরে উপস্থিত হইতে হইবে। এইবার আমরা দেখিতে পাইব, আলেকজাণ্ডার কনিংহাম সাহেব ও তাঁহার বীরহৃদয় সহকারিগণ কেমন আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও কৌশলবলে এই সমস্ত স্থান নবাবিষ্কৃত করিয়া কুশীনগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী ৫০০ লি উত্তর। ৫০০ লিতে ইংরেজী ৮৩ মাইল। উত্তর বলিতে গেলে ত আর ঠিক উত্তর বুঝায় না। ঠিক উত্তরের একটু এদিক হইতে পারে, একটু ওদিকও হইতে পারে। সুতরাং ৮৩ মাইল উত্তরে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, সাহেত-মাহেত নামক স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন সাহেত-মাহেতই শ্রাবস্তী বলিয়া অনুমান হইল। কিছুদিন পরে ঐ সাহেত-মাহেতেরই এক স্থানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী বুদ্ধপ্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার সিংহাসনে শ্রাবস্তী নগরের নাম খোদিত আছে, সুতরাং সাহেত-মাহেতই যে শ্রাবস্তী সে বিষয়ে আর বিশেষ সন্দেহ রহিল না।

শ্রাবস্তী হইতে ৫০০ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে কপিলবাস্তু। কপিলবাস্তু কোথায় ইহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষ কপিলবাস্তু নগরও পাওয়া গিয়াছে।

ভুঁইলাতাল নামক পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে যে সকল ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে, তাহাই কপিলবাস্তুর ভগ্নাংশ। কনিংহাম সাহেবের সহকারী কারলীল সাহেব এই স্থানে মায়াদেবীর মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন স্থান সকল আবিষ্কার ও নির্ণয় করিয়াছেন। কপিলবাস্তুর কথা লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হওয়া উচিত, এজন্য তাহার সবিস্তার বর্ণনা এস্থানে করা গেল না।

কপিলবাস্তু বা ভুঁইলাতাল হইতে ২০০ লি অর্থাৎ ৩০ মাইল পুর্ব্বে রামগ্রাম। রামগ্রামে হুয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধাতু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত একটী প্রকাণ্ড স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে স্তূপ শব্দের অর্থ ঢিপি। পূর্ব্বকালে নানা কারণে লোকে স্তূপ নির্ম্মাণ করিত। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের শরীরধাতুর কোন স্থান লইয়া অর্থাৎ নখ কেশাদি লইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিত, পরে তাহার উপর প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, স্তূপগুলির পরিমাণের কিছুই স্থিরতা ছিল না। ৫০।৬০।৭০।৮০ ফুট, এমন ২০০।৩০০ ফুট উচ্চ স্তূপের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্তূপের ব্যাস ৮৫।৮৬ ফুটও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপগুলি গোল থামের মত এবং নিরেট ইটের গাঁথনি। রামগ্রামে এইরূপ একটী স্তূপ ছিল। এক্ষণে ভুঁইলাতাল হইতে পুর্ব্বে প্রায় ৩০ মাইল অন্তরে রামপুর দেওড়িয়া নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, আর এই ভগ্নাবশেষ হইতে ৫০০ ফুট অন্তরে একটী স্তূপের ভগ্ন অংশ দৃষ্ট হয়। রামগ্রামে যে স্তূপ আছে এখন তাহা উচ্চে ২০ ফুট এবং উহার ব্যাস ৮৫ ফুট।

কপিলবাস্তু হইতে ২৬০ লি অর্থাৎ ৪৩ মাইল অন্তরে অনোমা নদী। অনোমা নদী বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থক্ষেত্র। বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। অনোমা নদীই তাঁহার পথের প্রথম নদী। তিনি অশ্বারোহণে এই নদী লম্ফত্যাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কপিলবাস্তু হইতে রামগ্রাম ৩০ মাইল। রামগ্রাম হইতে সোজা রাস্তা পাওয়া যায় না, অনেক নদী নালা ঘুরিয়া তামেশ্বরনাথ নামক শিবমন্দিরের নিকটে একটী নালা আছে। সেটী প্রায় ১৩ মাইল হইবে। নালার নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। নদীর নাম এখন অনোমা নাই; উহার নাম হইয়াছে "কড়োয়া", যাহার উপর কেহ লম্ফ দিয়া পার হইয়াছিলেন। উহা অন্য সময়ে অতি সামান্য নদী থাকে, বর্ষায় অত্যন্ত প্রবল হয়। কারলীল সাহেব এই নদীকেই অনোমা নদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উহার দূরত্ব কপিলবাস্তু হইতে ঠিক ৪৩ মাইল। ললিতবিস্তরে বলে যে কপিলবাস্তু হইতে অনোমা ৬ যোজন। ৭ মাইলে যোজন ধরিলে ৪২ মাইল।

এই অনোমা নদী পার হইয়াই ভগবান সংসারীর চিহ্নস্বরূপ রাজবেশ পরিহারপূর্ব্বক ভিখারীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন এবং

ছন্দক নামে তাঁহার যে ভৃত্য এতদূর সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। যেস্থানে এই তিনটী কার্য্য হয়, বৌদ্ধগণ সে তিনটী স্থানকেই পবিত্র পুণ্য তীর্থ বলিয়া মনে করিত এবং এই তিন স্থানেই বহুসংখ্যক স্তূপ বিহারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। এবং এই তিনটী স্থানেরই ভগ্নাবশেষ কড়োয়া নদী পার হইয়া ২ ক্রোশের মধ্যে অদ্যাপি লক্ষিত হয়। কারলীল সাহেব অনুমান করেন যে, যে স্থানে ভগবান মস্তক মুণ্ডন করেন সেই স্থানে একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর "শিরসারাও" নামক একটী গ্রাম আছে। শিরসারাও শব্দের অর্থ মস্তক মুণ্ডন করা। যেস্থানে তিনি আপন বেশ প্রদান পূর্ব্বক একজন ব্যাধের নিকট তাঁহার বেশ ভিক্ষা করিয়া ধারণ করেন, সেখানে নিরেট ইটের একটী প্রকাণ্ড স্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়; আর যেস্থানে ভগবান ছন্দককে বিদায় দেন, সে স্থানের নাম অদ্যাপি মহাস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই মহাস্থানে পরম সৌগত মহারাজা অশোক একটী প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের ইট খুব বড় বড়। এখন মহাস্থানে খুব বড় বড় ইট অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিনটী স্তূপের সান্নিধ্য হইতে হুয়েন সাঙ পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে ১৮০ লি অর্থাৎ ৩০ মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া নিবিড় ন্যগ্রোধবন মধ্যে মৌর্য্যরাজগণের রাজধানীতে উপস্থিত হন। ভগবান বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার শরীরের দাহ করা হয়। দাহবিশিষ্ট অস্থিসকল আট ভাগে বিভক্ত, যে আট জন রাজা দাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই সেই অস্থিসমূহ আটভাগে বিভক্ত করিয়া লন। এবং নিজ নিজ রাজধানীতে স্থাপন করিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভাগ শেষ হইয়া গেলে মৌর্য্যগণ তথায় উপস্থিত হন এবং ভগবানের ধাতু প্রাপ্ত হইতে না পারায় একান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার চুল্লীর অঙ্গারগুলি সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন এবং নিজ রাজধানীতে তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। হুয়েন সাঙ এই স্থানে ঐ অঙ্গারস্তূপ দেখিতে পান।

গোরকপুর জিলার মধ্যে গড়ানদীর তীরে রাজধানী উপধোলিয়া নামক স্থানে বহুসংখ্যক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান পূর্ব্বোক্ত মহাস্থান হইতে ২৯ মাইল এবং কড়োয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এবং উহার নিকট অদ্যাপি বহু সংখ্যক ন্যগ্রোধবৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য কারলীল সাহেব এই স্থানকেই উক্ত মৌর্য্যরাজগণের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই স্থানের একটী স্তূপকে অঙ্গারস্তূপ বলিয়া মনে করেন।

ফা হিয়ান নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক এবং হুয়েন সাঙ ঠিক এইস্থান হইতেই কুশীনগরে গমন করেন। কুশীনগর এই স্থান হইতে পূর্ব্ব-উত্তরপূর্ব্ব। কেবল বনের মধ্য দিয়া পথ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে কুশীনগরে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রতিমা সন্দর্শন

করিব এই আনন্দে বিভোর হইয়া হুয়েন সাঙ রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব লিখিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এবং ফা হিয়ান যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও ভুল আছে। ফা হিয়ান বলেন যে রাজধানী হইতে কুশীনগর ১২ যোজন—৮৪ মাইল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরিণামে দৃষ্ট হইবে যে, উহা বার যোজন নহে, বার ক্রোশ মাত্র—২৭।২৮ মাইল। যদিও রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব স্থিরীকৃত হইল না, কিন্তু হুয়েন সাঙ বলিয়া গিয়াছেন যে কুশীনগর হইতে বারাণসী ৭০০ লি অর্থাৎ ১১৭ মাইল এবং ফা হিয়ান বলিয়াছেন যে বৈশালী হইতে কুশীনগর ২৫ যোজন বা ১৭৫ মাইল; এক্ষণে এই সমস্ত দূরত্ব লইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে গোরকপুর নামক স্থান হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে কোন স্থানেই কুশীনগর নামক প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থটী অবস্থিত ছিল। গোরকপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল অন্তরে কসিয়া নামক একটী স্থানে একটী প্রাচীন নগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় একটী মাটীর টিপিমাত্র, কিন্তু খুঁড়িলে প্রচুর ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই কসিয়াই কুশীনগরের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং উক্ত মহাত্মা সাহেব কসিয়ার কয়েকটী স্থান খুঁড়িয়াও দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কসিয়া কুশিয়ার অপভ্রংশ আর কুশিয়া কুশীনগরের অপ্রভ্রংশ। সুতরাং এই কসিয়াই সম্ভবতঃ কুশীনগর হইবে। উহার নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় এই অনুমান অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। এইভাবে কিছুদিন যায়, পরে ১৮৭৬ সালে কনিংহাম সাহেব আপনার সহকারী কারলীল সাহেবকে কসিয়ার স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া উহা কুশীনগর কি না সপ্রমাণ করিবার আদেশ দেন; তদনুসারে উক্ত কারলীল সাহেব কসিয়া যাত্রা করিয়া ভগ্নাবশেষমধ্যে বুদ্ধভিক্ষুর যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার সান্নিধ্যে শিবির সন্নিবেশ করেন।

কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-স্তূপ ছিল, নির্ব্বাণ-প্রতিমা ছিল, একটী প্রকাণ্ড বিহার ছিল এবং নির্ব্বাণ-প্রতিমার জন্য একটী মন্দির ছিল। কারলীল সাহেব নিরতিশয় অধ্যবসায় বলে এই সকলগুলিই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তিনি যেস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন তাহার অবিদূরে মৃত্তিকারাশি অতি উচ্চ এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটা স্তম্ভের মত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই উচ্চ ভূভাগ এবং ঐ স্তম্ভপ্রায় পদার্থ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, এতই জঙ্গল যে নিকটে যাওয়া যায় না। ইহাতে যাইতে হইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। দূর হইতে এই উন্নত ভূভাগ ও উহার উপরিস্থিত স্তম্ভ শিখরাধ্যুষিত উচ্চ পর্ব্বতমালার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। কারলীল সাহেব মনে করিলেন, এই স্থানে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইবেন এবং বহুসংখ্যক লোক আনাইয়া ঐ উন্নত ভূভাগের জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন। তখন দৃষ্ট হইল যে, যে স্থানটী সর্ব্বোচ্চ

তাহার মস্তকে একটী নিরেট থাম প্রায় ২০ ফুট উচ্চ, তাহার পার্শ্বস্থ ভূমি অনেকটা নিম্ন এবং এই নিম্নভূমির পার্শ্বেই আর একটী উচ্চ মৃত্তিকারাশি। ইষ্টকস্তম্ভের ব্যাস প্রায় ২০ ফুট হইবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূভাগ হইতে উহার উচ্চতা ৫৭ ফুট। এই ৫৭ ফুট উচ্চ মৃত্তিকারাশির পশ্চিমে নিম্নভূমি, তাহার পার্শ্বে আবার উচ্চভূমি, দেখিয়া শুনিয়া কারলীল সাহেব অনুমান করিলেন যে এই ৫৭ ফুট উচ্চ ইষ্টকরাশি নির্ব্বাণ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ। তাহার নিকটস্থ উচ্চ ভূভাগ নির্ব্বাণ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আর চতুর্দ্দিগস্থ বিস্তৃত উচ্চভূমি নির্ব্বাণ-বিহারের শেষ অবস্থা মাত্র।

এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাণ-মন্দিরের শিরোভাগ হইতে মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে হইল নির্ব্বাণ-প্রতিমা ইহারই মধ্যে অবস্থিত হইবে। সে প্রতিমা ত ছোট খাট নহে; ২০ ফুট দীর্ঘ এবং শয়ান অবস্থায় অবস্থাপিত। মৃত্তিকারাশির ঠিক শিরোভাগ হইতে যদি কূপের ন্যায় খনন করা যায়, নির্ব্বাণ-প্রতিমা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই আশায় খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। আশা অচিরাৎ ফলবতী হইল। ১০ ফুট খুঁড়িতে না খুঁড়িতেই কোদালিতে পাথর ঠেকিল। কারলীল সাহেব আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন, চারিদিক খুঁড়িতে লাগিলেন। কোন অংশ না ভাঙ্গিয়া যায় তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক হইলেন। ক্রমে তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইল। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ফলিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান সফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রস্তর-প্রতিমা উদ্ধার হইল। ভগবান যেমন মৃত্যুসময় দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি শয়ন করিয়া আছেন। পশ্চিমাস্যে ভগবান নির্ব্বাণ লাভ করেন, ভগবানের প্রতিমাও পশ্চিমাস্যে। অনুমান হইল হুয়েন সাঙ প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তর প্রতিমা দেখিয়াছিলেন, এও সেই প্রতিমা। কিন্তু হায় প্রতিমার পদদ্বয় নাই, বামজানুর নিম্নভাগ নাই। বাম হস্ত নাই, কোমরের কিয়দংশ নাই। মস্তক ও মুখের কিয়দংশও নাই। কারলীল সাহেব এই সকল ভগ্নাংশের জন্য অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন এবং সুখের বিষয় এই যে, তাহার অনেকগুলি প্রাপ্তও হইলেন। অনেক অংশ সিংহাসনের মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ২০ ফুট দীর্ঘ সেই প্রতিমা উত্তোলন করতঃ, তাহার নিম্নস্থ সিংহাসন ভগ্ন করতঃ, প্রতিমার যে সকল অংশ তাহার মধ্যে গাঁথা ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে হইল। সিংহাসনটীর দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ও প্রস্থ ৫।৬ ফুট ইং। যতদূর সম্ভব প্রতিমার ভগ্নাংশসমূহ সংগৃহীত হইলে কারলীল সাহেব সিংহাসন ও প্রতিমার সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

আমরা গতবারে মহাত্মা কারলীলকে কুশীনগরের নিবিড় জঙ্গলাভ্যন্তরে ভগ্নাবশিষ্ট অগাধ ইষ্টকরাশির মধ্যে বুদ্ধপ্রতিমার সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছিলাম।

তিনি স্বহস্তে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া অল্পে অল্পে সিংহাসনখানি ও নির্ব্বাণ-প্রতিমাটীর পুনঃসংস্করণ সম্পাদন করিয়া উঠিলেন। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টক ও ধূলিরাশির মধ্যে এবং সিংহাসনের অভ্যন্তরে নির্ব্বাণ-প্রতিমার যে সকল অংশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বিশেষ পরিশ্রম ও প্রণিধানপূর্ব্বক যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও সে প্রতিমার সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হইল না। তখন তিনি অন্যান্য প্রস্তরখণ্ড দ্বারা অবশিষ্ট অংশ পূরণ করিলেন এবং ক্রমে যখন প্রস্তরেরও অভাব হইল, তখন বিলাতী মাটীর দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইলেন।

নির্ব্বাণ-প্রতিমা সম্পূর্ণ হইলে কারলীল সাহেব সিংহাসনের পুনরুদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। পূর্ব্বে সিংহাসনের চারি কোণে চারিটী ভাস্করকার্য্যখোদিত প্রস্তরময় স্তম্ভ ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটী বই পাওয়া গেল না।

বড় বড় পাথরের টালী আড় করাইয়া সিংহাসনের পার্শ্বদেশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেল না। যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে কেবল একদিক মাত্র পুনর্নির্ম্মিত হইতে পারে। কারলীল সাহেব উহা দ্বারা সিংহাসনের পশ্চিম পার্শ্বটী ছাইয়া দিলেন। পশ্চিম ধারে সিংহাসনের সহিত সংলগ্ন তিনটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি ছিল। উহার মধ্যমটীর পশ্চাৎভাগে অতি প্রাচীন অক্ষরে কয়েকটী কথা লেখা ছিল। তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে যে, হরিবল নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ব্বাণ-মহাবিহারের শোভার্থ ঐ প্রস্তরময় মূর্ত্তিটী প্রদান করিয়াছিলেন।

সিংহাসন ও প্রতিমা পুনর্নির্ম্মিত হইলে কারলীল সাহেব দেখিলেন যে, প্রতিমাটী যদি এই ভাবে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সংযোজিত প্রস্তর সকল উঠিয়া ও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব তিনি উহার উপর রঙ্ করা আবশ্যক মনে করিলেন। এজন্য তিনি মস্তকের চুলগুলি কাল রঙ্ করিলেন, যে কাপড়গুলি পরান ছিল তাহাতে সাদা রঙ্ করিলেন এবং শরীরের অন্যান্য ভাগে ঈষৎ রক্তাভ হরিদ্রা রঙ্ করিলেন।

পাছে দেশীয় মিস্ত্রীগণের হস্তে ভার দিলে তাহারা খারাপ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে কারলীল সাহেব সমস্ত নিজ হস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণ-প্রতিমার রঙ্ দেওয়া সম্বন্ধে অনেকে কারলীল সাহেবকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। প্রতিমা সংস্কারের কয়েক বৎসর পরে গারিক সাহেব কুশীনগর দর্শনার্থ তথায় গমন করেন। তিনি বলেন রঙ্ দিয়া কারলীল ভাল কাজ করেন নাই। তবে কিনা কয়েক বৎসর পরে রঙ্ উঠিয়া যাইবে, তখন নির্ব্বাণ-প্রতিমার নিজ জ্যোতিঃ বিকশিত হইবে। কিন্তু গারিক সাহেবের জানা উচিত ছিল যে, প্রতিমাসংস্কারকার্য্য একবিধ প্রস্তরে সম্পন্ন হয় নাই। উহাতে দুই তিন প্রকারের প্রস্তর দিতে হইয়াছিল। সুতরাং রঙ্ দেওয়ার বিশেষ দরকার হইয়াছিল। রঙ্ উঠিয়া গেলে নির্ব্বাণ-প্রতিমার জ্যোতির্বিকাশ হইবে না, বরং দেখিতে বিশ্রী হইবে। বিলাতী মাটীর জোড় দেখা যাইবে। দুই তিন

প্রকারের পাথর দেখা যাইবে এবং পাথর ক্ষয় হইয়াও যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় আট দশ বৎসর অন্তর একবার রঙ্ দেওয়া আবশ্যক।

প্রতিমা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির সংস্কার বিষয়েও কারলীল সাহেবকে মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। যখন মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া গেল, তখন দৃষ্ট হইল মন্দিরের ভিত্তি কোথায ৫ ফুট, কোথায় ৬ ফুট, কোথায় ৭ ফুট, কোথায় ১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। বাহিরের দিক হইতে মাপিলে যত পাওয়া যায়, ভিতরের দিক হইতে আবার তত পাওয়া যায় না। ছাদ একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। ভিত্তির অনেক স্থান এরূপ অবস্থায় ছিল যে কখন পড়িয়া যায় তাহার স্থির নাই। কারলীল সাহেব সেই ভগ্নপ্রায় অংশ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং ভিত্তি গাঁথিতে আরম্ভ করিয়া কারলীল সাহেব ক্রমে ১২ ফুট উচ্চ করিয়া তুলিলেন এবং বাহির দিকে ভিত্তি ক্রমে সরাইয়া দিয়া পোস্তার ন্যায় করিয়া দিলেন। মন্দিরের ভিতরটী পরিষ্কার করিবার সময় কয়েকটী ইটের চাপ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল যে ঐ চাপগুলি খিলানের অগ্রভাগমাত্র। একটী জানালার খিলানের, একটী দ্বারের খিলানের, একটী ছাদের খিলানের। ছাদটী খিলানে নির্ম্মিত ছিল। খিলানগুলি সূক্ষ্মাগ্র এবং মোচার অগ্রভাগের ন্যায়। অগ্রভাগের ইটের জমাট দেখিয়া খিলান কত বড় ছিল এবং কিরূপ বক্রভাবে অবস্থিত ছিল তাহা একপ্রকার জানা গেল। তৎদৃষ্টে দ্বার, জানালা ও ছাদ নির্ম্মিত হইল।

নির্ব্বাণ-প্রতিমার সংস্কার কার্য্য সমাপন না করিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ গৃহটী অগ্রে নির্ম্মাণ করিয়া লইলে তাহার মধ্যে কিরূপে সে প্রকাণ্ড প্রতিমা প্রবেশ করান যাইবে। বিশেষতঃ অগ্রে প্রতিমা নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়াই সেই প্রতিমার রক্ষার্থে মন্দিরের আবশ্যক হইয়াছিল। আরও মন্দির এবং প্রতিমা দৃষ্টে এরূপ প্রতীয়মান হয় যে প্রতিমার অনুরূপ করিয়াই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, মন্দিরের অনুরূপ করিয়া প্রতিমার নির্ম্মাণ করা হয় নাই। কারলীল সাহেব প্রতিমা ও মন্দির সংস্কার কার্য্যে এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রে প্রতিমা সংস্কার কার্য্য সমাপন করিয়া সেই ভগ্নগৃহের পুনঃসংস্করণ করিতে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

ছাদটী যদি কড়ি, বরগা ও টালী দিয়া ছাওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কয়েকটী ইটের জমাট দৃষ্টে উহা যে খিলানে নির্ম্মিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না।

কারলীল সাহেব প্রথমতঃ প্রতিমাটী বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিলেন এবং তাহার উপর কতকগুলি নরম মাদুর বিছাইয়া দিলেন। তৎপরে বাঁশ ও মাদুর দিয়া খাঁচার মত করিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি আড়দেওয়ালের উপরিভাগটী

খিলানের মত করিয়া গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি লম্বা দেওয়াল দুইটীর ভিতর দিকে কাদার গাঁথনি ১ ফুট চওড়া ৬ ফুট উচ্চ দুইটী দেওয়াল গাঁথিয়া লইলেন। এবং তাহার উপরিভাগটী বাঁশ দিয়া ছাইয়া ফেলিলেন। এতদ্বারা প্রতিমাটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইল। পরে একটী আড়দেওয়ালের অগ্রভাগ হইতে আর একটী আড়দেওয়ালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটী বাঁশ ফেলিয়া দিলেন, এবং যে দুইটী লম্বা কাঁচা দেওয়াল তুলিয়াছিলেন তাহার অগ্রভাগ হইতে এই বাঁশের উপর কতকগুলি বাঁশ কাত করিয়া ছাইয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের অগ্রদেশগুলি পূর্ব্বোক্ত বাঁশটীর সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন। এই কাত করা বাঁশগুলিতেও কাদা ও গোময় দিয়া কালবুদ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। সেই কালবুদের উপর মোচার অগ্রভাগের ন্যায় খিলান প্রস্তুত হইল। খিলান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গেলে জানালা দিয়া এই সমস্ত মাল মসলা বাহির করিয়া লওয়া হইল। ঘর প্রস্তুত হইলে দৃষ্ট হইল যে প্রতিমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাবিশ, ইট ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে করিতে পুরাণ মন্দিরের চূড়াটী তাহারই মধ্যে পতিত হইয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। চূড়াটী বেমেরামত ও ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, কারলীল সাহেব উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত করিলেন।

মন্দিরের সম্মুখভাগে একটী দরদালান ছিল, সাহেব বিশেষ যত্নসহকারে সেটীকেও পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু এই দরদালানটী পুনর্নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহাতে বহুসংখ্যক মনুষ্যের অস্থি, অঙ্গার ও ভস্ম দৃষ্ট হইল। মন্দিরের যে দ্বারটী ছিল, তাহার কবাটের বাজুর যেটুকু পাওয়া গেল তাহাও অঙ্গারময়। দ্বারটীর হাঁসকল ও ডুমুনি যে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইল। সুতরাং কুশীনগর হইতে বৌদ্ধদিগকে দূর করিবার সময় তাহাদের মন্দিরটী যে অগ্নিসাৎ করিতে হইয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই। কে যে এই পবিত্র মন্দিরে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। সে যেই হউক, হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণই হউক বা প্রতিমাদ্বেষী মহম্মদীয়ই হউক, কারলীল সাহেবের প্রযত্নে এতদিনের পর তাহাদের সমস্ত মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল। যে মন্দির ধ্বংসের জন্য তাহারা অগ্নিদেবের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই মন্দির আবার নবীকৃত হইল। যে প্রতিমা তাহারা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল। কারলীল সাহেবের যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায়কে শত শত ধন্যবাদ। এই কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে টাকা দিয়াছিলেন, সে টাকা ফুরাইয়া গেল, তথাপি সংস্কার কার্য্য তাঁহার মনোমত হইল না। তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার বেতন হইতে বারশত টাকা খরচ করিলেন। তাঁহার বেতন বোধ হয় চারিশত

টাকার অধিক নহে। তিনি এই কার্য্যের জন্য আপনার তিন মাসের বেতন ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। শুদ্ধ তাহাই নহে, তিনি পাছে কেহ মন্দিরের কোন ক্ষতি করে এই জন্য অনেকদিন ধরিয়া দুইটী লোক নিজ ব্যয়ে মন্দির রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল অধ্যবসায়শীল নিঃস্বার্থ লোক হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনরুদ্ধার কতকটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

কারলীল সাহেব এই যে অগাধ পরিশ্রম করিলেন, প্রাণপণে যত্ন করিলেন, সাত আট মাস ধরিয়া একাকী নিবিড় জঙ্গল মধ্যে বাস করিলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন, ইহার জন্য তিনি কি পুরস্কার পাইতে পারেন? বর্ত্তমানেও কিছুই দেখি না, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিবে, অনেকে তাঁহাকে আহাম্মক বলিবে এবং অনেকেই নানাবিধ কদর্য্য বিশেষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিবে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন লৌহবর্ত্ম, বাষ্পীয়পোত প্রভৃতির সহায়তায় চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া, কোরিয়া, সাইবেরিয়া, বর্ম্মা, সায়াম, সিংহল, তিব্বত, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি নানা দিক্‌দিগন্ত হইতে পরম সৌগতগণ ভগবানের ভবলীলার শেষ তীর্থ সন্দর্শন করিতে আসিবে, তখন তাহারা মন্দিরমধ্যে ভগবৎপ্রতিমা দর্শনের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কারলীল সাহেবকে পরম বোধিসত্ত্ববোধে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং তাঁহার নামাঙ্কিত শিলাশাসনকে পরমারাধ্য বস্তুবোধে নমস্কার করিবে।

বিভা
আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১২৯৪

[পাষাণের কথা] *

পুরাণ কথা কে বলে, বলিবার লোক নাই। বুড়া মানুষে না হয় ১০০।১৫০ বৎসরের কথা বলিল, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেখায় পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিসে লেখা হয়, সে ত আর বেশী দিন টিকে না। কাগজ ৮।৯ শত বৎসর টিকে, তালপাতা ১২।১৪ শত বৎসর টিকে, ভূর্জ্জপত্র ১৫।১৬ শত বৎসর টিকে, পেপিরস না হয় দুহাজার বৎসর টেঁকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে শুনিব। পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাও আবার সকল পাথরে হয় না। বেলে পাথর ৫০।৬০ বৎসরে ক্ষইয়া যায়। অনেক শক্ত পাথরে চটা উঠিয়া যায়। কেবল দুই প্রকার পাথরে আঁক চিরকাল থাকে। এক রকম পাথর আগুনের তাতে গলিয়া যায়, তাকে ধাতু কহে; আর এক রকম পাথর কিছুতেই গলে না, ক্ষয় হয় না, তাহাকে পাষাণ বলে। পুরাণ কথা শুনিতে গেলে এই পাষাণকে কথা কহাতে হয়, নহিলে পুরাণ কথা শুনিবার উপায় নাই।

অন্যদেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা সেখানকার পণ্ডিতেরা যে সকল পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বারবার নকল হইয়া আজ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক পুঁথি আসিয়া পঁহুছিয়াছে; তাহাতেও আছে সবই,—যাগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, কানুন আছে, চিকিৎসা আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যাকরণ আছে, কাব্য আছে, অলঙ্কার আছে, বিজ্ঞান আছে —আছে সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ কথা। পুরাণ কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভালবাসিতেন না; এ কথাটী কহিতে ঋষিদের মুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ, কবিদের

* খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'পাষাণের কথা' বাঙ্গালা ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থখানির একটী 'ভূমিকা' লিখিয়া দেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' এই 'ভূমিকা' সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রত্নবিদ্যার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছি, সেই আচার্য্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপক্রমণিকা না থাকিলে আমার উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্যর্থ হইত।" আমরা হরপ্রসাদ-লিখিত সেই ভূমিকাটী 'পাষাণের কথা' এই শিরোনামা দিয়া এখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক—।

মুখ বন্ধ, দর্শনের মুখ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জ্যোতিষের মুখ বন্ধ। সুতরাং আমাদের দেশে পুরাণ কথা যদি শুনিতে চাও তাহা হইলে পাথরকে কথা কহাও, নহিলে ভারতের পুরাণ কাহিনী বলিবার আর লোক নাই।

পাষাণ বড় শক্ত জিনিস, বাহিরও শক্ত ভিতরও শক্ত; কথা কহিতে গেলে শব্দ করিতে হয়। শব্দ ফাঁপা জিনিস ভিন্ন হয় না, অথচ পাষাণ নিরেট। ন্যায়-শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের গুণ; পাষাণের মধ্যে আকাশ থাকিতে পারে না, সুতরাং পাষাণকে কথা কহান বড় শক্ত ব্যাপার। আকাশ ত আকাশ! পাষাণের উপর বাটালিও চলা কঠিন। সে কালের রাজা রাজড়ারা বাটালি দিয়া কুঁদিয়া পাষাণে দুই চারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পাষাণ তারই প্রতিধ্বনি করে মাত্র। যখন হাজার হাজার বৎসর পরে বাটালির দাগ মিলাইয়া যাইবে, তখন প্রতিধ্বনি বন্ধ হইবে; ইতিমধ্যে পাষাণ তোমায় দু চারিটী কথা শুনাইতে পারিবে। আমাদের দেশময় অনেক অনেক জায়গায় পাষাণে এইরূপ বাটালি কাটা লেখা আছে। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশের পুরাণ ইতিহাস।

পাথরের কথা বুঝিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না, আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না। অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব পাষাণের ভাষার অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ করেন। তারপর কীটো, কনিংহাম, বিউলার প্রভৃতি বড় বড় সাহেবরা সে ভাষা বুঝিতে শিখেন। এখন এদেশের লোক অনেকে পাষাণের কথা কহিতে পারে, পাষাণের কথা বুঝিতে পারে ও লোকজনকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু পাষাণ অতি অল্প কথা কয়। একখানি শিলাপত্রে একটী মাত্র ঘটনার কথা থাকে। অনেক শিলাপত্র একত্র না করিলে ইতিহাস পাওয়া যায় না। শিলাপত্র ও আবার এক জায়গায় থাকে না। কোনখানি হিমালয়ে, কোনখানি বিন্ধ্যপর্ব্বতে, কোনখানি উরুবেলায়, কোনখানি আবার সুদূর নীলগিরিতে। এসকল সংগ্রহ করা বড় পরিশ্রমের কাজ। ইংরেজের নাকি বড রাজত্ব, প্রচুর ক্ষমতা এবং অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা; তাই তাঁহারা এই সমস্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন। যাহা আমাদের সাধ্যের অতীত, তাঁহারা তাহা সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক বিষয়েই আমরা ইংরেজের ঋণ শুধিতে পারিব না, এ বিষয়ে কিন্তু ইংরেজের নিকটে আমরা অনন্তকাল ঋণী থাকিব। এ ঋণ একেবারে শোধ হইবার নয়।

যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড়ই প্রভাব, তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করিত এবং তার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের একত্র মিলন বলিয়া মহা ভক্তিভরে তাহার পূজা করিত; সেই স্তূপের চরিদিকে বড় বড় পাথরের

রেল দিত। টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর দুই দুইটা থাম মিলাইবার জন্য তিনটী করিয়া সূচী। এমন করিয়া পালিস করিত যে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া পড়িত। প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক সূচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। ভারতবর্ষে এরূপ স্তূপ অনেক ছিল, দুই চারিটী এখনও আছে। এই স্তূপে অনেক পাষাণ আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া অনেক কথা কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথা শুনায়, আমাদের যে গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা আবার মনে করাইয়া দেয়।

বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল, কালের কুটীল গতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিংয়ের যে অংশটুকু আভাঙ্গা টাট্কা ছিল, কনিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন। এ স্তূপেরই একখানি পাথর কি কি পুরাণ কথা কহিতে পারে, আপনারা শুনুন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. এই সকল পাষাণের কথা অনেক পরিশ্রমে, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, এবং আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম *

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা যে বহু পূর্ব্বকালে এমন কি আর্য্যগণের পঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্ব্বেও সভ্য জাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অতি প্রাচীন কালে মানুষে হাতী পোষ মানাইয়াছে। রামায়ণে বল, মহাভারতে বল, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বল, জাতকে বল, জৈন অঙ্গ গ্রন্থে বল, সব জায়গায় পোষা হাতীর কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষমানানোটী বাঙ্গালা দেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত, এবং হাতীর সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতী পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছে।

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধোৎসব-সভায় শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।—সম্পাদক—।

ঋগ্বেদে বাঙ্গালা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে তিনটী জাতির নাম পাওয়া যায় [২।১।১]। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরেজীতে যাহাকে caste বলে তাহা নহে—কিন্তু Ethnic race। একটীর নাম বঙ্গ, একটীর নাম বগধ এবং আর একটীর নাম চের। দ্রাবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রাবিড় জাতির যে একটা খুব বড় অংশ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরে অনেক অর্দ্ধসভ্য জাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাসগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছিল; কিন্তু কতকাল পূর্ব্বে, সে কথা তাহারা বলিতে পারে না। কোন কোন Anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রাবিড় জাতি বাঙ্গালা দেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনও বাঙ্গালা দেশে আছে। রাঢ়ের বাগ্দীরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়, তাহা বাঙ্গালা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থপ্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তর বঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত্ত এই তিনটী জাতি ছিল। বেদের আর্য্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জ্জিলিং ও কাঠমণ্ডুর মধ্যে পর্ব্বতময় দেশে বাস করে। নেপালীরা তাহাদিগকে 'কিরান্তী' বলে। মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্র-গণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তর বঙ্গের একটী প্রধান নগর ছিল। কৈবর্ত্তরা উত্তর বঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তর বঙ্গে রাখেন এবং আর এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনও ঐ দুই স্থলে কৈবর্ত্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালায় যত জাতি (caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় এই সকল জাতি বাস করিত। ইহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল; কারণ, জৈনদিগের প্রায় সকল তীর্থঙ্করই বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ রাঢ়ে বহু দিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ বাঙ্গালীদিগের মত। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম দুইটী সাংখ্যদর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলের আশ্রম বাঙ্গালাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনও 'কপিলমুনি' বলিয়া একটী স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটী আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্যপণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন, একথা অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই; তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্যের কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি সাংখ্য ও কপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে, এবং যাহারা কপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অত নীচ। এমন কি ব্রাহ্মণদের সহিত কপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙ্গালীদের উপর আর্য্য ঋষিদিগের এবং তাঁহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়ই বেশী। তাঁহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন, শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙ্গালীকে বসিতে দিবে না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালা দেশ আর্য্যদের দেশ ছিল না। তবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজী হন না, তাঁহাদের উপকারার্থ এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৩৩ সালে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের অধিকার কালে রাজসাহী অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়। ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা। তবে কোন কোন পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০।১২ শত বৎসরের পূর্ব্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাঙ্গালায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে। আদিশূরের কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনও রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচজন

ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুঁথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গশাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসেন। একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট মীমাংসাসূত্রের শবরভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্ব্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাত শত ঘর অকর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচঘর কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাঙ্গালা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্ম্মও ছিল এবং সে ধর্ম্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে তখন এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্যধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়ীতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়ীতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, এক মাসের ভিতরে সে বাড়ীতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটী যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্ততঃ একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ এককোটী বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্ম্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন দেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা মূলস্থান, বাঙ্গালা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। তিনি নির্ব্বাণের

দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে।" * সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে শুধু যে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে—কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাঙ্গালা দেশে খুব বড় বড় দুইটী নগর ছিল—একটী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং আর একটী তাম্রলিপ্তি, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিলদিগের সহর। ভ্রাতা বীতশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোক রাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটী এখন দুই তিন মাইল ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েন সাঙের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে সকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করিত—কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল—পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাঙ্গালায় হেলে কৈবর্ত্ত ও জেলে কৈবর্ত্ত বলিয়া দুইটী জাতি হইয়াছিল। একদলে বৌদ্ধ দীক্ষা পাইত, আর এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি",

* সিংহলে পালি ভাষায় রচিত 'দীপবংস' ও 'মহাবংস' গ্রন্থ দুইখানিতে সিংহবাহুর পুত্র বিজয় কর্ত্তৃক লঙ্কা জয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই সিংহবাহুকে বঙ্গদেশের রাজার দৌহিত্র ও লাঠ দেশের রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের দিনে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমাগত দেববৃন্দের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব নাকি বলিয়াছিলেন: "লাঠ দেশের রাজা সীহবাহুর [সিংহবাহুর] পুত্র বিজয় সাত শত সঙ্গী সহ লাঠ দেশ হইতে লঙ্কায় আসিয়াছেন। হে দেবরাজ, লঙ্কায় আমার ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে; অতএব সঙ্গী সহ বিজয়কে ও লঙ্কা দ্বীপকে সাবধানে রক্ষা করুন।" (মহাবংস, ৭।৩-৪)। 'দীপবংসে' হুবহু ঐরূপ না হইলেও ঐ মর্মেরই উক্তি লিপিবদ্ধ আছে (৯।২১-২৩)। পালি গ্রন্থের এই লাঠ দেশ ও রাঢ় অভিন্ন মনে করিয়া বাঙ্গালা দেশের অনেকেই বিজয়সিংহকে বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। লাঠ দেশ এই মতানুসারে লাট বা সৌরাষ্ট্র, আমাদের রাঢ় নহে। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৭২-৭৩, পাদটীকা। জার্ম্মান পণ্ডিত W. Geiger ও বহু সিংহলী পণ্ডিতের মতে বিজয়সিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ অর্থাৎ ভারত হইতে সিংহলে আগত প্রথম আর্যভাষী ঔপনিবেশিকগণ পশ্চিম ভারতের গুজরাট অঞ্চলের লোক, পূর্ব্ব ভারতের রাঢ়ের বা বঙ্গের লোক নহেন।—সম্পাদক—।

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি", "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত, অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকরগুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনও ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইত। কেননা তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়ই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তবে এখনও তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্যজাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাৎ ছিল—ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত, কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা, অর্থাৎ অর্থটী যাহাতে প্রকাশ হয়, অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল "অস্মাকুনাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকরগুপ্ত একজন ভারী বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকরগুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ব্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে শুভাকরগুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন তৈলিক-পাদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কৈবর্ত্ত, সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোট ছোট রাজা ছিলেন, তাঁহারাও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোন ধর্ম্মই বাছিতেন না। রোগ

শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয় পরাজয়, এই সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, মহাভারতের পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণদের বাড়ী যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ ঐ সঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি", "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি", "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন * করাইতেন, স্তূপ নির্ম্মাণ করাইতেন, বিহার নির্ম্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া—তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনও দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় খুব ছিল। যাঁহারা বাঙ্গালা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়ই দার্শনিক মত কিনা—একেবারে সাংখ্যবাদ ভাঙ্গিয়া অদ্বয়বাদে উপস্থিত কিনা—তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—মহাযান মতে এই তিনটী জিনিস সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল—প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সঙ্ঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরাণী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার—তিনি হইলেন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশী বেশী হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কি হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল—অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্ত্তমান কল্পের ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা, ইঁহাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর—বর্ত্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্ত্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশী। কারণ, এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার যো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড় মুস্কিল হইল—কারণ, এখন হইতে,

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সঙ্ঘ-ভোজন, আর নিকটবর্ত্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সম্যক্ সম্ভোজন।

শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্ত্তিসমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্ত্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গী আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাদ্ধ মূর্ত্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাদ্ধ মূর্ত্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্ম্মে গোড়ায় যে কঠোরতা কাঠিন্য ছিল, এখন তাহা বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্ব্বাণের পথ পাইল—ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম্ম। সহজিয়া ধর্ম্মের অর্থ—ভগবান বুদ্ধ যখন সহজভাবে থাকেন, যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত অথচ শক্তির সন্তানসম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্ত্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্ম্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙ্গালী একেবারে অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্থানের খিলজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিয়া দিল—দেবমূর্ত্তি বিশেষতঃ যুগলাদ্ধ মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন, তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্ম্মের অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্ব্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস্ লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সংখ্যা তখন সব শুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখন তাঁহারা হঠিতেন, কখন বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহুসংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে

ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী ও ফকীর তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশী, সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল, আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্য্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগ্দী, কৈবর্ত্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরী দিতে হয়। তাহারা বাঙ্গালার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটী মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্দ্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরীর কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল; শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল; শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্ম্মরূপী এক ধর্ম্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্ম্মরূপ, ইহা আর কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্ম্মের যেমন চারিটী পা ও গলা, এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ধ্যানিবুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর একটী ধ্যানিবুদ্ধ থাকিতেন—এইরূপে স্তূপটী পঞ্চ ধ্যানি-বুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্ম্মরূপী ধর্ম্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটী করিয়া শক্তি ছিল, ধর্ম্মঠাকুরেরও তেমন একটী শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলী, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী—এই সকল ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্ম্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারো শত পাঁঠা পড়ে। ধর্ম্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোন না কোন রোগের ঔষধ দেন। বড়ালের ধর্ম্মঠাকুর 'ক্ষুদিরাম' রক্তামাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্ম্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচির নিকটে অচলরায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয়

জাতি। ধর্ম্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম), তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শূয়রের মাংস পাওয়া যায় কি না। লাউসেন বলিলেন, "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্ম্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাঙ্গালা দেশে ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ পরিণাম।

উদ্বোধন
আষাঢ়, ১৩২৪

ব্রাত্য *

ব্রাত্য শব্দ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের ছেলের ষোল বছরেও পৈতা না হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলিত। কিন্তু ১৯০১ সালে বাঙ্গালা দেশে যে সেন্সস হয়, সেই সেন্সসের কর্ত্তা রিজলি সাহেব এক পরওনা জারি করেন, বাঙ্গালার মধ্যে কোন্ জাতি বড় আর কোন্ জাতি ছোট তাহার একটা ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়া দাও। এই জন্য তিনি জেলায় জেলায় মীটিং করেন, আর কলিকাতায় একটা খুব বড় মীটিং হয়। তাহাতে সব জাতির দুই দুই জন করিয়া মাতব্বর নিযুক্ত হন। সে মীটিংএ আমারও ডাক ছিল, কিন্তু আমি যাই নাই, কেন না আমি জানিতাম ওরূপে জাতির ফর্দ্দ হইতে পারে না। কোন জাতিই আপনাকে ছোট বলিতে রাজী হইবে না, এবং যাহাদের হাতে জাতির কর্ত্তৃত্ব ছিল সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঐ সভায় স্থান পায় নাই। ফলতঃ হইলও তাহাই, মীটিংএ কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। রিজলি সাহেব উপরে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার জায়গায় আসিলেন গেট সাহেব। তিনি আসিয়াই স্থির করিলেন, আচার অনুসারে জাতির ফর্দ্দ হইবে। কে ছোট কে বড় সেকথা উঠিবে না। গেট

* বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ-সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ব্রাত্য কাহাকে বলে' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত অভিভাষণ প্রবন্ধাদি প্রায় সবগুলিই 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু 'ব্রাত্য কাহাকে বলে' প্রবন্ধটী 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধ পাঠের এক বৎসর পর 'প্রাচী' পত্রিকায় 'ব্রাত্য' নামে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাটী ইতিপূর্ব্বে কোথাও পঠিত হইয়াছিল কি না, লেখক বা পত্রিকা-সম্পাদক সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 'ব্রাত্য কাহাকে বলে' নামক প্রবন্ধটী এক বৎসর পর 'ব্রাত্য' নামে 'প্রাচী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব। শাস্ত্রী মহাশয় অন্যত্রও মুখ্যতঃ কিংবা প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন: (১) Annual Address (1920), Published

সাহেবের পরামর্শে, রিজলি সাহেব যে গোল তুলিয়াছিলেন যেন তাহা মিটিয়া গেল। কিন্তু দেশ ঠাণ্ডা হইল না। চারিদিক হইতে জাতি সম্বন্ধে বই বাহির হইতে লাগিল। জাতির বইএ দেশ ছাইয়া গেল। সকল জাতিই আপনাকে বড় করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কৃত বাঙ্গালা ইংরেজী বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রের নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। সকলের উদ্দেশ্য, আমরা বড় জাতি, ব্রাহ্মণেরা আমাদের নামাইয়া দিয়াছে। সেই সময়ে ব্রাত্য শব্দটা খুব চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ বলিলেন আমরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, কেহ বলিলেন আমরা ব্রাত্য বৈশ্য। অনেকে পৈতা লইলেন, অনেকে পৈতা লইতে উদ্যোগ করিলেন। একটা লাভ হইল, সকল জাতির লোকই সভা করিতে লাগিলেন এবং জাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ব্রাত্য শব্দের ঠিক অর্থ কি? ব্যুৎপত্তি কি? যাহা প্রচলিত অর্থ তাহা ব্যুৎপত্তি হইতে আসে কি না? আমার কাছে এইটাই একটা ভাবিবার চিন্তিবার ও অন্বেষণ করিবার বিষয় হইল। আমি শব্দকল্পদ্রুম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে পুরাণ, পুরাণ হইতে স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম সকলেরই মত সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী পতিত হইলে ব্রাত্য হয়। ব্রাহ্মণের যদি ষোল বছরে পৈতা না হয়, ক্ষত্রিয়ের যদি বাইশ বছরে পৈতা না হয়, বৈশ্যের যদি ঠিক সময়ে [চব্বিশ বছরে] পৈতা না হয়, তবে সে ব্রাত্য। যাহার দশবিধ সংস্কার হয় নাই, সে ব্রাত্য। যে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর, যে অভিধানেই দেখ, যে স্মৃতির পুঁথি খুল, ঐ এক মানে। একটা বড় ঘটনা মনে পড়িল। মারাঠা বলিয়া যে জাতি আছে তাহারা ত শূদ্র। শিবাজীও মারাঠা, তিনিও শূদ্র। কিন্তু তিনি যখন একটা বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হইলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল রাজা বলিয়া তাঁহার অভিষেক হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অভিষেক দিতে রাজী হন না, যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয় নন। ক্রমে ভোঁসলাদের একটা বংশলতা তৈয়ারী হইল যে তাঁহারা উদয়পুরের রাণাদের জ্ঞাতি। তাঁহারা দক্ষিণ দেশেতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সকল ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা ব্রাত্য হইয়া গিয়াছেন ও শূদ্র বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্বেশ্বর ভট্ট নামে একজন মহাপণ্ডিত কাশী হইতে সেতারায় উপস্থিত হইলেন। ইনি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, অনেক পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা কাশী

---

in the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series (1921) ; (২) Magadhan Literature, Pp. 1-21, 1923 ; (৩) Absorption of the Vratyas, Dacca University Bulletin, No. 6, 1926 ; (৪) 'মহাদেব', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮ ; (৫) শ্রীবিমলাচরণ লাহা-প্রণীত 'লিচ্ছবি জাতি' নামক পুস্তকের মুখবন্ধ হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত 'পূর্ব্বরঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ। এই রচনাটী 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র দ্বিতীয় সম্ভারে পুনর্মুদ্রিত হইবে।—সম্পাদক—।

বাস করিতেছেন। পুরুষানুক্রমে ইঁহারা বড় বড় পণ্ডিত। আকবর ইঁহাদের জগৎগুরু উপাধি দিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভট্ট শিবাজীকে ব্রাত্যস্তোম করাইয়া ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। ১৫ দিন ধরিয়া শিবাজী নানা কঠোর ব্রত করিলেন। তাহার পর তাঁহার অভিষেক হইল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের ছত্রপতি শিবাজী পড়ুন, সব দেখিতে পাইবেন। *

ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে, ব্রাত্য শব্দের অর্থ যে সাবিত্রীপতিত, ইহা শুধু বাঙ্গালায় নয়, সমস্ত ভারতের পণ্ডিতদিগের মত। স্মৃতির যে বই খুলিবে দেখিতে পাইবে, ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রীপতিত ['পতিতসাবিত্রীক']।† এসব ত একালের স্মৃতির কথা। সেকালের স্মৃতির কথাও ঐ।†† প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা শ্লোকবদ্ধ স্মৃতির মধ্যে সকলের অপেক্ষা প্রামাণিক। মনুসংহিতায়ও ব্রাত্যশব্দের অর্থ সাবিত্রীপতিত [২।৩৮-৩৯ ; ১০।২০]। তিনি আবার এই ব্রাত্যদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন ভাগ করিয়াছেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাত্য, কতকগুলি বৈশ্য ব্রাত্য [১০।২১-২২-২৩]। এইখানে বোধ হয় মনুসংহিতার কাল নির্ণয় করা একটু দরকার হইয়াছে। নোল্‌ড্‌কে নামক একজন জর্ম্মান পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, সংস্কৃত যে কোন পুস্তকে শক যবন পহ্লব এই তিন জাতির একত্রে উল্লেখ আছে সে পুস্তকখানি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টপর দ্বিতীয় শতকের মধ্যে লেখা হইয়াছে। কারণ, এই চারি শতকেই এই তিনটী জাতি খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং নানাদিকে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আলেক্সান্দারের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সেলুকস্ বাবিলনে রাজধানী করিয়া এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব্ব ২৪৮ সালে পারদ ও বাহ্লীকেরা বিদ্রোহী হইয়া দুইটী রাজ্য স্থাপন করে। পারদদিগকে ভারতবর্ষে পহ্লব বলিত। বাহ্লীকের গ্রীকেরা ভারতবর্ষে যবন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পারদেরা খ্রীঃ পূর্ব্ব ২৪৮ হইতে খ্রীঃ পর ২২৬ পর্য্যন্ত সমভাবে রাজত্ব করে।* যবনেরা ৮০।৯০ বৎসর পরে বাহ্লীক হইতে তাড়িত হইলে ভারতবর্ষে ও আফগানিস্থানে প্রবল হইতে থাকে। শকেরা যবনদিগকে তাড়াইয়া বাহ্লীক দখল করে। পরে পারস্য দেশের শকস্তান বা সিস্তান দখল করে। তাহার পর আসিয়া পশ্চিম ভারতে অনেক দিন রাজত্ব করে। তিন জাতি খ্রীষ্টীয় তিন শতকের মধ্যভাগে লোপপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং নোল্‌ড্‌কে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক নয়। বুলরও এই

---

* শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'শিবাজী' পুস্তকেও (অষ্টম অধ্যায়) এই বিষয়টী সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে।—সম্পাদক—।

† বিষ্ণুসংহিতা, ২৭/২৬-২৭ ; যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১/৩৭-৩৮ ; ব্যাসসংহিতা, ১/২০ ; শঙ্খসংহিতা, ২/৭-৮ ; ইত্যাদি।—সম্পাদক—।

†† বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র, ৩/১৩/৫-৬ ; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১/১৯/৫-৭ ; আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ১/১/১/২২-২৬ ; বাসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র, ১১/৭১-৭৫।—সম্পাদক—।

মতেই মত দিয়াছেন। মনুতে এই তিন জাতির একত্রে নাম আছে। সুতরাং মনু এই সময়ের মধ্যে পড়িতেছেন। কিন্তু আমরা বলি যে মনুসংহিতা যখন লেখা হয় তখন ব্রাহ্মণেরা দেশের রাজা ছিলেন, কারণ মনু অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, “সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ” [৮।৩৭]। ক্ষত্রিয় বা অন্য জাতি রাজা থাকিতে এ কথা বলা কাহারও সাধ্য হইত না। আর মৌর্য্য-বংশ ধ্বংস করিয়া যে সুঙ্গেরা ভারতবর্ষের একাধিপত্য করেন, তাঁহারা সুঙ্গ গোত্রের সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রাজত্বের প্রথম ভাগেই পতঞ্জলি মহাভাষ্য লেখেন। এই সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। সূত্রাকারে যে সমস্ত স্মৃতির গ্রন্থ ছিল, এই সময় হইতে সেগুলি শ্লোকবদ্ধ হইতে থাকে এবং মনুসংহিতাই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। সুতরাং মনু যখন ব্রাত্য শব্দের সাবিত্রীপতিত অর্থ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন এবং অন্যথা করিতে সাহস করেন নাই।

শুধু মনু যে একথা বলিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্বেও অনেকে একথা বলিয়া গিয়াছেন। বুলর সাহেব বোধায়নকে খ্রীঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতকের লোক বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি সূত্রাকারে লেখা। সে স্মৃতিতেও ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রীপতিত। তিনি আরও একটু কাজ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, সঙ্কর বর্ণসকলও ব্রাত্যেরই মধ্যে গণ্য [বৌ. ধ. সূ, ১।৯।১৫]। বুলর গোতমকে আরও প্রাচীন বলিয়াছেন। গোতমও ব্রাত্যের অর্থ করিয়াছেন সাবিত্রীপতিত [গৌ. ধ. সূ, ১।১৪]। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য আরম্ভ হইবার সময় হইতেই ব্রাত্য শব্দের এই অর্থ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ব্রত হইতে পতিত, এই অর্থে ব্রত শব্দের উত্তর কোনরূপ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহার সূত্র পাণিনি ব্যাকরণে নাই। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল তাহা ঘুচিল না। তখন আমায় নিরুপায় হইয়া বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশ করিতে হইল।

ঋগ্বেদে দেখিলাম ব্রাত্য শব্দ একেবারেই নাই। কিন্তু ব্রাত শব্দের অনেক বার ব্যবহার আছে।* ব্রাত শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড দল, যাহার সংখ্যা করা যায় না। মধুকর-ব্রাত শব্দ সংস্কৃতে অনেক জায়গায় ব্যবহার আছে। বাঙ্গালায় আমরা বলি মৌমাছির ঝাঁক। প্রকাণ্ড দলও বটে, সংখ্যাও করা যায় না। ঋগ্বেদে ব্রাত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটী শব্দের ব্যবহার আছে [৫।৫৩।১০-১১]। গণ অর্থাৎ ছোট দল—সংখ্যা

* ঋগ্বেদসংহিতায় ‘ব্রাত’ শব্দটীর আট বার ব্যবহার দৃষ্ট হয় : ১/১৬৩/৮ ; ৩/২৬/৬ ; ৫/৫৩/১১ ; ৬/৭৫/৯ , ৯/১৪/২ ; ১০/৩৪/৮,১২ ; ১০/৫৭/৫। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ‘ব্রাত’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘সঙ্ঘ’, ‘সমূহ’, ‘গণব্রাতয়োরূপো ভেদঃ’। শব্দকল্পদ্রুমে ‘ব্রাত’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে : ‘(বৃ+অতচ্ঃ ঘে)—সমূহ। ইত্যমরঃ। ব্যাধাদি। ইতি ব্রাত্যশব্দটীকায়াং ভরতঃ॥’—সম্পাদক—।

করা যায়, যেমন, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ ইত্যাদি। আর একটী শব্দ শর্দ্ধ *—অর্থ বড় দল। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল এক এক ঋষি বংশের লেখা। সুতরাং ঋগ্বেদের ঐ অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রাচীন অংশেরই এক স্থানে সূক্তকার ঋষি [ভরদ্বাজবংশীয় পায়ু] দেবতাদের কাছে [রথগোপগণ] এমন একখানি রথ প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে ব্রাতদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন [৬।৭৫।৯]। শব্দটী 'ব্রাতসহ'। † আরও দু'চার জায়গায় মনে হয় স্ত্রী পুরুষ ও ব্রাত্য শব্দ একত্র ব্যবহার হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ অর্থাৎ ঋষিদিগের নিজের দলের স্ত্রী ও পুরুষ, এবং ব্রাত, নিজের দলের বাহিরে। সুতরাং ব্রাত শব্দের অর্থ ঋষিমণ্ডলের বহির্ভূত লোক। ঋগ্বেদে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু নাই। যজুর্বেদে ব্রাত শব্দ নাই, কিন্তু ব্রাত্য শব্দ আছে। †† কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদে একটী অধ্যায় আছে যাহাতে কোন্ দেবতার কাছে কোন্ জীবকে বলি দিতে হইবে তাহারই ফর্দ্দ আছে। সে ফর্দ্দের মধ্যে ব্রাত্য আছে। ** ব্রাত্যকে বলি দিতে হইবে যে দেবতার কাছে তাঁহার নাম 'অতিক্রুষ্ট', অর্থাৎ যিনি খুব চেঁচান। ††† ব্রাত্যেরা চেঁচাইত, তাই তাঁহাদের বলি দিতে হইবে চীৎকারকারী দেবতার কাছে। ব্রাত শব্দ হইতে ব্রাত্য ব্যুৎপত্তি করিলে ব্যাকরণসিদ্ধ হয়। "ব্রাতে সমবেতা ব্রাত্যাঃ।" অতএব যজুর্বেদে ব্রাত্য শব্দের অর্থ হইল, একটা প্রকাণ্ড দলের লোক যাহারা চীৎকার ও গোলমাল করে। তাহারা ঋষিদিগের সমাজভুক্ত নয়, বরং তাহাদের বিরোধী। সাম-সংহিতার যোনি ঋক-সংহিতা, সুতরাং সাম-সংহিতায় আমরা ইতিহাসের খবর প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু সামবেদের ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের অনেক কথা আছে।

সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণের নাম প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ।

* সংস্কৃতের জ্ঞাতি ইংরেজী ভাষায় 'শর্দ্ধ' শব্দের প্রতিরূপ হইতেছে herd।—সম্পাদক—।

† মূলে আছে 'ব্রাতসাহাঃ,' পদপাঠে 'ব্রাতঽসহাঃ'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন 'সমূহানামভিভবিতারো ভবন্তীতি॥'—সম্পাদক—।

†† কিন্তু যজুর্বেদে 'ব্রাত' শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (১) শুক্লযজুর্বেদে (বাজসনেয়ি সংহিতা) একস্থলে আছে : '...নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ..' (১৬/২৫)। টীকাকার মহীধর 'ব্রাত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন : '...ব্রাতা নানাজাতীয়ানাং সঙ্ঘাস্তেভ্যো নমঃ'। (২) কৃষ্ণযজুর্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা) একস্থলে আছে : '...সর্বে ব্রাতা বরুণস্যাভূবন্নি মিত্র এবৈর্‌রাতিমতারীদসূষুদন্ত...॥' (১/৮/১০/২)। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এখানে 'ব্রাত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন : '..ব্রাতাঃ কর্ম্মযোগ্যা ..'।—সম্পাদক—।

** '...গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যং...'(বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩০/৮)। মহীধর এখানে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সাবিত্রীপতিতম্'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ঐ প্রসঙ্গেই আছে 'গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যম্' (৩/৪/৫)। সায়ণাচার্য্য সেখানে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'শাস্ত্রীয়সংস্কারহীনং পুরুষম্'।—সম্পাদক—।

††† মূলে কিন্তু আছে : 'অতিক্রুষ্টায় মাগধম্' (বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩০/৫ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩/৪/১)। মহীধর ও সায়ণ উভয়েই 'মাগধ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্য পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত' সন্তান।—সম্পাদক—।

এই ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যস্তোমের কথা আছে। ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা ব্রাত্যদিগকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া ঋষিসমাজভুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা যে কিছু খবর পাইয়াছি তাহার সংক্ষিপ্তসার দিতেছি :—

দেবতারা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা ব্রাত্যায় বাস করিত। (ব্রাত্যা শব্দের অর্থ, অল্পদিন যেখানে থাকা যায়, যেমন আমাদের বেদেদের টোল)। যেখান হইতে দেবতারা স্বর্গে গিয়াছেন, তাহারা সেইখানে আসিল। তাহারা দেবতার স্তোম বা সামবেদী স্তব জানিত না। তাহারা ছন্দঃ জানিত না। সুতরাং তাহারা দেবতাদের ডাকিতেও পারিল না, তাহাদের নিকট যাইতেও পারিল না। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে ১৬টী স্তোম শিখাইয়া দিলেন। তখন তাহারা আবার দেবতাদের সহিত মিলিত হইল। যাহারা ব্রাত্যায় বা টোলে বাস করে, তাহারা জঘন্য হইয়া যায়। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য জানে না, কৃষি জানে না, বাণিজ্য জানে না। [১৭।১]

প্রৌঢ়ব্রাহ্মণের এই সকল কথা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাত্যেরা একটা যাযাবরের দল। ঋষিরা যেখান থেকে আসিয়াছিলেন, তারাও সেইখান থেকে আসিয়াছিল। সেই দেবতাকেই উপাসনা করিত। কিন্তু উপাসনার পদ্ধতি জানিত না। তাহারা ঋষিদিগের সহিত শত্রুতা করিত। লুটপাট করিত। ইহার প্রমাণ এই যে, প্রৌঢ়ব্রাহ্মণে এক জায়গায় বলিতেছে যে উহারা 'গরগির' অর্থাৎ বিষের মত বাক্য ব্যবহার করে [১৭।১।৯]। গ্রামে ব্রাহ্মণদের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হইত, তাহারা সেই অন্ন কাড়িয়া খাইত। তাহারা ঋষিদিগের ভাষা উচ্চারণ করিতে পারিত না। যাহারা দণ্ডের উপযুক্ত নয় তাহাদেরও দণ্ড দিত। তাহারা দীক্ষা লইত না। কিন্তু দীক্ষিতের মত কথা কহিতে চেষ্টা করিত।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের এই সকল কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ব্রাত্যেরা যাযাবরের দল। কিন্তু তাহারা আর্য্যজাতি এবং ঋষি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী। যাহারা চার চাল বাঁধিয়া গ্রামে বা গোত্রে বাস করে, যাযাবরেরা যে ইহাদের বিরোধী হইবে ইহা ত একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। গ্রামবাসী ঋষিদের সঙ্গে ব্রাত্যদের আরও অনেক প্রভেদ আছে। ঋষিদের রথ ছিল, ব্রাত্যদের ছিল না। তাহাদের গাড়ী ছিল। ঋষিদের রথে তক্তা পেরেক দিয়া আঁটা থাকিত। ব্রাত্যদের গাড়ীতে তক্তা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিত। ঋষিদের ঘোড়া সায়েস্তা ছিল। ব্রাত্যরা ঘোড়া বা খচ্চর সায়েস্তা করিতে পারিত না। ঋষিরা লাগাম ব্যবহার করিতেন। উহারা পাঁচন বাড়ি ব্যবহার করিত। ঋষিদের ঘোড়া সোজা চলিয়া যাইত। উহাদের ঘোড়া বা খচ্চর কখন রাস্তার এধারে যাইত, কখন ওধারে যাইত। ঋষিরা সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, তাহারা রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। ঋষিদের পাগড়ী মাথার চারিদিকে গোল করিয়া বাঁধা থাকিত, উহারা তেরচা করিয়া মাথায় দিত। ঋষিদের ধুতি ও চাদর

ছিল, উহাদের একমাত্র ধুতি দুই গাছা দড়ি দিয়া কোমরে বাঁধা থাকিত। ঋষিদের কাপড়ের পাড় ছিল না, উহাদের কাপড়ের আড়ের দিকে কাল পাড় ছিল। ঋষিদের জুতা ছিল, উহার নাম 'উপানৎ'। উহাদের খড়ম ছিল, তাহার মাথায় উড়েদের জুতার চূড়ার মত এক রকম চূড়া থাকিত। ঋষিদের ধনুক ছিল, ছিলা ছিল, তীর ছিল। উহাদের শুধুই ধনুক ছিল, ছিলা ছিল না, তীর ছুঁড়িতে পারিত না।

ব্রাত্যস্তোম অন্যান্য যজ্ঞ হইতে এক বিষয়ে বড়ই পৃথক ছিল। অন্যান্য যজ্ঞে ঋত্বিক্‌রাই প্রধান। একমাত্র যজমান ও তাঁহার পত্নী যজ্ঞশালায় বসিতে পাইতেন, আর কেহ বসিতে পাইত না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে শত শত, সহস্র সহস্র যজমান আসিতে পারিত। উহাদের মধ্যে একজন মাত্র প্রধান হইতেন, তাঁহার নাম 'গৃহপতি'। তিনি সকলের চেয়ে বড়। তিনিই বেশী দক্ষিণা দিতেন। আর সকলে তাঁহার অনুসরণ করিত এবং অল্প দক্ষিণা দিয়া নিস্তার পাইত।

এইরূপে বৈদিক যুগের মাঝামাঝি অবস্থায় আর্য্য ঋষিরা দলকে দল আপনাদের সামিল করিয়া লইত। একবার যজ্ঞ করিলেই একদল ব্রাত্য আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোম অনেক হইত। অনেক ব্রাত্যের দল ঋষি হইয়া যাইত। তাহারা আসিয়া গ্রামে বাস করিত। কিন্তু ঋষিরা খুব সেয়েনা ছিলেন। যে ব্রাত্যদের তাঁহারা আপনাদের সামিল করিয়া লইতেন, তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোন চিহ্ন গ্রামে আনিতে দিতেন না। সেগুলি তাহারা হয় অন্যান্য ব্রাত্যদের ভাগ করিয়া দিয়া আসিত, অথবা মগধদেশীয় ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ মগধদেশে এক শ্রেণীর ইতর ব্রাহ্মণ ছিল তাহাদিগকে দান করিয়া আসিত।

কিন্তু যখন ব্রাত্যদিগকে ঋষিরা আপনাদের সামিল করিয়া লইতেন, তখন আর তাঁহাদের ভিতর কিছুই ইতর বিশেষ থাকিত না। তাঁহারাও শোধিত ব্রাত্যদের অন্ন গ্রহণ করিতেন, ব্রাত্যেরাও তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিত। তাহারা ঋক্, যজুঃ, সাম তিন বেদই পড়িত। তাহারা যজনও করিত। কেবল যে ইতর বিশেষ ছিল না, এমন নহে, তাহারা বড় বড় ঋষিও হইয়া যাইত। তাহারা বেদমন্ত্র প্রণয়ন বা দর্শন করিতে পারিত। দ্যুতান বলিয়া একজন ব্রাত্য ঋষি হইয়া কয়েকটী সামগান দর্শন করেন। ব্রাত্যস্তোমে সে গানগুলির খুব আদর। কৌষীতকি নামে এক ব্রাত্য অত্যন্ত বুড়া বয়সে স্তোম করিয়া শুদ্ধ হন। তিনি ঋগ্বেদের সমস্ত ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া কৌষীতকি ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

শুধু যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে এই সকল ব্রাত্যস্তোমের কথা আছে তাহা নয়, সামবেদের লাট্যায়নসূত্র [লা. শ্রৌ. সূ, ৮।৬] ও দ্রাহ্যায়ণ সূত্রেও ঐ সকল কথা আছে। শুক্লযজুর্বেদীয় কাত্যায়ন সূত্রেও ঐ সকল কথা আছে [কা. শ্রৌ. সূ, ২২।৪।১-২৮]। এই সকল পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে ব্রাত্যস্তোম

ছিল না। কেন না, দ্যুতান ঋষির গান লইয়া ব্রাত্যস্তোম। তিনি যখন শুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখনও ত ব্রাত্যস্তোম ছিল। নহিলে তাঁহার গান ব্রাত্যস্তোমে স্থান পাইল কি করিয়া? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধ একটা প্রচলিত ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞের ব্যাপার সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রাচীন ঋষিরা আর্য্যজাতির যাযাবর দলসমূহকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য এক সময়ে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সে সময় অনেক পূর্ব্বে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেটা বৈদিক যুগের মধ্যভাগে। তখন সূত্র লেখা আরম্ভ হয় নাই। ব্রাহ্মণগুলি সংগ্রহ হয় নাই। হয়ত অথর্ব্ববেদ তখনও লেখা নাই।* অন্ততঃ অথর্ব্ববেদকে তখন লোকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিত না। ব্রাত্যদিগকে এক করিয়া ঋষিরা সমাজ গঠন করিলেন। সে সমাজ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ঋষিরা তাঁদের আপনাদের প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। ইহাদের সুবিধার জন্য বোধ হয় বৈদিক ভাষা ক্রমে সংস্কৃতে পরিণত হইল। ঋষিদিগের অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়ম একটু একটু আলৃগা হইতে লাগিল। পুরাণ দেবতারা অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন, নূতন নূতন দেবতারা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন।

আমি পূর্ব্বে মহাদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেও ব্রাত্যদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।** আমার বিশ্বাস শিব রুদ্র নহেন; কেন না, রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি ছিল না। শিবের অষ্টমূর্ত্তি আছে, এবং শিবের একনাম 'একব্রাত্য'। সুতরাং ঋষিসমাজে শিবের আগমন ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। ঋষিরা ব্রাত্যদিগকে সম্পূর্ণরূপ আপনাদের সমান করিয়া লইয়াছিল। ব্রাত্যদের শিবকেও আপনাদের যজ্ঞের ভাগ দিতেও রাজি হইয়াছিল। কিন্তু এক বিষয়ে ঋষি ও ব্রাত্যের মধ্যে বেশ প্রভেদ ছিল। সেটী বিবাহ। ঋষিদের গোত্র ছিল, প্রবরও ছিল। ঋষিদের প্রবর প্রায় এক, দুই বা তিন। একটী প্রবরেও যদি বরকন্যার মিল হইত, বিবাহ হইত না। কিন্তু যাহাদের গোত্র ছিল না, কেবল প্রবরের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হইত, তাহাদের অধিকাংশ প্রবর না মিলিলে বিবাহ বন্ধ হইত না। ইহাদের প্রবরসংখ্যা তিন ও পাঁচ। তিন প্রবরের বরকন্যার যদি দুই প্রবর মিলিত, বিবাহ বন্ধ হইত। পঞ্চপ্রবরের বরকন্যার তিনটী প্রবর মিলিলে বিবাহ হইত না। এই যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ইহার অর্থ কি?

* অথর্ব্ববেদ সংহিতার পঞ্চদশ কাণ্ডে 'ব্রাত্যমহিমা' কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেখানে ব্রাত্যকে 'মহানুভাব', 'দেবপ্রিয়', 'দেবাধিদেব' পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।—সম্পাদক—।

** 'মহাদেব' এই শিরোনামায় শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র তৃতীয় সম্ভারে পুনর্মুদ্রিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অভিভাষণেও (১৯২০ খ্রীঃ অঃ) মহাদেব প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। (Annual Address, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, 1921)।—সম্পাদক—।

দশজন প্রজাপতি হইতে সৃষ্টি। মরীচি, অঙ্গীরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, নারদ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ। আমরা তর্পণের সময় ডান দিকে পৈতা রাখিয়া ইঁহাদের তর্পণ করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে পুলহ ও পুলস্ত্যের বংশ রাক্ষস ও পিশাচ। আর নারদের বংশ নাই। সুতরাং সপ্তর্ষি আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু ইঁহাদের বংশধরদের মধ্যে জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য এই আট জন ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক, অর্থাৎ ইঁহাদের বংশধরদের মধ্যে গোত্রকার ঋষিদের উৎপত্তি হইয়াছে। গোত্রের সংখ্যা কত বলিতে পারি না। একজন সূত্রকার বলিয়াছেন অনন্ত। 'গোত্রপ্রবরপ্রবন্ধকদম্বম্' নামে মহীশূর হইতে যে পুস্তক বাহির হইত, তাহাতে প্রায় ৪৫০০ গোত্রের নাম আছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই যে ৪৫০০ গোত্র ইহার মূল ঐ আটজন ঋষি। ইহাতে আরও একটী আশ্চর্য্যের কথা আছে যে, এই আট জন ঋষিই ঋগ্বেদের প্রধান ঋষি। এই আটজন ঋষি ও তাঁহাদের সন্তানসন্ততি ছাড়া আর যে আর্য্যজাতির লোক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাত্য। ব্রাত্যরা শোধিত হইলেও অনেকে গোত্র পান নাই। সুতরাং মনু যে বলিয়া গিয়াছেন—অসগোত্রপ্রবরা কন্যা, ইঁহাদের পক্ষে সেটী হওয়া কঠিন। কারণ, উঁহাদের গোত্র নাই। সুতরাং এক প্রবর মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া উঁহাদের বিবাহ করিতে হইত। কাজেই বহুদিন ধরিয়া কে প্রাচীন ঋষির বংশ কে নূতন ঋষির বংশ, ইহা জানিবার বেশ উপায় ছিল; এখন আছে কিনা জানি না, কেন না এখন অনেক অব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

একটা অব্যবস্থার কথা বলি। প্রবর শব্দের অর্থ কি? পণ্ডিত মহাশয়দের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা রঘুনন্দনের মত লইয়া বলিবেন—"গোত্রব্যাবর্ত্তক ঋষিবিশেষঃ"। অর্থাৎ আমিও কাশ্যপ, তুমিও কাশ্যপ। তোমায় আমায় এক বংশ কিনা জানিতে হইলে প্রবর উচ্চারণ করিলে, যদি একটীও প্রবর ভিন্ন হয়, জানিতে পারিব তোমার গোত্রকার কাশ্যপ আমার গোত্রকার কাশ্যপ ভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে। প্রবর উচ্চারণ না করিলে অগ্নি আমায় চিনিতে পারিবেন না। ঋষিরা অগ্নির বন্ধু ছিলেন। ঋষিদের নাম করিলে অগ্নি চিনিবেন যে আমি তাঁহার এক বন্ধুর বংশধর। তখন তিনি আমার যজ্ঞে আসিবেন এবং অন্যান্য দেবতাকে লইয়া আসিবেন। সুতরাং গোত্রব্যাবর্ত্তক ঋষিই যে প্রবর তাহা ত ঠিক নয়। প্রবরের উদ্দেশ্য অগ্নির সঙ্গে মিত্রতা।

প্রাচী

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ *

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পুরা মাত্রায় দেবতা হন, এ কথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটীকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইলেন। এই সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বড় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। ইহার কিয়দংশ 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় (মাঘ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। আমরা এখানে সমগ্র প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক—।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড় জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি; অনুপাধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি—"বন্দে শৈলসুতাসুতং," "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যে সব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা—দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য; তাঁহারা পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটী স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন—রোচনা, আর্য্যতারিকা [বজ্রধাত্বীশ্বরী ?], পাণ্ডরা, তারা, মামকী। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন—গণেশ [সমন্তভদ্র ?], রত্নপাণি, পদ্মপাণি, বিশ্বপাণি, মহাকাল [বজ্রপাণি ?]। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটী শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও; তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব; পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে

সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই : যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই মহাবস্তু অবদানে লেখা আছে, আগে বহু দিন পূর্ব্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই—জীব ছিলেন, তাঁহারা স্বয়ং-প্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্‌, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতিসুখে বিচরণ করিতেন। কিছু কাল পরে একটা হ্রদের মত দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মত একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত; সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,—"অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস: লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড় ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে ['বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ'] পাড়াগাঁয়ে যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ [অর্থশাস্ত্র, ২।১]। উহারা সেখানে গেলে লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সেজন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল; শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে ত?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী। অশোক রাজা একবার এক বৎসরের জন্য সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সঙ্ঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়া সঙ্ঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সঙ্ঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত—হিন্দুদের ত সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী; আমাদের সঙ্ঘে আসা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ হইত। মনে কর, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটী ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সঙ্ঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা

প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সঙ্ঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সঙ্ঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্ঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহারই উপর স্থাপিত। এই সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সঙ্ঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোন কারণে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সঙ্ঘাধিপ তাহার যাহা কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সঙ্ঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সঙ্ঘেরাই করিতেন। সুতরাং সঙ্ঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সঙ্ঘের গ্রাম অন্য সঙ্ঘকে দেওয়া হইত। সঙ্ঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সঙ্ঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি সঙ্ঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সঙ্ঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজশাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহা কতক কতক দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব হয় বলে, অপূর্ব্বের বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয়

বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষদ্‌গুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জলদর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস-লেখক জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে [দ্বাদশ সর্গ] স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উঁহাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর পরমার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থজ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি, অর্থাৎ কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্য্যবাদটীকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্যও সব জিনিসের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টী সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটীরই একটী করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষঃ, ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্‌পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে ষষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। ষষ্টিতন্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি অহির্বুধ্ন্য পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ ষষ্টিতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে।

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধসভায় যদি কাপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যে হেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দুরকম সাংখ্য আছে;—এক রকম হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা ত অত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক রকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক এক রকম "ফিসিকাল সাএন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরও বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দুজনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দুরকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটী প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপে বহুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত ছিল না। কারণ, আমরা উপমান বলি ও উপমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও উপমান শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে উপমান বলি এবং যাহার জন্য উপমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্য জ্ঞান।

গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচারপ্রণালী আর এক রকম। ১। বিষয়; ২। সন্দেহ; ৩। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ; ৪। তাহার পর উত্তর; ৫। তাহার পর নির্ণয় [সঙ্গতি]। এই পাঁচটার নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরেজী সিলজিসম (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচারপ্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড় বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টী মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুইজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটী মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই তিনটী প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জ্জুনের ও বর্ত্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটী প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটী প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও এক শত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বই নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় লজিকের মত হইয়া গেল perception and inference. অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্ব্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটী অবয়ব উড়াইয়া দিয়া পাঁচটী অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনও পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্‌নাগ কিন্তু আর দুইটী

তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটীতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টীতে হেতু নির্দ্দেশ ও তৃতীয়টীতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে ['ন্যায়প্রবেশ']। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি,—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥ [সৌন্দরনন্দ, ১৬।২৮-২৯]

কিন্তু তাঁহার পর এক শত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যরূপম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয়, অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে॥

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিত-সর্ব্বধর্ম্ম। আর এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মত। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত,

মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ—তিনি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চ্চাটা ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভাল নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক পৃথক। বৌদ্ধেরা আর এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরাণ। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রাকৃতের তর্জ্জমা মাত্র। এ সব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐ রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলা মাকান মরু খুঁড়িয়া যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভাল সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুসী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাঙ্ময় পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্ণে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন। তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্য্যে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয় অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে সে খাওয়াটা হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙ্গুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারটার পূর্ব্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরেজ বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই আছে Fast and worship—এদের দেশে কিন্তু Feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের 'ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ'—আহার করিয়া কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস

উপবাস শব্দের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হ'ল কেমন করে? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে [১।১।১।৭-১০] লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর একদল বলিলেন—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্প বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বলেন,—"ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ!" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসথ [<উপবসথ]। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু পোসহ করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ [ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়?] বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশী মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন—একজন নাভির উর্দ্ধটা কামাইত, আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁফ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে

ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সে কালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনী করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটী ভাল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটী ভাল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের টিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটুনী, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই সকল জাতিকে তাহারা কখনই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় ত তাহাকে কামাইবে না। হাড়ীদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সে জন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়া দিব অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য্য করিয়া দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদী, তোষক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্ধে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড

বড়মানুষী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশী সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরী-করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত কয়েক খেই কাপাশের সূতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চামড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গা'টা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কি দিয়া ছোপান হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বস্ত্র, কখনও বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙ্গা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় ত দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না। হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়; যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া

ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন,—"যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা॥ ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হুং হুং।"

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে জন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিস দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলীর মধ্যে উহাই সর্ব্বপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জ্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশী বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভাল দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত। আট আঙ্গুল দাঁতন তাঁহারা বড় ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙ্গুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ী ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিস জন্মিয়া মাড়ীকে আলগা করিয়া দেয়। সে জন্য মাজনটা সে কালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটী বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা

অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা । না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয়। অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। ততকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—"ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অন্নে পানে স্ফুঃ স্বাহা।"

কাপড় কাচা ও তেলমাখা

ধোপা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মাখিবার অনেক জিনিস ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্ম্মকর্ম্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসী-ভরা জল থাকিত ও একটা ছোট পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটী মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য্য শেষ হইলে দুইটী গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টী দ্বারা বাঁ হাতটী ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরটী গুলি সাজান থাকিত। সাতটী দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটী দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটীর দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। ততকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনা'য় বলিয়াছেন,—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যুষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামান্যেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গুঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্।
ততোহপি বহুভিশ্চৈব মৃদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাত্বন্যথা ভবেৎ॥"

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্য্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালনমন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন,—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটী ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্য্যটী করিব, সেটী মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোন সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, আয়ুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে

সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্য্যটী করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি। গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়—যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্য্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন শুঁয়ার ঠিক নীচে দুটী ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই শুঁয়াটী কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটী বাড়ীতে আনেন,—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোন কোন জিঁয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটী বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের শুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্ম্মেও এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্য্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ী মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটী সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুএকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটীকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ সকলগুলিই বিবাহটীকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ

সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্ম প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটী তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটী মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,—মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতের বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটী অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রী-সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি, —একটী ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মত নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে—এ সব কেতাবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই ত গেল নেপালী ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটীও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল ব্রহ্মাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিস লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব

না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটী শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রকৃচন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটী শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটী উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটী রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বল বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বল করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বলের নাম বোধিসত্ত্বসম্বল।

ততকরগুপ্ত রত্নত্রয়শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন,—"অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্ব্বসম্বলানাং বীজভূতম্। সম্বলাশ্চৈতানি (?) কতিসংখ্যাস্তে সম্বলা উচ্যন্তে বিভাষায়াম্। উপাসকাদি-পোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বলো দশমঃ তত্র উপাসক-উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসপ্তানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বলাঃ।"

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরও দুইটা সম্বল আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বল, আর একটা বজ্রব্রতসম্বল। বোধিসত্ত্বসম্বল বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বল অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উঁহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নি স্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লীটী ভাল করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লীতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লীটী পরিষ্কার করিলে আর জন্মে লোকটী ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কাল হয়। দাহকারীদের আর একটা প্রধান কর্ত্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দিঙ্‌মালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটীর 'শরীরনিধান' উঠাইয়া, তাহার চৌরাশী হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নেপালে এখনও অনেকগুলি স্তূপ অশোক স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন, —ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মত ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তূপের মত। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে—প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল,—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। ততকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়, বোধিসত্ত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা," এইটী তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ

করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মত। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়ই দোষ মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন থেকে তাহারা কাহারও এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিড়ীর উপর বসিয়া, উঁবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিড়ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে ঘটী বাঁ হাতে ধরিয়া আলুগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা'হলে সঙ্ঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সঙ্ঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন,—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিস নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে,—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি রহিল কি? আমাদের দেশে পালি পার্ব্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি—ভিখারী বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা

ইঁহাকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় ত এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় ত সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটী সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কি পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিস ত তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদ ও জিনিসে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচারব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

ততকরগুপ্ত বলিয়াছেন,—"গুরুর্ব্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সঙ্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতর্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েঽপি সূত্রেষু তন্ত্রেষপি জগৌ মুনিঃ॥"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩১

আমাদের ইতিহাস

আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইয়ুরোপীয়ানরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছিলেন, আমরা এখনও সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন। আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। প্রথম প্রথম তাহাই বলিয়াছেন,—"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল না; রাজ-রাজড়া থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজা থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বিশেষ কোন কাজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য।"

"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নানা ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানকার লোক অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর ছিল; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, মিথ্যা কথা তাহাদের স্বভাবের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে কিছু দিন চলার পর যখন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন,—"না, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস তাদের একেবারেই নাই। দুই চারখানি কাব্য আছে, ব্যাকরণ আছে, একটু আধটু দর্শনশাস্ত্রও আছে, আর বাকী সব অগ্রাহ্য—ইতিহাস একেবারেই নাই।"

এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবরা একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি স্তবকারী (পাথরের লেখা) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে পারিত না। সাহেবেরা পড়িলেন। শেষে স্থির হইল,

সেগুলি চন্দ্রগুপ্তের নাতির সময়ের। কিন্তু সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন—সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং প্রায় ষোল শত বৎসর একটা ফাঁক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পড়া একটা বিদ্যার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এ বিদ্যা জানিতেন; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন। ক্রমে এই সকল লেখ পড়িয়া ও সিক্কা পড়িয়া জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—স্বাধীন রাজারা লেখ দিতেন। তাঁহাদের প্রজারা লেখ দিবার সময় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রাজাদের সকলেই সিক্কা তৈয়ার করিতেন এবং সিক্কায় তাঁহাদের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রায় হাজার দুই হাজার রাজা এই ষোল শত বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝা গেল না; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।

দু চার দেশের দু চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়া গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা ঠিক হইল না। এত বড় যে সংস্কৃত সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাসবাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বেশ ঠাস গাঁথুনী হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন যে, ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুপ্তদের সময়েই হইয়াছিল—১৩।১৪ শত বৎসর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার ছিল না, সভ্যতার চিহ্ন বড় একটা ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চ্চা হইয়াছিল।

কিন্তু চর্চ্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়া পড়িল; সে ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, গুপ্ত রাজারা কোন রকমে ভাঙ্গাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে ইহাদের ইতিহাস টিতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব অন্ধকার। আলোর মধ্যে বেদ। সে বেদও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লেখা কিন্তু আমরা ধরিতে পরিতেছি না। সুতরাং ঋগ্বেদ যিশু খ্রীষ্টের

১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই যাইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১।১২ শত বৎসর যিশু খ্রীষ্টের আগে। *

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইয়া গিয়া যিশু খ্রীষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর আগে পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তার মধ্যে আবার বুদ্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু আঁট বাঁধিল। তার আগে সব ফস্‌কা।

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যটা ভাল করিয়া সব দিক থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দ্দশাটা হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়—প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে যাঁহারা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে হয় এবং তাঁহাদের কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্ব্বাপর ধারা দাঁড়ায়। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না। এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পুথির একখানি ভাল ক্যাটালগ আজও তৈয়ারী হয় নাই। আর ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। কিন্তু শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্মৃতি হইয়াছে। ঋষিদের যে স্মৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ঋষিদের স্মৃতির টীকা করিয়াছেন। তারপর মুসলমানরা যে সময় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ঋষিদের স্মৃতি ও টীকাকারদের টীকা চলিল না। ব্রাহ্মণেরা

---

* ইংরেজী ১৮৮২ সালে Max Muller কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্পর্কে কয়েকটী ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলি একত্রে India : What can it teach us? নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। এই পুস্তকের অন্তর্গত On the Renaissance of Sanskrit Literature নামক রচনাটীতে Max Muller 'খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হইতে অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্ত্তী' সময়কে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার এই মন্তব্যে প্রাচীনভারতবিদ্যাবিদ্‌গণের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Buhler খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কতিপয় অনুশাসনের ভাষার দৃষ্টান্তে Max Muller-এর অভিমতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ঐ ভাষার মধ্যে কাব্যরীতির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল এই অনুশাসন-ধৃত সাক্ষ্য যথেষ্ট বিবেচনা না করিলেও Max Muller উক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে (১৮৯২) ঐ বিতর্কমূলক রচনাটী পুনর্মুদ্রিত করেন না, এবং ভূমিকায় তাহার কারণ ব্যক্ত করেন। পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজীতে লিখিত একটী প্রবন্ধে Max Muller-এর ঐ অভিমত প্রচুর তথ্যপ্রমাণ সহযোগে খণ্ডন করেন (Refutation of Max Muller's theory of the Renaissance of Sanskrit Literature in the 5th. Century A.D.,.. Journal of the Asiatic Society of Bengal, July, 1910, PP.305-10)।—সম্পাদক—।

তখন প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এক একটা নিবন্ধ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন। নিবন্ধে আর একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। অনেক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকদ্দমা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুরা স্বাধীন হইয়াছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্মৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই। এই প্রমাণ ক্রমে খাটিয়া খুটিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

সুতরাং ভাল করিয়া স্মৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে। আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান—এই ভাবে পড়া, পূর্ব্বে না হইলেও পূর্ব্বে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা আবছায়া আবছায়া এই রকম ভাব ও জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে "হেমাদ্রি"র প্রকাণ্ড নিবন্ধটী সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে, হেমাদ্রির সময়ও জানা ছিল। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন,—দেবগিরির রামচন্দ্র রাজার অধীনে তিনি বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন। সেটা ১২৫০ খ্রীঃ হইতে ১৩০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি যে সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাহার পূর্ব্বে হইবে নিশ্চয়ই। কারণ, তিনিও ত একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্। তিনি আর পুথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া বোম্বাইর মাণ্ডলিক সাহেব, মনুর উপর মেধাতিথির যে টীকা আছে, সেটা ছাপাইয়াছেন। মেধাতিথি যে সকল বইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ করিতে করিতে গিয়াছেন।

বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র যিশু খ্রীষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়,—পাণিনি যে সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়,—মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত। পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে—যিশু খ্রীষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

গৌতমও তাঁহার আগেকার স্মৃতির বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে। তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে, গৌতমের আগেও স্মৃতি ছিল। স্মৃতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেদের অধীন। লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর ঋষিদের যে সকল কথা স্মরণ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তারপর স্মৃতি হইয়াছে—এই রকম করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস দিতেছি।

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতে যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মগধে পর পর ৫৯ জন রাজা হইয়াছিলেন। তার পর নন্দরাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। নন্দরাজারা যিশু খ্রীষ্টের ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পার্জিটার সাহেব এই ৫৯ জন রাজার নাম অনেক পুথিপাঁজি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজায় ১৫ শত বৎসর হইবে; ৪শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০০ হয়। কিন্তু পার্জিটার সাহেব একশ বৎসরে ৪ জন রাজা ধরেন নাই—১০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা যিশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১২ শত বৎসরে অথবা তাহারও পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে বলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যিশু খ্রীষ্টের ২৫ শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বলেন, কলির ৬ শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, আর কলি ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; সুতরাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

ঋষিদের তখন অসীম প্রভাব। তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাঁকজমকের বর্ণনা। যজ্ঞটা কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয়, তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়া পড়িল।

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্যা ছিল, একমাত্র কন্যা; তাহার বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধু-সৌবীরের রাজা। সিন্ধুদেশে সৌবীরবংশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে

দুঃশলার বিবাহ হইল। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের দুইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে [মোহেঞ্জোদড়ো]। তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।* ভারতবর্ষে এতদিন সুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া গিয়াছে পারস্য উপসাগরের ধারে। অনেকে বলেন, সুমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকে বলেন—না, এরা মিশরদের চেয়ে একটু নূতন। আমরা বলি, সুমেরদের যখন এত বড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে পাওয়া গিয়াছে, তখন সুমেররা ভারতবর্ষ হইতে পারস্য উপসাগরে যাইতে পারে, পারস্য উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর। সে ত যিশু খ্রীষ্টের ৩।৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, এই দুইটী জিনিস ছাড়িয়া দিলে আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে হস্তিনা নগর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্‌বংশ কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজত্ব করেন।† হস্তিনা—গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে

* খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মোহেঞ্জোদড়োতে খননকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বেই (১৯২০) দয়ারাম সাহনী মহাশয় পশ্চিম পঞ্জাবের মণ্টগোমরী জেলায় হরপ্পাতে খননকার্য্য শুরু করেন, এবং তাহার ফলে সেখানে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। রাখালদাসের পর Sir John Marshall, Hargreaves, কাশীনাথ দীক্ষিত, মাধবস্বরূপ বৎস প্রমুখ ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত মোহেঞ্জোদড়োতে ব্যাপক ভাবে খননকার্য্য চালাইয়া যান। ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা তিন খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত করেন ('Mohenjo-daro and the Indus Civilization by J. Marshall and others, 3 vols. London, 1931)। ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ সাল পয্যন্ত E. J. H. Mackay মোহেঞ্জোদড়োতে পুনরায় খননকার্য্য চালান, এবং ইহার বিবরণও দুই খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হয় (Excavations at Mohenjo-daro by E. J. H.Mackay, 2 vols. Delhi, 1937-38)। পরবর্ত্তী কালে R. E. Mortimer Wheeler মোহেঞ্জোদড়োতে পুনরায় খননকার্য্য চালাইয়া পুরাকীর্ত্তির মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি (১৯৫৩) The Indus Civilization নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে এবং Stuart Piggott-লিখিত Prehistoric India পুস্তকে (Pelican Series, 1950) ও V. Gordon Childe-এর New Light on the Most Ancient East গ্রন্থখানির নবম অধ্যায়ে (১৯৫৪ সংস্করণ) সিন্ধু সভ্যতার বর্ণনাত্মক বিবরণ এবং প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সহিত তাহার যোগাযোগ ও সাদৃশ্য বা পার্থক্য ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।—সম্পাদক—।

† পুরাণে এই ঘটনার উল্লেখ আছে : "...গঙ্গয়া তু হৃতে তস্মিন্নগরে নাগসাহ্বয়ে॥ ত্যক্ত্বা বিবক্ষুর্নগরং কৌশাম্ব্যাং তু নিবৎস্যতি॥"...(মৎস্যপুরাণ, ৫০/৭৮-৭৯, আনন্দাশ্রম সংস্করণ)। অন্যান্য পুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। দিল্লী হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, মীরাট জেলার অন্তর্গত মওয়ানা তহশীলে প্রাচীন হস্তিনাপুর নগরের ধ্বংসস্তূপ সম্প্রতি খননকার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বি. বি. লাল ইংরেজী ১৯৫০ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৫২ সালের মার্চ পর্য্যন্ত দুই দফায় হস্তিনাপুরে খননকার্য্য চালান। এই

১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনার ধারে। প্রায় এই সময় পরীক্ষিদ্‌বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান কালের ব্যাপার, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। যাঁহারা পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকৃষ্ণের সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিসীমকৃষ্ণের সময় হইতেই হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্ত্তমানেও হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কেমন করিয়া হয়? পুরাণের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাগুলি একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পারেন না। তাঁহারা এটাকে হয় নির্ব্বোধের কাজ, না হয় জুয়াচোরের কাজ বলিয়া মনে করেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসও অধিক। আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথা পার্জিটার সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য লোককেও স্বীকার করিতে বলিতেছেন।

অধিসীমকৃষ্ণের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন। বয়স তাঁহার এখন ৭৫।৭৬ হইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান হইয়া আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় মায়া; আমি সে সময় হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত। সুতরাং পুরাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, সেটা একটু মন দিয়া শোনা উচিত। তিনি যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্তু তিনি নিজের কোট ছাড়িলেন। তাঁহাকে ম্যাকডোনেল ও

দুই বারের খননকার্য্যের ফলে সেখানে বসবাসের পাঁচটী স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে দ্বিতীয় স্তরে হস্তিনাপুর নগর বহুলাংশে গঙ্গার প্রবল বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে নগর পরিত্যক্ত হয়। শ্রীযুক্ত লাল ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এই খননকার্য্যের ফলে পুরাণোক্ত একটী বিশেষ ঘটনার ঐতিহাসিকতার প্রমাণ মিলিতেছে, এবং তাঁহার অনুমান, গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবার ব্যাপারটী ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতকের শেষাশেষি। দ্রষ্টব্য Ancient India, Nos. 10 & 11, 1954 & 1955, PP. 5-151 (Excavations at Hastinapura...by B. B. Lal)।—সম্পাদক—।

কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারণ, ইঁহারাই এখন ইয়ুরোপের মধ্যে বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব খুব হুঁসিয়ার লোক। তিনি যে আপনার কোট ছাড়িয়াছেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান করা তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি এখানে ম্যাকডোনেল ও কীথের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। ম্যাকডোনেল ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর, না থাকে না কর; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে tradition, সেটা বিশ্বাসযোগ্য।

এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরামাত্রায় ঢালিয়া সাজিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু খ্রীষ্টের ৬ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে যিশু খ্রীষ্টের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি—ইঁহাদের সময় লইয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একজন দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেহ যিশু খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়া গিয়াছেন—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি ইঁহারা সকলেই পাটলীপুত্রে পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগর যিশু খ্রীষ্টের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য থাকে। সুতরাং পাণিনিকে ৫ শত বৎসরের পূর্ব্বে দিবার আর উপায় নাই।

এইরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে। এ জিনিসটাকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইংরেজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ১৮৲।১৯৲ টাকায় একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃতের কাজ সারেন। পণ্ডিত যাহা বলিয়া দেন, তাঁহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২

সংস্কৃত সাহিত্য

হরপ্রসাদের নিজের ধারণা ছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাতেই তাঁহার দান সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের একটী সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস কয়েক খণ্ডে রচনা করা তাঁহার অন্যতম কাম্য ছিল। সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি ভারতের নানা স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত পুথির অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন, এবং এই কার্য্যে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লব্ধ বা দৃষ্ট পুথির বর্ণনা ও বিচার অবলম্বন করিয়া তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান্ রিপোর্ট আছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর সহিত যতদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন ধরিয়া তিনি সোসাইটীর হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহের বিবরণী প্রস্তুতকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিবরণী (Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts) তাঁহার পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি বিস্তর নোট রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সোসাইটীর সংস্কৃত পুথির বিবরণী রচনায় ব্যাপৃত অন্যান্য পণ্ডিতেরাও অল্পবিস্তর ব্যবহার করিতেছেন। নেপালের সুবিখ্যাত দরবার লাইব্রেরীর কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তিকার বিবরণীও তিনি মুদ্রিত করিয়া যান (Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal, Parts I & II)। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন কেবল ঐতিহাসিকের শুষ্ক দৃষ্টি লইয়াই নহে, পরন্তু তাঁহার সাহিত্যরসিকেরও দৃষ্টি ছিল। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের নানা কথা লইয়া বাঙ্গালায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি সকলের পক্ষেই সুপাঠ্য। এই পর্য্যায়ে আমরা এই বিষয়ে হরপ্রসাদের কয়েকটী লক্ষণীয় প্রবন্ধ দিতেছি।—সম্পাদক—।

মেঘদূত *

কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণবাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই কাহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; রাজকৃষ্ণবাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতিবাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণবাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী; আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।

রাজকৃষ্ণবাবু কালিদাসের প্রত্যেক কবিতা ছয় ছত্রে অনুবাদ করিয়াছেন; এইরূপ ছয়ছত্ররূপ শিকল পরায় কোন কোন স্থলে অনুবাদ সমাপ্তির পর তাঁহাকে কিছু টানিয়া বুনিতে হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানে অল্পের মধ্যে অধিক ভাব প্রবিষ্ট করায় ভাষা একটু দুর্ব্বোধও হইয়াছে। উদাহরণ দ্বারা একথা সপ্রমাণ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় এ শিকল না পরিলেই ভাল হইত।

এই উপলক্ষে মেঘদূতের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে কোন একটা কথা পড়িলেই সেই কথা লইয়া আমোদ করিতে চায়। কালিদাস এই নূতন বেশে বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া

---

* The Meghaduta—Translated into Bengali Verse by Rajkrishna Mookerjee M.A. & B.L. Calcutta, Printed by Behary Lall Bannerjee at Messrs J. C. Chatterjea & Co.'s Press. 44, Amherst Street. Published by the Sanskrit Press Depository 148, Baranoshi Ghose's Street. Price 8 annas. [1882]

আমরা যদি তাঁহার মেঘদূতের বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি, বোধ হয় তাহাতে কেহ আমাদের দোষ ধরিবেন না।

কালিদাসের মেঘদূত ১১৫টী বই কবিতা নয়*; কিন্তু মহাকবি এই ১১৫টী কবিতায় যেন একটী নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে জগতের নিকট রুসোর Ideal World বোধ হয় পরাজিত হয়; যাঁহারা উপর উপর দেখেন তাঁহারা দেখিবেন যে, একজন যক্ষ স্বীয় প্রিয়ার অদর্শন দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে এবং মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে দৌত্যভারপ্রার্থনা জানাইতেছে; এবং তাহাকে কর্ত্তব্য উপদেশচ্ছলে যক্ষ-পত্নীর বিরহ অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন যে যদিও সম্মুখে মেঘ ও যক্ষ বই আর কিছুই নাই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দূরে, যতই প্রণিধানপূর্ব্বক দেখ, অতি পরিস্ফুটরূপে একটী নূতন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কবির কল্পনায় সমাজের, মনুষ্যের, সমাজনিয়মের, মনুষ্যের সুখের যত দূর উৎকর্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে

* আজ পর্য্যন্ত 'মেঘদূত'-এর প্রায় পঞ্চাশখানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন টীকায় শ্লোকের "পাঠবৈলক্ষণ্য" যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনই "শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য" দেখা যায়। সর্ব্বাধিক পরিচিত ও প্রচলিত মল্লিনাথের 'সঞ্জীবনী' নামক টীকায় ১২১টী শ্লোক ধৃত হইয়াছে। মল্লিনাথ এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও টীকায় স্থান দিয়াছেন। ইংরেজী ১৮৬৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নাগরী হরফে 'মেঘদূত'-এর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহাতে মোট ১১৫টী শ্লোক ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় লিখিত ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেন যে, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত 'মেঘদূত'-এর "সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ১২৭" হইলেও তাঁহার বিশ্বাস মতে "১১০টি শ্লোক কালিদাসপ্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টী" প্রক্ষিপ্ত। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদের ভূমিকায় লেখেন: "পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাদি-বিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অনুবাদপুস্তক লিখিত হইল। কেবল বি াসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দুইটী শ্লোক উত্তরমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম।" এই দুইটী শ্লোক হইতেছে: 'যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ.........' এবং 'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং... ...'। মল্লিনাথও 'শ্লোকদ্বয়ং প্রক্ষিপ্তম্' বলিয়াছে। মল্লিনাথ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দাক্ষিণাত্যবাসী দক্ষিণাবর্ত্তনাথ (খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) ও কাশ্মীরবাসী বল্লভদেব (খ্রীঃ দশম শতক) 'মেঘদূত'-এর দুই বিশিষ্ট টীকাকার। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর (খ্রীঃ ১৮৯১) অনেক পরে ইংরেজী ১৯১১ সালে বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত E. Hultzsch-এর সম্পাদনায় লণ্ডন হইতে মূল সহ বল্লভদেবের টীকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১১১টী শ্লোক ধৃত হইয়াছে। ১৯১৯ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় ত্রিবাঙ্কুর হইতে মূল সহ দক্ষিণাবর্ত্তনাথের টীকা প্রথম প্রকাশিত হয়। দক্ষিণাবর্ত্তনাথ ১১০টী শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। ইঁহাদের টীকা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে কেবল শ্লোকের পাঠ বিচার করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় "পৌনরুক্ত্য, দূরান্বয়, কষ্টকল্পনা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, অস্ফুটার্থতা, ব্যর্থ-বিশেষণতা প্রভৃতি দোষে আক্রান্ত" প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কালিদাসের কাব্যসাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তি ও শিল্পিজনোচিত সূক্ষ্ম রসবোধ না থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কৃতিত্বের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে।—সম্পাদক।

এই জগৎ সেই উৎকর্ষসমূহের সমষ্টি মাত্র। তাঁহারা দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুষারধবল কৈলাসের উপরে ভারতভূমি হইতে দুর্ভেদ্য প্রাচীরমালার দ্বারা পৃথক্‌কৃত করিয়া মহাকবি একটী মহানগরী সৃষ্টি করিয়াছেন। জলভরিত মেঘে অনবরত গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ বিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা হয় সে নগরের শোভাও সেইরূপ। উহার বরাঙ্গনাগণ বিদ্যুৎবরণী স্থিরসৌদামিনী তুল্য, উহার আলেখ্যসমূহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গের ধ্বনি মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়; উহাতে ছয় ঋতু নিরন্তর বিরাজমান; ছয় ঋতুরই ফুলকুল উহার বায়ুকে নিত্য আমোদিত করিতেছে; উহার পাদপসমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে; সকল সময়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকে, আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকল কালে মেখলাকারে বিচরণ করে; সকল সময়ে ময়ূরসমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তারকরতঃ জনগণের আনন্দ সমুৎপাদন করে। সর্ব্বরাত্রেই সুধাংশুদেব স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার সুধাধবলিত হর্ম্ম্যশ্রেণীকে শোভিত করেন।

তথায় আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন কারণে লোকের নয়নাশ্রু পতিত হয় না। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য প্রকার মনোবাদ কখন উপস্থিত হয় না; আর যৌবন ভিন্ন অন্য বয়স কখন দেখা যায় না; অর্থাৎ সে পুরীতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই, কলহ নাই, জরা নাই, মরণ নাই। *

---

* বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ অপরিহার্য্য সেখানে তাহার লেশমাত্র নাই; সেখানে দস্যু নাই, তস্কর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় নাই, শঙ্কা নাই, সেখানে সকলই সুখ; কেবল আনন্দ, কেবল উল্লাস, কেবল ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অন্ত নাই। যে এক মদনবাণের তাপ আছে তাহাও বিশেষ তীব্র হইবার যো নাই, কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, মদন ভয়ে বড় একটা অধিক জারী করিতে পারেন না।

অন্য কবি হইলে এরূপ সমাজের লোকে কি করিয়া দিন যাপন করে তাহার ইতিহাস দিতে পারিতেন না; কিন্তু কালিদাসের সৃষ্টির ক্ষমতার নিকট বুঝি বিধাতার সৃষ্টিক্ষমতা পরাভূত হয়। মানবচরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই; তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রীপুরুষ যুবক যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না, সকলেই এই অপূর্ব্ব সুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত। তথায় কন্যাকুল মন্দাকিনীর তীরস্থ বালুকাভূমির মধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অন্বেষণকরতঃ ক্রীড়া করে, শৈত্য-সৌগন্ধমান্দ্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ তাহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দেয় না। যদি কখন কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয়, নিকটেই কুসুমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই তলায় গিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, খেলা কখন ছাড়ে না; তথাকার অধিবাসিগণ নিরন্তর রূপে স্থিরসৌদামিনী সদৃশ রমণীগণের সমভিব্যাহারে বৈভ্রাজ নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়া কিন্নরদিগের গান শ্রবণ করে। সে গান আর কিছুই নহে, কেবল কুবেরের যশঃ গানমাত্র।

এই সুখময় পুরীতে যে সকল যক্ষ বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন মেঘদূতের নায়ক। তিনি যে অলকাপুরীর একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস একথা কোথাও বলেন নাই; আমাদেরও বোধ হয়, তিনি একজন সাধারণ কর্ম্মচারী মাত্র; কিন্তু তিনি শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুইটী নিধির অধীশ্বর; তাঁহার তোরণের পার্শ্বে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। শঙ্খ ও পদ্ম নিধি কি? নিধি শব্দে সঞ্চিত ধন বুঝায়; আমাদের দেশে লক্ষপতি কোটীপতি বড়ই গৌরবের কথা, কিন্তু এই সামান্য যক্ষ—লক্ষের উপর নিযুত, তাহার পর কোটী, তাহার পর অর্ব্বুদ, তাহার পর বৃন্দ, তাহার পর খর্ব্ব, তাহার পর নিখর্ব্ব, তাহার পর শঙ্খ ও তাহার পর পদ্ম এত ধনের অধিকারী। তাঁহার এক পত্নী, সেই তাঁহার প্রাণ,—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

"কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,

চকিত হরিণী তুল্য ললিতলোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনতকলেবরা,
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে,
বিধাতার আত্মসৃষ্টি যুবতী-সমাজে।"

যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়াই তাঁহার জীবন—তাঁহার প্রাণ—তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছিল; বাহ্য জগতের সত্তা তাঁহার নিকট বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছিল।

কুবের এই সুখভবনের অধিপতি। যক্ষকুল তাঁহার আজ্ঞাবহ; অন্যদেবগণ পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন, কুবেরের যান মনুষ্য; যাঁহার আজ্ঞায় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত সমাজ চলিতেছে, নিজপুরীমধ্যে তাঁহার কথা লঙ্ঘন করে এমন কেহই থাকিতে পারে না। আমাদের যক্ষ হয়ত দুই একবার আপন পত্নী সহবাস আর অলকার সুখভোগে মগ্ন হইয়া তাঁহার কথার অন্যথা করিয়াছিলেন। এই জন্য কুবের তাঁহাকে হয়ত দুই একবার সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবেন। একবার আশ্বিন মাসে তিনি উহাকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার এই কর্ম্ম সম্প্রতি তোমায় করিতে হইবে, দেখিও যেন ভুলিও না, আর যেন তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে না হয়।"

আজ্ঞা পাইয়া যক্ষ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুইটী মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুষ্পস্তবকভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল; বৃক্ষ দুইটী তাঁহার প্রিয় পত্নীর পোষ্যপুত্র, তাহাদের এই অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্গম দেখিয়া মহা আনন্দভরে প্রিয়াকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। প্রিয়া দীর্ঘিকাতীরে ভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তথায় গেলেন; দেখিলেন, মরকতশিলানির্ম্মিত সোপানাবলী পুষ্করিণীর গভীর জল পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে; বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত নালের উপর হেমপদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; হংসকুল তাহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; বর্ষাকালে মানস সরোবরে যে যাইতে হয় সে কথা তাহাদের মনেও নাই: দেখিলেন প্রিয়া তথায় নাই। নিকটেই ক্রীড়াশৈল ছিল; মনে করিলেন প্রিয়াকে তথায় পাইবেন; এই বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুষ্করিণীর তীর হইতে সে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; উহার শিখরসমূহ ইন্দ্রনীলমণিতে নির্ম্মিত; উহার তলদেশ কনক-কদলীতে বেষ্টিত; উহার একাংশে মাধবীলতাকুঞ্জের (হয়ত এই মাধবীলতা কুঞ্জেই কল্য রজনীতে বিহার করিয়াছিলেন) কুরুবকনির্ম্মিত বেড়ার পার্শ্বে একটী অশোক ও একটী বকুল বৃক্ষ; দুইটী বৃক্ষের ফুলে মদনের বাণ প্রস্তুত হয়; এই দুইটী বৃক্ষের মধ্যস্থলে একটী সোনার দাঁড় স্ফটিকের একখানি তক্তায় দুলিতেছে,

এবং তাহার তলদেশ অঙ্কুরাবস্থবংশের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট মণির দ্বারা বাঁধান। সেই দাঁড়ে একটী ময়ূর বসিয়া আছে। যক্ষ তথায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়া করতালী দিয়া তাহাকে নাচাইতেছেন; আর তাঁহার বালা রুণ রুণ করিয়া বাজিতেছে; শিখীটী সেই শব্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নাচিতেছে। প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন; তিনি সে দিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়ত সুরুচিসম্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশয়েরা বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের রুচিপরিবর্ত্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতারণাকরতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তরমেঘের ৫, ৭ এই দুইটী কবিতা প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করেন। †

পরদিন প্রভাত হইলে কুবের দেখিলেন, পুনরায় যক্ষ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, এবং প্রিয়ার প্রতি তাঁহার সর্ব্বান্তরিক অনুরাগই এরূপ অমান্য করার কারণ ইহা জানিতে পারিয়া কুবের এক বৎসরের জন্য যক্ষকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলায় যাহা দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহাই দেখাইলেন। দেখাইলেন, স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতেই হউক, সুখভবনেই হউক বা দুঃখভবনেই হউক—সমাজ যেখানেই হউক, উহার আজ্ঞা কঠোর, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য্য। যেমন শাস্তির আজ্ঞা হইল, অমনি সে যক্ষ অলকাপুরী হইতে রামগিরিতে আনীত হইল।

কুবের শাস্তি বিধান করিলেন; যক্ষকে অলকার কোন কারাগারে বদ্ধ করিলেন না কেন? তাহা হইলে ত যক্ষের জ্ঞানযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বোধ হয় অলকার ন্যায় সুখ-ভবনে কারাগার নাই, বোধ হয় দুঃখভোগ যাহার অদৃষ্টলিপি, অলকা তাহার বাসস্থান হইতে পারে না; তাই কুবের তাঁহাকে দুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিরহ ভিন্ন অন্য তাপ অলকাবাসীদের হইতে পারে না, এই জন্য কুবের সেই বিরহমাত্র শাস্তিরই বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ হইতে পারে না, কারণ মহাদেবের তথায় বাস, এইজন্য তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইল।

পাঠাইয়া দিলেন ত রামগিরিতে কেন? আণ্ডামানে দিলেই ত ঠিক হইত। কিন্তু না,—যক্ষের যাহাতে বিরহযন্ত্রণা অতি তীব্র হয়, সেই জন্য কালিদাস তাহাকে

† দ্রষ্টব্য "নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং……॥" এবং "যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গিতানাম্……॥"—সম্পাদক—।

রামগিরিতে আনাইলেন। কালিদাস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক ও দেবযোনিদিগের সুপরিচিত। রাম ও সীতা যেখানে পরস্পর সহবাসে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, যক্ষকে সেইখানে উপস্থিত করিলেন। সেখানকার প্রত্যেক তরু রামচন্দ্রের সুখের সাক্ষী; সেইখানে যক্ষ প্রিয়া-বিরহিত, স্বদেশ নির্ব্বাসিত। যক্ষরাজ রামায়ণের সেই সকল কথা স্মরণ করিতেন। রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়া যে সুখভোগে অযোধ্যার কথা কথঞ্চিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখও লেখেন নাই; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বনদেবতারাও তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বোধ হয় ভবভূতিও যক্ষের এই অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই উত্তররামচরিতে রামকে আবার পঞ্চবটীবনে আনিতে সাহস করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সীতার ছায়া দেখাইয়া ও বনদেবতাদিগের দয়ার পাত্র করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছেন। যক্ষও দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়া দেখিতেন এবং তাহাই দেখিয়া তিনি এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সে গিরির যেখানে যেখানে জল ছিল, অর্থাৎ নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, উৎস, প্রবাহ, নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, জনক-তনয়া সর্ব্বত্রই রামের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। যক্ষ সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে রাম ও সীতার ছায়া দেখিতেন। কালিদাস এই সকল কথা বলিবার জন্যই "জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু" অর্থাৎ "যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল" এই বিশেষণটী দিয়াছেন।

যক্ষ রামগিরিতে বসিয়া কি করিতেন? তিনি কখন কখন প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে লিখিয়া তাহার চরণস্থলে আপনাকে স্থাপন করিতেন। হরিণীর চঞ্চল নয়ন দেখিলে প্রিয়ার নয়ন তাঁহার মনে পড়িত, পূর্ণচন্দ্র দেখিলে প্রিয়ার মুখচ্ছবি তাঁহার প্রাণ আকুল করিত, ময়ূরের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশপাশভ্রমে তাহার বেশ বিন্যাস করিতে অগ্রসর হইতেন; ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে তাঁহার বোধ হইত, নৃত্যকালে তাঁহার প্রিয়ার ভ্রূযুগল কম্পিত হইতেছে। কিন্তু তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্পূর্ণ উপমা না পাইয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ভূমিতলে বসিয়া রোদন করিতেন। কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়ার সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময় জাগরিত হইয়া দেখিতেন, চারিদিকে টপ্ টপ্ করিয়া শিশিরবিন্দু পড়িতেছে। তখনই তাঁহার বোধ হইত বনদেবতারা আমার দুঃখ দেখিয়া কান্দিতেছেন, অমনি তিনি সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতেন। উত্তরদিক্ হইতে বায়ু বহিতে লাগিলে, তিনি সে বায়ু বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবিতেন যে ইহারা অবশ্যই আমার প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে অতি কষ্টে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই আট মাস কাটিয়া গেল। ভাবনায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গেল; তাঁহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়া পড়িল। এমন সময়ে সর্ব্বপ্রথম মেঘ দর্শন

দিল ; মেঘ দেখিলে প্রিয়সহবাসেও লোকের মন উৎকণ্ঠিত হয় ; বোধ হয় যেন কিছু হারাইয়াছি, বোধ হয় যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না। কিন্তু যাহারা প্রিয়-বিরহী, বল দেখি তাহাদের মন কত ব্যাকুল হয় ; তাহারা ভাবে যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না, তাহা না পাইলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন নাই। যাহার জন্য জীবন, যাহাতে সুখ, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এ নিঃসার অপদার্থ ভারভূত দেহে প্রয়োজন কি ? গরিব যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। মেঘ যে জড়পদার্থ, ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ কথা তাহার মনেও রহিল না ; মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে। আহা ! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে কি না, যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না ; যে দূরে আসিয়াছি, সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটী খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে এই ভাবিয়া কতকগুলি কুর্চ্চির ফুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য দিল, দিয়া বলিল "মেঘ ! তুমি বড় বংশে জন্মিয়াছ, তুমি সন্তপ্তদিগের দুঃখ বিমোচন কর, আমি অতি কাতর, তোমার শরণাগত, আমার দুঃখ দূর কর ; তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য, তোমার অগম্য স্থান নাই, আমার বিরহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের ন্যায় অতি কষ্টে বৃন্তে লাগিয়া আছে। কখন খসিয়া পড়িবে জানি না ; তুমি তাহাকে গিয়া আমার এই সংবাদটী দিবে। তাহা হইলে একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা হয় ; আমি আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম, তুমি ভায়ের কার্য্য কর ; মনে করিও না যে আমার প্রিয়ার—আহা !—কিছু হইয়াছে, তাহার এখনও আশা আছে আমি ফিরিয়া যাইব ; কিন্তু বোধ হয় সে ম্লানকুসুম আর বৃন্তে থাকে না ; তুমি যাও, গিয়া তাহাকে আমার সংবাদ দিয়া জীবিত কর"। এই কথা বলিতে বলিতে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, যক্ষের চক্ষে মেঘের যা কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হইল ; তিনি মেঘকে শুভক্ষণ সুযাত্রা দেখাইয়া দিলেন ; বলিলেন, "বলাকাকুল তোমার পথ দেখাইয়া যাইবে ; বলিলেন পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে ; তুমি দ্রুত যাও।" যাহাতে মেঘের পথে কষ্ট না হয় তাহার জন্য যক্ষ এই সময় যে সকল উপদেশ দিয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে, সে মেঘকে বাস্তবিকই মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছিল, এবং মেঘের জন্য বাস্তবিকই সহানুভূতি অনুভব করিয়াছিল।

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া দিবার ছলে কালিদাস যে সকল দেশ, নগর নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ লেখকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে সকল দেশ কোথায় ? এবং এখন খুঁজিয়া সে সকল পাওয়া যায় কি না প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার সন্ধান করুন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে হিন্দু কবিগণ জড়জগতকে দূর হইতে দেখিতেন ; তাঁহারা দেখিতেন জড়জগৎ নিম্নে, অন্তর্জগৎ উপরে। সংস্কৃত কবিরা জড়জগতের সহিত মিশিয়া জড়জগতের বর্ণনা

করিতে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা উপর হইতে জড়জগৎ দেখিতেন। কালিদাস বল, ভবভূতি বল, এই চক্ষেই জড়জগৎ দেখিয়াছেন, আর এই চক্ষে দেখিলেই জড়জগতে যথার্থ প্রকাণ্ডতা, যথার্থ সৌন্দর্য্য, যথার্থ মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। কালিদাস এই চক্ষে জড়জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া অদ্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

গতবারের বঙ্গদর্শনে মেঘদূতের সমালোচনায় আমরা কালিদাসের স্বভাববর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ছাড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড়জগৎ প্রাণিজগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাঁহারা এ কথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন, সেইখানে সেইখানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই সংস্কারের বশেই তাঁহারা, মানুষ জড়জগতের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া জড়জগতের শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহস করেন না। তাঁহারা দেখান, মানুষ উপরে, জড় জগৎ নীচে; মানুষ জড়জগৎ হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্টা সাক্ষী মাত্র। এরূপ বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশে, শকুন্তলায় সপ্তমে, ভবভূতির মহাবীরচরিতে শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। ভারবি অর্জ্জুনকে জড়জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে উর্দ্ধে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই। এখন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কবিগণ মনুষ্যকে এইরূপে জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘদূতের স্বভাববর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, নগরী কিরূপ দেখিবেন তাহাই লইয়া কবি ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম। তাঁহাদের এক কথা আছে "Bird's eye view", কিন্তু সে অতি সামান্য চিত্রমাত্র। একটী পর্ব্বতেরই না হয় 'Bird's eye view' তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের কবিরা চিরকালই সমস্ত জগতের Bird's eye view লইয়া থাকেন। তাঁহাদের নায়কেরা সমস্ত জগতের উপর চটিয়া মনুষ্য-সমাজে সুখ না পাইয়া জড়জগতের সহিত মিত্রতা করিতে আসেন না। যখন সুখে বা দুঃখে সমস্ত মন ডুবিয়া যায়, যখন কেবল মন একটী মাত্র বাসনায় মগ্ন হয়, সেই সময় আমাদের কবিরা হয় সুখের বৃদ্ধি বা দুঃখের সমতার জন্য জড়জগতকে আনয়ন করেন। Childe Harold যে চক্ষে জড়জগৎ দেখিয়াছেন, সে চক্ষে আমাদের

কবিরা জড়জগৎ দেখেন না। যে মনের অবস্থায়, যেরূপ হৃদয়ের উন্মত্ততায় **Skylark** কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায়ই আমাদের কবিরা জড়জগতের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক বাধাইয়া দেন। তাহাতে স্বভাবের শোভা দ্বিগুণিত হয়, মনুষ্যের অন্তরের শোভাও বর্দ্ধিত হয়।

কালিদাস এইরূপ উন্মত্ত অবস্থাতেই মেঘকে আনিয়া যক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। যক্ষের **Spirit** মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সমস্ত স্বভাবে তাহার গাঢ় সহানুভূতি হইল; সম্মুখে দেখিতে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু যক্ষও সেই পথে যাইতেছেন। মেঘ যেন যক্ষের আত্মা। সে যেন পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছে; যাইবার সময় মেঘদূতখানি মনে মনে লিখিয়া যাইতেছে। সে যেন দেখিতেছে, দূরে নর্ম্মদা উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রিয়া কত দূরে। রেবা দেখা যায়, কিন্তু যক্ষপ্রিয়া লোচনের অদৃশ্য। এইরূপে ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া কালিদাস মেঘকে অলকায় লইয়া গেলেন। অলকা সুখপুরী; সে পুরীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সেই পুরীর মধ্যে যক্ষের বাড়ী; আর সেই বাড়ীর মধ্যে সেই "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা" রমণী। সে কি অবস্থায় আছে? যক্ষ বলিতেছেন, "মেঘ, তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় আমার মঙ্গলের জন্য পূজা করিতেছে, না হয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছি মনে মনে ভাবিয়া আঁকিতেছে; অথবা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'সারিকে তুই তো তাঁহার বড় প্রিয় ছিলি, তাঁর কথা কি তোর মনে হয়?' না হয় মলিন বসনের উপর ক্রোড়ে বীণা ধরিয়া আমার কথার গান বাঁধিয়া গাইতেছে, আর নয়নজলে বীণার তার ভিজিয়া উঠিতেছে; আর অন্যমনে সুর ভুলিয়া যাইতেছে; অথবা ফুল দিয়া বিরহের আর কয় মাস আছে তাহাই গণিতেছে। আহা! সে যখন রুগ্নশরীরে সেই দুগ্ধ-ফেন-ধবল শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া থাকিবে, তোমার বোধ হইবে যেন পূর্ব্ব আকাশে এককলা মাত্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।"

এইখানে যক্ষরাজ তাঁহার প্রিয়াকে যে নিজ বিরহের সংবাদ দিয়াছেন, তত কোমল, তত মধুর, তত গভীর ভাব, বোধ হয় আর কখন কোন কবির হাত দিয়া বাহির হয় নাই। উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন, "We have few specimens either in classical or in modern poetry of a more genuine tenderness or delicate feeling."* ইহা পাশ্চাত্য কবির কল্পনার অতীত। যক্ষের সংবাদ এইরূপে

* Horace Hayman Wilson মূল সংস্কৃত হইতে 'মেঘদূত' কাব্য ইংরেজীতে পদ্যে অনুবাদ করেন। ইহাই ইউরোপীয় ভাষায় 'মেঘদূত'-এর প্রথম অনুবাদ। (The/Megha Duta ; /or,/Cloud Messenger :/ A Poem,/In the Sanscrit Language. / By Calidasa./Translated into English Verse,/with notes and illustrations./by Horace Hayman Wilson, / Assistant Surgeon in the service of

আরম্ভ হইতেছে, যক্ষ বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, তখন যদি সে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহাকে জাগাইও না; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিও, নিদ্রা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন দেখিবে, তাহার সে সুখের ব্যাঘাত করিও না। তাহার পর জাগিয়া উঠিলে তাহাকে এই মাত্র বলিও যে, 'আমি তোমার স্বামীর মিত্র মেঘ; তাঁহার সংবাদ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিরহী প্রবাসীদিগের মন আমি প্রিয়ার জন্য উৎসুক করি, ও ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সন্নিধানে প্রেরণ করি।' এই কথা বলিলেই সীতা যেমন এক মনে হনুমানের কথা শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ সে তোমার কথা শুনিবে। তাহার পর বলিবে, 'সে মরে নাই; সে তোমার কুশলসংবাদের জন্য লালায়িত হইয়াছে; তাহার অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে; সে কেবল মনে মনে তোমার ক্ষীণ অঙ্গ কল্পনা করিতেছে, আর মনে মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। সাদৃশ্য দেখিলে মনের তৃপ্তি হয়। সে শ্যামামৃগে তোমার শরীরের সাদৃশ্য দেখে; চকিত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের সাদৃশ্য দেখে। কিন্তু হায়! তোমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কিছুতেই নাই। প্রতিকৃতি দেখিলে মনের কষ্ট নিবারণ হয়। সে ধাতুরাগে তোমার ছবি পাথরে আঁকিয়া যেমন তাহার পদতলে পড়িতে যায়, অমনি নয়নের জলে তাহার দৃষ্টি লোপ হয়। তাহার পর স্বপ্নে যদি কখন তোমার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে তোমায় আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বপ্নে হস্ত প্রসারণ করে, আর তাই দেখিয়া বনদেবীগণের নয়ন দিয়া জলধারা নির্গত হয়। এইরূপে তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।' মেঘ! তুমি তাহাকে বলিও যেন এই কয় মাস কোন রূপে কাতর না হয়; তাহাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিও, আশা এখনও যায় নাই, একবার মিলন হইলে মনের সুখে অলকার সুখ সম্ভোগ করিব।"

এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ দিতে বলিয়া যক্ষের মনে হইল, মেঘকে যে দূত করিয়া পাঠাইব, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে পাঠাইলাম, প্রিয়া তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তখন যক্ষ কি বলিলেন? অঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন, না আর কোন চিহ্ন পাঠাইলেন? তাহা নহে। কালিদাস বুঝিয়াছিলেন মেঘদূতে এরূপ অভিজ্ঞান চলিবে না। রামায়ণে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু এ প্রেমোচ্ছ্বাসে অঙ্গুরীতে হইবে না। তিনি বলিলেন,

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।

the Honourable East India Company, and Secretary/to the Asiatic Society./Published under the Sanction/of the/College of Fort William./Calcutta:/Printed by P. Pereira, at the Hindoostanee Press./1813.)। এই সংস্করণে ধৃত শ্লোকসংখ্যা ১১৬। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক—।

সাস্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি॥
"বলেছেন তব কান্ত একথা আবার :—
পূর্ব্বে একদিন তুমি ছিলে ঘুমাইয়া
মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চীৎকার
করিয়া কি জন্য কাঁদি উঠিলে জাগিয়া,
হাসি জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্বপনে
দেখেছি বিহার তব, ধূর্ত্ত, অন্যসনে।"

অর্থাৎ, আমার এই দুঃখের আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে তুমি একদিন আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলে, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলে। আমি কেন কাঁদিলে বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় বলিলে, "শঠ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি তুমি আর এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছ।" কি গাঢ় প্রণয়!! কি প্রগাঢ় বিশ্বাস!! আবার ইহাই যক্ষ অভিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া দিলেন। এত সুন্দর ও এত কোমলতার আকর যে মেঘদূত তাহাতেও আর দ্বিতীয় নাই—এই জায়গায় বুঝি কালিদাস বাল্মীকির উপর উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরী অভিজ্ঞানে আর এ অভিজ্ঞানে যত প্রভেদ, বোধ হয় বাল্মীকি আর কালিদাসেও সেই প্রভেদ।

যেমন মধুর গ্রন্থ, মধুর ভাব, সমস্ত মধুময়, উপসংহারে মেঘের প্রতি যক্ষের আশীর্ব্বাদও তেমনি মধুময়। যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন,

মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥

"আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন বিদ্যুতের সহিত তোমার এমন বিরহ না হয়।" বিরহসন্তপ্তের মুখে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ হইতে পারে?

আমরা এতক্ষণ যে রূপে মেঘদূতের সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে উহার গল্পমাত্র সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের সমালোচনা মেঘদূতের সমালোচনা নহে। নাটক, নভেল ও মহাকাব্যের সমালোচনায় গল্পের সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক। মেঘদূতে সমালোচনায় উহার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি মেঘদূতের গল্প, ঘটনা, রচনা-প্রণালী কত সুন্দর তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এতক্ষণ লিখিতেছিলাম।

মেঘদূত গীতিকাব্য। যে অর্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিকাব্য সে অর্থে মেঘদূত গীতিকাব্য নহে। গীতগোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহা গীত হইতে পারে সত্য, এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ গীত হইলে সহৃদয়গণের হৃদয় উন্মত্ত করিতে পারে, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাতে

গান নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না। না বলুন, আমরা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। কাব্যের বাহ্য আকারের প্রতি আমাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই।

যে স্থলে কোন একটী ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া, হৃদয়কে অধিকার করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া, আপ্লুত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক কাব্যের নাম গীতিকাব্য। যে গানময় কাব্যে এই ভাবের প্রকাশ নাই, আমরা তাহাকে গীতিকাব্য বলি না। যদি গদ্যেও এই প্রকার গভীর ভাব প্রকাশ থাকে, তাহাকেও আমরা গীতিকাব্য বলিতে সঙ্কুচিত হই না।

অন্যে যাহাই বলুক, মেঘদূত আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। যক্ষের বিরহ, প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র হইয়াছিল। রামগিরিতে আসিয়া রাম ও সীতার মিলন-সুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পর্ব্বত ও প্রস্রবণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর হইতেছিল। কিন্তু এত দিন তাহা মনেই ছিল, আজি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে যক্ষের হৃদয় সে তীব্র যন্ত্রণায় ভাবপ্রবাহ আর ধারণ করিতে পারিল না। সে ভাব-প্রবাহ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল।—গরিব যক্ষ পাগল হইল। মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আপনার দুঃখকাহিনী বলিয়া নিজের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিল এবং পরিশেষে সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার দূতপদে বরণ করিল। যক্ষের সেই প্রবল স্থায়ী বিরহভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত হইয়া, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ পল্লবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার সমালোচনা মেঘদূতের প্রকৃত সমালোচনা।

কালিদাস প্রথম চারিটী কবিতায় যক্ষের পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, বিরহে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, কনকবলয় খুলিয়া পড়িতেছে, সে মেঘ দেখিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ মেঘের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া উন্মনা হইয়া রহিল। আপনার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা মনে মনে তুলনা করিয়া কান্দিতে লাগিল। প্রথম শ্লোকেই বলিল, আমার প্রিয়া দূরে, তাই আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিল, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ, তাই তুমি আমার সংবাদ লইয়া আমার প্রিয়াকে দেও। এরূপ গভীর প্রণয় স্থলে যেরূপ ঘটা স্বাভাবিক, যক্ষেরও তাহাই ঘটিয়াছে। যক্ষ আপনার প্রিয়ার জন্য যত কাতর, নিজের জন্য তত নহে। সেই প্রিয়ার সন্তাপ নিবারণের জন্য মেঘকে দূত করিতে চায়। সমস্ত মেঘদূতে বরাবর প্রিয়ার জন্য এই কাতরতা পরিদৃষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিরহিণীদিগের জন্যও তাহার কাতরতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজ বাক্যে তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছে, "মেঘ! তুমি আকাশে উঠিলে পথিকদিগের বনিতাগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবে।" আর এক স্থানে মেঘকে বলিতেছে, "যখন সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে অভিসারিকাগণ কান্তভবনে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে স্থিরসৌদামিনী বিস্তার

করতঃ পথ দেখাইয়া দিও।” “সূর্য্যদেব যখন সমস্ত রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া বিরহিণী নলিনীর নয়নাশ্রু নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে উদিত হইবেন, তখন যেন তুমি তাহার কর রোধ করিও না।” “যখন বিরহশীর্ণা কোন নদী তোমাকে দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তখন প্রচুর জলদানে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া যাইও।” “যখন মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে পর্ব্বতে আরোহণ করিবেন, তখন তুমি সেই পর্ব্বতে মিশিয়া তাঁহাদের কোমল সোপান হইও।” এই রূপে যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণয়সুখে তাহার সুখ এবং পরের দুঃখে তাহার গাঢ় দুঃখ প্রতিপদে প্রকাশ হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের, মনুষ্যের এবং মনুষ্যহৃদয়ের সৌন্দর্য্যে তাহার প্রগাঢ় সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া মেঘদূত কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাবসৌন্দর্য্যে। রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই সুদূরবিস্তীর্ণ পথে যেখানে যে বস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষ-মুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বতপাদমূলে নিরন্তর প্রবাহিনী নদী, সুপক্ক ভক্ষ্যফল ও প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত কাননমালা, কাননাবৃত পর্ব্বতের অভ্রভেদী উচ্চতা, উজ্জয়িনী নগরে রমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী, মহাকাল মন্দিরের সায়ংকালীন আরতি, ষড়াননমন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরদিগের উন্মন নৃত্যলীলা, ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ ক্ষত্রিয়যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিদ্বারসমীপে হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, তদনন্তর তুষারধবল কৈলাস পর্ব্বত, তন্মধ্যে নগর-শিরোমণি-ভূত কুবের-রাজধানী অলকা, অলকায় কুবেরের অত্যাশ্চর্য্য সমাজশাসন-প্রণালী, যক্ষদিগের স্বর্গসুখ প্রভৃতি স্বভাবে, শিল্পে, পুরাণে, যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা দেখিলে হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কালিদাস সে সমস্তই দেখাইলেন। ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া রমণী-সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য্য স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর; উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে অনুপম রূপবতীর রূপ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, কবি দেখাইলেন সেই রমণী-কুলললামভূতা যক্ষপত্নী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, অনবরত অশ্রুপ্রবাহে তাহার নয়ন স্ফীত হইয়াছে। সেই মুখের উপরে তৈলশূন্য রুক্ষ অলকাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ মেঘান্তরালে চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কবি তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সেই পরমরূপবতী পরমগুণবতী পতিপ্রাণা রমণীর চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূতভৌতিক পরিহার করিয়া চিত্তচৈত্তিক জগতে অবগাহন করিলেন। পরমপবিত্র প্রণয়ীর বিরহে পতিপ্রাণা প্রণয়িনীর হৃদয়ের ভাবগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। তিনি দেখাইলেন, যক্ষপত্নী যখন স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পূজা

করিতেছেন, সারিকার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সখি তুমি ত তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?" কখন বা তাঁহার প্রাণনাথ বিরহে কিরূপ কৃশ হইয়াছেন, মনে মনে তাহাই ধ্যান করিয়া চিত্রপটে তাহাই চিত্রিত করিতেছেন। কখন বা স্বামীর নাম দিয়া বিরহ-গান রচনাকরতঃ বীণাযোগে তাহা গান করিতে যাইতেছেন। প্রতিবারই নয়নজলে বীণাতন্ত্রী ভিজিয়া যাইতেছে। আর তিনি গানের তানলয় ভুলিয়া যাইতেছেন। কখন বা দ্বারদেশে রক্ষিত পুষ্পগুলি গণিয়া দেখিতেছেন, বিরহের আর কতদিন বাকী আছে। এই কোমলতার প্রতিকৃতি সমস্ত দিন বরং নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু রাত্রে একাকিনী সেই সুখভবনে, সেই সুখশয়নে তাঁহার আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না, ক্রমাগত পূর্ব্বকথা মনে পড়ে, ক্রমেই হৃদয়ের সন্তাপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন যক্ষপত্নী কোমলা, তাঁহার প্রণয়ী যক্ষও তেমন কোমলহৃদয়। তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, "ভাই রে! যদি সে তখন ঘুমাইয়া থাকে, তাহাকে জাগাস্ না, যদি কোনরূপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নে আমাকে পাইবে। তাহাকে জাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্ না।"

যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্ম্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই—"তুমি কেমন আছ?"

"তুমি কেমন আছ?" এ কথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটীতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সে-ই জানে 'তুমি ভাল আছ?' এই কথার মর্ম্ম কত গভীর। যক্ষ কত বার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই; কত বার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম "বৃন্তচ্যুত" হইয়াছে। তাই সে আজি "তুমি কেমন আছ?" জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

যক্ষের মনে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে কোনরূপ অবিশ্বাস নাই, বরং সম্পূর্ণ গাঢ়তর বিশ্বাস আছে। তাই সে বলিয়াছে—

বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥

কিন্তু এ অবিশ্বাসের কথা লইয়া মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। এই অকৃত্রিম বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় কথাটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে কথাটীর মর্ম্ম এই—"এই দারুণ সময়ে তোমারও অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, আমারও তাই। তোমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছে, আমারও সেরূপ

হইয়াছে। তোমার যেরূপ দারুণ মনস্তাপ, আমারও তেমনি। যদিও বিধাতা আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি আমরা যেন সহানুভূতিবলে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।" যক্ষপত্নী যে বিরহে কষ্ট পাইতেছে, তাহার শরীর যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে যেন সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।

দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই—"তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও। আমি ত নানা উপায়ে আমার চিত্ত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছি, কোথাও তোমার অঙ্গশোভা দেখিতেছি, কোথাও তোমার নয়নমাধুরী দেখিতেছি, কিন্তু আমার সাধ মিটিতেছে না।"

"আমি কখন কখন উত্তর দিক্ হইতে যে বায়ু আসিতেছে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, 'এই বায়ু অবশ্যই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে'। পরক্ষণেই আবার আপনার মূর্খতার কথা ভাবিয়া একান্ত অসহায়, অশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি! কিন্তু, প্রিয়ে! তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিও।"

দৌত্যের চতুর্থ কথা—আশা। যে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হৃদয়-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইত, সেই আশা। সে আশা আর কিছু নয়, আর চারি মাস বিরহের অবশিষ্ট আছে; এই চারি মাসের শেষে শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে আবার তোমার সহিত মিলিব, আর মনের সাধে এক বৎসর মনে মনে যত সাধ পূরিয়া রাখিয়াছি মিটাইব। কে বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয়? আমি ত দেখিতেছি বিরহে ভোগ হয় না, মনের নানা সাধ জমিয়া জমিয়া রাশীকৃত হইয়া থাকে। এই আশ্বাসই দৌত্যের শেষ কথা।

আমরা এই যে নদ নদী, পর্ব্বত কন্দর, বন উপবন, নগর নগরী প্রভৃতি সঙ্কুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভূত কৈলাস পর্ব্বত শিখরোপরিস্থিতা অলকাপুরী, তন্মধ্যে যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধ্যে কোমলতার প্রতিকৃতি যক্ষের পত্নী, বিরহে তাহার ম্রিয়মাণ অবস্থা, এই যে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সন্দর্শন করিলাম, এই যে পৃথিবী হইতে স্বর্গ, স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম, ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া মানস রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া লইলাম, এ সমস্তই এক সুরে বাঁধা। যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই মাখান। সমস্তটুকু যেন যক্ষ গাইতেছে আর আমরা শুনিতেছি, শুনিতেছি আর তন্ময় হইয়া যাইতেছি। আমাদেরও যেন প্রাণ ফাটিয়া ঐ দুঃখলহরী বাহির হইতেছে। তাই আমরা প্রথমে বলিয়াছিলাম যে, মেঘদূত গীতে রচিত না হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, ভুবনে অতুল।

বঙ্গদর্শন
অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন, ১২৮৯

রঘুবংশ

আমরা অদ্য কালিদাসের রঘুবংশ সমালোচনা করিব। অনেকে মনে করেন, রঘুবংশই কালিদাসের কাব্যসমূহের মধ্যে অপকৃষ্ট। কেহ বলেন উহা কাব্যই নহে। কেহ বলেন, উহা পুরাণ; কেহ বলেন, উহা ইতিহাস। একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি; প্রথম দিলীপসুদক্ষিণা, তাহার পর রঘুদিগ্বিজয়, তাহার পর অজেন্দুমতী, তাহার পর দশরথের মৃগয়া, তৎপরে রামায়ণ, তৎপরে কুশোপাখ্যান, তাহার পর অতিথির রাজনীতি ও সর্ব্বশেষে অগ্নিবর্ণের দুশ্চরিত্র—এই কয়েকখানি কাব্য কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন, শেষ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ জুড়িয়া একখানি কাব্য আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ কোন মতেই মত দিতে পারি না। আমাদের মতে রঘুবংশ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, ইহা কাব্যসংগ্রহ নহে, একখানি কাব্য। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহার উদ্দেশ্য আছে, একতা আছে, উপদেশ আছে, এবং গভীর অর্থ আছে। রঘুবংশের দৈর্ঘ্যই উহার নিন্দার কারণ। এই সুদীর্ঘ কাব্য অনেকে পড়িয়া উঠিতে পারেন না। দুই চারি সর্গ পড়িয়াই শেষ করেন, ও একটা যা হয় সমালোচনা করিয়া বসেন। কালিদাসের রঘুবংশ যত অধিক দূর পড়িবে, ততই উহার সার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ সর্গ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার এরূপ দীর্ঘকাব্য যত অধিক পড়িবে ততই উহার নির্ম্মাণকৌশল অবগত হইতে পারিবে। ফলতঃ যখন প্রথম পড়িবে, তখন সব ছাড়া ছাড়া লাগিবে। দ্বিতীয় বারে কতক বোধ হইবে উহার একতা আছে। তৃতীয় বারে একতা ও গূঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। রঘুবংশ সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত আছে বলিয়াই কালিদাসের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা রঘুবংশের সমালোচনা অধিক প্রয়োজনীয়।

আমাদের বিশ্বাস রঘুবংশই কালিদাসের শেষ লেখা, আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কথাটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। এই কথাটী বুঝিতে পারিলেই রঘুবংশের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ রঘুবংশের রচনায় গাম্ভীর্য্য ও বৃদ্ধজনোচিত অলঙ্কারসাহিত্য দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারসম্ভবে অলঙ্কার ও ভাব (Sentiment) রাশি রাশি পরিলক্ষিত

হয়। রঘুবংশের সর্ব্বত্র কবিকল্পনার ধীরতা ও কুমারে প্রাখর্য্য দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, যখন বয়স অল্প থাকে, তখনই কল্পনার দৌড় অধিক হয়, বর্ণনার কড়াকড়ি অধিক হয়, ভাষার নানারূপতা হয়। তখন বহুদর্শিতা অল্প, হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টা অধিক হয়, অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াস অতিরিক্ত হয়। লোকের মনে উন্নত ভাব উদয় করিবার চেষ্টা, উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা, ও অদ্ভুত নূতন পদার্থ গঠনের চেষ্টায়ই কবি ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকেন। কুমারসম্ভবে এই সকলগুলিই লক্ষিত হয়। কল্পনার দৌড় হিমালয় বর্ণনা [১।১-১৭]। হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনায়ও কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন [১।৩১-৪৮]। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, নিজের কল্পনায় সন্তুষ্ট না হইয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন,

> সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
> যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
> সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ
> একস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥ [১।৪৯]

ইহার অর্থ এই যে, হায় আমি আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বয়স হইলে কল্পনার এত তীব্রতা দেখা যায় না। যুবক কবির অতৃপ্ততা কুমারের প্রতি পত্রে অঙ্কিত। বর্ণনার বাড়াবাড়িও অল্প বয়সের গুণ। অজবিলাপ ও রতিবিলাপ তুলনা কর।* রতিবিলাপের বিষয় অল্প, ভাব অধিক; বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। কবি একবার রতিকে নিরস্ত করাইলেন, আবার বসন্তকে আনাইয়া খানিক কাঁদাইলেন! পার্ব্বতীর বিবাহবর্ণনা দেখ [৭।৭৩-৮৫]। রঘুবংশ ও কুমারে অনেকগুলি শ্লোকই এক; কিন্তু কুমারে বিবাহবর্ণনা অনেক অধিক। রঘুতে কয়েকটী মাত্র শ্লোক [৭।২০-২৮], কিন্তু যেমন রঘুবংশের বিবাহটা বড় জাঁকাল ব্যাপার, কুমারের বিবাহটা যেন তেমন নয়। কুমারের বিবাহটা বেশী বড় বলিয়া যেন একটু বিরস বিরস। কুমারের ভাষাও নানা স্থলে নানারূপ। অনেক জায়গায় যেন শক্ত শক্ত। অনুষ্টুপ ছন্দের সর্গগুলিতে যেন কিছুই নাই। শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইব চেষ্টাটাও যেন অধিক। কিন্তু রঘুতে সেরূপ নহে, ভাষা প্রায়ই সর্ব্বত্র সমান সরল। তাহার উপর আবার বিষয়মাহাত্ম্যে কখন উঠিতেছে, কখন পড়িতেছে। কুমারে যেখানে সোজা সেখানে খুব সোজা, যেখানে কঠিন সেখানে অভিধান নহিলে চলে না। একেবারে হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টাটাও কুমারে অধিক। একটা উদাহরণ দিব। কুমারের হিমালয়বর্ণনায় "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" [১।১] এই কথার ভাবে আর রঘুতে সমুদ্রবর্ণনায় "বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা" [১৩।৫] এই কথার ভাবে একবার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, কুমারের একটা অভূতপূর্ব্ব

* দ্রষ্টব্য: রঘুবংশ, ৮।৪৩-৬৯; কুমারসম্ভব, ৪।৫-২৪, ২৭-৩৮।—সম্পাদক—।

পদার্থের উৎপ্রেক্ষা করিয়া ধাঁধা দিবার চেষ্টা, আর রঘুতে ধীরভাবে উপমাদ্বারা স্বরূপ বর্ণনা। অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াসও অল্প বয়সের প্রয়াস। কুমারসম্ভবময় অলৌকিক বর্ণনা, মহাদেব কল্পনাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ, পার্ব্বতী স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণী; তাহার পর ইন্দ্র অলৌকিক, মদন অলৌকিক, রতি অলৌকিক, সবই অলৌকিক। যখন বহুদর্শিতা অল্প, অথচ কল্পনা মহীয়সী, অলৌকিক বর্ণনাটা সেই সময়েরই বর্ণনা। রঘুতে অলৌকিকের এত বাড়াবাড়ি নাই, লোকে যাহা দেখে, লোকে যাহা শুনে, লোকে যাহা শিখে, তাহার উৎকৃষ্ট বস্তুই লইয়া রঘুবংশ। উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদানের চেষ্টা বাল্যবয়সের কবিদের এক রোগ। সেটা প্রথম পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অলৌকিক প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের সৃষ্টি হইয়াছিল। পার্ব্বতী সমস্ত ত্যাগ করিয়া পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু সমস্ত আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া নিজের জীবন তৃণতুল্য তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর পদার্থ অনুশীলনে রত। তিনি প্রথমে পার্ব্বতীকে লক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য করিলেন না, তাহার পর তাঁহার প্রথম প্রণয়োদয় সময়েই প্রণয়ে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু জঘন্য তৎসমুদয়ের মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ মদন ভস্ম হইয়া গেল—কালিদাস দেখাইলেন যে প্রণয়ে মদন ভস্ম হয় সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, তাহা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমহাদেব এই সার মর্ম্ম বুঝিয়া তত্ত্বচিন্তা ত্যাগকরতঃ পার্ব্বতীর সেই অতুল প্রেমে মগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় লোকের এত দূর দৌড় থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কালের লেখা। রঘুবংশের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক সময়ের লেখা। ইহার সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জীবে সহানুভূতি জাজ্জ্বল্যমান। যে কয়েকটী রাজার বর্ণনা করা হইয়াছে, সকলেই অতি উদারচিত্ত। একজন লোককে সর্ব্বগুণময় করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে, হয় অত্যুক্তি হয়, না হয়, একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়। কালিদাস একথা বুঝিয়া মনুষ্যশরীরে যত গুণ থাকা আবশ্যক রঘুবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সেই সমুদয় যথাযথরূপে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মবল, ক্ষত্রবল ও দৈববল এই তিনে রঘুবংশের উৎপত্তি। বশিষ্ঠের মতে সুরভি কন্যার আরাধনায় মহারাজাধিরাজ দিলীপের রঘু নামে সন্তান হইল, নন্দিনীর বরে তিনি বংশপ্রবর্ত্তক হইলেন; কারণ রাজা বর চাহিলেন "বংশস্য কর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে" [২।৬৪]। তিনি বাল্যকালে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার দশবিধ সংস্কারকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি কিশোর অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃকৃত অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করাইলেন। রাজভার প্রাপ্ত হইয়াই সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিলেন। ভূমণ্ডল জয় করিয়া সমস্ত ধন বিতরণকরতঃ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে মৃণ্ময়পাত্র যখন সম্বল, তখন এক ব্রাহ্মণ চৌদ্দ

কোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিল, রাজা কুবেরের নিকট অর্থ আনিতে যাইতেছেন, কুবের স্বয়ং আনিয়া টাকা তাঁহার রাজকোষে রাখিয়া দিল। কালিদাস বলিলেন, এইরূপ লোকই বংশপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন। ইনি দয়াবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীর। কালিদাস ইঁহার হৃদয়ের ভাব সকল দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইঁহার পুত্রবাৎসল্য, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রমণীপ্রণয় কালিদাস বর্ণনা করেন নাই। কালিদাস রঘুর পুত্র অজের জন্য সেগুলি সমস্ত তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। অজ সকল বিষয়েই ঠিক পিতার ন্যায় "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ" [৮।১২]। অজ একেশ্বর সমবেত রাজন্যবর্গের পরাজয় সাধন করিলেন। সুতরাং তিনি বীর। তিনি সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যে রূপবান্। তাই ইন্দুমতী মালা দিলেন। তিনি অতি মায়াবী। পিতা যখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে চাহিলেন, অজ সেটী সহ্য করিতে পারিলেন না। "...শিরসা বেষ্টনশোভিনা সুতঃ পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ" [৮।১২]। পিতাকে কাছে রাখিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। রঘুর বংশ লইয়া রঘুবংশ, তাই রঘুকে কালিদাস পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শেষও রঘু অতি প্রাচীন বয়সে যোগসমাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগদুঃখ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে রাজা অজ উদ্যান বিহারে গমন করিলেন; তথায় তাঁহার এত সাধের প্রণয়িনী ইন্দুমতী প্রাণপরিহার করিলেন। অজের কোমল হৃদয় আর সহিতে পারিল না। তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে পত্নীবিয়োগসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ কতক কতক বুঝিতে পারেন। আজিও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পত্নীবিয়োগের ভয়ে অজবিলাপ পাঠ করেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় সেই দুঃখেই মিলাইয়া যাইত। কিন্তু পুত্র নাবালক, এখন আত্মহত্যা অন্যায়; অতএব পুত্রের সাবালকতা পর্য্যন্ত আট বৎসর জীবন ধারণ করিয়া মহারাজ অজ— মূর্ত্তিমান্ প্রণয় তীর্থজলে শরীর ঢালিয়া দিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা দশরথ। কালিদাস দশরথের বনবিহার মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন দশরথ বড় মৃগয়াপ্রিয়; উন্মত্ত হইয়া অনবধানক্রমে একজন ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রাণ নাশ করেন। এই পবিত্র বংশে প্রথম দোষ প্রবেশ করিল। রাজ্য সুশাসিত; সমস্ত স্বচ্ছন্দ; রাজা দশরথ আর কাজ না পাইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ান। তিনিও পিতৃপিতামহবৎ অশেষগুণময়; কিন্তু মৃগয়া দোষ। মৃগয়ায় আসক্ত বলিয়া পবিত্র বংশে দোষ প্রবেশ করিল। প্রথম ঘুণ ধরিল।

এই সময়ে ভগবান নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি রঘুবংশেই জন্মগ্রহণ স্থির করিলেন। রাজাও অনেক দিন সন্তানসন্ততি না হওয়ায় নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেছিলেন। সুতরাং নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইলেন। রঘুবংশের রামচন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। এই রঘুবংশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি। বাল্মীকির রাম (ideal) মনুষ্য; সদ্গুণময় মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ। কালিদাস বাল্মীকির রামটী চুরি করিয়া লইলেন; অর্থাৎ

দেখাইলেন, রঘু, অজ ও দশরথের বংশে যিনি রাজা হইবেন তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। রামায়ণের রাম আর রঘুবংশের রাম কিছুতেই ইতরবিশেষ নাই। কেবল এই যে, রামায়ণের রাম একখানি ছবিতে একটী প্রতিকৃতি; আর রঘুর রাম একখানি আলেখ্য, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির মধ্যে সকলের চেয়ে ভালটী। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে রামায়ণ অপেক্ষা রঘুবংশে সমধিক কারিগরী আছে। রামের মৃত্যুর পর রাজত্ব ভাগ হইয়া গেল। অযোধ্যা নগর আর রাজধানী রহিল না। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্যত্র রাজধানী করিলেন, অযোধ্যা ক্রমে ভগ্নাবশিষ্ট নগরীতে পরিণত হইতে লাগিল। মহারাজ কুশ অত সুন্দর নগরীর দুর্দ্দশা দেখিতে না পারিয়া আপন রাজধানী অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিলেন। বংশক্রমাগত গুণ অপেক্ষা তাঁহার সুন্দর পদার্থের প্রতি অনুরাগ অধিক। তিনি অযোধ্যার অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। কালিদাস তাঁহার রাজত্বের আর একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জলক্রীড়া। যখন রাজা নগর সাজাইতে আর জলক্রীড়ায় মত্ত হইলেন, তখন দশরথের সময় যে ঘুণ ধরিয়া আসিয়াছিল তাহাই বাড়িয়া উঠিল। শত্রুহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে মহারাজ কুশের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অতিথি পণ্ডিত ছিলেন; তিনি রাজ্যশাসনের পরম সুব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে যাহা আছে তাহাই রাখিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ। রাজার মনে যখন এরূপ ভাবনা উদয় হয়, সে রাজ্যের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অতিথির পর এক এক করিয়া অনেকগুলি রাজা হইলেন। কিন্তু কালিদাস তাঁহাদের আর বিশেষ বর্ণনা করিলেন না। ইঁহারা পৈতৃক নামে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। শেষে রাজা নাবালক হইলেন। নাবালক রাজা মন্ত্রিগণের নিকট বেশ শিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহার কাল হইল! তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ রাজা হইয়া অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হইলেন, এবং রাজযক্ষ্মারোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার গর্ভবতী ভার্য্যার গর্ভকে অভিষেক করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। রঘুবংশ শেষ হইল। কেহ বলেন, রঘুবংশের আর তিন সর্গ আছে। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাদের বোধ হয় কাব্যালোচনাশক্তি নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, অগ্নিবর্ণের পর আর রঘুবংশ বর্ণনার প্রয়োজনই নাই। তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

কালিদাস কুমার লিখিলেন, শকুন্তলা লিখিলেন, মেঘদূত লিখিলেন, আরও অনেক গ্রন্থ লিখিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে, কোথাও সমস্ত ভুবনের একটী একীকৃত বর্ণনা করিতে পারিলেন না। আর তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে সকল কাব্যই সুখে শেষ করিতে হয়, না করিলে সামাজিকেরা ভাল বলে না। বিয়োগান্ত কাব্য হইতে পারে, এটা এদেশীয় সামাজিকদিগের বিশ্বাসই ছিল না। সুতরাং সংসারের যথার্থ চিত্র দেওয়া হয় না। সামাজিকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বিয়োগান্ত নাটক লেখা

সুবিধা নয়। তাহাতেই একটী বংশের অদৃষ্ট সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-অদৃষ্টের যথার্থ চিত্র দেখাইলেন। আর একখানি কাব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের অনুকরণ দেখাইলেন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, রঘুবংশ কালিদাসের উৎকৃষ্ট কাব্য এবং নানা কারণে উহা তাঁহার শেষ লেখা ও অনেক বহুদর্শিতার ফল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

কালিদাসের ঋতুসংহারে মঙ্গলাচরণ নাই, কুমারসম্ভবে মঙ্গলাচরণ নাই, মেঘদূতেও মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু রঘুবংশে মঙ্গলাচরণ আছে। রঘুবংশ লিখিবার সময় কালিদাসের ধর্ম্মবুদ্ধি গভীর ও প্রবল হইয়াছিল। কোনও গ্রন্থে কালিদাস, আমি যে একান্ত অকিঞ্চন, এ ভাব প্রকাশ করেন নাই। কেবল শকুন্তলা ও রঘুবংশে করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলায় লিখিয়াছেন :—

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

রঘুবংশে লিখিয়াছেন :—

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ [১।২-৪]

এই বিনয়পূর্ণ বাক্যদ্বয়ের মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথম বাক্যটী যদিও বিনয়পূর্ণ, কিন্তু তথাপি আমি যে শিক্ষিত এই অভিমানটী সম্পূর্ণ আছে। ইহা বহুদর্শিতার অভাবের ফল। দ্বিতীয়টীতে এরূপ অভিমানের লেশ মাত্রও নাই, তাহার প্রতি অক্ষরে বলিতেছে যে আমি নিতান্ত অকিঞ্চন। যেন লেখক স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব কবিরা তাঁহা অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় কিছুই নহেন। এত বিনয়, এত অভিমানশূন্যতা যতদিন বয়স থাকে, ততদিন হয় না। কালিদাস এই কয়টী কবিতায় আপনার পূর্ব্ব কবিদিগের যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

এই সকল বিনয়বচনের পর কালিদাস নিজ মহাকাব্যের বিষয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশ লিখিবার সময় অন্যান্য কাব্য লেখা অপেক্ষা কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যে অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী লিখিতে কিছুমাত্র ভীত, কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয়েন নাই, রঘুবংশ আরম্ভ

করিয়া তাঁহার মনে নানাবিধ দ্বিধার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিষয়ের মাহাত্ম্য, নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব ভাবিয়া চমকিত হইয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থ লিখিতে বসিলেই বাল্মীকি, বেদব্যাসের সহিত তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সে রঙ্গভূমে তাঁহার জয়লাভ একান্ত সন্দেহাস্পদ। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে, নায়ক নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা সহজ ও চিরপ্রচলিত। তিনি নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজে যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু এবার নূতন ব্যাপার। এ রচনায় নায়ক নায়িকা নাই, বিশ পঁচিশ পুরুষ ধরিয়া একটী বংশের বর্ণনা করিতে হইবে, অথচ সে বংশবর্ণনা পুরাণ হইবে না, ইতিহাসও হইবে না, অথচ উৎকৃষ্ট কাব্য হওয়া চাই। কালিদাস মনে মনে বিলক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সামাজিকেরা তাঁহার গ্রন্থের আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, কারণ এ গ্রন্থখানি সামাজিকতা, অলঙ্কারের নিয়ম, কবিদিগের চিরপ্রসিদ্ধি সমস্ত অতিক্রম করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বনপুরঃসর লিখিতে হইয়াছে। তাই তিনি সামাজিকদিগকে তোষামোদ করিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিয়াছেন,

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥ [১।১০]

আমরা এ কবিতার এরূপ অর্থ বুঝিয়াছি—"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার কাব্যখানি গ্রহণ করুন (অর্থাৎ নূতন রকমের কাব্য বলিয়া অবহেলা করিবেন না।) যেহেতুক ভালই হউক আর মন্দই হউক, আপনারাই কেবল তাহা বুঝিতে পারিবেন। উহা যদি ভাল হয়, গ্রহণ করিবেন; মন্দ হয় পরিত্যাগ করিবেন"। এইরূপ সঙ্কুচিত হৃদয়ে, কুণ্ঠিত অন্তঃকরণে ও ভীত মনে, মহাকবি কালিদাস যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে,

"..unattempted yet in prose or rhyme."

মিল্‌টন যদি (Paradise Lost) নামক মহাকাব্যের ভূমিকায় [Bk. 1, 1.16] উহাকে "unattempted yet in prose or rhyme" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তবে আমাদিগেরও কালিদাসের উক্ত মহাগ্রন্থকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিবার অধিকার আছে।

বাল্মীকি রামায়ণ মধ্যে আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা ও আদর্শ পরিবার দেখাইয়াছেন। কালিদাস আরও একটু ছাড়াইয়া উঠিলেন। কালিদাসের উদ্দেশ্য আদর্শ বংশ বর্ণনা। ঐ বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে লও, তিনিই কোন না কোন বিষয়ের আদর্শ। রঘুরাজা দিগ্বিজয়ীর আদর্শ, অজরাজা সহৃদয়তার আদর্শ, রাজা দশরথ ব্যসনাসক্তির আদর্শ, কুশরাজা রুচিমত্তার আদর্শ, অতিথি নীতিপরায়ণতার আদর্শ; সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য যে অগ্নিবর্ণ, সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শসমূহের

ঠিক মধ্যস্থলে বাল্মীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন। বসাইয়া, রঘুবংশরূপ প্রকাণ্ড চিত্র হইতে প্রকাণ্ডতর চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাহাতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা সুন্দর, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, তৎসমূহ সংযোগে পূর্ব্বোক্ত আদর্শ চিত্রসমূহের এক প্রকার নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! তোমরা মনে করিও না, কালিদাসের চিত্র-সমূহ আলেখ্যলিখিত চিত্রের ন্যায়। উহারা সচল, সজীব ও জীবনময়। কালিদাসের মনুষ্যগুলি অলৌকিক জীবনীশক্তিতে জীবনময়, দেবগণ স্বর্গীয় জীবনীশক্তিতে জীবনময়। কালিদাসের ভৌতিক পদার্থ বর্ণনায় ভৌতিক পদার্থগুলিকে জীবনীশক্তি দিয়া যেন জীবনময় করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এ জীবন বাইরনের জীবনের ন্যায় খরপ্রবাহিত নহে। উহা শান্তিময়, তেজোময় ও সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক। বাস্তবিকই কালিদাসের রঘুবংশের ন্যায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কিনা সন্দেহ। বড় বড় কাব্য পড়িতে বসিলে অল্পক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যন্ত একঘেয়ে। মিলটন বল, রামায়ণ বল, মহাভারত বল, সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও ঐ এক দোষে সব মাটি করিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের এ প্রকাণ্ড গ্রন্থে ঐ দোষের লেশ মাত্রও নাই। যতই পড়িয়া যাইবে, ক্রমেই দেখিবে নূতন নূতন পদার্থ আসিতেছে, বর্ণনা কোথাও লম্বা নহে। যতটুকু বলিলে বর্ণিত বস্তু পাঠকগণের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, তাহার উপর রঘুবংশে কালিদাস একটী অক্ষর অধিক লিখেন নাই।

রঘুবংশের প্রত্যেক রাজাই মনুর অনুমোদিত রাজগুণসমূহে বিভূষিত। তিনি গ্রন্থারম্ভে এই রাজগণের সাধারণ গুণগ্রাম এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥
যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।...[১।৫-৯]

এত গুণ ত সকলেরই ছিল। তাহার উপর আবার কালিদাস দেশগত, পাত্রগত, কালগত, অবস্থাগত ও কার্য্যগত বিশেষ বিবেচনা করিয়া নানাবিধ নূতন গুণের অবতারণা করিয়া এক একটী রাজাকে এক একটী দেবতুল্য করিয়াছেন।

দিলীপ

কালিদাসের প্রথম রাজা দিলীপ। ইনি রঘুবংশের রাজা নহেন, বংশপ্রবর্ত্তয়িতা রঘুরাজার পিতা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কালিদাস গ্রন্থারম্ভ করিলেন প্রৌঢ়বয়স্ক এক রাজা আর তাঁহার অতীতযৌবনা এক রমণী লইয়া। তাই না হয় হউক, ইঁহাদের মধ্যেও প্রাণের তরঙ্গ নাই। নাই থাকুক, না হয় চন্দ্রালোকমধ্যে প্রমোদকাননেই গ্রন্থারম্ভ হউক, তাহাও নহে। গ্রন্থারম্ভ হইল কি লইয়া? না এক বুড়া এক বুড়ী ছেলে হয় না বলে বনের ভিতর দিয়া গুরুর বাড়ী চলিলেন। যদি কালিদাস অল্প বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মত "পক্কতাং গতঃ" লোক আর কখনও জন্মায় নাই ও জন্মাইবে না। যদিও কখনও যুবক কবি এইরূপ বুড়া বুড়ী লইয়া গ্রন্থারম্ভ করেন, তাঁহার সহিত বর্ণনীয় বুড়া বুড়ীর কিছু মাত্র সহানুভূতি থাকে না, কিন্তু দিলীপ ও সুদক্ষিণার বর্ণনায় কালিদাসের হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। রাজার আকার এইরূপ :—

ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥ [১।১৩]

তিনি বড় রাশভারি লোক, অথচ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কেহ থাকিতে পারে না!

ভীমকান্তৈর্ন্‌পগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্‌।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥ [১।১৬]

এ সব হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথা নয় ত কি? কালিদাস নিজে বৃদ্ধ বয়সে নিজের মনের মত একটী বৃদ্ধ রাজা গড়িয়া আপনার গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবেশ করিয়াছেন। কালিদাস এই রাজার বিষয় যত বর্ণনা করিয়াছেন ও ইঁহার বর্ণনায় যত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন, আপনার লিপি চাতুর্য্যের ও অলঙ্কার-প্রয়োগ-কুশলতার যত পরিচয় দিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কোথাও দেন নাই। অনেকে বলেন যে, রাজার চরিত্র বর্ণনা একটু লম্বা বিরক্তিকর হইয়াছে। আমারও প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, কালিদাসের ভাষা অন্যত্র যেরূপ সরল, এখানে তত সরল নহে। উহা গূঢ় অলঙ্কারমালায় পরিপূর্ণ। কালিদাসের কবিতা পড়িবামাত্রেই ভাব ও চিত্র যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। কিন্তু এখানে দেখিলাম, একটু প্রণিধান করা আবশ্যক। আরও বিস্মিত হইলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, রঘুবংশ কালিদাসের বৃদ্ধাবস্থায় লেখা; যখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাস বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধ রাজার গুণ বর্ণনায় নিতান্ত ব্যস্ত; তখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাসের এই বর্ণনায় একটু গূঢ়ত্ব রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই ভাষা তত সরল নহে, একটু গম্ভীর। প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কালিদাস এই গাম্ভীর্য্যময় ভাষার অন্তরালে কি এক চমৎকার স্থবির নরপতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত

করিয়াছেন। রাজা ধার্ম্মিক, যজ্ঞনিরত, নির্লোভ, প্রজাহিতৈষী, দেবব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দুরাজার যত গুণ থাকা আবশ্যক, তত গুণে ভূষিত। শূর, বীর, দয়ালু, সাহসী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ, বিদ্বান্—রাজা সকল গুণের আধার:—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥
... ...
স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ॥ [১।২১-২২, ২৫]

সুদক্ষিণা

কালিদাস সুদক্ষিণার বড় বর্ণনা করেন নাই, ভারতীয় অন্যান্য সাধ্বীদিগের ন্যায় সুদক্ষিণার স্বামী ভিন্ন অন্য জীবন ছিল না। তাই বহুদর্শী, বিচক্ষণ কবি সুদক্ষিণার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এমন কি, সমস্ত রঘুবংশে আমরা যে পরিমাণে রমণীবর্ণনা দেখিতে চাই, তাহার কিছুই পাই না। হিন্দু সংসারে রমণীজীবন বিবাহের দিন হইতেই স্বামীতে বিলীন,—উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তাই কালিদাস রমণীচরিত্র লইয়া রঘুবংশে তত বাড়াবাড়ি করেন নাই। প্রাচীন বয়সে রমণী লইয়া বাড়াবাড়িটা তত ভাল দেখায় না। রাজা-রাণীর বর্ণনা হইলে পর, কালিদাস মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রাজা ও রাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক রথে আরোহণ করিয়াছেন; রথ মেঘের ধ্বনির ন্যায় গুড় গুড় গুড় ধ্বনিকরতঃ বনমধ্য দিয়া প্রস্থান করিতেছে। রাজা ও রাণী তদুপরি আরোহণকরতঃ বনশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বনভূমি .

কবিদিগের স্বভাববর্ণনায় একটু আশ্চর্য্য কৌশল আছে। স্বভাব আজিও যেমন, কালিও তেমনি। উহাকে যে চক্ষে যখন দেখিবে, তখন সেইরূপ দেখিতে পাইবে। যখন মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, তখন স্বভাবের সকল বস্তুই খারাপ খারাপ বোধ হয়। আবার যখন বড় আমোদ, তখন সমস্ত স্বভাব যেন চারিপাশে হাসে। ঐ দেখ প্রৌঢ়বয়স্ক রাজা রাণী ভক্তিভাবে রীতিমত সংযত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের চক্ষে সমস্ত স্বভাবই পবিত্র। কালিদাস তাঁহার পাঠকদিগকে একখানি বনভূমি দেখাইয়াছেন। তাহাতে রাজা ও রাণীর পবিত্র ধর্ম্মভাব মাখান।

রাজা বনের মধ্যে যা কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে, সমস্তই আপনার প্রিয়তমাকে দেখাইতে দেখাইতে যাইতেছেন। রাজা ও রাণীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রমার যোগ হইয়াছে। রাজা এইরূপে গল্প করিতে করিতে আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কত পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

আশ্রম

দূর হইতেই আহুতির গন্ধে রাজা বুঝিতে পারিলেন, আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। ক্রমে আহুতির ধূম আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন তেজোময় ঋষিগণ চারিদিক হইতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেছেন। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। ঋষিদিগের শরীর হইতে অগ্নিময় প্রভা নির্গত হইতেছে। বোধ হইতেছে, তাঁহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কিনা, তাই অগ্নিদেব তাঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন, চারিদিকে হরিণ শিশুরা কুটীরদ্বারে মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঋষিপত্নীরা নীবার-ধান্যগুলি দিনের বেলায় রৌদ্রে শুকাইয়া উঠানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়াছেন। রাজা প্রথমে রাণীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন, পরে নিজে নামিলেন।

বশিষ্ঠ

রাজা যখন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন বশিষ্ঠ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া অরুন্ধতীর সহিত বসিয়া আছেন। রাজা উপস্থিত। ঋষি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহার সমস্ত বিঘ্নবিনাশ করেন, তাহার আবার অকুশল কি প্রকারে হইতে পারে?" রাজার বাক্যপরম্পরার প্রতিপদে তাঁহার অতুল গুরুভক্তি ও ব্রাহ্মণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে রাজা আপনার অপুত্রকতার উল্লেখ করিয়া নিতান্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন। এ দুঃখ তাঁহার নিজের জন্য নহে—হিন্দুরা নিজের জন্য দুঃখ করিতে কখনও শিখেন নাই। রাজার দুঃখ পূর্ব্বপুরুষদিগের জলপিণ্ড-স্থানলোপ হইবে বলিয়া—

নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ।
ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ॥
মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃ পূর্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥ [১।৬৬-৬৭]

রাজার অটল বিশ্বাস, তাঁহার গুরুদেব নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন। কারণ তিনি উপসংহারে বলিতেছেন,

ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ॥ [১।৭২]

বশিষ্ঠদেব এইকথা শুনিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে দেখিলেন, সুরভির কোপই রাজার অনপত্যতার কারণ। কিন্তু সুরভিকে এখন পাইবার যো নাই, অতএব সুরভির কন্যা বশিষ্ঠ-গৃহপালিতা নন্দিনীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুরভির কোপ ক্ষান্ত হইবে ও রাজার সন্তান উৎপন্ন হইবে। অতএব তিনি রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে পরামর্শ দিলেন। বশিষ্ঠের কথা শেষ হইতে না হইতেই নন্দিনী সমস্ত দিন চরিয়া, হেলিয়া দুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, যখন নাম করিতে নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে। আপনি কল্য হইতে উহার সেবায় নিযুক্ত হউন।" এইরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ একটী কথায় একজন রাজরাজেশ্বরকে আপনার বাড়ীর রাখাল করিয়া তুলিলেন। এবং রাজাও দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালি করিতে রাজি হইলেন।

কালিদাস দেখাইলেন, যে আমা হইতে উচ্চ, তাঁহার কথার বশ হওয়া একান্ত আবশ্যক, নহিলে সংসার চলে না। এইরূপে বশীভূত ভাবে চলিলে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন
কার্ত্তিক ও পৌষ, ১২৯০

কালিদাসের মেয়ে দেখান

কালিদাসের নাটকে মেয়ে দেখানর একটা বেশ কায়দা আছে,—কাব্যেও তাঁর মেয়ে দেখানর একটা কায়দা আছে। লোকে বলে, কালিদাস একজন মহামূর্খ ছিলেন; পণ্ডিত স্ত্রীর কাছে গালি খাইয়া মনের দুঃখে তিনি বিবাগী হইয়া যান, শেষে কোন সিদ্ধপুরুষের পরামর্শে সরস্বতীর আরাধনা করিতে থাকেন। সরস্বতী তাঁহাকে বর দেন, 'তুমি বড় কবি হইবে'। বর দিবা মাত্র কালিদাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিল,—তিনি প্রথমেই সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ করিলেন। যেমন অন্য লোকে স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা করে, সেইরূপে তিনিও মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সরস্বতীর রূপবর্ণনা করিলেন। সরস্বতী কিন্তু তাহাতে একটু রাগত হইলেন,—এবং "তুই একটা সামান্য বেশ্যার মত আমার রূপ বর্ণনা করিলি, তুই দেবতার রূপ বর্ণনা করিতে জানিস না,—তুই কেবল আদিরসের কবি হইবি" বলিয়াই তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই কালিদাস কুমারসম্ভবে যখন পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করেন, তখন মাথা হইতে

পা পর্য্যন্ত বর্ণনা না করিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন [১।৩১-৪৯]। মেয়েকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের রূপবর্ণনা কালিদাসের এই প্রথম ও এই শেষ। তাহাতেই লোকে বলে কালিদাস সরস্বতীর কাছে যে পাপ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। যদি বল, মেঘদূতেও তিনি যক্ষপত্নীর সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে বর্ণনায় ও কুমারসম্ভবের বর্ণনায় একটু বিশেষ আছে। কালিদাস কুমারসম্ভবে উনিশটী কবিতায় পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনায় তাঁহার একটী মাত্র শ্লোক খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে উনিশটী মাত্র কথা আছে।* আবার রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে [ষষ্ঠ সর্গ] তিনি ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, একটীও কবিতা খরচ করেন নাই, দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে এক রাজার কাছ হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে [৬।২০-৬৯], তখন এক একটী করিয়া উনিশটী মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন; তাহাতেই একটা জমকালো রূপবর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

নাটকের রূপবর্ণনা কিন্তু আর এক রকম। প্রতি নাটকেই প্রথমেই তিনি মেয়ে দেখাইয়াছেন। মেয়েটীকে তিনটী ভঙ্গীতে দাঁড় করাইয়া অন্য ব্যক্তির মুখে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বর্ণনা করাইয়াছেন। কোন নাটকেই তিনের উপর চার অবস্থা দেখান নাই। বাস্তবিকও দেখাইতে গেলে একটু যেন লম্বা হইয়া পড়ে, একটু এক-ঘেয়ে হয়। তাই কালিদাস তিনেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এক একবার তিন তিন অবস্থা দেখাইয়া জগতের সম্মুখে এক একটী অপরূপ রূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রবন্ধে এই তিনটী ভঙ্গীরই ব্যাপার দেখাইব।

কালিদাসের নাটক তিনখানি, তিনখানিই যে কালিদাসের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিত। আমার সে সন্দেহ একেবারে নাই, তাই আমি তিনখানিই কালিদাসের বলিতেছি। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র পাত্রগুলি সবই পৃথিবীর। মালবিকা নিজে বিদর্ভরাজের কন্যা। মালবরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া স্থির ছিল, তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল মালবিকা। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র পাত্রগণ প্রায়ই স্বর্গের। উর্ব্বশী নিজে অপ্সরা,—তাহার সহচরীরা অপ্সরা। ভরতমুনি স্বর্গের নাট্যকার। উর্ব্বশী তাঁহার নাটকে অভিনয় করেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের বেশ সমাবেশ আছে। শকুন্তলা ঋষির ঔরসে অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন। তিনি যেখানে থাকেন সেটা হিমালয়ের পাদদেশ, পৃথিবীতে স্বর্গের দুয়ারে। রাজা ত্যাগ করিলে তিনি যেখানে গেলেন, সেটী স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে। পাত্রগুলি কতক স্বর্গের, কতক মর্ত্ত্যের, কতক মাঝখানের। কালিদাস যেন প্রথমেই পৃথিবীর জিনিস লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একেবারে

* "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা......॥" —'মেঘদূত' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৭০।—সম্পাদক—।

স্বর্গে গিয়া উঠিলেন। স্বর্গ বড় উঁচু জিনিস,—স্বর্গের নাটক লিখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই যেন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই মিশাইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তলা রচনা করেন।

আমি এই তিনখানি নাটকের মেয়ে দেখানর কৌশল এই ক্রমেই দেখাইব—প্রথমে দেখাইব মালবিকাগ্নিমিত্রের, পরে বিক্রমোর্ব্বশীর, তারপরে অভিজ্ঞানশকুন্তলার।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অগ্নিমিত্র রাজার রাজধানী বিদিশানগরে রাজার যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ঘর, সেইখানে মেয়ে দেখান হয়। রঙ্গমঞ্চ বাঁধা, প্রেক্ষকদের জন্য গ্যালারি করা। উপস্থিত আছেন রাজা, তাঁহার বিদূষক ও রাণী। আর একজন আছেন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পরিব্রাজিকা। অসময়ে রাণীর নিযুক্ত নৃত্যাচার্য্য গণদাস তাঁহার শিষ্যা মালবিকাকে লইয়া প্রেক্ষাগৃহে আসিলেন। গণদাস তাঁহার শিষ্যাকে রাজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "ভয় করিও না—প্রকৃতিস্থ হও"। এই অবস্থায় রাজা তাঁহার রূপ দেখিয়া লইলেন। মালবিকার রূপ দেখাই রাজার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পূর্ব্বে উহার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ছবির রূপ প্রকৃত রূপের সহিত মিলিবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। সম্মুখে মালবিকাকে দেখিয়া সে সন্দেহ ত তাঁহার দূর হইলই, বরঞ্চ তিনি ভাবিলেন ছবিওয়ালা ঠিক আঁকিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার চোখ দেখিলেন, মুখ দেখিলেন, হাত দুটী দেখিলেন, বক্ষঃস্থল দেখিলেন, পার্শ্ব দেখিলেন—ভাবিলেন নর্ত্তকী হইবার জন্যই বুঝি বিধাতা ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর গণদাস কেমন নৃত্য শিখাইয়াছে তাহার পরীক্ষার জন্য শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত চতুষ্পাদিকা গান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে 'ছলিক' নামে নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাচিতে নাচিতে এই গান করিয়াই যযাতির প্রতি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মালবিকাও নাচিতে নাচিতে সেই গান করিলেন। যেখানে যেমন রস তাঁহার নাচও সেই রসই প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিদাস একবার দাঁড় করাইয়া মেয়ে দেখাইয়াছেন, এবার নাচে ও গানে মেয়ে দেখাইলেন। কিন্তু কালিদাসের আর এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। বিদূষকেরও আর এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। নাচিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া মালবিকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বিদূষক বলিয়া উঠিল, "একটু থাক, তুমি একটা কাজ ভুলিয়া গিয়াছ।" গণদাস ভাবিল, বুঝি সত্যই কিছু ভুল হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—"মালবিকা, তোমার দোষ হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করিয়া যাও।" রাণী চটিয়া উঠিলেন। রাণীতে ও গণদাসে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। পরিব্রাজিকা মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। ইত্যবসরে রাজা সে দাঁড়ান-রূপ আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। কিন্তু দাঁড়ান-রূপ ত একবার দেখান হইয়াছে—তাহা দেখাইলে ত কালিদাসের তৃপ্তি হইবে না—বিদূষকেরও তৃপ্তি হইবে না। শেষ সকলে বিদূষককে বলিলেন—মালবিকা কি ভুলিয়াছে? বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, "প্রথম শিক্ষা দেখাইতে আসিলে, আগে যে ব্রাহ্মণের পূজা করিতে

হয়—সেটা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।” সকলে হাসিয়া উঠিল—মালবিকাও হাসিল—রাজার হাসি দেখা বাকী ছিল—তিনি বলিলেন, ইহার হাসি দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। ইহার হাসিমুখে কচি দাঁতগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে পদ্মটী ফোট ফোট হইয়াছে—কেশরগুলি কেবল একটু একটু দেখা যাইতেছে। বিদূষক আবার দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—এবার গণদাস মালবিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজারও কার্য্য শেষ হইল—কালিদাসেরও মেয়ে দেখান শেষ হইল—আমাদেরও ক’নে দেখা শেষ হইল।

বিক্রমোর্ব্বশীতে উর্ব্বশী অনেকগুলি অপ্সরার সঙ্গে মহাদেবের পূজা করিয়া কুবেরের বাড়ী হইতে ফিরিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। পথে কেশী নামে দানব বেগে আসিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে রথে চড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। অপর অপ্সরারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা পুরূরবা সূর্য্যোপস্থান করিয়া মর্ত্ত্যে ফিরিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আমি থাকিতে কে আর্ত্তনাদ করে?” অপ্সরারা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“ওগো! কেশীদানব উর্ব্বশীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। দেবতাদের প্রতি যদি তোমার ভক্তি থাকে, আমাদের সখীকে বাঁচাও।” রাজা কেশীকে দূর করিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে আপনার রথে লইয়া অপ্সরাদের নিকট আসিলেন—উর্ব্বশীর রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম প্রবেশ। উর্ব্বশী তখনও চোখ চাহিতে পারিতেছেন না—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রলেখা ডান হাত দিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া রহিয়াছে—রাজা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—“আর ভয়ের কোন কারণ নাই—তুমি চক্ষু মেল।” চিত্রলেখা বলিতেছেন, “কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসেই বোধ হইতেছে ইনি বাঁচিয়া আছেন—এখনও আমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না।” রাজা দেখিলেন, উঁহার হৃদয়ের কম্প কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ঐ দেখ মন্দার-কুসুমমালা কেবল উঠিতেছে আর পড়িতেছে। স্তনদ্বয়ের মধ্যে আঁচলটী একবার উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ক্রমে উর্ব্বশীর চৈতন্য হইল। রাজা দেখিলেন, চাঁদ উঠিলে যেমন অন্ধকার হ্রাস হয়—ধূম গত হইলে যেমন অগ্নির শিখা বাহির হয়—পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িলে গঙ্গার জল প্রথমে ঘোলা হইয়া উঠে ও পরে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়—ইঁহার মোহ তেমনি অপগত হইতেছে—ইঁহার প্রাণ আবার ফিরিয়া আসিতেছে। উর্ব্বশী মনে করিয়াছিলেন, ইন্দ্রই বুঝি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু যখন শুনিলেন পুরূরবা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তিনি চক্ষু মেলিয়া রাজাকে একবার দেখিলেন। দেখিয়াই মনে মনে বলিলেন,—কেশী ত তবে আমার বেশ উপকারই করিয়াছে। এই ভাবে উর্ব্বশী, রাজা ও সখী পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ও পরস্পর নানারূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অন্য অপ্সরারা যেখানে ছিলেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উর্ব্বশীকে রথ হইতে নামানর চেষ্টা করা হইল। তিনি রথ হইতে

নামিতে গিয়া ভয়ে পড়িয়া যাইতে যাইতে রাজাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাজা মনে মনে বলিলেন, আমি যে দেশে ফিরিয়া আসিলাম তাহা সফল হইয়াছে। যেহেতু ইঁহার অঙ্গে আমার রোমাঞ্চিত অঙ্গ স্পর্শ করিল। কালিদাস মূর্চ্ছা অবস্থায় উর্ব্বশীকে একবার দেখাইলেন—মূর্চ্ছাভঙ্গের অবস্থায় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন—রথ হইতে নামিবার সময় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন—তাঁহার মেয়ে দেখান শেষ হইল—অমনি ইন্দ্রের দূত আসিয়া অপ্সরাদের স্বর্গে লইয়া গেলেন—রাজাকেও যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, ইন্দ্রের সহিত দেখা করিবার এ সময় নয়। নাটকের [প্রথম] অঙ্ক শেষ হইয়া গেল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলাতেও রাজা দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন—তিনটী মেয়ে ছোট ছোট ঘটে জল লইয়া ফুলগাছে দিতেছে, কিন্তু এ তিনটীর কোন্‌টী যে শকুন্তলা তাহা তিনি চেনেন না। সেইটী চিনিয়া লওয়া তাঁহার প্রথম দরকার। কালিদাসও তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন—"সখিরা, এদিকে এস।" আর একজন বলিলেন, "শকুন্তলে, তোমার চেয়েও দেখিতেছি তোমার বাবা এ গাছগুলিকে ভালবাসেন। তোমার শরীর নবমালিকার মত কোমল—তোমাকে দিয়াও তিনি এই সকল গাছে জল দেওয়াইতেছেন!" তখন প্রথম মেয়েটী বলিল, "বাবার কথায়ই কি আমি জল দিতেছি, ইহারা কি আমার সহোদর নহে? ইহাদের প্রতি কি আমাদের স্নেহ নাই?" এই বলিয়া সে গাছে জল দিতে লাগিল। তখন রাজা চিনিলেন—এইটীই কণ্বের মেয়ে, শকুন্তলা। তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ মেয়েকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্বমুনি ভাল করেন নাই। তিনি কি নীলপদ্মের পাপড়ির ধার দিয়া শাঁইগাছ ['শমীলতা'] কাটিতে চান?" এই বলিয়া তিনি গাছের আড়ালে গিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। জল দেওয়ার অবস্থায় শকুন্তলাকে কালিদাস একবার দেখাইলেন। শকুন্তলা ঋষিকন্যা—ঋষির আশ্রমে লালিতা, সুতরাং তিনি পরেন বল্কল। গাছের ছাল পিটিয়া পিটিয়া খুব নরম করিয়া এক রকম কাপড়ের মত হইত—বেশ পুরু হইত, কিন্তু গাছের ছাল ত? আমাদের ধুতি অপেক্ষা অনেক শক্ত। আর দশ হাত বাকল ত আর পাওয়া যাইত না? কোমরে বড় জোর দেড় ফের কি দুই ফের হইত। আর একখানা বাকল একটা কাঁধের উপর দিয়া বুকটা ঢাকিয়া রাখিত। এইরূপ দু'খানা বাকল পড়িয়া শকুন্তলা নুইয়া নুইয়া গাছে জল দিতেছিলেন—বাকল আঁটা ছিল—তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল—তাই তিনি একজন সখীকে বলিলেন, আমার বাকলখানা একটু শিথিল করিয়া দাও। সে শিথিল করিয়া দিল—শকুন্তলা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন—আর এক ভঙ্গীতে কালিদাস রাজাকে শকুন্তলার রূপ দেখাইলেন। রাজাও বলিয়া উঠিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং" ইত্যাদি—

একবার নোয়াইয়া শকুন্তলাকে দেখান হইয়াছিল। এবার ঠিক সোজা করিয়া তাঁহাকে দেখান হইল। কিন্তু আর এক ভঙ্গীতে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাই কালিদাস তাঁহাকে এক আমগাছের তলায় দাঁড় করাইলেন—সে আমগাছে একটী নবমালিকা উঠিয়াছে। নবমালিকার ফুল ফুটিয়াছিল—তাহাতে ভ্রমর বসিয়াছিল। গাছে জল দেওয়ায় গাছ নড়িয়া উঠিল—সেও উড়িয়া গেল। উড়িয়া শকুন্তলার মুখের উপর বসিতে গেল। পাছে কামড়ায় বলিয়া শকুন্তলা বড় ভয় পাইলেন। তিনি যেদিকে যান, ভ্রমরও সেদিকে যায়। কখনও কানের গোড়ায় যায়, কখনও চোখের উপর বসিতে যায়—তাড়াইয়া দিলে আবার ঘুরিয়া আসে। শকুন্তলা অন্যত্র চলিয়া গেলে সেও সঙ্গে সঙ্গে যায়। তখন শকুন্তলা বসিয়া ভাবিলেন—কে আমায় এই দুর্ব্বিনীত মধুকরের হাত হইতে রক্ষা করে। কালিদাস দু'প্রকারে রূপ দেখাইয়াছেন; ভ্রমরবাধায় তিন রকমে দেখান হইল—আর তাঁহার রূপ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। সখীরা বলিল—"আমরা কি করিয়া তোমায় রক্ষা করিব; তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা রাজা, তুমি দুষ্যন্তকে ডাক।" এই কথা বলিতে বলিতেই দুষ্যন্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপ দেখান পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

তিন নাটকেই রূপ দেখান পর্ব্বই এক রকম। মেয়েটীকে তিন অবস্থায় ফেলিয়া দেখান। তবে মালবিকা রাজার মেয়ে—শিক্ষিতা, কলাপটু; এখন তিনি দাসী হইয়াছেন—আত্মগোপন করিয়া চলেন—তাঁহাকে দেখিতে রাজার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, তিনিও শিক্ষিতা যুবতীর ন্যায় দেখা দিয়া গেলেন। একবার দাঁড়াইলেন, একবার নাচিলেন, একবার হাসিলেন। তাঁহার অবস্থা যেরূপ, বেশীক্ষণ রাজদরবারে থাকা তাঁহার অভিপ্রেত নহে—তিনি সরিয়া পড়িলেন। বেশ চতুরার মত আপনার মনের ভাব রাজাকে বুঝাইয়া গেলেন—আপনিও রাজার মনের ভাব বুঝিয়া গেলেন। এক রাজা ও বিদূষক ভিন্ন কেহই সে কথা বুঝিল না।

উর্ব্বশী অপ্সরা, থাকেন স্বর্গে। স্বর্গে সবই সুখ, বিশেষ তিনি নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—তিনি অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের অপেক্ষা শিক্ষিতা। ভরত-মুনি সকল নাটকেই তাঁহাকে নায়িকা সাজাইতেন। কিন্তু দেবতাদের এক ভয়—দানবের। উর্ব্বশীকে দানবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তিনি ভয়ে বিহ্বল—জ্ঞানশূন্য। সেই অবস্থায় কালিদাস তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে আনিলেন—তাঁহার চৈতন্য হইল—সে অবস্থাও দেখাইলেন। তাহার পর রথ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজাকে ধরিলেন। তিন অবস্থা দেখান হইল।

শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, একজন ঋষি তাঁহার পিতা। আর একজন ঋষি তাঁহাকে পালন করেন। তিনি সংসারের কোন ধারই ধারেন না। গাছে জল দেন, বাবার পূজার আয়োজন করিয়া দেন, তপোবনের কার্য্য করেন। তিনি মালবিকার ন্যায়

চতুরাও নহেন, উর্ব্বশীর ন্যায় পাকাও নন—তাই কালিদাস মুগ্ধভাবেই তিন অবস্থায় তাঁহার রূপ দেখাইলেন;—একবার দেহ বেঁকাইয়া, একবার দাঁড় করাইয়া, আর একবার ভ্রমরের ভয়ে চকিত করিয়া। রূপ দেখান হইলে রাজার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ হইল। যদি পূর্ব্বে চাক্ষুষ হইত, তাহা হইলে কালিদাসের আর রূপ দেখান হইত না। শকুন্তলা নিশ্চয়ই একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু মালবিকা ও উর্ব্বশীর বেলায় রূপ দেখানর সময়েই চাক্ষুষ হইয়াছিল, কারণ কালিদাস জানিতেন ইহারা রাজা দেখিয়া জড়সড় হইয়া যাইবে না।

নারায়ণ
ভাদ্র, ১৩২২

কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন। ১ম, ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে। ২য়, মালবিকাগ্নিমিত্রের ৩য় অঙ্কে। ৩য়, কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে, সেটী অকাল-বসন্ত। ৪র্থ, রঘুবংশের নবম সর্গে। বর্ণনা ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনা ক্রমেই ছোট হইয়া আসিয়াছে, ক্রমেই বাজে জিনিস ছাঁটা পড়িয়াছে। জিনিসগুলি ক্রমেই বেশী করিয়া ফুটিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা আরও দেখিবেন, ভাষা ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর ও মধুরতম হইয়া গিয়াছে। ছন্দে সুরও মধুরতর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে।

ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস আটাশটী কবিতায় বসন্ত-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। তিনি বসন্তকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফুটে-উঠা আমের মুকুল তাহার বাণ, ভ্রমরের সার তার ধনুকের ছিলা। কামিগণ তাহার শত্রু, তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। বসন্তকালের সবই মনোহর। গাছে ফুল ফুটিয়াছে; জলে পদ্ম ফুটিয়াছে। বাতাসে গন্ধ ভরিয়াছে; যুবক যুবতীর মন উদাস হইয়াছে। যুবতীরা কুসুমফুলের রঙ্গে ছোপাইয়া রেশমের কাপড় পরিয়াছে এবং কুমকুমে ছোপাইয়া রেশমের কাপড়ের ওড়না করিয়াছে। তাঁহাদের কানে গোছা গোছা সোঁদালের ফুল, অলকে অশোকফুল, এবং সর্ব্বাঙ্গে নবমল্লিকাফুলের অলঙ্কার। শীতকাল চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা মুক্তার হারে চন্দন লাগাইয়া গলায় পরিতেছেন। খুব পালিশ করা বালা ও বাজু পরিতেছেন এবং কোমরে চন্দ্রহারও পরিতেছেন। এতদিন তাঁহাদের মুখে

যে অলকা তিলকা কাটা থাকিত, তাহা একবার কাটিলে অনেকদিন চলিত, কিন্তু এখন আর সেটী হইবার যো নাই, বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়া সেগুলিকে উঠাইয়া দিতেছে। অনঙ্গের আবির্ভাবে যুবতীগণের চক্ষু চঞ্চল হইতেছে, কপোল পাণ্ডুবর্ণ হইতেছে, শরীরবন্ধ শিথিল হইতেছে এবং বার বার মুখে হাই উঠিতেছে। তাঁহারা প্রিয়ঙ্গু, কুমকুম, চন্দন ও মৃগনাভি মিলাইয়া অঙ্গরাগ করিতেছেন। মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরিতেছেন ও অগুরুধূপের ধোঁয়া দিয়া তাহাকে সুবাসিত করিতেছেন।

বসন্তে আমের মুকুল খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া কোকিল কোকিলার মুখচুম্বন করিতেছে, ভ্রমরও পদ্মের মধু খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গান করিয়া ভ্রমরীর মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমের মুকুলগুলি ফুটিয়াছে, তাহার নীচে কচি কচি রাঙ্গা দু'একটী পাতা রহিয়াছে। বাতাসের ভরে গাছটী কাঁপিতেছে দেখিয়া মানুষের মন আকুল হইয়া উঠিতেছে। অশোক গাছের গোড়া হইতে রাঙ্গা ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপর অশোকের কচি কচি চাটাল চাটাল গরদ কাপড়ের মত পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া কোন্ যুবক বা যুবতীর মন স্থির থাকিতে পারে?

আমের মুকুলে ফুল ফুটিয়াছে। তাহার উপর, চারিদিক হইতে ভ্রমরেরা মত্ত হইয়া তাহার উপর পড়িতেছে, আর কচি পাতাগুলি অল্প বাতাসে তাহাদের উপর ঝুলিয়া পড়িতেছে। অতিমুক্তলতা দেখিয়া রসিকের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ উন্মত্ত ভ্রমর এক একবার ফুলে বসিতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে, আর তার কচি পাতাগুলি মৃদু বাতাসে নীচুমুখ হইয়া দুলিতেছে। কুরুবকের ফুল ফুটিয়াছে। মঞ্জরীর চারিপাশে ফুল ঠিক যেন একখানি সুন্দর মুখ। সে মুখ দেখিয়া কাহার মন না উড়্ উড়্ করে। চারিদিকে পলাশের ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের ভরে গাছ সব নুইয়া পড়িয়াছে ও তাহার উপর বাতাস বহিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিক পলাশবনে আচ্ছন্ন হওয়ায়, বোধ হয়, যেন পৃথিবী লাল চেলী পরিয়া আবার বিয়ের ক'নে সাজিয়াছেন। একে তো চারিদিকে পলাশ ফুটিয়াছে, ফুলগুলা যেন টিয়াপাখীর ঠোঁট, তার উপর সোঁদালের ফুল, ইহার উপর আবার কোকিল ডাকিতেছে—এ সময় কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? এ সময়ের বাতাস বড় মিষ্ট, কারণ হিম আর পড়ে না, বাতাস গায়ে লাগিলে মনের একটু স্ফুর্ত্তি হয়। বাতাস আসে আমের বোল কাঁপিয়ে; বাতাস আসে দূর হ'তে কোকিলের স্বর ব'হে নিয়ে। এ বাতাসে সকলের মন মোহিত হইয়া যায়। কুঁদফুলে বাগান আলো ক'রে রয়েছে; দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রসিকা যুবতী হাসিতেছে। এ সময়ের পাহাড়গুলি দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। পাহাড়ের চারিদিকে ফুলের গাছ ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে; কোকিলের ডাক পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যেখানে তক্তার মত বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, সেইখানেই শিলাজতু বাহির হইয়া গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। এই সময়ে বসন্তের সহচর অনঙ্গ তোমাদের মঙ্গল করুন। আম্রের মনোহর মঞ্জরী তাঁহার শর হইয়াছে, পলাশের ফুল তাঁহার ধনু হইয়াছে, ভ্রমরকুল তাঁহার জ্যা হইয়াছে। নহিলে ধনুকের ছিলা টানিলে গুন্ গুন্ শব্দ হয় কেন? চন্দ্র তাঁহার শ্বেতছত্র হইয়াছে। মলয়ানিল তাঁহার মত্ত হস্তী হইয়াছে, কোকিলেরা তাঁহার স্তুতিপাঠক হইয়াছে, এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের বলে তিনি সর্ব্বলোক জয় করিতেছেন।

এই এক রকম বর্ণনা; যেমনটী দেখা তেমনটীই লেখা। সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল কালিদাসের কবিত্ব মাত্র। সে কবিত্ব এখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই; এখনও উপমার বাহার নাই, উৎপ্রেক্ষার চটক নাই, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই।

মালবিকাগ্নিমিত্রের বসন্ত-বর্ণনা

মালবিকাগ্নিমিত্রের ৩য় অঙ্কে রাজা বিদূষকের সহিত প্রমোদকাননে আসিতেছেন। ২য় অঙ্কে তাঁহার মালবিকার সহিত দেখা হইয়াছে, তিনি মালবিকার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রণয়িনী ইরাবতীকে তাঁহার আর মনে ধরিতেছে না। যাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি দাসীকে রাণী করিয়াছিলেন, সেই ইরাবতী তাঁহাকে আজি বসন্তের প্রথম উপহার দিবে বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দু'জনে দোলায় চড়িয়া দোল খাইবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রাজা প্রমোদ-বনে যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার পা উঠিতেছে না, মন সরিতেছে না; কারণ ইরাবতী যদি কোনরূপে টের পায় রাজার মন অন্যের প্রতি আসক্ত, তাহা হইলে সে প্রমাদ করিয়া ফেলিবে। রাজা বরং তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন না, কিন্তু তবুও তাহার কাছে ধরা দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিদূষক বরং রাজাকে বলিলেন, "রাণীদের সকলের উপরেই আপনার সমান ভাব থাকা উচিত।" রাজা কহিলেন, "তবে চল"।

এইখানে প্রমোদবনে বসন্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইল। বিদূষক বলিলেন, "প্রমোদবন যে পল্লব-অঙ্গুলি নাড়িয়া আপনি "শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন" বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে।" এই সময়ে বসন্তের হাওয়া রাজার গায়ে লাগিল। রাজা বলিলেন, "বসন্ত বড় উচ্চবংশ-জাত, বড় সহৃদয়। সে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেমন মদন-বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছ ত? নহিলে কোকিলেরা অমন করিয়া ডাকিতেছে কেন? তাহারা উন্মত্ত হইয়া ডাকিতেছে, আমার কান ভরিয়া যাইতেছে। বসন্তই কোকিলের মুখ দিয়া আমার বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আবার দেখ, আমের মুকুলের গন্ধে ভরিয়া মলয়মারুত আমার গায়ে লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন বসন্ত আমার বিরহজ্বালা নিভাইবার জন্য আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।"

বিদূষক প্রমোদবনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বয়স্য দেখ দেখ বসন্তলক্ষ্মী যেন তোমার মন ভুলাইবার জন্যই ফুলের গহনা পরিয়া আছে। যুবতীর বেশ এ বেশের কাছে কোথায় লাগে? রাজা বলিলেন, দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। ঠাকুরাণীরা রাঙ্গা ঠোঁটে আলতা পরেন, কিন্তু এক অশোকফুলেই বসন্তলক্ষ্মী সে আলতার উপরে উঠিয়াছেন। আর এই যে কুরুবকের ফুল,—কোনটী কাল—কোনটী শাদা—কোনটী রাঙ্গা—ঠাকুরাণীরা যে অলকা তিলকা পরেন সে কি এর কাছে লাগে? তাঁহারা যে তিলক কাটেন, সে তিলকে আর বসন্তের তিলক-ফুলে ঢের তফাৎ; বিশেষ যখন সে ফুলে ভ্রমর গিয়া অঞ্জনের কাজ করে। স্ত্রীলোকেরা মুখের শোভা বৃদ্ধির জন্য যা কিছু করিয়া থাকেন, বসন্তলক্ষ্মী যেন সেগুলাকে অবজ্ঞা করিতেছেন।"

যখন মালবিকা তরুরাজিমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার দিকে আসিতেছেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "দেখ, ইহার গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, গাযে কয়েকখানি মাত্র গহনা রহিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ইনি বসন্তকালের কুন্দলতা। কুন্দলতা মাঘমাসে ফুলে ভরিয়া থাকে; যত বসন্ত আসিতে থাকে, ইহার ফুল আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। আর উহার সবুজ পাতাগুলি পাকিয়া শাদা হইয়া যায়।" সুতরাং মালবিকার এখনকার অবস্থার সহিত উহার তুলনা হইয়াছে।

মালবিকাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া যখন বিদূষক ইঙ্গিত করিলেন, 'এ তোমারই জন্য উৎকণ্ঠা', তখন রাজা বলিলেন, "মলয়মারুত গায়ে লাগিলেও অকারণে উৎকণ্ঠা হয়। কারণ মলয়-মারুত কুরুবকের ধূলি মাখিয়া সুবাসিত হয়; আর কচি কচি পাতাগুলির জোড় খুলিয়া ভিতর হইতে ঠাণ্ডা জলের কণা চুরি করিয়া ঠাণ্ডা হয়। মলয়মারুতই মালবিকার উৎকণ্ঠার কারণ।"

এই অঙ্কে মালবিকা আসিয়াছেন অশোকের দোহদ করিবার জন্য। যে অশোকগাছের ফুল ফুটে না, অথবা ফুল ফুটিতে দেরী হয়, কবিরা মনে করেন, কোন নিখুঁত সুন্দরী যদি সাজিয়া গুজিয়া নূপুর পরিয়া সেই অশোককে পদাঘাত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফুল ফুটে। তাই রাণী মালবিকা দাসীকে নিজের সাজসজ্জায় সাজাইয়া প্রমোদকাননে এইরূপ এক অশোকগাছে পদাঘাত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। মালবিকার সাজসজ্জায় বসন্তের ফুল, বসন্তের পল্লব, বসন্তের মুকুলও আছে। মালবিকার চরণস্পর্শমাত্র অশোকগাছ ফুলে ভরিয়া গেল। তাই দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অশোকের পল্লব লইয়া উনি কানের গহনা করিয়াছেন, আর তাহারই বদলে চরণখানি তাহাকে দিতেছেন। বেশ সমান সমান বিনিময় হইতেছে।"

এ সকলই বসন্ত বর্ণনা। ফুল, ফল, গাছপালার বর্ণনা ত আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা অনুরাগ প্রভৃতিও আছে। উৎকণ্ঠা অনুরাগের সঙ্গে ঈর্ষা দ্বেষও আছে। কিন্তু ঈর্ষা দ্বেষ মালবিকার নহে, ইরাবতীর। উভয়েই বসন্তকালে ক্রীড়া করিতে

আসিয়াছিলেন। যিনি স্বপ্নেও দুর্লভ পদার্থ পাইলেন, তিনি আনন্দে ভোর হইলেন; আর যিনি পাওয়া ধন হারাইলেন, তিনি ঈর্ষায় কলুষিত হইলেন।

কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনা

কুমারসম্ভবের বসন্ত অকাল বসন্ত। দারুণ শীতের মধ্যে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বসন্ত আসিল দেখিয়া, হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বসিয়া যাঁহারা যোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যোগের মহাবিঘ্ন উপস্থিত। সূর্য্য দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে গেলেন। দক্ষিণ দিক যেন প্রিয়বিরহে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাই একটু একটু গরম মলয় বাতাস বহিতে লাগিল। স্বয়ং মূর্ত্তিমান বসন্ত উপস্থিত, তাই অশোকগাছ আগাগোড়া ফুলে ভরিয়া গেল। যুবতীর পাদপ্রহারের জন্য অপেক্ষা করিল না। নূতন আমের মুকুল ফুটিয়া উঠিল, তাহার গোড়া হইতে গুটিকতক লাল কচি কচি পাতা বাহির হইল। তাহাতে ভ্রমর আসিয়া জুটিল, বোধ হইল যেন মদনের চোকা বাণ। পাতাগুলি বাণের পাখা, আর ভ্রমরগুলি ধনুকধারীর নামের অক্ষর। সোঁদালের ফুল ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল রঙে দিক আলো করিয়া রহিল। পলাশ ঘোরাল লাল, এখনও ফুটে নাই—বাঁকা হইয়া রহিয়াছে, যেন সুন্দরী যুবতীর গায়ে নখের দাগ রহিয়াছে। তিলক ফুল ফুটিয়াছে, তাহাতে সারি সারি ভ্রমর বসিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী মুখে অলকা তিলকা কাটিয়াছেন। আমের কচিপাতা বসন্তলক্ষ্মীর ওষ্ঠ, তাহাতে সূর্য্যের লাল কিরণ পড়িয়াছে, যেন তিনি লাল ঠোঁটে আলতা দিয়াছেন। পিয়াসাল গাছে মঞ্জরী বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রাশি রাশি ধূলা বাহির হইতেছে, বসন্তের আগমনে হরিণগুলা মদমত্ত হইয়া ঘুরিতেছে, আর তাহাদের চক্ষে সেই ধূলা পড়িতেছে; তাহারা বনের ভিতর দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের পায়ের চাপে তলায় পড়া শুকনা পাতাগুলি মড়্ মড়্ করিয়া শব্দ করিতেছে। কোকিলেরা আমের মুকুল খাইতেছে, কষা জিনিস খাওয়ায় তাহাদের গলা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে আর তাহারা কুহু কুহু রবে বন মাতাইয়া দিতেছে। যেসব গরবিণী মান করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান সেই কুহু-স্বর শুনিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কিন্নরীরা শীতকালে মুখে অলকা তিলকা কাটিয়াছিলেন, তখন একবার কাটিলে অনেক দিন থাকিত, এখন একটু গরম পড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে, আর অলকা তিলকাগুলি উঠিয়া পড়িতেছে।

পশুপক্ষীরাও বসন্তের প্রভাব অনুভব করিতে লাগিল এবং আপন আপন প্রিয়ার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ভ্রমর ভ্রমরীর সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর একই ফুলে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কৃষ্ণসার শিং দিয়া মৃগীর গা চুলকাইয়া দিতেছে আর মৃগী চক্ষু বুজিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে। হস্তিনী

পদ্মপুকুরের সুগন্ধি জল শুঁড়ে লইয়া অনুরাগভরে হস্তীকে দিতেছে, আর চক্রবাক একটী মৃণালের অর্দ্ধেক খাইয়া বাকী আধখানি চক্রবাকীকে দিতেছে। কিন্নরী ফুলের মদ খাইয়া গান ধরিয়াছে, তাহার চক্ষু ঘুরিতেছে, পরিশ্রমে ঘাম হইতেছে, অলকা তিলকাগুলি ফুলিয়া উঠিতেছে, কিন্নর সে মুখ দেখিয়া কি আর মনের বেগ সংবরণ করিতে পারে? লতা আসিয়া তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে, বড় বড় ফুলের থোকা তাহাদের স্তন, লাল লাল কচি কচি পাতাগুলি তাহাদের ওষ্ঠ হইয়াছে, আর তাহাদের শাখাগুলি হাতের মত নীচের দিকে ঝুলিতেছে। অপ্সরারা গীতি আরম্ভ করিয়াছেন।

এই ত হইল কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত-বর্ণনা। ইহার পর পার্ব্বতী আসিতেছেন। তিনিও কবির বসন্ত-বর্ণনে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার গায়ে অশোকফুলের গহনা—পদ্মরাগ মণি তাহার কাছে কোথায় লাগে। সোঁদালের ফুলের গহনা দেখিয়া কে বলিবে এ সোনার গহনা নয়? নিসিন্ধা ফুলের হার হইয়াছে যেন সত্য সত্যই মুক্তার হার। তিনি এত ফুলের গহনা পরিয়াছেন যে, ফুলের ভারে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বোধ হইতেছে যেন ফুলে ও পাতায় ভরা একটী লতা চলিয়া যাইতেছে। বকুলফুলে তাঁহার চন্দ্রহার হইয়াছে, সেটা যত পড়িয়া যাইতেছে তিনি ততই তাহাকে টানিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাসের গন্ধে অন্ধ হইয়া ভ্রমর তাঁহার মুখের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর তিনি হাতের পদ্ম দিয়া তাহাকে তাড়াইতেছেন।

রঘুবংশের বসন্ত-বর্ণনা

রঘুর নবম সর্গে কালিদাস আর একবার বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথ রাজা খুব ভাল রাজত্ব করিতেছেন দেখিয়া বসন্ত পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব কুবেরের দেশে যাইবার জন্যই যেন ঘোড়া ফিরাইয়া মলয়পর্ব্বত ত্যাগ করিলেন। বরফ গলিয়া গেল। প্রভাত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। যে বনে বড় বড় গাছ ছিল তাহাতে প্রথম ফুল ফুটিল, তাহার পর নূতন পাতা গজাইল। তাহার পর ভ্রমর ও কোকিল ডাকিয়া উঠিল। এইরূপে একের পর আর আসিয়া বসন্তকে প্রকাশ করিল, পলাশগাছে কুঁড়ি ধরিল, যেন তাহার গায়ে নখের দাগ পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব শিশির শুখাইয়া দিলেন, কারণ হিমে স্ত্রীলোকদিগের অধরে বড় যাতনা হয়, আর উহারা চন্দ্রহার পরিতে পারে না।

আমের শাখায় মঞ্জরী বাঁধিল। আর শাখাটী মলয় মারুতে দুলিতে লাগিল, বোধ হইল যেন সে ঋষিদিগেরও মন ভুলাইবার জন্য অভিনয় শিক্ষা করিতেছে। যেখানে যত ভ্রমর ছিল, আর জলে পাখী ছিল, তাহারা আসিয়া পদ্মবনের চারিদিকে জুটিল, কেননা পদ্মে এখন খুব মধু। এইরূপেই লোকের যখন খুব সম্পদ্‌ হয় তখন নানা লোকে তাহার নিকট উপকার পাইবার জন্য উপস্থিত হয়। অশোকতরুর ফুলই যে

কেবল লোকের মন উড়ু উড়ু করিয়া দেয় এমন নহে। উহার কচি কচি পাতাগুলিও স্ত্রীলোকের কাণে লাগাইয়া রাখিলে লোকের মন কেমন কেমন করিতে থাকে। কুরুবকের ফুল ফুটিল, বোধ হইল যেন বসন্ত উদ্যানলক্ষ্মীর মুখে অলকা তিলকা কাটিয়া দিলেন। কুরুবকে যথেষ্ট মধু আছে, মধুকরেরাও চারিদিকে খুব রব তুলিয়া দিল। মধুলুব্ধ মধুকরেরা লম্বা লম্বা সারি বাঁধিয়া বকুলগাছকে আকুল করিয়া তুলিল, কেননা তাহার ফুল ফুটিয়াছে। সে ফুলের গন্ধ সুগন্ধ মদের ন্যায়। সুন্দরীরা মদের গণ্ডুষ না দিলে ত তাহার ফুল ফুটে না। কুসুমিত বনরাজিতে কোকিলের প্রথম ডাক শোনা গেল—যেন নূতন বৌ দু'টী একটী কথা কহিতেছে। উপবনের লতাগুলিতে নূতন কচি পাতা বাহির হইয়াছে, তাহাতে বাতাস লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সে হাত দিয়া ভ্রমরের গানে লয় দিতেছে। ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মদ্য নিজের গন্ধে বকুলফুলের গন্ধকে পরাজয় করিয়াছে। মদ্যপান করিলে মনের ভাব নানারূপ হইয়া যায়, তাই স্ত্রীলোকে স্বামীর সহিত মদ্যপান করিতেছে। রাজবাড়ীর দীঘিগুলিতে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, নানাজাতীয় জলচর পক্ষী আনন্দভরে কলরব করিতে করিতে তাহার উপর সার বাঁধিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে দীঘিগুলি যেন রমণী সাজিয়াছে; পদ্মগুলি তাহাদের হাসি হাসি মুখ, আর পাখীর সারগুলি তাহাদের চন্দ্রহার, শব্দ করিতেছে আর ধনুর আকারে বাঁকিয়া পড়িয়াছে। বসন্তের আগমনে রজনী কৃশ হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর আবার চন্দ্রের উদয়ে তাঁহার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন প্রিয়বিরহে কোন বধূ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছেন ও তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। হিমের কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, চন্দ্রের কিরণ পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্র যেন এই সকল কিরণের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধি করিতেছে। আহুতি প্রদান করিলে প্রজ্জলিত অগ্নির যেরূপ রং হয়, সোঁদাল ফুলের রং তেমনি হইয়াছে; উহা এখন সোনার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছে। উহার পাপড়ী দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়, উহার কেশর দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। তাই মনের মানুষ যখন রমণীর ঝাপটায় ঐ ফুল ঝুলাইয়া দিতেছেন, তিনি মনের আনন্দে তাহা ধারণ করিতেছেন। বনস্থলীতে তিলকফুলের গাছ রহিয়াছে। উহাতে শাদাফুল সারি দিয়া ফুটিয়া আছে, তাহাতে কাজলের ন্যায় কাল ভ্রমরের দল পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন একটী স্ত্রীলোকের মুখে অলকা তিলকা কাটা হইয়াছে। নবমল্লিকা মধুরগন্ধে মন মাতাইয়া দিতেছে, তাঁহার ফুল ফুটিয়াছে, তিনি যেন বিলাসভরে তরুর উপর উঠিয়া হাসিতেছেন। আর কচি কচি লাল পাতাগুলির উপর ফুলের আভা পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনীর অধরে হাসি খেলিতেছে। এ সময়ে নূতন কচি পাতাগুলি লাল হইয়া উঠিতেছে, যবের অঙ্কুরগুলি স্ত্রীলোকেরা কানে পরিতেছে। কোকিলেরা কুহু কুহু করিয়া দেশ মাতাইতেছে, এসময়ে কি বিলাসীরা স্থির থাকিতে

পারে? তিলক গাছের মঞ্জরীতে শাদা শাদা ফুল ফুটিয়াছে। চারিদিকে পরাগ উড়িতেছে, তাহাতে মঞ্জরীর দেহ যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর সারি সারি ভ্রমর আসিয়া বসিতেছে। বোধ হইতেছে যেন কোন রমণীর কাল ঝাপটায় সারি সারি মুক্তার মালা রহিয়াছে। মুক্তাগুলি খুব উজ্জ্বল, তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোক বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অলকগুলি ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইতেছে। উপবনে মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের কেশর হইতে রেণু উড়িয়া দিগন্ত ব্যাপ্ত করিতেছে; সে রেণুরাশি ধনুকধারী মদনের পতাকার ন্যায় দেখা যাইতেছে, এবং সেই রেণুতে বসন্তলক্ষ্মী মুখময় যেন পাউডার মাখিয়া সাজিয়া বসিয়া আছেন। ক্রমে দোল আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক যুবতী দোলায় দুলিতে গেলেন। যুবতী দোলার দড়ী ধরিতে বেশ পটু, তথাপি তিনি ভাণ করিতে লাগিলেন, তাহার হাত যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, তিনি যেন দড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছা, প্রিয়ের কণ্ঠধারণ করিয়া তিনি দোল খান। গরবিণী মান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কোকিল ডাকিল। সে ডাকে যেন বলিল, মানিনী, মান ত্যাগ কর, মিছে কেন ঝগড়া কর, এ যৌবন বড় চঞ্চল, একবার যাইলে আর ফিরিয়া আসিবে না, অতএব মান আর রেখ না। কোকিলার ডাকে এই কথাটা শুনিয়া মানিনী আপনিই মান ত্যাগ করিলেন, আবার উভয়ের মিলন হইয়া গেল।

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটী জায়গারই ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিলাম। ব্যাখ্যা মানে ব্যাকরণ লাগাইয়া নয়, বাদার্থ লাগাইয়া নয়, অলঙ্কার লাগাইয়া নয়, ছন্দ লাগাইয়া নয়, অভিধান লাগাইয়াও নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত কালিদাসের কবিত্ব মিলাইবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালিদাস কি চক্ষে স্বভাবের শোভা দেখিতেন, তাই বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালিদাস কত যত্ন করিয়া, কত নিপুণ হইয়া প্রকৃতির কার্য্যকলাপ দেখিতেন, কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছোট বড় সব প্রকারের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্যই এই প্রস্তাব।

কালিদাস অল্প বয়সে এমন কি তাঁহার পড়িবার সময়েই ঋতুসংহার লিখেন। তাঁহার যেদেশে বাড়ী, সেদেশের কবিদের ঋতুবর্ণনা একটা রোগ ছিল। লোকে শিলালেখ লিখে, কোন ধর্ম্ম করিলে তাহার স্মরণার্থ। শিলালেখ লিখিলেই তাহাতে তারিখ দিতে হয়, প্রথম বৎসর, তাহার পর মাস, তাহার পর মাসের দিন। কালিদাসের দেশের কবিরা তারিখ দিতে গিয়া সেই ফাঁকে একটু ঋতুবর্ণনা করিতেন। আমরা খ্রীঃ ৪০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীঃ ৫৩৩ পর্য্যন্ত যতগুলি শিলালেখ পাইয়াছি,

তাহার সকলগুলিতেই ঋতুবর্ণনা। কালিদাস সেই দেশেরই লোক, তিনিই বা ছাড়িবেন কেন, সমস্ত ঋতুগুলির বর্ণনা লইয়া তিনিও একখানি বই লিখিলেন। অন্য ঋতুর বর্ণনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা বসন্ত ঋতুর কথাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋতুসংহারে যেমনটী দেখা, তেমনই লেখা—দেখাও তাঁহার নিজের বাড়ীর কাছেই। এখনও তাঁহার হাত পাকে নাই, তিনি নবিস্ মাত্র। দেশের রোগও তিনি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই, ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় তিনি অতিমুক্তলতার খুব জাঁকাল বর্ণনা করিয়াছেন। এই লতা মাধবীলতার মত। বিশেষের মধ্যে এই, রাত্রি ৪টার সময় ফুটিয়া অতিমুক্ত বেলা ৮টার মধ্যেই ঝরিয়া যায়, তাই এ'র নাম অতিমুক্তলতা। মালবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইহা দেখা যায়। কালিদাস বসন্তবর্ণনায় ঋতুসংহারেরই অতিমুক্তলতার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কুমার, রঘু কি মালবিকাগ্নিমিত্র—ইহার কোনটীতেই অতিমুক্তলতা নাই। মালবিকা পূর্ব্বমালবের জিনিস, কালিদাস সেখানেও অতিমুক্তলতার বর্ণনা করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাস নিজের বাড়ী বসিয়াই যেমনটী দেখিয়াছিলেন তেমনই লিখিয়াছেন।

ঋতুসংহারে হেমন্তবর্ণনায় কালিদাস প্রিয়ঙ্গুর নাম করিয়াছেন, প্রিয়ঙ্গু তাঁহার দেশে জন্মিত। বর্ষায় গাছ হইত, শরতে উহার খুব শ্রীবৃদ্ধি হইত, প্রতি ডালে আগাগোড়া ফুল ফুটিত, ডাল উচা হইয়া থাকিত, ঠিক যেন স্ত্রীলোকের একখানি হাত —আগাগোড়া গহনাপরা। হেমন্তে গাছ শুকাইয়া যাইত, পাতা হলুদ বর্ণ হইয়া যাইত বোধ হইত যেন প্রিয়বিরহেই শুকাইয়া যাইতেছে। প্রিয়ঙ্গু কালিদাসের দেশে যথেষ্ট হইত, তাই তিনি বসন্তকালেও উহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বসন্তবর্ণনায় তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক ও কুঙ্কুম ঘষিয়া স্তনে লেপ দিতেছে।

তাঁহার হাত যে এখনও পাকে নাই, তাহার এই, তিনি বসন্তে কুন্দফুলের খুব বর্ণনা করিয়াছেন। ঋতুসংহারে তিনি বলিতেছেন, কুন্দফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। কুন্দলতা কিন্তু বসন্তে বাগান আলো করার মত কখনই ফুটে না, শীতেই এইরূপ হয়। তাই তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে কথাটা সারিয়া লইয়া বলিলেন—

মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা ॥

কুমারসম্ভব কি রঘুবংশে উহার নামও করিলেন না।

ঋতুসংহারে বসন্তঋতু যেন বিলাসিনীদের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সুতরাং সেইদিকের বর্ণনাই বেশী। অন্যত্র বিলাসিনীদের এত ছড়াছড়ি নাই। রূপকও ঋতুসংহারেই বেশী। প্রথমেও তিনি বসন্তকে যোদ্ধা সাজাইয়াছেন, শেষেও যোদ্ধবেশেই তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন।

ক্রমশঃ বসন্তবর্ণনায় কালিদাসের কেমন হাত পাকিয়া উঠিল, তাহাই তুলনা করিয়া দেখাইব।

ঋঃ সং গুঞ্জন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ
প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥

কুঃ সং মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।

কুমারসম্ভবে অনুরাগের ভর কত বেশী।

ঋঃ সং পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ
কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন
পর্য্যাকুলং কুলগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্ ॥

কুঃ সং চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥

রঃ বং ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ
ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে
স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥

কোকিল আর ভ্রমর উভয়ে মিলিয়া মধুর স্বরে কুলবতীর মন উচাটন করিয়া দিল। এটী নিশ্চয়ই প্রথম বয়সের লেখা। অধিক বয়সে কালিদাস বুঝিলেন, মন উচাটন কোকিলের স্বরে যেমনটী হয়, তেমনটী ভ্রমরের স্বরে হয় না। তাই কুমার-সম্ভবে কালিদাস ভ্রমরকে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। কোকিলের কূজনেই মানিনীর মানভঞ্জন করিয়া দিল। কিন্তু কি কথায় মানভঞ্জন হইল, তাহা এখানে বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। সেকথাটী রঘুবংশে প্রকাশ পাইল। যখন রঘুবংশ লেখা হয়, তখন কালিদাসের বয়স অনেক গড়াইয়া গিয়াছে। কারণ অল্প বয়সে, এমন কি চল্লিশের পূর্ব্বে "চতুর বয়স একবার গেলে আর ফিরিবার নয়" একথা কাহারও মনেই আসে না। অনেকে নাক সিটকাইয়া বলিবেন, "ছিঃ মানভঞ্জনের কথায় বৈরাগ্যের কথাটা তুলা ভাল হইয়াছে কি?" তাহার উত্তর এই যে মানভঞ্জনই দরকার, তা "যেন তেন প্রকারেন"। এইরূপ তুলনায় কিরূপে ক্রমে ক্রমে কালিদাসের হাত পাকিয়াছিল, আমরা তাহার উদাহরণ দিলাম।

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কালিদাসের হাত ক্রমে পাকিয়াছে। ঋতুসংহারে তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করেন নাই। বসন্তে যেমন ফুল ফুটে, কোকিল ডাকে, ভ্রমর ভ্রমরী একসঙ্গে বেড়ায়, যেমনটী স্বভাবে দেখা যায়, তাহাই তিনি বর্ণনা

করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বভাববর্ণনা মাত্র। তাহারা মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরে। কুসুমফুলের রঙে কাপড় ছোপায়, অঙ্গরাগ করে, চন্দ্রহার পরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকাগ্নিমিত্রেই প্রথম স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বভাব-সৌন্দর্য্যের তুলনা দেখা যায়। এ তুলনায় স্বভাবের সৌন্দর্য্যই বড়, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য তাহার কাছে লাগে না। স্বভাবকবি এখনও স্বভাব লইয়াই মত্ত—স্ত্রীলোকের শোভা তাঁহার মনে ধরে না। কুমারসম্ভবে আর একটী ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে স্বভাবের শোভা ও স্ত্রীলোকের শোভায় খুব একটা মিশামিশি ভাব। কোন্‌টী বড় কোন্‌টী ছোট, কবি এখন ধেঁাকা পড়িয়াছেন। তাই খানিক স্বভাব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন—

কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং
দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ

এই বলিয়া তিনি ভ্রমর-ভ্রমরী, মৃগ-মৃগী, হস্তি-হস্তিনী, চক্রবাক্‌-চক্রবাকী, কিন্নর-কিন্নরী—প্রভৃতির প্রেমময় ভাব বর্ণনা করিলেন। এমন কি বৃক্ষলতাকেও নায়ক-নায়িকা সাজাইয়া বর্ণনা করিলেন। এই যে প্রেমের ভাব, ইহাতে স্ত্রীসৌন্দর্য্যের উপর কবির যথেষ্ট আস্থা প্রকাশ পাইতেছে।

আবার পটপরিবর্ত্তন কর। রঘুবংশে দেখ সমস্ত স্বভাব স্ত্রীলোকের নিকট সৌন্দর্য্য শিক্ষা করিতেছে—কেহ বা অভিনয়, কেহ বা তাল দেওয়া শিখিতেছে। এখানে স্ত্রীসৌন্দর্য্যই প্রধান, স্বভাব-সৌন্দর্য্য তাহার পশ্চাতে। এতদিন স্ত্রীসৌন্দর্য্য উপমেয় ছিল, স্বভাব-সৌন্দর্য্য উপমান ছিল। এখন স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইল উপমেয়, আর স্ত্রীসৌন্দর্য্য উপমান।

এই এক বসন্ত-বর্ণনার তুলনা করিয়াই আমাদের বেশ বোধ হয় যে, কালিদাস অতি অল্প বয়সেই ঋতুসংহার লিখিয়াছিলেন; তাহার পর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মাতিয়া মালবিকাগ্নিমিত্র বাহির করেন; ক্রমে, হয় ত বিবাহের পর, মেঘদূতে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন; বয়স পাকিয়া আসিলে কুমারসম্ভবে স্বভাব-সৌন্দর্য্য ও স্ত্রীসৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করেন, এবং শেষ বয়সে, রঘুবংশে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের উপর স্ত্রীসৌন্দর্য্য দাঁড় করাইয়া দেখাইলেন।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২২

ইরাবতী

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ইরাবতী এক সময়ে পাটরাণী ধারিণীর দাসী ছিল। কিন্তু তাহার চেহারাখানি ভাল; সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, বেশ একটু রসিকতা করিতেও জানে। ক্রমে সে রাজার নজরে পড়িয়া গেল। সেকালে বহুবিবাহ দোষের ছিল না, রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিয়া দিলেন। একেবারে দাসী হইতে রাণী! ইরাবতীর মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গেল, তাহার উপর সে আবার একটু মদ ধরিল এবং সকলের উপর একটু প্রভুত্বও করিতে লাগিল। রাজার আদরের রাণী, সকলেই মজিয়া থাকিল।

ইরাবতী তো দাসী। সে রাজা রাজড়ার চাল কি বুঝিবে? পাটরাণী ধারিণী ইরাবতীর সর্ব্বনাশের জন্য একটু চাল চালিলেন। যাহাতে ইরাবতীর উন্নতি, তিনি তাহাতেই ইরাবতীর অধোগতির উপায় করিলেন। তাঁহার এক ভাই ছিলেন রাজার সেনাপতি। তিনি বনের ভিতর ডাকাতের হাত থেকে একটী মেয়ে উদ্ধার করেন। সে মেয়েটী তিনি আপনার ভগিনীকে উপহার দেন। ভগিনী অর্থাৎ রাণী দেখিলেন মেয়েটী বড় সুন্দরী, বেশ বুদ্ধিমতী, একটু আধটু নাচ গানও জানে। তিনি একজন ভাল নাট্যাচার্য্য আনিয়া মেয়েটীকে ভাল করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন, কেন শিখাইতে লাগিলেন কালিদাস কোথাও সেটী খুলিয়া বলিলেন না। কিন্তু প্রথমাঙ্কের প্রথম বিষ্কম্ভকে একজন চেটীর মুখে শুনাইয়া দিলেন, "বেশ্ বেশ্ এ যেন ইরাবতীকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।" সুতরাং রাণী যে ইরাবতীকেই অপদস্থ করিবার জন্য মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন, একথা চেটীরাও জানিত। কিন্তু ইরাবতী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। পাটরাণী ধারিণী ভাবিয়াছিলেন; একটা চাকরাণী রাণী হইয়া গিয়াছে, আর একটাকে রাণী করিয়া ওটাকে সরাইব। পাটরাণী মালবিকাকে খুব লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা যাহাতে কিছুতেই টের না পান। সে নাচগানে খুব পরিপক্ক হইলে তাহাকে রাজার সামনে যাইতে দিবেন।

কিন্তু দৈব মালবিকার অনুকূল। রাজা একদিন পাটরাণীর ঘরে তাহার একখানি ছবি দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে?" রাণী কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, রাজার

একটী ছোট মেয়ে বলিয়া দিল, 'ও মালবিকা।' রাজা বিদূষকের সাহায্যে মালবিকাকে দেখিলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এখন ইরাবতীকে তাঁর আর মনে ধরে না।

বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। ইরাবতী প্রমোদ-কাননে শোভা দেখিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বসন্তের প্রথম ফুল লাল কুরুবক বা ঝাঁটি ভেট্ পাঠাইলেন, আর বলিয়া পাঠাইলেন, 'রাজা যদি আসেন দু'জনে একবার দোলায় চড়িব।' রাজা শুনিয়াই বিদূষককে বলিলেন, "না—যাওয়া হবে না। আমার মন যখন অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তখন ইরাবতী সেটা নিশ্চয়ই টের পাইবে, আর টের পাইলে রক্ষা থাকিবে না।" বিদূষক বলিল, "সেও কি হয়? আপনাকে সব রাণীরই মন যোগাইয়া চলিতে হইবে।" রাজা খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে চল।" যাইতে যাইতে প্রমোদ-কাননের মধ্যেই মালবিকার সহিত রাজার দেখা হইয়া গেল। কবিরা বলেন, সুন্দরী যুবতী যদি আলতা পরিয়া সেই পায়ে অশোকগাছে লাথি মারে তবে তাতে ফুল ফুটে। প্রমোদ-কাননের এক অশোকগাছে কিছুতেই ফুল ফুটে না। কথাটা ছিল রাণী ধারিণী একদিন আসিয়া ঐ গাছে পদাঘাত করিবেন। কিন্তু দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিলেন না। তাই তিনি মালবিকাকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সখী বকুলাবলিকা তাঁহার পায়ে আলতা পরাইতেছেন। তিনি একটা গাছের ছায়ায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া আছেন। রাজা ও বিদূষক তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া লতার আড়ালে গেলেন। গিয়াই বিদূষক বলিলেন, "নিকটে বোধ হয় ইরাবতীও আছেন।" রাজা বলিলেন, "হাতী জলে পড়িয়া যদি কমলিনী পায়, তবে কি আর সে হাঙ্গরের ভয় করে?"

ইরাবতী এখনও রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন নাই। প্রবেশ করিলে রাজা তাঁহার কিরূপ আদর করিবেন, কবি এখন হইতেই তাহার একটু নমুনা দিয়া রাখিলেন। ক্রমে মালবিকার দু'পায়েই আলতা পরান হইল। রাজা বলিলেন, "এ আলতাপরা পায়ে কা'কে কা'কে লাথি মারিতে পারে? হয় বাঁঝা অশোকগাছকে অথবা অপরাধী স্বামীকে?" বিদূষক বলিলেন, "তুমি অপরাধ করিতেছ, তোমাকেই মারিবে।" রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না।" রাজা যে ইরাবতীকে একেবারে সম্পূর্ণরূপ মন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, সেইটী আগে দেখাইয়া কবি ইরাবতীকে রঙ্গমঞ্চে আনিতেছেন।

ইরাবতীর তখন বেশ একটু নেশা হইয়াছে। সঙ্গে তাঁহার চেটী নিপুণিকা আছে, সেও বোধ হয় মদ খাইয়াছে। কেন না মদটা একা খেলে তত সুবিধা হয় না। ইরাবতী বলিতেছেন, "নিপুণিকা, লোকে যে বলে মদটা স্ত্রীলোকের ভূষণ, একথাটা কি সত্য?" নিপুণিকা বলিল, "প্রথম একটা কথার কথা ছিল, কিন্তু এখন সত্য হইয়াছে।"

"তুমি একথাটা আমার প্রতি স্নেহ আছে বলেই বলিতেছ; সে যা হোক, এখন বল দেখি, আমার আগে রাজা দোলাঘরে গিয়াছেন কি না সেটা কেমন করিয়া জানিব।"

"আপনার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে কি আর বুঝিতে বাকী থাকে?"

"মন যোগান কথা কো'য়ো না, অপক্ষপাতে কথা কও।"

"বিদূষক লাড়ু খাইবার লোভে একথা আগেই বলিয়া গিয়াছে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" তাড়তাড়ি চলিতে গিয়া ইরাবতী টলিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "আমার হৃদয় তো তাড়াতাড়ি করিতে চায়, কিন্তু আমার চরণ যে চলে না।"

"এই তো দোলাঘরে এসেছি—"

"নিপুণিকা, কই আর্য্যপুত্রকে তো দেখিতেছি না।"

"আপনি ভাল ক'রে দেখুন, হয় ত আপনাকে পরিহাস করিবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন; আমরা প্রিয়ঙ্গু-লতার বেড় দেওয়া এই অশোক গাছের তলায় পাথরের উপর বসি।"

ইরাবতীর মনে রাজার প্রতি অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এখনও জানেন রাজা তাঁহারই আছেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, রাজা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন, আগেই আসিবেন। যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন বলিলেন, কোথা ও লুকাইয়া আছেন। খুঁজিতে লাগিলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবি, দেখুন আমের বোল খুঁজতে গিয়ে পিঁপড়েয় কামড়াল।"

"সে কি?"

"অশোক গাছের ছায়ায় বকুলাবলিকা মালবিকার পায়ে আলতা পরাইতেছে।"

ইরাবতীর একটু সন্দেহ হইল, "সে কি! এ ত মালবিকার জায়গা নয়! সে কেমন ক'রে এল।"

"রাণীর পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তাই তিনি বোধ হয় উঁহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ এইটাই খুব সম্ভব।"

"আর কি স্বামীর অনুসন্ধান করিবেন?"

"আমার পা তো আর অন্যত্র যেতে চায় না। আমার মদের নেশা এসে পড়েছে। কিন্তু যখন সন্দেহ হয়েছে, এটার শেষ দেখে যেতে হবে।"

বেশ করিয়া মালবিকার মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আমার হৃদয় যে কাতর হয়েছে তা ঠিক। কারণ রাজা যদি এ চেহারা দেখেন, আমার উপর আর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিবে না।"

ক্রমে ইরাবতী সেইখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ বড়ই বাড়িয়া গেল। একবার বকুলাবলিকা বলিল, "মালবিকা, তোমার পা দুখানি যেন

লাল শতদল পদ্ম। তুমি যেন স্বামীর সোহাগের পাত্র হও।" শুনিয়া ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই, এ হল কি? ক্রমে তিনি শুনিতে লাগিলেন রাজা মালবিকায় আসক্ত, মালবিকাও রাজার প্রতি আসক্ত, আর বকুলাবলিকা বৃন্দে দূতী সাজিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কাটা তা হলে ঠিক্। যা হোক এখন তো সব টের পেলাম, এরপর যা করবার তা কর্‌ব।" তখনও ইরাবতীর সন্দেহটা যায় নাই, এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন পাটরাণীর হুকুমে অশোক গাছের জন্যই সে এসেছে। ক্রমে মালবিকা আসিয়া অশোক গাছে পদাঘাত করিল। রাজা বলিলেন, "অশোক গাছ ইঁহাকে কানের গহনা দেয়, ইনি তাহাকে চরণ দিলেন। লালে লালে বেশ বিনিময় হইয়া গেল। যা বঞ্চিত আমিই হলাম। আমার তো কিছু দেবার নাই।" ক্রমে রাজা লতার আড়াল হইতে আসিয়া মালবিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবি! রাজা যে আসিলেন।" ইরাবতী বলিলেন, "আমারও মনে মনে এই সন্দেহটাই হচ্ছিল যে রাজা এর ভিতর আছেন।" ক্রমে মালবিকা নমস্কার করিলে রাজা নিজহাতে তাহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "কঠিন গাছে তোমার এমন কোমল বাঁ পাখানি দিয়াছিলে, না জানি তোমার কত কষ্ট হইয়াছে।"

ইরাবতী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, বলিলেন, "আহাহা আর্য্যপুত্রের হৃদয় তো নয় যেন ননী।" মালবিকা এখন চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। বকুলাবলিকা বলিল, "রাজার অনুমতি লও।" রাজা বলিলেন, "যাবেই তো, আমার একবার ভিক্ষাটা শোন।" বকুলাবলিকা বলিল, "মন দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোন, বলুন তো আপনি।" রাজা বলিলেন, "আমার আর কাহাতেও রুচি নাই। অশোকের যেমন ফুল হইতেছে না, আমারও তেমনি আর ধৈর্য্য হয় না। অশোককে যেমন স্পর্শ করিয়াছ, আমাকেও তেমনিই স্পর্শ কর।" রাজার এই কথা যেমন বলা, আর অমনি ইরাবতীর সেইখানে আসা। আসিয়াই বলিলেন, "স্পর্শ কর, স্পর্শ কর, অশোকের ফুল তো ফুটল না, ইঁহার ফুল ফুটে উঠবে।" ইরাবতী বকুলাবলিকাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আর্য্যপুত্রের অভিলাষ পূরণ কর।" বকুলাবলিকা ও মালবিকা তো একেবারেই চম্পট। রাজা বিদূষককে বলিলেন, "এখন উপায়।" বিদূষক বলিলেন, "জঙ্ঘাবল।"

ইরাবতী বলিলেন, "পুরুষের উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। হরিণী যেমন ব্যাধের গীতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ ইহার বঞ্চনা-বাক্যে আমি প্রতারিত হইয়াছি।" বিদূষক বলিলেন, "বয়স্য হাতেনাতে ধরা পড়েছ। এখন আর উপায় নাই, যাহা হয় একটা কল্পনা ক'রে বল।" রাজা বলিলেন, "সুন্দরি, মালবিকার সঙ্গে আমার কি? তোমার দেরী হচ্ছে দেখে কোন রকমে সময় কাটাচ্ছি।"

"আপনি অবিশ্বাসের কাজ করেছেন। আপনি যে সময় কাটাবার এমন উপায়

পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না। জানিলে, আমি চিরদুঃখিনী, কখনও এমন কর্ম্ম করিতাম না।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন রাণী, রাজা সকল রাণীকে সমান দেখেন, তা যদি তিনি সম্মুখে পড়িলে দেবীর পরিজনের সঙ্গে দু'টো কথাবার্ত্তা কন্, সেটা কি অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে? তাহলে আপনার সঙ্গেও ত কথাবার্ত্তা কহা হয় না।"

"কথাবার্ত্তাই হোক, আমি আর কেন আপনাকে কষ্ট দিই"—এই বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইরাবতীর চন্দ্রহার খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি তিনি চলিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমার একান্ত প্রণয়ী, আমার প্রতি তোমার নির্দ্দয় হওয়া ভাল দেখায় না।"

"তুমি শঠ, তোমার উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"আমায় শঠ বলিয়া তুমি অবহেলা করিতে পার, কিন্তু তোমার চন্দ্রহার তোমার পায়ে জড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে, তুমি রাগ করিও না।"

"এ হতভাগাও দেখিতেছি তোমারি পথে যাইতেছে"—এই বলিয়া চন্দ্রহার তুলিয়া লইলেন এবং রাজাকে তাহার বাড়ী মারিতে উদ্যত হইলেন।

একে ইরাবতী সুন্দরী, তাহাতে বেশ একটু মদে মুখ লাল হইয়াছে, তাহার উপর তিনি রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছেন, হাতে চন্দ্রহার উচাইয়া মারিতে যাইতেছেন—এ অবস্থাতেও রাজা সেই রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—"এই ইরাবতী, ইঁহার চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল ঝরিতেছে। ইঁহার চন্দ্রহার খসিয়া পড়িয়াছে, ইনি রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া সেই চন্দ্রহার তুলিয়া আমায় প্রচণ্ডভাবে মারিতে আসিতেছেন—যেন মেঘমালা বিদ্যুতের দড়ী দিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতকে প্রহার করিতে আসিতেছে।"

"কেন তুমি বারবার আমায় অপরাধিনী করিতেছ?"

রাজা তাঁহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন, "আমি অপরাধ করিয়াছি, আমার দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া কেন থামিয়া যাইতেছ? তোমার হাবভাব ইহাতে আরও খুলিতেছে, দাসের প্রতি কেন তুমি রাগ করিতেছ। আমি এখন যাহা করিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমার মত আছে।"

এই বলিয়া তিনি ইরাবতীর চরণে পতিত হইলেন। ইরাবতী বলিয়া উঠিলেন—"এ ত মালবিকার চরণ নয় যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ও আনন্দের লহর তুলিয়া দিবে?"

এই বলিয়া তিনি সখীর সহিত চলিয়া গেলেন। বিদূষক ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বয়স্য উঠ, তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন।" রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া বলিলেন,—"কি? চলিয়া গিয়াছে?"

"তোমার অবিনয় দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন, এস আস্তে আস্তে সরিয়া যাই। কে জানে মঙ্গল গ্রহের মত আবার ঘুরিয়া সেই রাশিতে উপস্থিত না হয়।"

রাজা বলিতেছেন, "প্রণয় কি বিষম। আমার মন মালবিকায় আকৃষ্ট। আমি পায়ে পড়িলাম, তাতেও ইরাবতী প্রসন্ন হইল না, আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে। সে আমায় বড় ভালবাসিত, সে যখন রাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।"

এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইল। ইরাবতীরও এইখানে শেষ হইলে ভাল হইত। ইরাবতীর অপরাধ তিনি রাজাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিলেন, ভালবাসিয়া একটু উঁচাইয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পতন হইল। কবি কিন্তু এই পতন দেখাইয়া খুসী হইলেন না। কবিরা বড় নিষ্ঠুর, ইরাবতীকে আরও যন্ত্রণা দিবেন, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। ইরাবতী মনে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আর যে কখন রাজার ত্রিসীমানায় যাইবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যানও নাই। অত ভালবাসার এইরূপ পরিণাম হইলে যাওয়া যায়ও না। তবু তাঁহার কিছু কিছু সান্ত্বনা তো আছে? কবি সে সান্ত্বনার পথগুলিও বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতী ও নিপুণিকা আবার রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। আবার সেই দু'টী। নিপুণিকা খবর দিল, বিদূষক সমুদ্রগৃহের বারান্দায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, চন্দ্রিকা একথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। ইরাবতী বলিলেন, "একথাটা কি সত্য?" নিপুণিকা বলিল, "সত্য না হইলে কি আপনাকে বলিতে পারি?" "তবে এস আমরা যাই। বেচারা বড় বিপদে পড়িয়াছিল, তাহার খবর করি।" বিদূষককে সাপে কামড়াইয়াছিল।

"আপনার আরও কিছু বলিবার আছে বোধ হয়?"

"আছে বৈকি? সেখানে রাজার ছবি আছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং প্রসন্ন হইতে বলিব।" "এখনই কেন রাজার কাছে যান না?" "যাহার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে সে আসলের চেয়ে নকল অনেক ভাল। আমার সৌজন্যের একটু অভাব হইয়াছিল, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তা ছবির কাছেই ভাল।"

ইরাবতী এই কথা বলিয়া নিপুণিকাকে বুঝাইলেন বটে, কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। সমুদ্রঘরে রাজার একখানি ছবি ছিল। সেখানি ইরাবতীর বিবাহের দিনের ছবি। ইরাবতীর বর্ত্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। রাজা যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, সে আশা নাই। আবার যে ভালবাসিবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাঁহার সহিত দোলায় চড়িবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাঁহার সহিত প্রমোদ-কাননে বসন্তের ফুল দেখিয়া বেড়াইবেন, সে আশা নাই। কিন্তু তিনি ত রাজাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না? তিনি যে এখন রাণী। রাজা যে একদিন তাঁহাকে পায়ে রাখিয়াছিলেন, এখন ত তিনি দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে ভালবাসিতেই হইবে, কিন্তু এখনকার রাজাকে তিনি ভালবাসিতে পারেন না। এ রাজার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে, সুতরাং এ রাজা

ইরাবতীর কাছে কাঠ। তিনি বরং রাজার ছবির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু এ রাজার কাছে যাইবেন না। তাই তিনি সমুদ্রগৃহে তাঁহার বিবাহের দিনের রাজার ছবি দেখিতে যাইতেছিলেন। তিনি এখন অতীতের স্মৃতি লইয়া থাকিবেন। সেই সেকালের রাজাকে ভালবাসিবেন। তাঁহারই কাছে আপনার মনের কথা বলিবেন, তাঁহারই কাছে মাফ চাহিবেন। এই তাঁহার আশা, এই তাঁহার ভরসা, এই সুখেই তিনি যে কয়দিন বাঁচিবেন সুখী হইবেন, এই স্মৃতিই তাঁহার জীবন হইবে। নিষ্ঠুর কবি কালিদাস তাঁহাকে এ সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত করিবেন। যে সরিষা দিয়া ইরাবতী ভুত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কালিদাস সেই সরিষার মধ্যেই ভুত আনিয়া দিলেন।

নিপুণিকা ও ইরাবতী যাইতেছেন, এমন সময় পাটরাণীর এক চেটী আসিয়া ইরাবতীকে বলিল, "রাণী আপনাকে খবর দিয়াছেন যে এটা আমাদের সতীনিপনার সময় নহে। আমি তোমার প্রতি আদর দেখাইবার জন্য মালবিকা ও তাহার সখীকে আটক করিয়াছি। রাজার যদি কোন প্রিয় করিতে হয়, তুমি যখন বলিবে তখন করিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা বল।" চেটীর মুখে রাণীর এই আদরের খবর শুনিয়া ইরাবতী সত্য সত্যই গলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতেন রাণী তাঁহার সতীন, তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারিলেই তিনি খুসী হন।

তিনি তখন বলিলেন, "মহারাণীকে পরামর্শ দিবার আমরা কে? তিনি আপনার দাসীকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। আরও কথা, কার অনুগ্রহে আমি আছি, আমি বেড়েছি, আমি রাণী হয়েছি, সবই তো তাঁরই অনুগ্রহে।"

চেটী চলিয়া গেলে উহারা দু'জনে বিদূষকের কাছে গেল। দেখিল যে সে সমুদ্রগৃহের দুয়ারে বাজারে বলদের মত বসে বসেই ঘুমুচ্ছে। তাহাকে ওভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া ইরাবতীর ভয় হইল বুঝি বা এখনও বিষের শেষ আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহা নহে, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন। এমন সময় বিদূষক স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মালবিকা'। শুনিয়াই নিপুণিকা বলিল, এ হতভাগাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। চিরকাল আপনার স্বস্তিবাচনের মোয়া খেয়ে এখন কিনা মালবিকাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। এমন সময়ে বিদূষক আবার বলিয়া উঠিল, "তুমি ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" এটা আর নিপুণিকা সহ্য করিতে পারিল না। বিদূষকের এক হেঁতালের লাঠি ছিল, সেটা আঁকাবাঁকা ঠিক সাপের মত। নিপুণিকা থামের আড়ালে থাকিয়া সেই লাঠিগাছটা বিদূষকের গায়ে ফেলিয়া দিল। ইরাবতী ইহাতে বড় খুসী হইল, ভাবিল বেইমানের উপর উপদ্রব করাই উচিত।

লাঠি গায়ে পড়িবামাত্র বিদূষক "সাপ সাপ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "বয়স্য বয়স্য" বলিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিল। রাজা হঠাৎ সমুদ্রঘর হইতে বাহির

হইয়া আসিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই ভয় নাই।" সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাও আসিল, বলিল, "সাপ্ সাপ্ বলিতেছে, আপনি বাহির হইবেন না।" ইরাবতী রাজাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বকুলাবলিকা হঠাৎ বাহির হইয়া বলিল, "আপনি বাহির হইবেন না, সাপের মতই দেখা যাইতেছে।" ইরাবতী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। থামের আড়াল হইতে রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনারা দিনের বেলায় যে সঙ্কেত করিয়াছিলেন, সেটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে ত।" বকুলাবলিকাকে বলিলেন, "বেশ বেশ, তুই খুব দূতীগিরি করলি যা হোক্।"

রাজা বলিলেন, "তোমার দেখছি অদ্ভুত সৌজন্য।" শুনিয়াই বিদূষক বলিল, "রাজা আপনাকে দেখিয়াই আপনার পূর্ব্ব ব্যবহার সব ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি এখনও প্রসন্ন হন না কেন?" ইরাবতী বলিলেন, "আমি রাগ ক'রেই বা কি করব?" রাজা বলিলেন, "এ যে অস্থানে রাগ, এটা কি তোমার পক্ষে সাজে? বিনা কারণে তোমার মুখে কখনই ত রাগের চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলে কি কখন গ্রহণ উপস্থিত হয়?"

এ কথাগুলি ইরাবতীর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি অস্থানে রাগের কথা যা বলিয়াছেন তা ঠিক। আমার যে সৌভাগ্য ছিল, সে যখন অন্য জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, তখন যদি আমি রাগ করি লোকে যে হাসবে।" রাজা বলিলেন, "তুমি উল্টা মানে করলে, আমি এতে রাগের কোন কারণই দেখতে পাইনে। আজ আমাদের উৎসব, তাই সব কয়েদী খালাস দিয়াছি, এ দু'টী মেয়ে খালাস পেয়ে আমাদের নমস্কার করতে এসেছে।" রাজা একটা বাজে কথা কহিয়া ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিতে গেলেন, কিন্তু ইরাবতী ঠাণ্ডা হইলেন না। তাঁহার মনে হইল, রাণী ধারিণী যে খবর দিয়াছিলেন যে তিনি মালবিকাকে আটক করিয়াছেন, সেটা ঠিক নহে। তিনি নিপুণিকাকে বলিলেন, "তুমি দেবীর কাছে গিয়া বল, আমি তাঁর পক্ষপাত আজ বেশ বুঝতে পারলাম।" নিপুণিকা কিছু দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় মাধবিকার সহিত আমার দেখা হইল, সেই এই কথা বলিয়া গেল।" বলিয়া ইরাবতীর কানে কানে সব কথা বলিল। তখন ইরাবতী বুঝিলেন, রাণী যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। বিদূষক কৌশল করিয়া আটকান মেয়ে দু'টীকে বাহির করিয়া রাজার কাছে উপস্থিত করিয়াছে। সে বিদূষকের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি এখন রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী। এসকল ইহারই নীতি।" বিদূষক বলিল, "আমি যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে রাজাকে আমি কখন এমন কার্য্যে পাঠাতাম না।"

তৃতীয় অঙ্কের শেষে রাজাতে ও ইরাবতীতে এক রকম কাটান ছিড়ান হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতীর কপাল কেমন ভাঙ্গিয়াছে, সেটী দেখাইবার জন্য আর একবার রাজার সহিত তাঁহার দেখা হওয়া দরকার। তাই কালিদাস তাঁহাকে

সমুদ্রগৃহে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন সমুদ্রগৃহেই রাজা ও মালবিকা। যে স্মৃতিটুকু জাগাইবার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সে স্মৃতিটুকুও অন্ধকারময় হইয়া গেল। ইরাবতীর আর কিছুই রহিল না। তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই গেল; কিন্তু একটা কথা হইতেছে, রাজা ত তৃতীয় অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সঙ্গে কাটান ছিড়ান করিয়া আসিয়াছেন, আবার কেন ইরাবতীর খোসামোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে, ইরাবতী ও ধারিণী দু'জনে মিলিয়া মালবিকাকে আবার কষ্ট দিবেন। তাই তিনি ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার যে ভয় হইয়াছিল, সেটী বিদূষকের একটী কথায় প্রকাশ হইয়াছে। যখন ইরাবতী নিপুণিকাকে ধারিণীর নিকট পাঠাইলেন, তখন বিদূষক মনে মনে করিল—হায় হায় বাঁধন খুলে পায়রা বিড়ালের মুখে গিয়ে পড়ল।

কিন্তু ইরাবতী তেমন মেয়ে নয়। তিনি যে মালবিকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবেন, তাঁহার সে প্রকৃতিই নয়। তিনি আপনার সুখে আপনি মত্ত ছিলেন, এখন আপনার দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিলেন। সমস্ত বইখানায় ইরাবতী মালবিকার সহিত একটী বারও কথা কহেন নাই। বরং অশোকতলায় মালবিকার মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, এমুখ দেখিলে রাজা তাঁহাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন। ইরাবতী একেবারে ক্রূর, খল বা কপট নহেন। চতুর্থ অঙ্কের শেষে যখন জয়সেন আসিয়া খবর দিল, রাজার মেয়ে বসুলক্ষ্মী বানর দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছে এবং ক্রমাগত কাঁপিতেছে, তখন ইরাবতীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য দৌড়িলেন এবং রাজাকেও শীঘ্র যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

চতুর্থ অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সর্ব্বনাশ করিয়া পঞ্চমাঙ্কে কবি আর ইরাবতীকে আনিলেন না। রাণী কয়েক বার ইরাবতীর নাম রাজার কানে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু ইরাবতীর রঙ্গমঞ্চে আর আসিলেন না। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহাদি হইয়া গেলে নিপুণিকা আসিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ইরাবতী আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আপনার সম্মান রাখেন নাই, তজ্জন্য তিনি অপরাধিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীর অনুকূল কার্য্যই করা হইয়াছে এবং আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার মান রক্ষা করিবেন।" রাজা একথার কোন উত্তর দিলেন না। ইরাবতীকে আর তাঁহার মনে নাই। তিনি এখন মালবিকাময় হইয়া উঠিয়াছেন। এখন অপরাধিনী ইরাবতীরও যে দশা, নিরপরাধিনী সর্ব্বস্বত্যাগিনী মহারাণী ধারিণীরও সেই দশা। তাই তিনি নিপুণিকাকে জবাব দিলেন, "আর্য্যপুত্র তাঁহার সেবা জানিবেন।" নিপুণিকা, "অনুগৃহীত হইলাম" বলিয়া প্রস্থান করিল। যে ইরাবতীর সৌভাগ্য দেখিয়া এক সময় রাজপরিবারের সকলেই হিংসায় মরিত, সেই ইরাবতী একেবারে লোপ হইয়া গেলেন।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

পার্ব্বতীর প্রণয়

আমরা আজ কালিদাসের একটী প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখান এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে লোকে যে বলে কালিদাস বড় অশ্লীল সেই কথাটার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সত্য সত্যই কি কালিদাস অশ্লীল? সত্য সত্যই কি তাঁহার কাব্য পড়িলে লোকের মনে কুভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়? সত্য সত্যই কি তিনি স্থানে অস্থানে কেবল বখামীই করিয়া গিয়াছেন। আমার ত বোধ হয় তিনি তাহা করেন নাই। তিনি অতি বড় কবি। জগতের এমন সুন্দর পদার্থ কিছুই নাই যাহা তিনি বর্ণনা করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের মিলন জগতের একটা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর জিনিস, সুতরাং সে জিনিসটাও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে, বিক্রমোর্ব্বশীতে, শকুন্তলায় এই মিলনই মূলমন্ত্র; তাহার সঙ্গে আরও অনেক ভাল কথা আছে। কুমার ও রঘুতে সারা জগৎটাই আছে, তাহার মধ্যে এ মিলনও আছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন কালিদাস ঐ কথা বই আর অন্য কথা কহেন না, তাঁহারা বড়ই বাড়াবাড়ি করেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এক জায়গায় বাধ্য হইয়া কামকলার বর্ণনা করিয়াছেন। সে রঘুবংশের ঊনবিংশে— সর্গটীর নাম "অগ্নিবর্ণ—"। কিন্তু তাহার বর্ণনাও কত চাপা। একজন বড় রাজা, বয়স অল্প, রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাঁহার দেখা পায় না, প্রজারা দেখিবার জন্য বড় হৈচৈ করিলে জানালা দিয়া পা বাড়াইয়া দেন। তিনি উন্মাদের মত হইয়া কেবল স্ত্রীলোক লইয়াই আছেন। অথচ সেখানকার লেখা পড়িলে কালিদাস কত সাবধানে এই ভোগবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; অশ্লীলতায় তত নহে।

এইরূপ স্থলে অন্য কবিরা কি করিয়াছেন, যদি দেখা যায়, কালিদাসকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অষ্টাদশ সর্গে নলদময়ন্তীর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। সর্গের গোড়াতে তিনি বলিলেন, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রাদিতে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, আমি এমন সব জিনিস বর্ণনা করিব। বলিয়াই তিনি নলকে

দময়ন্তীর মহলে লইয়া গেলেন। মহলের প্রথমেই সব অদ্ভুত ছবি। প্রথমখানিতে ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান। তাহার পরই ইন্দ্র কিরূপে অহল্যা হরণ করিতেছেন তাহার নাটক, এইরূপ প্রায় কুড়িটী শ্লোক। তাহার পর নল দময়ন্তীর ঘরে গেলেন। সেখানকার সাজপাট সবই ঐ রকম। তাহার পর বিছানায় উঠিলেন, সখীরা সরিয়া গেল। এইখানেই থামিয়া গেলে আমার পক্ষে ভাল হইত। কিন্তু ঐ সর্গের ১৪০ হইতে ১৫২ শ্লোক এত ভয়ানক যে স্ত্রীপুরুষেও বসিয়া পড়া যায় না। যাঁহারা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের ছোট ছোট নভেলগুলি পড়িয়া নাক সিটকান, আর নারায়ণের নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া নৈষধের ঐ সর্গটী পড়িয়া দেখেন, বড় ভাল হয়। তাহার উপর আবার বলি, ঐ সর্গটী সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষার পাঠ্য। টোলে টোলে উহা পড়াইবার কথা। সংস্কৃত পরীক্ষার বোর্ড উহা পাঠ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি স্বয়ং আশুতোষ, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ উহার মেম্বর। টোলের এবং কলেজের অধ্যাপকগণও মেম্বর। শুনিলাম নাকি যিনি অশ্লীলতার উকীল সরকার, পবলিক প্রসিকিউটার, যিনি লোকের অশ্লীলতা লইয়া অনেকবার নালিসবন্দ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রস্তাবে ঐ সর্গ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এসব বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাস ত বাপের ঠাকুর। সত্য সত্যই ঋষি। তাঁহার বর্ণনা খুব চাপা—রঘুর উনবিংশ হইতেই একটী শ্লোক তুলিতেছি—

চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্।
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ॥ [১৯।২৫]

তিনি আরও দুই চারি জায়গায় বাধ্য হইয়া একটু একটু অশ্লীলতা আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অশ্লীল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বুঝিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছাত্রদের জন্য যে সকল এডিশন্ করিয়াছেন তাহাতে উহা বাদ দেন নাই। যথা—

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥ [কুমার, ৩।৩৯]

এসকল কবিতার তর্জ্জমা করিয়া দিলেও কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে, উহায় রুচিবিরুদ্ধ কোন জিনিস আছে। না বুঝাইয়া দিলে কেহ সেকথা বুঝিতে পারিবেন না।

না হয় মানিয়া লইলাম, কালিদাস যে প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রুচিবিরুদ্ধ কিছু না থাকিলেও ইহলোকের কথাই প্রবল। কিন্তু আমরা আজি যে কথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয়, বোধ হয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না? অন্য কবিদের ত কথাই নাই।

সে প্রণয় পার্ব্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি প্রণয়। যে প্রণয়ে দুয়ে মিশিয়া এক

হইয়া যায়, সেই প্রণয়। এই প্রণয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে, ইহার পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহার অলৌকিক ভাব বুঝিতে হইলে, আগে পার্ব্বতী কে ও শিব কে তাহা জানা আবশ্যক; নহিলে এ আকর্ষণের উদারতা বুঝা যাইবে না।

পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মহাদেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, দক্ষ তাহাতে বড় চটিয়া যান। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞে সকল দেবতার নিমন্ত্রণ হয়। মহাদেবের হয় না। দক্ষের কন্যা সতী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া বাপের বাড়ী যান। সেখানে দক্ষ শিবের অনেক নিন্দা করেন, সেই নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে মহাদেব শক্তিশূন্য হইলেন, তিনি সব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তপস্যায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার গণ নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি যা খুসী তাই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন মনছাল পায়ে মাখে, কখন নমেরুর ফুল দিয়া সাজসজ্জা করে, কখন ভূর্জ্জপত্রের কাপড় পরে, কখন শুয়ে থাকে, কখন বসে থাকে, কখন লাফালাফি করে।

মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়। তিনি ধ্যানেই মগ্ন থাকেন, গঙ্গার ধারে একটা দেবদারু গাছের তলায় থাকেন, মৃগনাভির গন্ধ সুঁকেন, বাঘছাল পরেন আর কিন্নরদের গান শুনেন। পার্ব্বতী ত মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছিলেন, আবার জন্মিয়াছেন। এবার তাঁহার পিতা হিমালয়, মাতা মেনকা, ভাই মৈনাক। তিনি একমাত্র কন্যা; বড় আদরের ধন। তাঁহার আদরের আরও কারণ এই যে, ইন্দ্র পাছে ডানা কাটিয়া দেন, এই ভয়ে তাঁহার ভাই জলেই ডুবিয়া থাকেন, বাড়ী আসিতে পারেন না।

পার্ব্বতী এবার বড়—বড় ঘরে জন্মিয়াছেন। কালিদাস প্রথমেই তাঁহার বাপের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সে বর্ণনায় সতরটী কবিতা খরচ করিয়াছেন। তিনি হিমালয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়, আমরা এবার সে বর্ণনার কথা বলিব না। তবে তিনি যে প্রকাণ্ড, তিনি যে পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন, সে কথাটা বলিতে হইবে, আর তিনি যে কত উঁচু সে কথাটাও বলিতে হইবে। তিনি মেরুর সখা অর্থাৎ মেরু যত উঁচু তিনিও তত উঁচু। সূর্য্য মেরুর যেমন চারিদিকে ঘোরেন, তাঁহারও তেমনি চারিদিকে ঘোরেন। তাঁহার শিখরে যে সব পুকুর আছে, সে পুকুরে ত পদ্ম হয়। কিন্তু সূর্য্য যদি নীচুর দিকে রহিলেন, তবে সেখানে পদ্ম ফোটে কি করিয়া। তাই কালিদাস বলিয়াছেন, সূর্য্য উপরের দিকে কিরণ পাঠাইয়া সে সব ফোটান, তাঁহার মাথা সূর্য্যমণ্ডলেরও উপর। এ ত তাঁহার স্থূল দেহ, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ একটী দেবতা। প্রজাপতি দেখিলেন, সোমের উৎপত্তি ত হিমালয় ছাড়া হয় না, তাই তিনি হিমালয়কে দেবতা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে যজ্ঞের একটা ভাগ দিলেন, সকল পর্ব্বতের রাজা করিয়া দিলেন। কালিদাস, যজ্ঞের ভাগ দিলেন, এইটুকু বলিয়াছেন, কি ভাগ দিলেন তাহা বলেন

নাই। বেদে আছে, যজ্ঞে যে হাতী মারা হয়, সেই হাতীটী হিমালয়ের ভাগ, সুতরাং প্রজাপতির সৃষ্টিতে যাহা কিছু বড় সকলই হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত।

এই যে এত বড় হিমালয়, ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে? এত বড় বরের এত বড় কনে নহিলে ত সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দ্যৌঃ আর পৃথিবী দুটীকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে এক জোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনও কখনও দ্বিবচনে "মেনে" বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটী ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ দিয়াছেন "আত্মানুরূপাং", অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকার বিবাহ, এ যে কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই যে দ্যাবাপৃথিবীর সহিত হিমালয়ের বিবাহ, এ বিবাহে প্রথম সন্তান মৈনাক অর্থাৎ সমুদ্রের পর্ব্বত। সেও বাপের মত দিগন্তবিস্তৃত, তবে সে হিমালয়ের মত অচল নহে। আজ এ-সমুদ্রে, কাল ও-সমুদ্রে তাহার প্রভাব দেখা যায়। তাই কবি বলিয়াছেন, সকল পর্ব্বতের ডানা কাটা গিয়াছে, মৈনাকের ডানা কাটা যায় নাই। সে লুকাইয়া সমুদ্রের মধ্যে আছে, এবং এখনও নড়িয়া বেড়াইতে পারে। পর্ব্বতের ডানা কাটা কথাটী নিতান্ত গাঁজাখুরী নহে। যে কেহ মুসুরীর বাজারে দাঁড়াইয়া একবার শিবালয় পর্ব্বতের দিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে হইয়াছে, যেন একসার ডানা-কাটা পায়রা পড়িয়া আছে।

হিমালয় ও মেনকার দ্বিতীয় সন্তান পার্ব্বতী। যেমন মা, যেমন বাপ, যেমন ভাই —মেয়েও তেমনি। তিনি জগৎ-জননী, তিনি আদ্যাশক্তি, সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে মহাদেব শক্তিশূন্য, কেবল ধ্যান করিতেছেন—আবার কবে আমার শক্তি আসিবে। কালিদাস বলিয়াছেন, "কেনাপি কামেন তপশ্চচার" [১।৫৭]। যিনি অন্যে তপস্যা করিলে তাহার পুরস্কার প্রদান করেন, তিনি আবার কিসের জন্য তপস্যা করিবেন। তাঁহার কি কামনা থাকিতে পারে? কোন অনির্ব্বচনীয় কামনা আছেই। সে কামনা আবার শক্তি লাভ। কালিদাস "কিম্" শব্দের "অনির্ব্বচনীয়" অর্থ আরও স্থানে স্থানে করিয়াছেন।

আরও একটা কথা—দেবতাদের একজন নূতন সেনাপতির দরকার। ব্রহ্মা তারকাসুরকে বর দিয়াছিলেন, "তুমি দেবগণের অবধ্য হইবে।" সুতরাং সে এখন প্রবল হইয়া দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করিয়াছে এবং নানারূপে তাঁহাদের কষ্ট দিতেছে। ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। মহাদেবের ছেলে হইলে

সেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু মহাদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি 'পরংজ্যোতিঃ', আমিও তাঁহার ঋদ্ধি ও তাঁহার প্রভাব ইয়ত্তা করিতে পারি না, বিষ্ণুও পারেন না। সুতরাং আমরা যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করাইব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তিনি উমার রূপে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহাতে হন, তোমরা তাহাই কর। তিনি আকৃষ্ট হইবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার ছেলে হইবে, সেই ছেলে তারকাসুরকে বধ করিবে।

এই পার্ব্বতী ও মহাদেবের প্রণয় আমাদের বর্ণনীয় পদার্থ। নারদ একদিন হিমালয়ের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকটে পার্ব্বতী রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এই মেয়েটী মহাদেবের একমাত্র পত্নী হইবেন এবং একদিন তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর লাভ করিবেন।" এই কথা শুনিয়া হিমালয় আর অন্য বরের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি ত আর যাচিয়া কন্যা দিতে পারেন না, তাহাতে আবার মহাদেব কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন, এ সময়ে বিবাহের কথাই হইতে পারে না। তাই তিনি একদিন মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমার এই মেয়েটী আপনার আরাধনা করিবেন, আপনি অনুমতি করুন।" মহাদেব বলিলেন, "আচ্ছা"; কেন, মহাদেব বেশ জানেন যে তাঁহার কিছুতেই চিত্তবিকার হইবে না।

পার্ব্বতী সেই অবধি অনন্য মনে মহাদেবের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহার পূজার ফুল তুলিয়া দেন, তাঁহার পূজার জায়গা করিয়া দেন, তাঁহার জল তুলিয়া দেন, তাঁহার কুশ আনিয়া দেন। এইরূপে নিত্যই তাঁহার সেবা করেন। মহাদেব তাঁহাকে কিরূপভাবে দেখেন সে কথা কবি বলেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন যে, পার্ব্বতী মহাদেবের মাথায় যে চন্দ্রকলা আছে তাহারই কিরণে আপনার ক্লান্তি দূর করেন। তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে ঐটুকুই এত সেবার পুরস্কার। মহাদেব তাঁহাকে তাঁহার কপালের চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিতে দেন, তাহাতেই পার্ব্বতী কৃতার্থ।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। কিন্তু দেবতাদের দেরী সয় না। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্র সভা করিয়া মদনকে ডাকিলেন। তাঁহাকে দেবতাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। বলিলেন, "তুমি একটা বাণ মারিয়া আমাদের রক্ষা কর।" মদন ভাবিলেন কাজটী খুব সোজা—তিনি বসন্তকে ডাকিলেন, রতিকে সঙ্গে লইলেন ও মহাদেবের আশ্রমে গিয়া পঁহুছিলেন। বসন্ত অকালে হিমালয়ে আবির্ভূত হইল। স্থাবর জঙ্গম সব আনন্দিত ও মিলনের আশায় উৎফুল্ল। আশ্রমের বাহিরে ফুল ফুটিল, পশু পক্ষী জোড় বাঁধিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্নর কিন্নরী গলা মিলাইয়া গান করিতে লাগিল। মহাদেবের গ্রাহ্যও নাই। তিনি যথাসময়ে ধ্যানস্থ হইলেন। নন্দী দেখিলেন, গণেরা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একটী আঙ্গুল মুখে তুলিয়া তাহাদের বলিয়া দিলেন, "ঠাণ্ডা হও"। অমনি গণেরা চুপ। বসন্তের সব জারিজুরি ভাঙ্গিয়া গেল। মদনও

পিছন হইতে বাণ উঁছাইতেছিলেন। কিন্তু মহাদেবের চেহারা দেখিয়াই তাঁহার হাত থেকে ধনুক ও বাণ পড়িয়া গেল; তাহা তিনি টেরও পাইলেন না। তাঁহারও জারিজুরি সব ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময়ে পার্ব্বতী আসিলেন। মদন লুকাইয়া নন্দীকে এড়াইয়া আশ্রমের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন। বসন্ত তাহাও পারেন নাই। তিনি এখন পার্ব্বতীকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহাকে ফুলের গহনা পরাইয়া, সেই সঙ্গে কোনও রূপে আশ্রমে আসিলেন। পার্ব্বতীও আসিলেন, মহাদেবেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। মদনেরও আশা হইল, ভরসা হইল। পার্ব্বতী রীতিমত পূজা করিলেন। তাহার পর একগাছি পদ্মের বীচির মালা লইয়া মহাদেবকে দিতে গেলেন, মহাদেবও হাত বাড়াইয়া লইলেন এবং "অনন্যসাধারণ পতি লাভ কর" ['অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি'] বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মদন ভাবিল, মাহেন্দ্রক্ষণ; সে বাণ জুড়িল। মহাদেবের মনের ভিতরে যে মন আছে তাহাতে একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন মদন, তাঁহার ক্রোধ হইল, তাঁহার কপালের চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইল, আর অমনি মদন ভস্মসাৎ। মহাদেবের রূপজ মোহ নাই, ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ নাই, তাই তিনি মোহের যিনি কর্ত্তা তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিলেন ও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বময়, কোথায় গেলেন কেহই জানিল না।

মদন যখন বাণ উঁছাইয়াছিলেন, তখন পার্ব্বতী মহাদেবের সম্মুখে, সে বাণে তাঁহারও রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মুখ হেঁট করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে তাঁহার বড় দুঃখ হইল যে, বাবার এত বড় আশা ব্যর্থ হইল। তিনি নিজ রূপের উপর ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং শূন্য মনে বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। সব ফুরাইয়া গেল। হিমালয়ের আশালতা নির্ম্মূল, দেবতাদের আশা নির্ম্মূল। মদন পুড়িয়া ছাই; রতি মূর্চ্ছিত। পার্ব্বতী কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

মহাদেব চোখের উপর মদনকে যখন ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, তখন আর কি আমার দিকে চাহিবেন, এই ভাবিয়া পার্ব্বতী বড় ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। বৃথা আমার রূপ হইয়াছিল, বলিয়া মনে মনে আপনার উপর তাঁহার বড়ই অবজ্ঞা হইল। আর সকল পথই ত বন্ধ; সুতরাং এখন তপস্যা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং তিনি তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মা ত শুনিয়া বার বার বারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন। জল নিম্নমুখ হইলে তাহার গতি যেমন রোধ করা যায় না, তেমনি যে মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহারও গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

ক্রমে কথা বাপের কানে পঁহুছিল। তিনি বড় খুসী হইলেন। এত কঠোর তপস্যা

না করিলে কি অমন স্বামী পাওয়া যায়। তপস্যায় অনুমতি দিলেন। পার্ব্বতীও তপোবন যাত্রা করিলেন। সেখানে, মাথাপোরা চুল ছিল তাহাতে জটা পড়িয়া গেল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা হইল, ভূমিতে শয্যা হইল। চক্ষের আর সে চঞ্চলভাব রহিল না। নিজেই জল তুলিয়া গাছে দিতে লাগিলেন। হরিণগুলিকে নিজ হাতে খাবার দিয়া বশ করিয়া লইলেন। তিনি যখন স্নান করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দিয়া বাঘছালের উড়ানি পরিয়া, বেদ পড়িতে বসিতেন, ঋষিরাও তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। ক্রমে তপোবন পবিত্র হইয়া উঠিল, জন্তুরা পরস্পর হিংসা ত্যাগ করিল, অতিথিসেবার জন্য ফলমূল তপোবনেই ফলিতে লাগিল, নূতন খড়ের ঘরে যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

ইহাতেও যখন মহাদেবের দয়া হইল না, তখন পার্ব্বতী আরও কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, মাথার উপর সূর্য্য, চারিদিকে চারিটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া পার্ব্বতী পঞ্চতপা করিলেন। তাঁহার চোখের কোলে কালি পড়িয়া গেল। উপবাসের পর তাঁহার পারণা হইত, আকাশের জল আর চন্দ্রের কিরণ। যখন বর্ষণ আসিল নূতন জল পড়িল, তাঁহার শরীর হইতে গরম বাহির হইতে লাগিল। তিনি ঘরে থাকা বন্ধ করিলেন, আকাশের তলায় পাথরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। পৌষ মাসে জলে ডুবিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মুখখানি পদ্মের মত জলের উপর ভাসিত। ঝরা পাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেই লোকে মনে করে, তপস্যার চরম হইল। কিন্তু পার্ব্বতী তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। পাতার এক সংস্কৃত নাম পর্ণ। পাতা খাওয়াও ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল অপর্ণা। তপস্বীরাও এত কঠোর করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থায় একদিন তাঁহার আশ্রমে একজন জটাধারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার পার্ব্বতীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। জটিলের চেহারাটী খুব ভাল। তিনি আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন, পার্ব্বতী ত যতদূর সম্ভব তাঁহার সৎকার করিলেন। জটিলও জমকাইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন—আপনি কেমন আছেন? আশ্রমের মঙ্গল ত? গাছপালা বেশ জল পায় ত? ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার এমন রূপ, তুমি এমন রাজার মেয়ে, তুমি তপস্যা কর কেন বল দেখি? কি কোন বরের কামনায়? আমি ত এমন কোন যুবক দেখি না যে তুমি কামনা করিলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে না করিবে। দেবতা চাও, তাহারা ত তোমার বাবার রাজ্যেই বাস করে। তোমায় হয়ত কেহ কোনও প্রকার অবমাননা করিয়াছে, তাই তুমি তপস্যা করিতেছ। তাহা ত বোধ হয় না; তুমি হিমালয়ের মেয়ে, তোমায় অপমান করিতে পারে এমন কে আছে? যাহাই হউক, তুমি বড়ই কষ্ট পাইতেছ। আমার একটা কথা আছে শোন, আমার অনেক সঞ্চিত তপস্যা আছে, তাহার অর্দ্ধেক তোমায় দিতেছি, তুমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লও।

জটিল যখন পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই মত কথা সব বলিল, তখন পার্ব্বতী সখীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, সে সকল কথা বলিল। পার্ব্বতী যে মহাদেবের প্রতি আসক্ত, তাহা সে প্রথম কথায়ই বলিয়া ফেলিল। বলিল, মহাদেবের হুঙ্কারে মদনের যে বাণ ছিটুকাইয়া পড়িয়াছিল সে বোধ হয় ইঁহারই হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে। সেই অবধি ইনি বড় উন্মনা হইয়াছেন। কিছুতেই ইঁহার শরীর শীতল হয় না। কিন্নরীরা যখন মহাদেবের চরিত গাহিতে থাকে, তখন ইনি ভাবাবেশে গাহিতে পারেন না, ইঁহার গলা ধরিয়া যায়, স্বর স্খলিত হয়, কিন্নরীরা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। শেষ রাত্রিতে অনেক বার স্বপ্নে মহাদেবকে পাইয়া "হে নীলকণ্ঠ তুমি কোথায়?" বলিয়া জাগিয়া উঠেন। তখন দেখা যায়, উঁহার হাত দুটী যেন কাহারও গলা জড়াইয়া আছে। অতি গোপনে নিজের হাতে মহাদেবের ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন, "তোমায় পণ্ডিতেরা 'সর্ব্বগত' বলেন; আমি যে তোমার তরে কাতরা, এটা কি তুমি জানিতে পার না?" ইনি এতকাল তপস্যা করিতেছেন যে উঁহার হস্তার্জ্জিত গাছেও ফল ধরিল। ইঁহার কিন্তু মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, হইবার কোনও লক্ষণও দেখা যায় না। কবে যে দেবাদিদেব সখীর প্রতি দয়া করিবেন জানি না। সখীরা আর উঁহার মুখের দিকে চাহিতেও পারে না।

জটিল এই সব কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, এ সব কথা কি সত্য? না পরিহাস?

পার্ব্বতী এতক্ষণ স্ফটিকের অক্ষমালা জপিতেছিলেন। এখন মালা ছড়াটী হাতের আগায় রাখিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কথা কিন্তু ফুটিতে চাহে না। অনেক যত্নের পর কয়েকটী মাত্র কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল। পার্ব্বতী যে মহাদেবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, একথা আমরা এতক্ষণ পরে পরেই শুনিতেছিলাম, আর তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছিলাম। এইবার তাঁহার নিজমুখে তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাইব। সেও অতি অল্প কথা। কথাটা কি? জানিবার জন্য আমরা বড়ই উৎসুক। পার্ব্বতী বলিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সবই ঠিক। আমার আশা বড়ই উচ্চ; তাহারই জন্য এ তপ। কারণ—'মনোরথানামগতির্ণবিদ্যতে'।"

পার্ব্বতীর মুখে এই যে অনুরাগের কথা শুনিলাম, এরূপ আর কোথাও কেহ শুনিয়াছ কি? ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ নাই। ইহকালের কথাও নাই। ইহা স্থির ধীর অটল ও অচল প্রণয়। আমি কিছুই নই, আমার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু আমার আর উপায় নাই, তাই আমি কঠোর তপস্যা করিতেছি। এই কথায় কত দৈন্য, কত আত্মবিসর্জ্জন, মহাদেবের প্রতি কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা ও কত প্রেম প্রকাশ পাইতেছে।

জটিল বলিল, মহেশ্বরকে ত আমরা জানি। আবার তুমি তাঁহাকেই প্রার্থনা

করিতেছ। তিনি অমঙ্গলময় ইহা আমি জানি। আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারি না। বড় অসদৃশ সম্বন্ধ—তোমার হাতে থাকিবে বিবাহের সূতা আর তাঁর হাতে থাকিবে সাপের বালা। এ দুটা কি খাপ খায়? তুমি খাসা চেলী পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে, আর তাঁর গায়ে হাতীর কাঁচা চামড়া হইতে টাট্‌কা রক্ত পড়িবে।" তিনি দেখাইয়া দিলেন, মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। বলিয়া তিনি মহাদেবের কতই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যিনি বাপের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিতের মুখে এত শিবনিন্দা শুনিয়া সহ্য করিবেন, কখনই সম্ভব নয়। যিনি "আমি শিবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী" এই কথা কয়টাও কহিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য," এখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, চক্ষুর কোণ রাঙা হইয়া উঠিল, কোপে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। তিনি স্থির স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি হরকে ঠিক জান না, জানিলে তুমি এমন কথা কেন বলিবে? নির্ব্বোধ লোকে মহাত্মার চরিত্র বুঝিতে পারে না, কারণ তাঁহার চরিত্র সাধারণ লোকের মত নয়; তাহারা চিন্তা করিয়াও তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।" এই বলিয়া ক্রমে জটিল মহাদেবের বিরুদ্ধে যত কথা বলিয়াছিল, সমস্তগুলিই খণ্ডন করিয়া দিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, "তোমার সহিত বিবাদে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে যত মন্দ বলিয়া জান, তিনি তাই হোন। কিন্তু আমার মন তাঁহাতেই পড়িয়াছে, সে আর ফিরিবে না। আমি ইচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমি নিন্দার ভয় করি না।"

তাঁহার বাক্য শেষ হইলে তিনি দেখিলেন, জটিলের ঠোঁট নড়িতেছে, সে আবার কিছু বলিতে চায়। তিনি সখীকে বলিলেন—"তুমি উঁহাকে বারণ কর, কারণ যে বড় লোকের নিন্দা করে সেই যে কেবল অপরাধী হয় এমন নহে। উহার কথা যে শোনে সেও তাই হয়। অথবা কথায় কাজ নাই, আমি এখান হইতে সরিয়া যাই।"

বলিয়া তিনি যেমন সরিয়া যাইবেন, অমনি মহাদেব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। পার্ব্বতীর একটী পা উঠিয়াছিল। সেটী সেই ভাবেই রহিল। তিনি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। মহাদেব বলিলেন, "তুমি তপস্যা করিয়া আমায় কিনিয়াছ, আমি তোমার দাস।" পার্ব্বতী যে এত কঠোর করিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহে যেন নূতন স্ফূর্ত্তি আসিয়া পৌঁছিল [৫।৮৫-৮৬]।

এই যে প্রণয়, ইহাতে কামগন্ধের লেশও নাই। তাই শুরুতেই কামদেব ভস্ম হইয়া গেলেন। কাম বলিতে "স্পর্শ বিশেষ" বুঝায়; কিন্তু এখানে কাম শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় মাত্রেই। আমি আমার বাঞ্ছিতকে দেখিতেও চাই না, স্পর্শ করিতে চাই না,

তাঁহার স্বর শুনিতেও চাই না, তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণও করিতে চাই না। চাই শুধু আপনার সব—মনপ্রাণ সব—সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে; তিনি আমায় পায়ে রাখেন, এইটী জানিলেই আমি কৃতার্থ। এই যে অপূর্ব্ব প্রণয়, এ একটা বড় তপস্যা। এই নিঃস্বার্থ প্রণয় লাভ করাও অনেক তপস্যার ফল। তাই পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধও হইয়াছিল। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন, পার্ব্বতী কাঁচা সোনা। তাই আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নিজে উপযাচক হইয়া, ঘটক খুঁজিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দু'জনে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছিলেন। আর কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কোন দেবতারও নয়।

নারায়ণ
আষাঢ়, ১৩২৩

উর্ব্বশী বিদায়

প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। একদিকে গঙ্গার শাদা জল তোড়ে আসিতেছে, আর একদিকে যমুনার কাল জল বেগে আসিতেছে। যেখানে দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানকার অপূর্ব্ব শোভা কালিদাস একদিন মহাকবির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলনার অতীত, কিন্তু সে বর্ণনায় আমাদের আজ কাজ নাই। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভরা যমুনাও পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে এ দুয়ের মিলন হইয়াছে, সেইখানে একটী সাততলা প্রকাণ্ড শাদা মারবেলের রাজবাড়ী—এমন পালিশ করা যে, দিনরাত যেন চক্‌-চক্‌ করিতেছে—ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে। সেই সাততলা বাড়ীটীই আজ আমাদের বর্ণনার বিষয়। আজ আকাশে মেঘ নাই, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদ পুবদিক্ হইতে উঠিতেছে আর যেন নির্জ্জলা দুধের মত শাদা আলোয় পৃথিবীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভরা গঙ্গার শাদা জলের উপর দুধ ঢালা—যমুনার কাল জলের উপর দুধ ঢালা। যমুনার কাল রং ডুবাইয়া দিয়া যেন শাদা রংয়ের ঢেউ উঠিতেছে। মারবেলের বাড়ীর উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—যেন সব বাড়ীটীকে দুধে নাওয়াইয়া রাখিয়াছে। মারবেলের ছায়া গঙ্গার জলে পড়িয়াছে, ছায়া হইলে কি হয়, সেও যেন শাদা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে শাদার উপর শাদা, তার উপর শাদা, এক অপরূপ শাদা রংয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সকলের উপর একটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ভাব সকলেরই মন হরণ করিতেছে।

আজি সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ীর সকলের মুখেই কিন্তু একটা বিপদের ছায়া পড়িয়াছে। সকলেই চিন্তিত—একটা যেন কি মহাশোকের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সাততলার ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া আরসীর মত প্রতিফলিত হইতেছে। নক্ষত্রগুলির ছায়ায় ছাদে যেন ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এ ছাদে কিন্তু আজ বীণা বেণু মৃদঙ্গ কিছুই বাজিতেছে না। নাচ বা গানের নামও নাই। আছেন কেবল রাজা পুরূরবা, তাঁহার পাটরাণী ঔশীনরী, অপ্সরা উর্ব্বশী আর তাঁহার বিদূষক। উর্ব্বশীর শাপ ছিল—তিনি মানুষ হইয়া পৃথিবীতে থাকিবেন; কিন্তু ছেলের মুখ দেখলেই তাঁহাকে আবার স্বর্গে যাইতে হইবে। পুরূরবার প্রেমে কিন্তু উর্ব্বশী এতই মগ্ন যে, ছেলেটী হইবামাত্র তাহার মুখ না দেখিয়াই উর্ব্বশী তাহাকে এক ঋষির আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ঋষি তাহাকে আপনার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাইশ বৎসর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সকালে দৈবের বিপাকে তাহাকে রাজারাণীর সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। উর্ব্বশী তাহাকে চিনিয়াছেন ও তাহার মুখ দেখিয়াছেন; আর তাঁহার পৃথিবীতে থাকিবার কোন উপায় নাই। তাঁহাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। ঠিক দুই প্রহর রাত্রিতে তাঁহাকে স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ীর সকলের মুখেই আজ বিষাদের ছায়া। তাই আজ সাততলার ছাদে রাজা, রাণী ও উর্ব্বশীর আগমন। সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন—কখন্ দুপুর বাজিবে। চাঁদ ক্রমে উদয়-পাহাড়ের মাথা হইতে আকাশে উঠিতে লাগিলেন। রাজ-পরিবারেরও শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা পুরূরবা চাঁদের নাতি। বুধের ছেলে। তাঁহার মায়ের নাম ইলা। সুতরাং মানুষ হইলেও দেব-অংশেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ। সে জ্যোতিতে কখন জোয়ার-ভাঁটা নাই। তাঁহার এত বয়স হইয়াছে। তিনি এত দেশ জয় করিয়াছেন—একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের সমস্ত তাঁহার মাথার উপর। কতবার তিনি দেবতার হইয়া অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মুখখানি দেখিলে মনে হয়, তিনি এখন ১৮ ছাড়িয়া ১৯এ পড়েন নাই। তিনি যে দিন কেশী দানবকে নাশ করিয়া সূর্য্যলোক হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন, উর্ব্বশী সেইদিন হইতে দেখিতেছেন—রাজার মুখের, রূপের, শরীরের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি যেন কার্ত্তিকের মত চির-কুমার।

উর্ব্বশী তো স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী—সকলের অগ্রগণ্যা। তিনি শাপে অপ্সরা হইতেই মানুষ হইয়াছেন। তাঁহাকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই। রাজা যখন কেশী দানবের হাত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিত। মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই রাজা তাঁহাকে হেমকূটশিখরে সখী-দিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত করেন। তখন তাঁহার দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ।

সখীরা অনেক যত্ন, অনেক সেবা করিলে ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি চোখ খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আমায় উদ্ধার করিল? সুরপতি ইন্দ্র কি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন?" সখীরা কহিল, "সুরপতি আপনার উদ্ধার করেন নাই; কিন্তু তাঁহারই একজন প্রিয় সুহৃদ্ ও চির-সহায় আপনাকে কেশীর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" দুরাত্মা অসুরের নাম শুনিয়াই উর্ব্বশী আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবার চৈতন্য হইলে তিনি মহারাজ পুরূরবাকে দেখিলেন। দেখিয়াই মজিলেন। তিনি একটু সুস্থ হইলে পুরূরবা যখন নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি অতি করুণ, যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া করুণ রস তাঁহার চক্ষু হইতে প্রবাহিত হইয়া রাজাকে আপ্লুত করিতে লাগিল। সেই অবধি মহারাজের নাম তাঁহার জপমালা হইল; তিনি শয়নে স্বপনে কেবল পুরূরবাকেই দেখিতে লাগিলেন এবং কিরূপে মহারাজের সহিত তাঁহার মিলন হয়, কেবল সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন ভূর্জ্জপত্রে আপনার মনের ভাব লিখিয়া একজন অপ্সরা সখীর হাতে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে অদৃশ্য হইয়া সখীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পত্র পড়িয়া রাজার মনের যেরূপ ভাব হইল, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া সশরীরে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন। উভয়ে প্রেমালাপ হইতেছে, এমন সময় চেটী আসিয়া খবর দিল, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসা অবধি রাজার শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিয়া পাটরাণী তাঁকে দেখিতে আসিতেছেন। শুনিয়াই উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়া গেলেন; তাঁহার অপ্সরা সখী আকাশপথে লীন হইয়া গেলেন। রাজা ভূর্জ্জপত্রখানি আর একবার পড়িলেন, নিকটেই বিদূষক ছিল, তাহার হাতে সেইখানি দিয়া বলিলেন, "এখানি যত্ন করিয়া রাখিও, রাণী যেন টের না পান। উর্ব্বশীর বিরহে এই পত্রখানি তাঁহার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক করিয়া রাখিবে ও আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।" বিদূষক কিন্তু আল্‌গা লোক। তাহার হাত হইতে সে পত্রখানি যে উড়িয়া গেল, সে তাহা টেরও পাইল না। পত্রখানি পড়বি তো পড় উড়িয়া গিয়া রাণীর হাতেই পড়িল। রাণী আসিয়া পত্রখানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং অনেকক্ষণ কোন্দল করিয়া মানভরে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না।

ওদিকে উর্ব্বশী স্বর্গে ফিরিয়াই শুনিলেন, ভরতমুনি লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন; সে খানি শীঘ্রই ইন্দ্রের সভায় অভিনয় হইবে আর তাঁহাকে লক্ষ্মী সাজিতে হইবে। এখন রিহার্সাল; রিহার্সালে লক্ষ্মী সাজিয়া উর্ব্বশী যেখানে নারায়ণের নাম করিতে হইবে, সেখানে পুরূরবার নাম করিয়া বসিলেন। ভরতমুনি বড় বদরাগী ও বদমেজাজী। তিনি ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না;

একেবারে শাপ দিয়া বসিলেন,—'তুই যখন নারায়ণের নাম করিতে গিয়া মানুষের নাম করিয়াছিস, তুই যা, মনুষ্যলোকে গিয়া থাক্।' শাপের কথা শুনিয়া ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যাপারটা সব তলাইয়া বুঝিলেন, ঋষিকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে শাপমোচন করিতে বলিলেন। শেষে স্থির হইল, পুত্রমুখ দর্শন হইলেই শাপান্ত হইবে। ইন্দ্র তখন মাতলিকে ডাকিয়া উর্ব্বশীকে সঙ্গে দিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'উর্ব্বশী তোমার প্রতি অনুরক্ত, তুমিও উর্ব্বশীকে বড় ভালবাস। তুমি আমার বন্ধু—উপকারী, তাই উর্ব্বশীকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিই। তুমি ইহাকে কাছে রাখ।'

মাতলি চলিয়া গেল। রাজা, উর্ব্বশী ও বিদূষক তিনজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় চেটী আসিয়া খবর দিল, রাজার কাছ হইতে গিয়া অবধি রাণী উপবাস করিতেছেন। তাঁহার এক ব্রত আছে, সে ব্রত আজ সাঙ্গ হইবে। কিন্তু রাজার নিকট না আসিলে সে ব্রত আজ উদ্যাপন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অনুনয় বিনয় করিয়া একবার দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তিনি আসুন।" রাণী আসিলেন; সঙ্গে অনেক চেটী অনেক পূজার জিনিস লইয়া আসিয়াছেন। রাণী রাজাকে পূজা করিলেন। ফুল দিলেন, মালা দিলেন, চন্দন দিলেন, ভাল ভাল খাবার জিনিস দিলেন। বিদূষকের বড় আহ্লাদ। আরতি করিলেন। পূজার অঙ্গ শেষ হইলে গলায় কাপড় দিয়া বলিলেন,—"আজ অবধি আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালবাসিব; সে আমার ভগিনী হইবে। এই আমার ব্রত, এই ব্রতের নাম প্রিয়প্রসাদন।" রাণী সেই অবধি উর্ব্বশীকে আপনার ভগিনীর মত জ্ঞান করেন, তাই আজ উর্ব্বশীর বিদায়ের দিনে রাজার নিকট উপস্থিত আছেন। তাঁহার মুখখানি আজ অতিশয় ম্লান—মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"উর্ব্বশি! তবে তুমি আজ সত্য সত্যই যাইবে?"

উর্ব্বশী বলিলেন—"আমরা দেবরাজের অধীন, আমাদের কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই। আমার শাপমোচন হইয়াছে, আমাদের এই শেষ দেখা। এই বিদায়ের দিন যাহাতে শীঘ্র না আইসে, তাই মা হইয়াও ছেলেটীকে এত কাল বনবাসে দিয়াছিলাম, কিন্তু বিধিলিপি ত খণ্ডন হয় না; তাই আজ আমায় তাহার মুখ দেখিতে হইল, আমারও বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বুঝি ত সব; কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না। তুমি ত জান উর্ব্বশী, তুমি কাছে না থাকিলে আমার কিরূপ অবস্থা হয়। জান ত কার্ত্তিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়া তুমি যখন লতা হইয়া গিয়াছিলে, আমার কি হাল হইয়াছিল। তখন যে আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। মেঘ

তোমায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। ময়ূরের কাছে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করিলে সে যখন কক্ কক্ করিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার সহিত কত ঝগড়া করিয়াছিলাম। আমার আবার বোধ হয় সেই দশা উপস্থিত হইবে।" এই বলিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাণী ও উর্ব্বশী অনেকক্ষণ সেবা শুশ্রূষা করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রাণী ঔশীনরী প্রমাদ গণিলেন। উর্ব্বশী রাজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"মহারাজ, স্থির হউন—আপনার অবস্থা যে বড়ই শোচনীয় হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। আপনার শৌর্য্য-বীর্য্য, রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের যে পরমগুরু মহর্ষি ভরত, তাঁহারও সাক্ষাতে আত্মসংযম করিতে পারি নাই। এই যে যাইতেছি, আবার যে কি হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। অমন ভুল আবার হইলে এবার ঋষি যে কি করিবেন, ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। হয় ত এবার বলিয়া বসিবেন—'তুই যার জন্য বার বার ভুল করিতেছিস, অনন্তকালেও তোর সহিত তাহার দেখা হইবে না।' সে বারের শাপে ত আমাদের ভালই হইয়াছিল, এবার যদি উল্টা শাপ দেন, তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য আমরা চির-দুঃখে ও চির-বিরহে পড়িয়া থাকিব।"

রাজা বলিলেন—"আর না উর্ব্বশী, ও কথা আর মুখে আনিও না; শুনিলে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমি তোমার সহিত মিলনের আর এক উপায় করিয়াছি। স্বর্গে যাইলে ত তোমায় দেখিতে পাইব। অতএব আমি এখনি মরিয়া তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

উর্ব্বশী—"মহারাজ, অতি বড় শত্রুও যেন অমন কথা মুখে না আনে। কারণ, আত্মহত্যা করিলে স্বর্গে যাইবার কোন উপায় নাই। কারণ, আত্মঘাতী লোকে অসুর-লোকে যায় এবং সেখানে গাঢ় অন্ধ-তমসায় আচ্ছন্ন থাকে। অতএব ওরূপ কথা যদি আপনি মনেও ভাবিয়া থাকেন—আর ভাবিবেন না। আমার ভগিনী ঔশীনরী আছেন, ইনিই আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। আমি তো জানি, তিনি আপনাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন। স্ত্রীলোকে সব করিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বামীটীকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে কেহই পারে না। দিদি আমার তাহাও আর একজনের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মনচোরকে আর একজনকে চুরি করিতে দিয়াছেন এবং সেই চোরকে ভগিনী বলিয়া ভালবাসিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন—"রাণীর আমার গুণের পার নাই। সে কথা তুমি আমায় বুঝাইবে কি। তাঁহাকে আমি তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী দিন ধরিয়া জানি—তাঁহার গুণে আমি চির-ঋণী; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমায় ত তার আমি

নাই—আমি আর এক রকম হইয়া গিয়াছি। এখন তোমায় কি করিয়া পাই, তাহারই উপায় বল। আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না!" বলিয়া রাজা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

উর্ব্বশী বলিলেন—"মহারাজ আমি একান্ত পরাধীন, তথাপি আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিতেছি। আপনি ত অলৌকিক শক্তিশালী; আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনে যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন। আপনি যখন যেখানে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন, সেইখানে উর্ব্বশী বলিয়া ডাকিবেন—আমি পরাধীন হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার পাশে গিয়া দাঁড়াইব। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের ঠিক মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশীও চকিত হইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের ভার কমিয়া আসিতে লাগিল। শরীর হইতে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ত, মাংস, হাড়, পাঁজরা সব লোপ হইতে লাগিল; তাঁহার শরীরকান্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। তিনি যে উর্ব্বশী ছিলেন, সেই উর্ব্বশীই রহিলেন; কিন্তু সে আর মাটীর উর্ব্বশী নহে। পৃথিবীর যা কিছু ছিল, পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিব্যমূর্ত্তিতে আবার অপ্সরা হইয়া আকাশপথে উঠিতে লাগিলেন। রাজা স্তব্ধ, রাণী স্তব্ধ, প্রতিষ্ঠানপুরের সমস্ত লোক স্তব্ধ, যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া উর্ব্বশীর পার্থিব দেহের এই পরিণাম একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজার দৃষ্টির অতীত হইয়া যান, এমন সময়ে রাজা একবার চন্দ্রালোকময়ী পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের আবেগে ডাকিয়া উঠিলেন—"উর্ব্বশি! উর্ব্বশি!" অমনি উর্ব্বশী আসিয়া আবার তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং দুইজনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চন্দ্রালোকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ও প্রতিষ্ঠানপুরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইলেন। তখন রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; বুঝিলেন স্বভাব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে উর্ব্বশীকে ডাকিলেই পাইবেন। সুতরাং পুনর্ব্বার উর্ব্বশী যাইবার জন্য আকাশে উঠিলে তিনি আর তাঁহাকে ডাকিলেন না। মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করিয়া অতি কষ্টে রাত্রিটী কাটাইয়া দিলেন।

মহারাজা পুরূরবা অনেক দিন গত হইয়াছেন, তাহার পর কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখন যে স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "উর্ব্বশী উর্ব্বশী" বলিয়া ডাকে, সে সত্য সত্যই তাহাকে দেখিতে পায়। উর্ব্বশী কল্পনার প্রধান সঙ্গিনী, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, কবিরা যাহাকে রস বলেন, সেই রসের খর প্রস্রবণ।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২৩

বিরহে পাগল

রাজা উর্ব্বশীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভরতমুনির শাপে উর্ব্বশীরও বর হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র উর্ব্বশীকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। পাটরাণী সতীনপনা ভুলিয়া উর্ব্বশীকে ভগিনী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রাজা ও উর্ব্বশী দুইয়ে এখন এক। রাজা যদি মহাদেব হইতেন, হয় ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি হইয়া যাইতেন। এ প্রণয়-মিলনে যে সুখ, রাজার তাহার চরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাজধানী আর ভাল লাগিতেছে না। এখানে লোকজন অনেক, কাজকর্ম্ম অনেক, সুতরাং এ জায়গাটা ছাড়িতে হইবে। এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে রাজা দেখিবেন উর্ব্বশী, আর উর্ব্বশী দেখিবেন রাজা। তবেই ত মিলনের চরম হইবে। তবেই ত দ্বৈতভাবে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে! জায়গাটাও মনোরম হওয়া চাই; নেহাৎ মরুভূমিতে হইবে না, বনে জঙ্গলে হইবে না, পাহাড় পর্ব্বতেও হইবে না। যেখানে ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, শ্রম, ক্লান্তি, ইহার একটীও থাকিবে অথবা একটুও থাকিবে, সেখানেও অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত হইবে। তাই উর্ব্বশী স্থির করিলেন, গন্ধমাদন যাইতে হইবে। বরফের পাহাড়ের নিকটে, অথচ তত শীত নহে, তত বরফ পড়ে না, এমন জায়গায় গন্ধমাদন নামে এক পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতের গায়ে, পাশে, মাথায় কেবল ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলের গন্ধে যে শুধু চারিদিক আমোদ করিয়া আছে, এমন নহে; এ গন্ধে লোকেও পাগল হয়। কেহ কেহ বলে, সেখানে গেলে লোকে কেবল হাসিতে থাকে; এত হাসি হাসে যে, হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফুলের ধুল্লায় আকাশ ভরিয়া যায়। বদরিকাশ্রমের উত্তরে বরফের পাহাড়ের ঠিক নীচে এইরূপ একটী পাহাড় আছে, উহাকেই গন্ধমাদন বলে। শীত কালে বরফ পড়ে। গরমের সময় বরফ গলিয়া গিয়া নানারূপ সুগন্ধি ফুলের গাছ গজাইয়া উঠে। বর্ষায় যখন ফুল ফুটে, তখন নামটী সার্থক হয়।

উর্ব্বশী রাজাকে বলিলেন, 'চল আমরা দুজনে গন্ধমাদন যাই। সেখানে আর কেহই থাকিবে না। রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের উপর দাও; নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা দুজনে সেখানে থাকি। চাকর-চাকরাণী, খানসামা, খিদমদগার কিছুরই দরকার নাই। তোমার সঙ্গে কেবল থাকিবে তোমার অপরূপ রূপ, আর সে রূপ দেখিবার জন্য থাকিবে কেবল আমার দুটী চক্ষু। সে পাহাড়ের উপর দিয়া একটী নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে; ধীরে ধীরে বহিতেছে বলিয়া দেবতারা তাহার নাম রাখিয়াছেন মন্দাকিনী।

মন্দাকিনীর দুই দিকে এখন প্রকাণ্ড চড়া, সে চড়ায় কেবল বালি। চল, সেই চড়ায় গিয়া আমরা বেড়াই। প্রণয়ের মিলনের সেই ত স্থান।' সমস্ত গ্রীষ্মকালটা রাজা ও উর্ব্বশী মন্দাকিনীর তীরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে একেবারে জনশূন্য স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হইতে তফাৎ হইয়া তথায় তাঁহারা দুজনেই—নূতন জগৎই বল, আর নূতন স্বর্গই বল, বা নূতন বৈকুণ্ঠই বল, নূতন সুখাবতীই বা বল —গড়িয়া লইলেন।

তাঁহারা কিরূপে সেখানে কালযাপন করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সে কথা বলেন নাই। কিন্তু সেটা সকলেই মনে মনে আঁচিয়া লইতে পারেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। গ্রীষ্ম যায়—বর্ষা আসে, এমন সময় একটী বিদ্যাধরের মেয়ে দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উর্ব্বশীর এটুকুও সহ্য হইল না। যেখানে ভালবাসার মাত্রাটা বড় বেশী, সেখানে রাগের মাত্রাও খুব বেশী। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আর একজনের দিকে চাহিবে! উর্ব্বশী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, উর্ব্বশীর রাগ পড়িল না। তিনি রাগে গর-গর হইয়া মন্দাকিনীর বালির উপর দিয়া চলিলেন; রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া উর্ব্বশী একটী বাগান দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন বাগানে ঢুকিতে গেলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাজা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথাও উর্ব্বশী নাই। রাজা তখন একা —একেবারে একা। একজন সঙ্গী ছিল, তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ যে ভয়ানক একা! তাহার উপর গন্ধমাদনের গন্ধ। সে গন্ধে অন্যলোক ত একেবারেই পাগল হয়। তাহার উপর এই অদ্ভুত বিরহ! মিলনের আশাও নাই। কালিদাস একবার এইরূপ বিরহে ফেলিয়া একটী বেচারা যক্ষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই সে জড় পদার্থ মেঘকে দূত করিয়া আপন স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ত আশা ছিল, বৎসরের পর আবার মিলন হইবার আশা ছিল। সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়াছিল, তবে বর্ষা আসায় তাহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাই সে একটু পাগলামী করিয়াছিল। কিন্তু এবার ত সে আশা নাই। উর্ব্বশী অপ্সরা, সে অদৃশ্য হইয়া গেল, কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই। যদি আসে ত কবে আসিবে, তাহার ঠিকানা নাই। তাহাতে স্থানটা গন্ধমাদন, আবার বর্ষা আসিতেছে। সুতরাং রাজা একেবারে পাগল হইয়া গেলেন—উন্মাদ পাগল হইয়া গেলেন। এদিকে উর্ব্বশী ওদিকে উর্ব্বশী ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন রাত্রি নাই, কেবল ছুটাছুটি। এমন সময়ে মেঘ উঠিল। রাজার বা যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও লোপ হইল। ভালবাসার সামগ্রী কাছে

থাকিলেও মেঘ উঠিলে মনটা কেমন কেমন করে; কি যেন হারাইয়াছি, হারাইয়া যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়; তাহা পাইব কি না ভাবিয়া অধীর হইতে হয়। রাজা যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি যে পাগল হইবেন, উন্মাদ হইবেন, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইবেন, সব উল্টাপাল্টা করিবেন—তাহাতে বিচিত্র কি?

কালিদাস মেঘদূতে যক্ষকে পাগল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগল সাজাইতে পারেন নাই। এখানে রাজাকে পাগল সাজাইয়াছেন। বিক্রোমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—"ততঃ প্রবিশতি উন্মত্তবেষো রাজা," রাজা উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের বেশে প্রবেশ করিলেন। কোন কোন পুঁথিতে রাজা যে আসিতেছেন, সেটা জানাইয়া দিবার জন্য একটা প্রাকৃত গান আছে।* গান যে কে গাহিল তাহার নির্ণয় নাই, বোধ হয় যেন নেপথ্য হইতেই কেহ গাহিয়া দিল, কিন্তু নেপথ্য বলিয়া যেমন অন্য অন্য জায়গায় লেখা থাকে, তেমন লেখা কিছুই নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এ পুঁথির পাঠ ঠিক নয়। নাই হউক ঠিক; কিন্তু উহাতে রাজার পাগল বেশের একটা বর্ণনা আছে। গানে বলিতেছে—

"হাতী আপন ভালবাসার বিরহে উন্মাদ হইয়াছে, নানারূপ উল্টা-পাল্টা পাগলামীর লক্ষণ দেখাইতেছে। গাছের পাতা আর ফুল ছিঁড়িয়া দেহের সম্মুখভাগটা সাজাইয়াছে, আর বনের ভিতর ঢুকিতেছে।"

গান গাওয়ার পরই রাজা আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে, সেটা একটা পাগলেরই লক্ষণ—সাজগোজও পাগলের মত। আসিয়াই রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"রে দুরাত্মা রাক্ষস, তুই আমার ভালবাসার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় যাইতেছিস্?" খানিক এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"পাহাড়ের আগা থেকে আকাশে উঠিয়া আমার উপর তীর ছুঁড়িতেছিস্?" খানিক পরে ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—"হায় হায়! এ ত দুরাত্মা রাক্ষস নয়, এ যে নূতন মেঘ। এ ত ধনুক নয়, এ যে রামধনু। এ ত বাণ নয়, বৃষ্টির ধারা। এ ত উর্ব্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ, যেন কষ্টি পাথরে সোনার দাগ।"

বোধ হয়, বৃষ্টির ধারা পাগলের মাথায় পড়ায় সে একটু সুস্থ হইল। তাহার জ্ঞান কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে তখন টের পাইল, যাহা রাক্ষস ভাবিয়াছিল, তাহা রাক্ষস নয়, যাহাকে উর্ব্বশী ভাবিয়াছিল, সে উর্ব্বশী নয়। যে পুঁথির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে এইখানে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন লেখা আছে, আপনার ভ্রম বুঝিয়া লজ্জিত হন লেখা আছে, মেঘের কাছে মাপ চাওয়ার কথা লেখা আছে, আরও কত কি কথা আছে; কিন্তু সে সব কথা এখন আর বলিব না। যদি বারান্তরে সে সকল পুঁথির কথা বলিতে পারি, বলিব। এখন রাজার পাগলামীটা কালিদাস

* দ্রষ্টব্য Bombay Sanskrit Series No. XVI, Appendix I, 1901.—সম্পাদক—।

যেমন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই বলি। তবে যখন অন্য পুথির কথা পাড়িয়া রসভঙ্গ করিয়াছি, তখন একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমরা ঐ বাড়্তি কথাগুলি কালিদাসের বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই, কালিদাস কখন কোন বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সব অত্যাচার সহা যায়—রাজার অত্যাচার সহা যায়, ধর্ম্মের অত্যাচার সহা যায়, পুলিসের অত্যাচার সহা যায়, ভালবাসার অত্যাচার সহা যায়, কিন্তু কবির অত্যাচার সহা যায় না। কবি যে কথাটী তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, সেইটী ফেনাইয়া ফুলাইয়া বাড়াইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবেন, এটা কেহই সহিবে না। তাই কালিদাস কখনও কোন জায়গায় বাড়াবাড়ি করেন নাই। আর বাড়াবাড়ি করেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহার এত আদর। তিনি "জগতের কালিদাস" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজা বলিলেন—"তাই ত, এ যদি মেঘ, রাক্ষস নয়; ওটা যদি বিদ্যুৎ, উর্ব্বশী নয়; তবে উর্ব্বশী গেল কোথায়? সে ত অপ্সরা; বড় রাগ হইয়াছে বলিয়া কি দেবশক্তিতে লুকাইয়া আছে? তা ত হ'তে পারে না। সে ত বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকে না। তবে কি সে স্বর্গে চলিয়া গেল? সেও ত হ'তে পারে না, আমার উপর তার যে বড় টান। তবে কি তাহাকে কেহ হরিয়া লইয়া গিয়াছে? সেও ত হ'তে পারে না, অসুরেও আমার কাছ থেকে তাকে হরিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ ব্যাপারটা কি?" রাজা একবার এদিক্ একবার ওদিক্, একবার ডাহিনে, একবার বামে দেখিতে লাগিলেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাদের ভাগ্য মন্দ, তাদের দুঃখের পরই দুঃখই আসে। এই দেখ না—একে ত উর্ব্বশী কাছে নাই, আমি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছি, তাহার উপর আবার মেঘ দেখা দিতেছে। দিনে আর গরম থাকিবে না, আমায় সমস্ত দিনই বিরহেই কেবল ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। তাই বা কেন হইবে? কেনই বা কষ্ট পাইব? মুনিরা ত বলেন, 'রাজা কালস্য কারণম্।' আমি যদিই কালের কারণ হইলাম, আমি কেন বলি না, বর্ষা, তুমি এখন আসিও না। তাহা হইলেই ত সব চুকিয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়? আমি যে রাজা বনে একলা রহিয়াছি, তবুও ত আমি রাজা। আমার ত রাজার চিহ্ন কিছুই নাই; কিন্তু বর্ষাকাল যে আমার সব রাজচিহ্ন আনিয়া দিতেছে। দেখ না, মেঘ আমার চাঁদোয়া হইয়াছে। রাজার চাঁদোয়ায় সোনার কাজ করা থাকে; বিদ্যুৎগুলিই সে সোনালির কাজ। রাজার চামর থাকে; হিজল গাছের বড় বড় মঞ্জরীগুলি চামরের কাজ করিতেছে। রাজার ভাট-চারণ থাকে; মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা ডাকিতেছে, তাহাতেই ভাট-চারণের কাজ হইতেছে। সওদাগরেরা রাজাকে ভেট দেয়; পাহাড়গুলাই সওদাগর হইয়াছে আর পাহাড়ের গা ধুইয়া কত কি আমার নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমার ভেট হইতেছে।

দূর হউক ছাই, ও সব কথা আর ভাবিব না। বেশভূষার গরব ক'রে আর কি হবে? যাই, তাহারই সন্ধানে যাই—যার বিহনে সব অন্ধকার দেখিতেছি। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে একটী ভুঁই-চাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার "ভালবাসা"র চোখটী দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্ব্বশীর চোখে জল আসিয়াছে, আর চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভুঁই-চাঁপার পাপড়িগুলি একটু লালচে হয়, আর বর্ষায় তাহার ভিতরে জল থাকে। ভুঁই-চাঁপা দেখিয়া রাজা অধীর হইয়া উঠিলেন ;—বলিলেন, তিনি যে কোন্ পথে গিয়াছেন, কেমন করিয়া টের পাইব? বনের বালিতে বর্ষার জল পড়িয়াছে, তাহার উপর দিয়া যদি তিনি চলিয়া যাইয়া থাকেন তাহা হইলে ত তাঁহার পায়ের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারি। কারণ, সে দাগটী পিছন দিকে গভীর হইবে, আর সে দাগের পাশে আল্‌তার দাগ থাকিবে।

এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া, আনন্দে আটখানা হইয়া রাজা বলিলেন, "বাঃ, বাঃ! পেয়েছি—পেয়েছি। এই যে তাঁহার বুকের কাপড়, সবুজ চেলি, ঠিক যেন শুক পাখীর পেটের রঙ। রাগে যখন তাঁহার চোখের জল পড়িয়াছে, সে জল ঠোঁটের উপর পড়িয়াছে। লাল রঙ করা ঠোঁটে লাল রঙ গলিয়া সে জল লাল হইয়া গিয়াছে, আর বুকের কাপড়ে পড়িয়াছে। বোধ হয়, রাগে চলিয়া যাইবার সময় কাপড়খানি খসিয়া পড়িয়াছে।" বেশ করিয়া কাপড়খানি রাজা ঠাহরাইয়া দেখিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এ যে কাপড় নয়, ঘাসের জমীর মাঝে মাঝে ইন্দ্রকীট রহিয়াছে।"

ইন্দ্রকীট নামে রাঙা রাঙা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পোকা আছে। বর্ষার প্রথম ভাগে তাহারা মাঠের অনেক জায়গা ছাইয়া থাকে। ঘাসের জমীর উপর ইন্দ্রকীটের ঝাঁক পড়ায় সবুজ চেলির উপর রঙ গোলা চোখের জলের মত বোধ হইতেছিল।

এ নির্জ্জন বনে কাহার কাছে তাহার সন্ধান পাই বলিয়া পাগল চারিদিকে চাহিতে লাগিল ; দেখিল, একটা ময়ূর বর্ষার জলে যে জায়গায় শিলাজতু ভিজিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটা পাথরের উপর আনন্দেতে ঘাড় উচা করিয়া কেকারব করিবার চেষ্টায় আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ময়ূর হে, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? সে এই বনে কোথায় আছে কি বলিতে পার?

গেল যা! আমার কথার জবাব না দিয়াই নাচিতে লাগিল। নাচে কেন? কিসে ওর এত আনন্দ হয়েছে? বুঝেছি—বুঝেছি, আমার ভালবাসার ধন নাশ হইয়াছে, ময়ূরের বড় আনন্দ। এত দিনে উহার পেখমের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তাই এত আনন্দ। উর্ব্বশীর খোঁপা যখন খুলিয়া যাইত, আর তাহার ফুলগুলি দেখা যাইত, তখন যে কেহও ময়ূরের নাচের দিকে চাহিতও না। আজ সে নাই, তাই এত আনন্দ। যাক্ যাক্, পরের দুঃখে যার সুখ, সে পাষণ্ডকে কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না।

বাঃ! এই যে এদিকে একটা কোকিলা জামগাছের ডালে বসে আছে। আজ ওর ভারি আনন্দ; গ্রীষ্ম শেষ হইয়াছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পাখীর মধ্যে কোকিলই পণ্ডিত, আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

ওহে কোকিল, তুমি ত মদনের দূত, মান ভাঙাতে তোমার মত এ দুনিয়ায় আর কে আছে? হয় তাকে আমার কাছে এনে দাও, না হয় আমায় তার কাছে নিয়ে চল। কি বললে? আমি তাকে এত ভালবাসি, তবে সে কেন চ'লে গেল? শোন তবে সে চটেছে; কিন্তু কেন, সে কথা আমি বলিতে পারি না। আমি তার কাছে এতটুকুও অপরাধ করি নাই। স্ত্রী ত স্বামীর প্রভু, যা খুসী করিতে পারে, অপরাধের অপেক্ষা তার নাই।

এ কি! কথা কইতে কইতে আপনার কাজে মন দিলে? পরের দুঃখ যতই বড় হউক, সেটা ঠাণ্ডা। নহিলে আমি এই এত দুঃখ জানাইতেছি, আমার কথায় কান না দিয়া কোকিলটা জামের ডাঁশা ফল চুষিতে লাগিল—মনে করিয়াছে বুঝি ওর প্রিয়ার অধর।

যা হোক, ওর স্বরটী বেশ মিষ্ট—যেন উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বর। ওর উপর রাগ করিয়া আর কি করিব? যাই, অন্য দিকে দেখি গে।

ডান দিকে যে নূপুরের শব্দ শুনিতেছি। প্রিয়া কি এই দিকে আসিয়াছেন? যাই, দেখি গিয়া। কিছু দূর গিয়া—ছি ছি! হাঁসের শব্দ, চারিদিক্ মেঘে কাল হইয়া গিয়াছে, হাঁসগুলা মানস-সরোবরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এ তাদেরই শব্দ, নূপুরের শব্দ নয়। যতক্ষণ ইহারা মানসে না চলিয়া যায়, তারি মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কোন খবর পাই কি না।

ওহে পক্ষিরাজ, মানস-সরোবরে এর পর যেয়ো। মুখে পথখরচের জন্য যে মৃণালখণ্ড লইয়াছ, তাহা একবার রাখ, আমায় উদ্ধার কর, আমায় তাঁর খবর দাও, তার পর যেয়ো। সাধু লোক আপনার কাজের চেয়ে পরের উপকারকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

যখন মুখ উচা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে, তখন বোধ হয় বলিতেছে—আমরা বড় ব্যস্ত, দেখিতে পাই নাই।

যদি তুমি পুকুরের পাড়ে তাহাকে নাই দেখিতে পাইয়াছ, তবে তুমি তাহার গতিটা সমস্তই চুরি করিলে কিরূপে? তা হবে না, তুমি আমার কান্তাকে ফিরাইয়া দাও, তুমি তাহার ঠমকটা ত চুরি করিয়াছ, তখন তাহাকেও চুরি করিয়াছ। কোনও অংশ পাওয়া গেলে, চোরকে সমস্ত চোরাই মাল দিতে হয়, তা বুঝি জান না? বাঃ! পাছে আমি রাজা চোরের শাসন করি, তাই ভয়ে উড়িয়া গেল।

আবার খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা দেখিলেন, চক্রবাক, ও চক্রবাকী

বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে, ইহার কাছে ঠিক খবর পাইব। ওহে চক্রবাক্, আমার ভালবাসার যে সামগ্রী ছিল, তাহার নিতম্বও চক্রের মত। সে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি বড় আশা করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কোথায় গেল, বলিতে পার কি?

এমন সময় চক্রবাক্ কক্ কক্ করিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন, ও বোধ হয় আমায় চিনে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে 'কঃ কঃ'? সূর্য্য ও চন্দ্র আমার মাতামহ আর পিতামহ; দুই স্ত্রী আমায় আপনি বরণ করিয়াছিল—এক পৃথিবী, আর এক উর্ব্বশী।

বাঃ! এ যে চুপ করিয়া রহিল। তুমি ত ভারি মজার লোক হে! যদি চকী পদ্মের পাতার আড়ালে থাকে, তা হলেও তুমি সে কোথায় গেল ভাবিয়া চীৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তোল। গৃহিণীর উপর তোমার এতই টান যে, তুমি কিছুতেই তফাৎ থাকিতে পার না। আর আমি আমার ভালবাসার সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়াছি, তুমি আমায় তাহার খবরটাও দিতে পারিলে না! এতে আর কি বলিব, আমার ভাগ্যই মন্দ।

যাই, এখানে ত হ'ল না, অন্যদিকে যাই। রাজা দু এক পা গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। এই পদ্মফুলটা দেখিয়া আমি আর যাইতে পারিতেছি না। এটার ভিতর একটা ভ্রমর বন্ধ আছে, আর সেটা গুণ্ গুণ্ করিতেছে। আমি অধর দংশন করিলে সে যখন ফোঁস ফোঁস করিত, তখন তাহার মুখখানি ঠিক এইরকমই দেখাইত। আমি ঐ ভোমরাটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এখান থেকে চলে গেলে, এর পর হয় ত দুঃখ হবে কেন তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই?

মধুকর! আমার গৃহিণীর চোখ দুটী মত্ত চকোরের মত, তুমি আমায় তাঁর খবর দাও!

অথবা সে সুন্দরীকে তুমি একেবারেই দেখ নাই। তার মুখের সুন্দর গন্ধ যদি পাইতে, তাহা হইলে কি আর এই পদ্মফুলটার উপর তোমার আস্থা থাকিত?

যা হোক, অন্য জায়গায় যাই। এই যে একটী হাতীর সঙ্গে হাতিনী কেলিকদম্বগাছের কাঁধে শুঁড় লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি করিব না। হাতিনী শুঁড় দিয়া একটী টাট্‌কা কচি শল্লকীর ডাল ভাঙ্গিয়া উহাকে দিতেছে। আটায় মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। ও ডালটা বেচারা খাইয়া লউক, তাহার পর উহাকে বিরক্ত করিব। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হাতীর আহার শেষ হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে হাতি, তুমি আমার স্থিরযৌবনা প্রিয়তমাকে দূর হইতেও দেখিয়াছ কি?" এমন সময় হাতী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাজা বড় খুসী; মনে করিলেন, বুঝি খবর দিবে। না হবে কেন? ও হ'ল হাতীর রাজা,

আমি হলেম মানুষের রাজা, পরস্পর একটা টান ত আছেই। দেখ ভাই, আমি হলেম রাজাদের রাজা, তুমি হাতীর রাজা; তোমার দান অনবরত মোটাধারে ঝরিতেছে, আমার দানেরও বিরাম নাই; উর্ব্বশী আমার স্ত্রীলোকের মধ্যে রত্ন, তোমার হাতিনীও তোমার যূথের মধ্যে রত্ন। তোমায় আমায় তফাতের মধ্যে এই যে, আমি বিরহে কাতর, আর এ দুঃখটা তোমায় কখনও সহিতে হয় নাই। তা ভাই, তোমরা সুখে থাক, আমি আমার কাজে যাই।

এই যে সুরভিকন্দর নামক একটী পাহাড় দেখা যাইতেছে, এটী বড় রমণীয় স্থান, অপ্সরারা ইহাকে বড় ভালবাসে। সেও ত অপ্সরা, সে কি ইহার কাছে কোথাও আছে? বলিয়া রাজা চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কি কষ্ট! মেঘে যে সব ছাইয়া আছে, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে যদি একটা বিদ্যুৎ নলপায়, তবুও কিছু দেখা যায়; তাও ত হয় না। যা হোক পাহাড়টাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব না। ওহে গিরিরাজ! তোমার নিতম্ব ত বড় প্রকাণ্ড; তাহারও ত তাই। তাহার বুকে জায়গা নাই; দেহের যেখানে পাপ, তাহার সেইখানটাই নীচু। সে কি তোমার কোন বনে আশ্রয় লইয়াছে?

বাঃ! চুপ করিয়া রহিলে যে? দূরে আছে বলিয়া বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।

গিরিরাজ, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বামা এই বনান্তে কি তোমার চোখে পড়েছে? খানিক কান খাড়া করিয়া রাজা বলিলেন, বাঃ, কি বলছে! চোখে পড়েছে। বেশ তবে হয়ত আরও ভাল খবর শুনিতে পাইব। তবে বল ত ভাই, সে কোথায়? কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, সে কোথায়? ও সর্ব্বনাশ, এ ত প্রতিধ্বনিমাত্র, গুহামুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে। রাজা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এই ঝরণার ধারে ব'সে একটু তরঙ্গের বাতাস খাই।

এই নদীটী দেখিয়া আমার মন বড় প্রসন্ন হইতেছে। উর্ব্বশীই বুঝি আমার অপরাধের কথা মনে করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িবার জন্য নদী হইয়া গিয়াছে; তাঁহার ভ্রূভঙ্গই নদীর তরঙ্গ হইয়াছে। হাঁসগুলা পার হইতে যাইতেছে, আর নদীর টানে তাহাদের সারিগুলি বাঁকিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝুলিতেছে; পাখীগুলা ভয় পাইয়া শব্দ করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝন্‌ঝন্ করিতেছে। ফেনা হইয়াছে আর নদীর বেগে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন শাদা কাপড় রাগের চোটে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পাথরের উপর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাগে চলিয়া যাইতে যাইতে উছট খাইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমি উহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাই। দেখ, আমি তোমার

একান্ত অনুরক্ত। কখনও মিষ্টি ছাড়া কড়া কথা কই না। তুমি যা চাও, কখনও না বলি না, না বলিতে চাইও না; আমার কি অপরাধ দেখিলে যে, আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ? আমি ত তোমার দাস।

হায় হায়! এটা দেখিতেছি সত্য সত্য নদী, নহিলে আমায় ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে যাইবে কেন? সমুদ্রের নিকট অভিসার করিবে কেন? যাই হউক, কষ্ট না করিলে মঙ্গললাভ হয় না। যাই, সেইখানেই যাই—যেখানে উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে রাজা বলিলেন, ভালই হইয়াছে, তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সেই লাল কদম-ফুলের গাছ, গ্রীষ্মের শেষে যাহার একটী ফুল তিনি আপনার মস্তকের ভূষণ করিয়াছিলেন, তখনও সব কেশর ফুটে নাই, উঁচু-নিচু হইয়াছিল। বাঃ! এই যে একটা হরিণ বসিয়া আছে, উহাকে একবার খবরের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।

উহার রঙ গাঢ় কাল। বনশোভা দেখিবার জন্য কাননশ্রী যেন আপনার কটাক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। (কবিরা কটাক্ষকে কাল বলিয়া বর্ণনা করেন। মৃগের রঙ কাল, যেন কাননশ্রীর কটাক্ষ।)

কি আমায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল! না না, মৃগী উহার নিকটে আসিতেছিল, মৃগশিশু স্তনপানের ইচ্ছায় উহাকে আসিতে দিতেছে না। তাই একদৃষ্টে গলা বাঁকাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া আছে। অহে যূথপতি, আমার তাঁহাকে কি বনে দেখিয়াছ? তাঁহার লক্ষণ বলিয়া দিই, শোন। তোমার প্রিয়ার যেমন বড় বড় চোখ, তাঁহারও তেমনি। ইহাকেও দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনিও তেমনি সুন্দর।

এ কি, আমার কথা শুনিল না, স্ত্রীর দিকেই চাহিয়া রহিল। হ'বেই ত—অবস্থা খারাপ হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে। আমি এখান থেকে—আগ্রহ সহকারে দেখিয়া—পাথরের ফাটালের মধ্যে এ কি দেখা যাইতেছে? প্রভায় চারিদিক্ লেপিয়া ফেলিয়াছে। অথচ সিংহের মারা হরিণের মাংস ত নয়। আগুনের ফুলকি হইবে কি? তাহাও ত হইতে পারে না। কারণ, আকাশ হইতে এইমাত্র বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। (ভাল করিয়া দেখিয়া) লাল অশোক-থোলোর মত একটী মণি। সূর্য্য যেন ইহাকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছেন।

মণি আমার মন হরণ করিতেছে। তুলিয়া লই। অথবা তুলিয়া লইয়াই বা কি করিব? কাহার মাথায় এ মণি দিব? মন্দারফুলে সুগন্ধি যাহার মাথায় এই মণি দিব, তাহাকেই পাইতেছি না। কেন শুধু চোখের জলে এই এমন মণিটী মলিন করিব?"

রাজা এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কে নেপথ্য হইতে বলিয়া দিল—

'বৎস, এই মণি তোমাদের মিলন করাইয়া দিবে। পার্ব্বতীর পায়ের আল্‌তায় এই মণির উদ্ভব। কাছে রাখিলে শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছিতকে পাইবে।'

রাজা কান খাড়া করিয়া এই সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন, "আমায় এ উপদেশ কে দিতেছেন? বোধ হয়, কোনও মুনি এ কথা বলিলেন। ভগবন্, আপনি উপদেশ দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।" মণিটী তুলিয়া লইয়া রাজা বলিলেন—"হে মণি, তোমার কল্যাণে যদি আমি তাহাকে পাই, তাহলে, শিব যেমন চন্দ্রকলাকে আপনার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও তেমনই তোমাকে আমার শিরোভূষণ করিব।"

কিছু দূর গিয়া রাজা একটী লতা দেখিলেন, তাহাতে একটীও ফুল নাই, তথাপি দেখিয়াই তাহার প্রতি তাঁহার বড়ই ভালবাসা হইল। বলিলেন, "লতাটী যেন উর্ব্বশী, মধুকরের শব্দ নাই, লতাটী নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। আমি পায়ে ধরিলেও আমায় ত্যাগ করিয়া গেছেন বলিয়া যেন উর্ব্বশী পস্তাইতেছেন ও চিন্তায় চুপ করিয়া আছেন। ফুলের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার একটীও ফুল নাই। মানিনী উর্ব্বশী যেন সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। মেঘের জলে লতার সব কচি পাতগুলি ধুইয়া গিয়াছে। চোখের জলে প্রিয়ার যেন ঠোঁট দুটীর লাল রঙ ধুইয়া গিয়াছে। এটী ত ঠিক আমার প্রিয়ারই মত, আমি উহাকে আলিঙ্গন করিব।" বলিয়া লতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই লতাটী উর্ব্বশী হইয়া গেল। রাজা তাঁহার স্পর্শ-সুখ লাভ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বলিলেন, "এ ঠিক যেন উর্ব্বশীরই স্পর্শ," আমার শরীর জুড়াইয়া গেল, কিন্তু বিশ্বাস নাই। কত বার 'এই উর্ব্বশী' 'এই উর্ব্বশী' বলিয়া মনে করিয়াছি, আবার তখনই তাহা অসম্ভব হইয়া গিয়াছে; অতএব সহসা চক্ষু খুলিব না।" অনেকক্ষণ থাকিয়া চক্ষু খুলিলেন; দেখিলেন, তাঁহার আলিঙ্গনে উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "এটী কার্ত্তিকের বাগান। তিনি চিরকুমার। সুতরাং স্ত্রীলোকের ঐ বাগানে প্রবেশ নিষেধ। যে প্রবেশ করিবে, তখনই সে বেড়ার লতা হইয়া যাইবে। আমি রাগে এ সব কথা ভুলিয়া বাগানে ঢুকিতে গিয়া লতা হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ই ঠিক ছিল; আপনি যাহা করিয়াছিলেন, সবই দেখিয়াছি। গৌরীর আল্‌তায় যে মণি হইয়াছে, সেই মণি আপনার সঙ্গে ছিল, তাহারই স্পর্শে আমি আবার যা ছিলাম, তাই হইয়াছি। নিয়ম এই যে, ঐ মণিই লতাকে ফের মানুষ করিতে পারে।" রাজা এই সকল কথা শুনিয়া মণির যথেষ্ট আদর করিলেন। উর্ব্বশী মণিটী লইয়া মাথায় রাখিলেন। উর্ব্বশীর মুখখানি প্রভাত-সূর্য্যের আলোয় নূতন ফোটা পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও উর্ব্বশী মেঘে চড়িয়া রাজধানী প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কটা বোধ হয় মেঘদূতের উপর টেক্কা। কালিদাস আপনারই উপর আপনি টেক্কা দিয়াছেন। যক্ষদের প্রণয়ই প্রাণ। যক্ষদের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন—তাহাদের বয়স যৌবনেই শেষ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রৌঢ়-বৃদ্ধাবস্থা নাই; কুসুমায়ুধ ছাড়া তাহাদের অন্তক নাই অর্থাৎ তাহারা যে জীবনে কষ্টটুকু পায়, সেটুকু বিরহেরই কষ্ট; তাহাদের চেতনা যায় কখন,—যখন তাহারা স্ত্রীসম্ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মেঘদূতেও কালিদাস বলিয়াছেন—আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনও কারণে তাহাদের চক্ষে জল পড়ে না; কুসুমশরের তাপ ভিন্ন তাহাদের আর তাপ নাই—সে তাপও ভালবাসার জিনিস পেলেই মিটিয়া যায়; তাহাদের বিচ্ছেদও প্রণয়কলহ ভিন্ন অন্য কোনও কারণেই জন্মায় না; যৌবন ভিন্ন তাহাদের অন্য বয়সও নাই। কালিদাসের মেঘদূতের এই কবিতাটী কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন বলিয়াই কুমার-সম্ভবের শ্লোকটীও উদ্ধার করিতে হইল। যক্ষ অপরাধ করিয়াছিল, রাজকাজে অবহেলা করিয়াছিল, তাই রাজা তাহাকে বিরহ-সাজা দিয়াছিলেন। যে হেতু, বিরহ ভিন্ন তাহাদের অন্য সাজাই নাই। বিরহের মেয়াদ এক বৎসর। সেই মেয়াদের মধ্যে মেঘ দেখিয়া যক্ষ পাগলপারা হইয়া যায়; মেঘকে মানুষ বলিয়া মনে করে ও তাহাকে দিয়া আপনার স্ত্রীর কাছে "আমি বাঁচিয়া আছি" এই খবর দিবার চেষ্টা করে। মেঘদূতে এই পর্য্যন্ত।

বিক্রমোর্ব্বশীতে কালিদাস অতি প্রাচীন কালে গিয়াছেন, সৃষ্টির এক রকম গোড়ায়। ব্রহ্মা প্রথম মন হইতেই সৃষ্টি করিতেন। প্রজাপতিরা তাঁহার মনের সৃষ্টি। দুই তিন পুরুষ এইরূপ গেলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুরূরবা সেই সময়ের লোক, তাঁহার পিতামহ চন্দ্র ও মাতামহ সূর্য্য। বলিতে গেলে সৃষ্টির প্রথম মানুষই তিনি। কারণ, তাঁহার পিতা বুধ দেবতা। কালিদাসের বড় বুকের পাটা, তাই তিনি প্রথম মানুষের প্রণয় ও বিরহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য কবি হইলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এ প্রণয়ের পাত্র পৃথিবীতে মিলিল না। স্বর্গ হইতে অপ্সরা ধরিয়া আনিতে হইল। সেও বোধ হয়, প্রথম অপ্সরা-সৃষ্টির প্রধান অপ্সরা। এই দুইজনের প্রণয় ও বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস অদ্ভুত গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রণয়ের কথা এবার বলিব না; বিরহের কথাই বলিব। অদ্ভুত উপায়ে বিচ্ছেদ। এই দুটীতে এক হইয়া আছে—হঠাৎ একজন অদৃশ্য হইয়া গেল। যে রহিল, সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্বভাবের অনুপম শোভার মধ্যে সে তাহার ভালবাসার সামগ্রী খুঁজিতে লাগিল। প্রথম মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়া মনে করিল, এই উর্ব্বশী, কাল প্রকাণ্ড রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেঘ পাহাড়ের ডগা ছাড়াইয়া উঠিল, সে মনে করিল, রাক্ষস পলাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে ভাবিল, রাক্ষস শত শত বাণ বর্ষণ করিতেছে। ক্রমে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল, মেঘ, বিদ্যুৎ, পাহাড়, আর জলের ধারা।

তাহার পর একটা ভুই-চাঁপা ফুল দেখিল। পাপড়িগুলি একটু লাল, উপর হইতে জল পড়িয়া ফুলটী ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন উর্ব্বশীর চোখ, রাগে চোখের কোণ একটু লাল হইয়াছে, আর জলে চোখ ভরিয়া গিয়াছে; আবার একটা নদী দেখিল; মনে হইল, তাহার শরীর। ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাগে তাহার ভ্রূ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হাঁসগুলা সারি বাঁধিয়া নদী পার হইতেছে, নদীর তোড়ে সে সারি বাঁকিয়া যাইতেছে, আর হাঁসগুলা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া শব্দ করিতেছে। বোধ হইল যে, তাহার চন্দ্রহার মাঝখানে বাঁকিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাতে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ফেনা উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কাপড় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পাথরে পাথরে জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, রাগে চলিতে চলিতে পদস্খলন হইতেছে। কিন্তু শেষ জানা গেল, সেটা স্ত্রীলোক নহে—নদী।

আবার একটা লতার কাছে গেল। বৃষ্টির জলে তাহার সব কচি কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন, ঠোঁটের উপর যে লাল রঙ করা ছিল, চোখের জলে তাহা ধুইয়া গিয়াছে। এ ফুল ফুটিবার সময় নহে, সুতরাং একটী ফুল নাই। রাজা মনে করিলেন, যেন রাগ করিয়া সে গহনা ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল নাই, ভোমরা আর শব্দ করে না; মনে হইল যেন, মানিনী মানভরে চুপ করিয়া আছে; যেন ভাবিতেছে, কেন মান করিলাম, এত সাধিল, কেন তারে ফেলিয়া আসিলাম?

এই ত একরকম পাগ্‌লামী, আর একরকম পাগ্‌লামী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা—"ওগো, আমার তাকে তুমি দেখেছ কি?" একবার ময়ূরকে জিজ্ঞাসা করিল—কোন জবাব নাই। একবার হাঁসকে জিজ্ঞাসা করিল—জবাব নাই। একবার হাতীকে জিজ্ঞাসা করিল—জবাব নাই। পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করিল—জবাব নাই। জবাব না পাইলে রাগ হইতেছে, ক্ষোভ হইতেছে, আপনাকে ধিক্কার দিতেছে, অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। একবার কোকিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে মন দিয়া রাঙা রাঙা জাম চুষিয়া খাইতে লাগিল। এবার তাহার উপর রাগ নাই—"আহা, তোমার গলার স্বর আমার তাঁর মত, তোমার উপর রাগ করিব না।" একবার চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল, সে "কঃ কঃ" করিয়া উঠিল। অমনি পাগল বলিল,—"কি, আমি কে, জান না তাহা? তুমি কে, তুমি কে, জিজ্ঞাসা করিলে? আমার ঠাকুরদাদা চাঁদ, আর সূর্য্য আমার দাদামহাশয়।" এইরূপে কত জায়গায় কত রকম পাগ্‌লামী করিল। হাঁসকে বলিল, "তুমি চোর, তুমি তাহার ঠমক চুরি করিয়াছ। চোরাই মালের কোন অংশ পাওয়া গেলে সবটাই চুরি করিয়াছ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তুমি আমার তাঁকে আনিয়া দাও।" আবার পাগলামী—বলিল, "আমি রাজা, আমার

হুকুম, বর্ষাকাল তুমি আসিও না।" আবার কি মন গেল, বলিল, "আহা, তুমি এস, এস, আমি রাজা, আমি এই বনে একা, তোমা হ'তে আমার রাজচিহ্ন সব পাওয়া যাইবে—চাঁদোয়া, ছাতা, চামর তুমিই দিতেছ।"

এই সমস্ত পাগ্‌লামীটা—এটা একটা সৌন্দর্য্যের খনি। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে যে সুন্দর জায়গা, কালিদাস রাজাকে আর উর্ব্বশীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। দুটীতে এক হইয়া থাকিলে ত পরস্পরের সৌন্দর্য্যে দুজনেই ডুবিয়া থাকে, তাই কিছুকালের জন্য একটীকে সরাইয়া আর একটীকে দিয়া সেই সৌন্দর্য্যটুকু প্রকাশ করিয়া দিলেন। সমস্ত সৌন্দর্য্যের পিছনে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া।

যক্ষ বিরহে পড়িয়া মেঘকে দূত করিয়াছিল। রাজা বিরহে পড়িয়া মেঘকে রাক্ষস করিলেন। আবার যখন মিলন হইল, তখন দুজনে সেই মেঘে চড়িয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে আপনাদের রাজধানীতে গেলেন। কালিদাসের হাতে মেঘ বেচারার নানা অবস্থা হইল।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

শকুন্তলার মা

শকুন্তলার মা মেনকা। স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাদের সেরা। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারী। বিশ্বামিত্রের ভয়ানক তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি মেনকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "উহার তপস্যার বিঘ্ন কর।" মেনকা আপনার অপরূপ রূপ লইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ হইল, মেনকার এক কন্যা হইল। কন্যাটীকে তিনি ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কণ্বমুনি মেয়েটীকে কুড়াইয়া আনিয়া পালন করিলেন। সেই মেয়েটীই শকুন্তলা।

মহাভারতে এই গল্পটী একটু অন্যরূপ। মেনকা যাইতে চাহেন না। কেন না, ঋষি বড় রাগী লোক, পাছে রাগ করিয়া শাপ দিয়া বসেন, সেই ভয়ে তিনি যাইতে চাহেন না। ইন্দ্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। মেনকা বলিলেন, "দেখুন, আপনি যাঁহার ভয়ে অস্থির, আমায় তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন কেন? তিনি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বশিষ্ঠকে নিঃসন্তান করিয়াছেন। আপনার শৌচের জন্য তিনি এক প্রকাণ্ড নদী বহাইয়া দিয়াছেন। যাঁহার দুর্গে মহর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ হইয়া আপনার স্ত্রীপুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় যিনি আশ্রমে আসিয়া পারা নামে নদী সৃষ্টি

করিয়াছিলেন। তিনি মতঙ্গের জন্য যজ্ঞ করিলে, আপনি ভয়ে তথায় সোমপানের জন্য যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যিনি নক্ষত্র দিয়া অপর একটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুকে গুরু শাপ দিলে, তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে স্বর্গের রাজ্য পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। যিনি এমন প্রবলপ্রতাপ, আপনি আমায় কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন?" ইন্দ্র আরও পীড়াপীড়ি করিলেন; মেনকা রাজি হইলেন; কিন্তু সর্ত্ত রহিল যে, 'আমার সঙ্গে মদন ও বায়ু যাইবেন'। মেনকা ঋষির নিকটে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বায়ু তাঁহার কাপড় উড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি সেই কাপড় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনের মিলন হইল ও শকুন্তলার জন্ম হইল। মেয়েটীকে ফেলিয়া মেনকা স্বর্গে গেলেন। ঋষিও সরিয়া পড়িলেন। পাখীরা দেখিল, এমন মেয়েটী হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া আছে, এখনই বাঘে খাইয়া ফেলিবে। তাহারা ঘেরিয়া লালন-পালন করিতে লাগিল। তাই তাহার নাম শকুন্তলা। পাখীরা একদিন কণ্বমুনিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া মেয়েটীকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিল। শকুন্তলা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি আমরা মহাভারতেই পাই; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ইহার নামমাত্রও নাই।

কিন্তু মেনকা কি শকুন্তলাকে ভুলিয়াছিলেন? তাহা ত বোধ হয় না। শকুন্তলার গল্প পড়িলেই মনে হয়, একটা না একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিতেছে; তাঁহার গতিবিধি দেখিতেছে ও যাহাতে তাঁহার ভাল হয় করিতেছে। মহাভারতে ছেলে হইবামাত্রই দেবতারা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, আবার রাজা তাড়াইয়া দিলে দৈববাণীতে দেবতারা বলিয়া দিলেন যে, এ ছেলে তোমারই। তুমি শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে গোড়া হইতেই আমরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। প্রথম অঙ্কে রাজা যেন নিয়তি-প্রেরিত হইয়াই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাণীদের নিমন্ত্রণও যেন সেই নিয়তিরই খেলা। চতুর্থ অঙ্কে দৈববাণীও নিয়তির কাজ। বনদেবতাদের হাত বাহির করিয়া গহনা দেওয়া অলৌকিক শক্তির বিকাশমাত্র। পঞ্চমে ত স্ত্রীরূপধারী এক জ্যোতিঃ শকুন্তলাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠে মেনকার এক সখী সর্ব্বদাই উপস্থিত। সপ্তমে মেনকা স্বয়ং মারীচের আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অতএব মেনকা মেয়েটীকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্গ হইতে তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই উহার উপর চোখ রাখিতেন। অপ্সরা মহলের সকলেই জানে, শকুন্তলা মেনকার মেয়ে। সকলেই শকুন্তলার মঙ্গল কামনা করিত।

শার্ঙ্গরব যখন শকুন্তলাকে কুলটা বলিয়া তাহাকে পতিগৃহে দাস্য করার কথা

বলিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "আপনারা কেন উহাকে ঠকাইতেছেন? চাঁদ কুমুদিনীকেই চায়, সূর্য্য কমলিনীকেই চায়; ভদ্রলোকের মন কখনই পরের স্ত্রীকে চায় না।" অর্থাৎ শকুন্তলা আমার স্ত্রী নহে, আমি উহাকে বাড়ীতে দাস্যবৃত্তি করিতেও দিতে রাজী নহি। তখন শার্ঙ্গরব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আপনারই ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?" তখন রাজা পুরোহিত সোমরাতকে মধ্যস্থ মানিলেন; বলিলেন, "আপনাকেই আমি মধ্যস্থ মানিতেছি, বলুন দেখি, আমিই ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা এই মিথ্যা কথা কহিতেছে; এইরূপই যখন সন্দেহ তখন আমি কি করি? স্ত্রী ত্যাগ করিয়া পাপী হইব অথবা পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়া পাতকী হইব? এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টা গুরু আর কোন্‌টা লঘু, আপনিই আমায় উপদেশ দিন।" পুরোহিত মহাশয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, আপনার প্রথম সন্তানে চক্রবর্ত্তী রাজার সব লক্ষণ থাকিবে। যদি কণ্বমুনির দৌহিত্রের— আপনার পুত্র বলিতে যখন আপনি সঙ্কোচ করিতেছেন, তখন কণ্বমুনির দৌহিত্র বলাই ঠিক—সেই সব লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ইঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন; নচেৎ ইনি বাপের বাড়ীই যাইবেন; এখন ইনি আমার গৃহেই থাকুন।" রাজা তাহাতে রাজী হইলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ গেল না, তিনি খুসী হইলেন না।

শকুন্তলাকে লইয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীরাও গেলেন। রাজা এই চিন্তায়ই মগ্ন হইয়া খানিক বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে নেপথ্যে শব্দ হইল—"আশ্চর্য্য!" রাজা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, পুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। ক্রমে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "কণ্বশিষ্যেরা চলিয়া গেলে মেয়েটী আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিল আর হাত তুলিয়া তুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর অমনি অপ্সরাদের যে ঘাট আছে, সেইখান হইতে একটা জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল; জ্যোতিঃটার আকার একটী স্ত্রীলোকের মত। সে উহাকে লইয়া উপর দিকে উঠিয়া গেল।" রাজা বলিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি? আপনি বিশ্রাম করুন গে, আমিও বড় আকুল হইয়াছি, শুই গিয়া।"

এখন সকল বড় বড় নগরেই অনেক ঘাট থাকে। হস্তিনায় শচীর ঘাট ছিল। সেইখানেই গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার আঙটী হারাইয়া গিয়াছে। আর একটী ঘাট ছিল, তাহার নাম অপ্সরাতীর্থ। সেখানে, আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি, পালা করিয়া অপ্সরারা পাহারা দিত। মেনকার মেয়ের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সেদিনকার অপ্সরা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল; মেনকার কাছে তাহাকে দিয়া আসিল। বিষম সঙ্কট সময়ে মেনকার দ্বারাই শকুন্তলার উদ্ধার হইল।

শকুন্তলার মা কি এই উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? তাহা নহে। তাহার জন্য সকল অপ্সরাই ব্যস্ত—কিসে রাজবাড়ীর খবর পাইব; কেমন করিয়া রাজা

শকুন্তলাকে আবার গ্রহণ করিবেন। একদিন অপ্সরাতীর্থে সানুমতী অপ্সরার পালা ছিল। সে পালা খাটিয়া মনে করিল, 'যাই, রাজবাড়ীর খবর লইয়া যাই। মেনকার সম্পর্কে শকুন্তলা ত আমার মেয়েরই মত। মেনকা ত আমায় বলিয়াই দিয়াছেন যে, তুমি সর্ব্বদা রাজার বাড়ীর খবর লইবে। আচ্ছা, এই ত বসন্তকাল পড়িয়াছে, এই সময় ত উৎসব হয়; আজ তাহার নামও নাই কেন? আমি ধ্যানে জানিতে পারি; কিন্তু তা হলেও এ খবরটা চোখে দেখাই ভাল। কারণ, তা হলেও মেনকার উপর আদর দেখান হইবে। যা হোক, আমি অদৃশ্য থাকিয়া এই মালিনীর ব্যাপারটা দেখি। মালিনীরা উৎসবের জন্য আমের বউল তুলিতেছে আর গল্প করিতেছে ও বউল দিয়া মদনের পূজার আয়োজন করিতেছে।' এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোরা বউল ছিঁড়্‌টিস্‌ যে? জানিস না, উৎসব বন্ধ, রাজা নিজে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন?" তাহারা বলিল, "আমরা নূতন আসিয়াছি, জানি না। হাঁ মহাশয়, কেন রাজা এমন হুকুম দিলেন?" সানুমতী মনে মনে বলিল, 'কোন গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে।' কঞ্চুকী বলিল, "আপনার একটী আঙটী পাইয়া রাজার ঠিক মনে হইয়াছে যে, ঋষির যে কন্যাটীকে সে দিন তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সত্য সত্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই উৎসব বন্ধ।" মালিনীরা চলিয়া গেল। সেইখানে রাজা আসিলেন, বিদূষক আসিলেন, আর প্রতিহারী আসিলেন। রাজাকে দেখিয়াই সানুমতী মনে মনে বলিলেন, 'তাড়াইয়া দিলেও শকুন্তলা যে আজও রাজার জন্য ঝোরে, তা ঠিক।" রাজা যখন বলিলেন, "আহা, সে বেচারা আমার মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিল, তখন ত আমি বুঝিলাম না, এখন মনে হওয়াটা কেবল অনুতাপেরই কারণ হইল।" সানুমতী শুনিয়া মনে মনে বলিল, 'বেচারার ভাগ্যই এমনি।' রাজা সেখান হইতে মাধবীলতাকুঞ্জে গেলেন; সানুমতী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা যখন অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী একটু খুসী হইলেন; কিন্তু বলিলেন, 'আমরা এমনি স্বার্থপর যে, এ বেচারা কাঁদিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর আমার আমোদ হইতেছে।'

রাজা যখন বলিলেন, "শকুন্তলার মা মেনকা, তাই বোধ হয়, কোন অপ্সরা তাহাকে লইয়া গিয়াছে", তখন সানুমতী বলিলেন, 'ইঁহার যে ভুল হইয়াছিল, সেইটাই আশ্চর্য্য; মনে পড়া ত কিছু আশ্চর্য্য নয়।' রাজা যখন অঙ্গুরীটীকে তিরস্কার করিলেন, সানুমতী বলিলেন, 'এটী যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, সত্যই তিরস্কারের যোগ্য হইত।' রাজা যখন বলিলেন, "এই আঙটীটী হাতে পরাইবার সময় বলিয়াছিলাম, আমার নামের অক্ষরগুলি রোজ একটী একটী করিয়া গুণিতে থাক; যে দিন শেষ হইবে, সেই দিনই আমার লোক তোমায় লইতে আসিবে।" সানুমতী বলিলেন, 'এমন সরতও ভাঙে।'

বিদূষক বলিলেন, "জেলের মাছের মধ্যে গেল কি করিয়া?" রাজা বলিলেন, "শচীতীর্থে স্নান করিতে গিয়া হারাইয়া গিয়াছিল।" সানুমতী বলিলেন, 'এই জন্যই রাজার বিবাহে সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে এত ভালবাসা, সেখানে কেন অভিজ্ঞান চাহিতে হইবে, বুঝি না।' চতুরিকা যখন শকুন্তলার ছবি আনিয়া রাজার হাতে দিল, সানুমতী বলিলেন, 'বাঃ, রাজা ত বেশ আঁকিতে পারেন। সখী যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।' রাজা যখন ছবিটীর আলোচনা করিতে লাগিলেন, সানুমতী বলিলেন, 'রাজার যেমন স্নেহ, যেমন মমতা, তার মতই আলোচনা হইতেছে।' বিদূষক যখন বলিল, "এ তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী শকুন্তলা?" তখন সানুমতী মনে মনে বিদূষককে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে যখন বলিল, এমন ছবি, ইহাতে আবার কি লিখিবে?" তখন সানুমতী মনে করিলেন, 'সখী যে সকল জায়গা ভালবাসে ও তাহার যে সাজ বনবাসে সাজে, এ সব না লিখিলে ত ছবিখানা পুরা হয় না।' এইরূপে সানুমতী দেখাইতেছেন, তাঁহারা অপ্সরারা, ছবি আঁকায় এক একজন দক্ষ বৃহস্পতি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাজাও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সানুমতীও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। রাজা ভোমরাটাকে শাস্তি দিবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় বিদূষক বলিল, "এ যে ছবি, কর কি?" তখন সানুমতী বলিলেন, 'আমারই ভ্রম হইয়াছিল; রাজার ত হবেই; ইনি যে নিজে ভেবে লিখেছেন।' রাজা মনে করিতেছিলেন, সত্য সত্যই শকুন্তলা সামনে রহিয়াছেন। এখন ওটা ছবি শুনিয়া তিনি একেবারে ছটফট্ করিতে লাগিলেন। সানুমতী বলিলেন, 'রাজার এ বিরহটার গতি বুঝা যায় না; এর আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নাই।' রাজা বড়ই বিলাপ আরম্ভ করিলেন। সানুমতী বলিলেন, 'সখীকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা যে দুঃখ দিয়াছেন, সে দুঃখটা এখন মুছে ফেলা উচিত।' দেবী বসুমতীর উপর রাজার ভাব দেখিয়া সানুমতী মনে করিলেন, 'রাজার মন এখন অন্যের উপর হইলেও রাজা আগেকার ভালবাসা ভুলেন নাই।' রাজা যখন "আমারও ছেলে নাই" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী কহিলেন, 'তোমার বংশ এখন লোপ করে কে?' আবার যখন আপনি নিঃসন্তান বলিয়া রাজা মূর্চ্ছা গেলেন, তখন সানুমতী বলিলেন, 'কি কষ্ট, দীপ রহিয়াছে, পর্দ্দার দোষে অন্ধকার দেখিতেছেন। আমি এখনই ইঁহাকে সুখী করিতে পারি, কিন্তু দাক্ষায়ণী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিবার সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন যে, দেবতারা শীঘ্রই মিলন করাইয়া দিবেন। দিনকতক যাক না। কিন্তু এই সব কথা আমার মুখে শুনিলে তাঁহার নিশ্চয়ই আশা হইবে।' এই বলিয়া সানুমতী অদৃশ্য অবস্থাতেই উপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই যে সানুমতীকে অদৃশ্য করিয়া আনা, ইহাও কালিদাসের একটা ভারি গুণপনা। ইহাতে রাজার কোন উপকারই হইল না; তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি হইল

না। না হওয়াই ভাল। যিনি অত সাধ্যসাধনার পরও শকুন্তলাকে নিলেন না, তাহাকে মিথ্যাবাদী কুলটা বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যে একটু শাস্তি হয়, এটা সকলেই চায়। সানুমতী বলিয়াছেন, 'ইঁহার দুঃখে আমার সুখ হইতেছে।' যারা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে, তাহাদেরও মনের ভাব তাই। কিন্তু সানুমতীকে এইভাবে আনিয়া কালিদাস প্রেমিকবর্গের উৎকণ্ঠাটা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। আবার রাজাকে শকুন্তলার খবর না দিয়াও শকুন্তলাকে রাজার খবর দেওয়াইয়া তাহার মনেও আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস এ কৌশল কোথায় পাইলেন, জানা যায় না। ভাস কবির অবিমারক নামক নাটকে কতকটা এইরূপ কৌশল আছে। একটী আঙটী ডান হাতে পরিলে তাহাকে দেখা যাইত, আবার বাঁ হাতে পরিলে দেখা যাইত না। তাই থেকে যদি কালিদাস এই কৌশল লইয়া থাকেন, তাহা হইলে এক রকম নূতন সৃষ্টিই বলিতে হইবে। কালিদাস কোথায় পাইয়াছেন, না জানিতে পারিলেও ভবভূতি যে কালিদাসের এই সানুমতীর অদৃশ্য থাকা লইয়া একটী অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভবভূতি একজন সখীর সহিত সীতাকে অদৃশ্য করিয়া আনিয়াছেন এবং রামের অবস্থা দেখাইয়া নিজের দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছেন। কালিদাস যেটা পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়াছেন, ভবভূতি সেইটাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়াছেন।

আমরা কোথাও মেনকাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার কার্য্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অনেক জিনিস তাঁহার কার্য্য নাও হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস মেনকাকে বাহির না করিয়া এমনি কৌশল করিয়াছেন—যাহা তাঁহার কার্য্য নহে, তাহাও তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। মারীচাশ্রমেও মেনকাকে আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু দাক্ষায়ণী বলিয়াছেন, তিনি এইখানেই আছেন। কেন আছেন? যেহেতু, আজ রাজার সহিত শকুন্তলার মিলনের দিন—আর মেনকা—শকুন্তলার মা।

নারায়ণ
কার্ত্তিক, ১৩২৪

দুর্ব্বাসার শাপ

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বার বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবারে অস্বীকার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর ছেলেটাকে "হোৎকা" বলিয়া "হাতী" বলিয়া গালি দিলেন। শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ।' লোকে দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোক-লজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।

কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন কি, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন? যাহারা দেখিতেছে, তাহারা রাজার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতীহারী বলিলেন, 'আহা, আমাদের রাজার কি ধর্ম্মজ্ঞান! এমন রূপ! স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! মুখের কথায় আপনার হইয়া যায়। শুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহাকে লইতেছেন না।' শকুন্তলা যখন কপট; শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, "তুমি ঘাসে ঢাকা কুয়া, ধর্ম্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ" ['ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো'], তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "দুষ্মন্তের চরিত্র ত' আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতর যে শঠতা আছে, কখন দেখি নাই।' যাঁহারা থিয়েটার দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোন দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্মন্তকে "কাপুরুষতার" দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটী খুব খুলিয়াছে। অঙ্গুরী পাইয়াই রাজার যেমন সব কথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল

আর তাঁহাকে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজার স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিল কে? সানুমতী আর নাটকের প্রেক্ষককুল! এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটা মনে করাইয়া দেয় নাই, সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, আমি "অপুত্রক" অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটী হেলায় হারাইয়াছি! তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; এতটা অধীর হইলেন যে, মাতলি তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গেলে কোন কাজই পাওয়া যাইবে না। তাই বিদূষককে মারিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কণ্বের আশ্রমে প্রথম দেখার সময় সকলে রাজার ভাব দেখিয়াছেন। লতা-কুঞ্জে গান্ধর্ব্ববিবাহের সময়ও রাজার ভাব দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। বিশেষ নিন্দা করারও কিছু ছিল না। শকুন্তলাকে তাড়াইবার সময়ও তাঁহার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা আছে। রাজা চেষ্টা করিতেছেন, মনে পড়িতেছে না। শকুন্তলার কথাবার্ত্তা আকার-প্রকারে শকুন্তলা যে তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছে, এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না; ঠিক তাহার সব কথা বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। কারণ, নিজের সে সকল কথা একেবারেই মনে নাই। সন্দেহ পুরাই হইতেছে অথচ সন্দেহ করিলে চলিতেছে না। এখনি মীমাংসা করিয়া হয় শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার ছেলেকে আপনার বলিয়া লও, না হয় উহাকে যাইতে বল। ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। রাজা তখন কি করিবেন? যাইতে বলাই ঠিক মনে করিলেন। করিলেনও তাই। ইহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। লইলে বরং দোষ দিত, কলঙ্ক হইত।

যে অবস্থায় রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহা যে একটা বিষম সমস্যা, কে অস্বীকার করিবে? ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ।" ঋষিদের রাজাকে ঠকাইবার কি কারণ আছে? কেন তাঁহারা একটা মিছা হাঙ্গাম লইয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে হস্তিনায় আসিবেন? সুতরাং বিশ্বাস করিবার বেশ কারণ রহিল। আর এক দিকে আবার শকুন্তলার আকার-প্রকার কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে বোধ হয়, সে দুষ্ট, শঠ বা কপট বা ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিজের কথা তাঁহার একেবারে মনে নাই। যদি কাহারও মনে থাকিবার কথা হয়, তবে শকুন্তলার ও তাঁহার নিজের। রাজা

মনে মনে বলিলেন ইহারা মনে করাইয়া দিক্, আমি লইতেছি। শকুন্তলা আঙটী খুঁজিলেন, নাই। একটা উপায় ছিল, সেটা নাই। কত কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছুই হইল না। সে কথা মনে পড়িল না। কেমন করিয়া পড়িবে? শাপ হইয়াছে যে, পাগল যেমন আগের কথা পরে মনে করিতে পারে না, তেমনি বুঝাইয়া দিলেও, মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা রাজার মনে পড়িবে না। সুতরাং পাহাড়ে মাথা কুটিলেও যেমন পাহাড়ের কিছুই হয় না, ব্রহ্মশাপের বিরুদ্ধে শকুন্তলার এত চেষ্টা, এত বলা কহা, সব বৃথা হইয়া গেল। ব্রহ্মশাপও নড়িল না, রাজারও মনে পড়িল না। রাজা কি করিবেন? শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন।

আঙটী হাতে পড়িবামাত্র শাপের অবসান হইল, সব কথা রাজার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অগ্নিশরণে শকুন্তলার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ও তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। তিনি, যে আঙটী আনিয়াছে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, বসন্তের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নিশরণে শকুন্তলার তরফ যত কথা বলা হইয়াছিল, সব সত্য বলিয়া ধারণা হইল। যে মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সে ইন্দ্রঘাটের জেলে। আর গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রঘাটে শচীকুণ্ডের জলস্পর্শের সময় আঙটী পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ীর কথা ত ঠিকই হইল। আর তিনি কি করিয়া সেই সত্যবাদী বুড়ীকে বৃদ্ধ তাপসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে সামান্য স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া গালি পাড়িয়াছেন। শকুন্তলা হরিণের কথা মনে করাইয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি শকুন্তলাকে কাকের বাসায় কোকিলের মত ডিম ফুটাইতে আসিয়াছ বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এখন বিদূষককে নির্জ্জনে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। এ কথা বলায় রাজার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু রাজা যে তপোবনে শকুন্তলা নামে এক তপস্বীর মেয়েতে আসক্ত হইয়াছিলেন, সে কথা ত বিদূষকও জানিত, সে কেন বলে নাই? তাহার কারণ, রাজা একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তপস্বীর মেয়ের কথাটা পরিহাস মাত্র, সত্য কথা নয়। মিথ্যা কথার ফল ফলিবেই ফলিবে। নহিলে বিদূষক যদি রাজা আসিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমিও এলে, তোমার সে শকুন্তলার কি করে এলে? তাহা হইলে ত' এত বিভ্রাট না হইলেও না হইতে পারিত।

রাজা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথি সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুদ্ধ শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে? প্রমোদবনে রাজার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হইয়াছে, লোক তাঁহার দুঃখে দুঃখাই হইয়াছে! তাঁহার কষ্টে, অনুতাপে, করুণ রোদনে লোকের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার

পর যখন শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রয়ে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। শকুন্তলার তাঁহাকে চিনিতে যতটুকু দেরী হইয়াছিল, তাঁহার ততটুকুও হয় নাই। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র না? নহিলে রক্ষামঙ্গল শুদ্ধ আমার ছেলেকে কে আর অপবিত্র করিতে পারিবে।" ইহাতে চিনিতে যে একটু দেরী হইয়াছিল, বেশ বুঝা যায়। রাজার কিন্তু কিছুই হয় নাই। দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একটী চুলের বিনুনী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর এক খানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমায় দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলে; তাহাতে বুঝিলাম, তোমার প্রতি আমি পূর্ব্বে যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভালই হইয়াছে।" শকুন্তলার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'এখন আমার আশার সঞ্চার হইল। রাজার বোধ হয় রাগ গিয়াছে। দৈব বোধ হয় আমার অনুকূল। ইনি সেই আর্য্যপুত্রই বটেন।' রাজা বলিলেন, "রাহু গ্রাস করিলে চাঁদের কিছুই থাকে না, রাহুর হাত হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হন, তেমনি কোন রাহু আমার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে রাহুও মরিয়া গিয়াছে, আর তুমিও আমার সম্মুখে উপস্থিত।" এখন শকুন্তলার ভয় পুরা ভাঙ্গিল। 'আর্য্যপুত্রের জয়' বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন, 'জয় বলিতে গিয়া তোমার যদিও কথা বাহির হইল না, আমার কিন্তু খুব জয় হইল। কারণ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।" বলিতে বলিতে রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে জন্য আমার উপর আর রাগ করিও না। আমার তখন কি যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিতে পারে না। যে কাণা, তাহার মাথায় ফুলের মালা দিলেও, সে সাপ মনে করিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দেয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য শেষে সুফল দিলেও তখন বোধ হয় দুরদৃষ্ট দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নহিলে আপনি আমার প্রতি এত সদয়, তবুও তখন এত বিরূপ হইলেন কেন?" এতক্ষণ রাজা পায়ে পড়িয়া ছিলেন, এখন উঠিলেন। শকুন্তলা —"আমার কথা আপনার মনে পড়িল কিরূপে?" রাজা—"আমার দুঃখ একেবারে ঘুচিলে সে কথা বলিব। তুমি যখন কাঁদিয়া আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন তোমার চক্ষের জল তোমার অধরের উপর পড়িয়া অধরকে ক্লেশ দিতে লাগিল, তখন আমি তাহার দিকে চাহি নাই, উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। আজ আবার তোমার চোখের পালকে জল দেখিতেছি। আমি উহা মুছিয়া দিয়া নিজের দুঃখ দূর করি"

বলিয়া উঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তখন রাজার হাতে সেই আঙটী দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, এই সেই আঙটী।" রাজা বলিলেন, "এই আঙটী পেয়েই আমার সব কথা মনে পড়িল।" "সে সময় দুর্লভ হইয়া এই আঙটীটাই অনর্থ বাধাইয়াছিল।" "তবে এ আঙটী তোমার আঙ্গুলেই থাকুক।" "না, আমি উহাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না।" বলিতে বলিতে মাতলি আসিল ও সকলকে কশ্যপের নিকট লইয়া গেল। কশ্যপের নিকট রাজা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শকুন্তলাকে সম্মুখে পাইয়াও মনে হয় নাই, পরে আঙটী দেখিয়া মনে হইল এ কি রকম? দুর্ব্বাসার শাপের কথা রাজাও জানিতেন না, শকুন্তলাও জানিতেন না। মুনি সে কথা বলিয়া দিলে দুজনে সব খবর বুঝিতে পারিলেন। আগাগোড়া সব ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল, আবার দুজনের যেমন ছিল, তেমনি হইল।

এ ব্যাপারে রাজার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে ছাড়া কমে না। রাজার যখন ধারণা ছিল, বিবাহ করি নাই, মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বীরের ন্যায় সেই ধারণামত কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে হইল, বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আবার বীরের মত কার্য্য করিলেন। পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলাও দুর্ব্বাসার শাপে যথেষ্ট বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটী সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটী সখী ছিলেন, তার পর দুটী ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে ষ্টেজে আনিতেই পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ, সংসারে যে পান থেকে চুণ খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটী আঙটী —তাও আবার যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। সেই আঙটী না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন—তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরীব শকুন্তলার এতটা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সে আঙটীটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়ই কষ্ট পাইল। শেষ রাজা যখন আবার সেই আঙটী তাহার আঙ্গুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, "আর না, ও আঙটীটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" দোষটা আঙটীর হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সে আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে

দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনও হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কি বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটীটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দুজনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে, যে কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্ব্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্ত্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ্ হইলে সেটা ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লালসেন মরিলেন—ব্রহ্মশাপে। কত রাজা উৎসন্ন গেলেন—ব্রহ্মশাপে। এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন—ব্রহ্মশাপে। এত বড় বাহ্‌মনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল—ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত ব্রহ্মশাপে। কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।

নারায়ণ
পৌষ, ১৩২৪

শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী

প্রথম বয়সে বঙ্কিম বাবু যে সকল নভেল লিখিতেন, তাহাতে তিনি দেখিতেন, গল্পটী সাজান হইল কিরূপে। সে সাজানর কোন খুঁত আছে কি না? তাহার আগা-গোড়ায় মিল আছে কি না? সকলের উপর দেখিতেন, জিনিসটা জমাট হইল কি না? পাত্রগুলি ঠিক হইল কি না? তাহাদের ব্যবহারে আগাগোড়া মিল হইল কি না? ছেলের মুখে বুড়ার কথা বাহির হইল কি না? বুড়ার মুখে ছেলেমী বাহির হইল কি না? চোরের মুখে সাধুর মত কথা বাহির হইল কি না? সাধুর মুখে চোরের কথা বাহির হইল কি না? তাহাদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য রহিল কি না? এক কথায় তিনি "কাব্যাংশের" দিকেই দেখিতেন, আর কিছু দেখিতেন না। এইরূপে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল নভেল লেখার পর তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হইল। কাব্যাংশে অপরূপ, তুলনার অতীত। তাহার পর তাঁহার মাথায় ঢুকিল—কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের কথা বলিতে হইবে। ধর্ম্মের দিকে মানুষের মন লওয়াইতে হইবে। এক কথায় 'ধর্ম্মপ্রচার' করিতে হইবে। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম এই সময়ের লেখা। সেইগুলিতে ধর্ম্মই অধিক লক্ষ্য, কাব্য তত নয়। সামাজিক, সমজদার লোক চটিয়া গেল। ধর্ম্মওয়ালারা খুসী হইল।

কালিদাসেরও সেইরূপ। তাঁহার প্রথম বয়সের লেখায় ধর্ম্মের কথা বড় একটা থাকিত না। মালবিকাগ্নিমিত্রে, মেঘদূতে, এমন কি বিক্রমোর্ব্বশীতেও ধর্ম্ম নাই, আছে কেবল কাব্য। আছে কেবল জমাট, আছে কেবল প্রেম। একটু একটু উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা একেবারেই টের পাওয়া যায় না। না তলাইলে টেরই পাওয়া যায় না। তাঁহার শেষ বয়সের লেখাও ত তাই। তবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহার উপদেশগুলিতে এখন হিন্দু-ধর্ম্মের ভাব বেশী বেশী, কুমারসম্ভবের কথা ছাড়িয়া দাও, হর-পার্ব্বতী লইয়া যে কাব্য, সে ত ধর্ম্ম ছাড়া হইতেই পারে না। তাঁহার শকুন্তলায় ও তাঁহার রঘুবংশে বেশী হিন্দুয়ানী কথা আছে। সে সময় বৌদ্ধধর্ম্মে ভারত ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই। নিপুণ হইয়া পড়িয়াও তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধভাব বা বৌদ্ধ-মত বা বৌদ্ধ-দ্বেষের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার হিন্দুয়ানীর তিনটী প্রধান অঙ্গ—একটী ব্রাহ্মণে ভক্তি, একটী

গরুতে ভক্তি, একটী দেবতার প্রতি ভক্তি; বিশেষ হরি ও হরের প্রতি ভক্তি। শকুন্তলায় শুদ্ধ ব্রাহ্মণে ভক্তিই প্রকাশ হইয়াছে, কুমারসম্ভবে হরের প্রতি ভক্তি, রঘুবংশে গো-ব্রাহ্মণ ও নারায়ণে ভক্তি। ভক্তির অভাব কোথাও নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রে বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণদের মাসিকের ব্যবস্থা, গণদাস ও হরদত্তের ব্যাপার, ব্রাহ্মণভক্তি নয় ত কি? বিক্রমোর্ব্বশীতে চ্যবনের আশ্রম ও ভরতমুনির শাপও সেই ভক্তি। কিন্তু এ দুয়ে ব্রাহ্মণভক্তির বিকাশ নাই। বিকাশ অন্য জিনিসের। কুমারে হরপার্ব্বতীর প্রতি ভক্তিও তাহারই বিকাশ। রঘুবংশে বিষ্ণুভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি ও গোভক্তি তিনেরই বিকাশ; কিন্তু সে যে বিকাশ, সেও কাব্যেরই অঙ্গ। তোমার মনে হইবে, কাব্যই পড়িতেছি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখিবে, ভক্তিটাই মূল। কাব্য কেবল বাহিরে। বঙ্কিম বাবুর এ চমৎকারিত্বটুকু নাই। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া অনেক সময় ধর্ম্মপ্রচার করেন। কাব্যে সেটা কেমন কেমন দেখায়। অশ্বঘোষ যেমন মধু মিশাইয়া তিক্ত ঔষধ দেন ['পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং…'*], তিত ও মধু দুই দেখা যায়, বঙ্কিম বাবুরও তাই। কিন্তু কালিদাসের তাহা নহে। তাঁহার প্রচারটা না তলাইলে বুঝা যায় না। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের কথা যখন উঠিবে, তখন বলিব। এখন শকুন্তলার কথাই বলা যাক্।

শকুন্তলার প্রথম চার অঙ্ক কণ্বের আশ্রমে; শেষ অঙ্ক মারীচের আশ্রমে। সুতরাং ঋষির আশ্রম লইয়াই শকুন্তলা। এখানে প্রেক্ষাগৃহ নাই, নাচ নাই, গান নাই, নাট্যাচার্য্য নাই, নাট্যাচার্য্যদের টক্কর দেওয়া নাই, সমুদ্রগৃহ নাই, বড় বড় ছবি নাই, বিবাহের সভা নাই। পঞ্চমে যদিও রাজবাটী আছে, কিন্তু আমরা রাজবাটীতে কি দেখিতেছি, দেখিতেছি শুদ্ধ অগ্নিশরণ; বল, এক রকম যজ্ঞশালা। রোজ সেখানে অগ্নিহোত্র হয়। প্রমোদবন দেখিতেছি, কিন্তু সেখানে উৎসব বন্ধ অর্থাৎ সেও এক রকম তপোবন। সমস্তটাই যেন ধর্ম্মের ভাবে মাখান। অলক্ষিতভাবে আছেন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এবং তাঁহার অপার করুণা, আর অলক্ষিতভাবে আছেন মেনকা ও তাঁহার সহচরী অপ্সরারা। এই জন্যই এই ধর্ম্মভাব মাখান থাকার জন্যই হিন্দুরা মালবিকা ছাড়িয়া, উর্ব্বশী ছাড়িয়া, শকুন্তলাকে এত ভালবাসেন। তাই তাঁহারা বলেন,—

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা॥

বাস্তবিকও শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক, যেখানে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন, সেটা এতই পবিত্র, এতই করুণ, এতই সুন্দর যে, উহার উপমা মিলা দুষ্কর।

কালিদাসের আশ্রম ও মহাভারতের আশ্রমে একটু বেশ তফাৎ আছে। কালিদাসের আশ্রম পরম পবিত্র—পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ, এখানে অধর্ম্মের লেশও থাকিতে পারে না। তাই একটী পাখী মারার জন্য আয়ুর তপোবন হইতে বিদায় [বিক্রমোর্ব্বশী, ৫ম অঙ্ক],

* দ্রষ্টব্য 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের শেষ সর্গের সর্ব্বশেষ শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক।—সম্পাদক—।

তাই শকুন্তলারও বিদায়। কিন্তু মহাভারতের আশ্রম আর একরূপ, সেখানে সর্ব্বদমন বার বৎসর ধরিয়া কত পশুই বধ করিয়াছে, তথাপি সে আশ্রমেই ছিল। শকুন্তলাও লুকাইয়া বিবাহ করার পরও বার বৎসর আশ্রমে ছিলেন। কালিদাসের আশ্রমে বিলাসের লেশমাত্র নাই। তপস্বীরা স্বয়ং সমিধ্ আহরণ করেন। কারণ, শাস্ত্রে লেখা আছে, "কুশপুষ্পসমিদ্বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।" তাঁহারা সোমযজ্ঞ করেন, রোজ তিন বার সবন করেন। তাঁহারা উড়িধান খান ও পশুদিগকে বিতরণ করেন। মহুয়ার ফলের তেল ব্যবহার করেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা পরেন গাছের ছাল। তপোবনে আছে লতা, গাছ, ফল, ফুল, হরিণ ও ময়ূর। আর আছে শান্তি, ধর্ম্ম, তপ, ক্ষমা, করুণা আর নিষ্ঠা।

এমনি তপোবনে কালিদাস হিঁদুয়ানীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার একশেষ দেখাইয়াছেন। দুষ্যন্ত একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি আসিতেছেন—মৃগয়ায় উন্মত্ত তাঁহার রথ চলিতেছে ভয়ানক বেগে—এই যে জিনিসটা একটা দাগের মত ছোট্ট দেখাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। যে দুটা জিনিসের মাঝে অনেকখানি জায়গা, সেটা হঠাৎ জুড়িয়া গেল—যেটা স্বভাবতঃ বাঁকা, সেটা ঠিক সোজা দেখাইতে লাগিল—কোন জিনিসই একক্ষণের জন্য পাশে দেখা যায় না—দূরেও দেখা যায় না। 'এই হরিণ যায়—ঐ যায়—এই মারলাম', রাজার মুখে এই মাত্র শব্দ—রাজা আর কিছু দেখিতেছেনও না, শুনিতেছেনও না। এমন সময়ে শব্দ হইল—"মৃগটী আশ্রমের, মারিও না, মারিও না।" রাজা শুনিতে পাইলেন না—কিন্তু সারথি শুনিল। সে বলিল, "ঐ হরিণটার ও আপনার মাঝখানে তপস্বীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" রাজার আর কথা নাই; সারথি সত্য বলিতেছে, কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহার বিচার নাই। সারথির ভুল হইল কি সে সত্যই বলিল, তাহার বিবেচনা নাই। একেবারে বলিয়া বসিলেন, "তবে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাও।" তাহার পর রাজা তপস্বীদের দেখিতে পাইলেন। তাহারাও আবার বলিল, "আশ্রমের মৃগ, মারিও না, মারিও না। আপনার বাণ তুলিয়া রাখ।" রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "এই লইলাম।" তপস্বীরা বলিলেন, "তোমার পুত্রলাভ হউক্। সে রাজচক্রবর্ত্তী হউক্।" রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।" এই সব ঘটনা এত শীঘ্র হইয়া গেল যে, ইহার মধ্যে রাজাও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিবার অবসরও পান নাই। তপস্বীরা বলিলেন, "কণ্বের আশ্রম—মালিনী-তীরে ঐ দেখা যায়। যদি কাজের তাড়া না থাকে, আতিথ্য স্বীকার করিয়া যান।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলপতি আছেন কি?" উত্তর হইল, "না, তিনি নাই। তবে তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি-সৎকারের ভার দিয়া তিনি সোমতীর্থে গিয়াছেন।" "আচ্ছা, তাঁরই সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। তিনিই আমার ভক্তি মহর্ষিকে নিবেদন

করিবেন।" ঋষি ঘরে নাই, তবু তাঁহার আশ্রমের পূজা, যেটুকু প্রাপ্য, দিয়া যাইতে হইবে। সারথিকে রথ চালাইতে বলিলেন। যখন তপোবন নিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন বলিলেন, "ভিতরে রথ গেলে তপোবনের পীড়া হইতে পারে, রথ এইখানেই রাখ।" তাহাতেও সন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "রাজবেশে তপোবনে যাইতে নাই; আমার ধনুঃ ও পোষাক-পরিচ্ছদ এইখানে থাক্" বলিয়া, সব খুলিয়া ফেলিলেন। সামান্য বেশে, তীর্থযাত্রীর বেশে আশ্রমের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ হইল—"ইদো ইদো সহীও।"

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা, মহর্ষির কন্যা, তাঁহাকে ত পাওয়া যাইবে না, ভাবিয়া আকুল হইলেন। শেষ কথাবার্ত্তায় যখন জানিলেন, তিনি অপ্সরার মেয়ে, তখন রাজা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যখন তাঁহারই দলের লোক আসিয়া তপোবনের চারিদিকে গোলমাল করিতেছে শুনিলেন, আর একটা হাতী ক্ষেপিয়া ধর্ম্মারণ্যের দিকে ছুটিতেছে শুনিলেন, তিনি শকুন্তলাকেও ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। কেননা গিয়াই তিনি সকলকে বারণ করিয়া দিবেন যে, কেহ যেন তপোবনের কোনরূপ বিঘ্ন না করে। যখন তিনি বিদূষকের সঙ্গে যুক্তি করিতেছেন, কিরূপে তপোবনে কিছুদিন থাকা যায়, সেই সময়ে খবর আসিল, দুইটী ঋষি বালক তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। রাজ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বিলম্ব করিতেছে কেন, শীঘ্র আন।" বালক দুইটী আসিলে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি জানিতেন, গোখুরা সাপটীও যেমন, সলুইটীও তেমনি। তাহারা যখন যজ্ঞরক্ষার ভার তাঁহার উপর দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, "রথ আন"; তখনই যাইতে প্রস্তুত। রাজা গেলে ঋষিদের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তখন সদস্যেরা অনুমতি করিলে রাজা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যজ্ঞশালা হইতে বাহিরে আসিলেন। আবার সন্ধ্যার সময় যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রাক্ষসেরা যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে আসিল। আবার রাজার ডাক পড়িল। এইরূপে রাজা যজ্ঞরক্ষার জন্য দিন রাত খাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সব কাজ শেষ হইলে পর, তিনি নগর গমনের অনুমতি পাইলেন।

রাজধানীতে পঁহুছিবার কিছুদিন পরে একদিন রাজা বিচারের ও রাজ্যের সব কাজ সারিয়া একটু বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বুড়া কঞ্চুকী আসিয়া খবর দিল কণ্বের কতকগুলি শিষ্য আসিয়াছেন; খবর দিতে বৃদ্ধের মন সরে না। অনেক খাটুনির পর একটু আরাম করেন, আজ আবার তাও হবে না। বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইল; তবে কাজ না করিলেও নয়। বিশেষ ঋষিদের কাজ, সকলের আগে। কঞ্চুকী খবর দিল। রাজার দ্বিরুক্তি নাই, অমনি বলিলেন, "কণ্বের শিষ্যেরা আসিয়াছেন, আচ্ছা, তাঁহাদের অভ্যর্থনা ত আমাদের দিয়া হইবে না। পুরোহিত ঠাকুরকে বল, তিনি যেন শ্রৌতসূত্রে যেরূপ বিধি আছে, সেইমত তাঁহাদের সৎকার করিয়া নিজেই

তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আর আমাকেও অগ্নিশরণে লইয়া চল।" ঋষি তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করার মত পবিত্র জায়গা—অগ্নিশরণই। সে জায়গাটী অতি পবিত্র। এইমাত্র ঝাড়ু দেওয়া হইয়াছে, নিকটেই হোমধেনু। রাজা বারান্দায় বসিলেন। পুরোহিত রাজাকে দেখাইয়া ঋষিদের বলিলেন, "এই দেখুন, যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আপনাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।" শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী ও শকুন্তলার সঙ্গে রাজার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে [পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। শার্ঙ্গরব ত বড়ই কড়া কড়া কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা কিন্তু বিরক্ত হইয়াও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহাকে দস্যু বলা হইল, তাঁহাকে নিপাত দেওয়া হইল; কিন্তু রাজা অটল অচল। তিনি সব কথারই জবাব দিলেন, কিন্তু স্থিরভাবে—ধীরভাবে। তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না, শকুন্তলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। শকুন্তলা সব কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু শাপ হইতেছে "তুমি বুঝাইয়া দিলেও তিনি মনে করিয়া উঠিতে পারিবেন না," তখন শকুন্তলার সব চেষ্টা বিফল হইল। রাজা শাপের জন্য মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল; তাহাতে তিনি শেষ মনে করিলেন, "হবেও বা।"

কণ্বের তপোবন ছাড়িয়া, ভারত ছাড়িয়া স্বর্গের পথে হেমকুট গিরি। তাহার চূড়াগুলি সোনার। পর্ব্বতটী পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের সন্ধ্যার সময় যেমন সোনালি রঙের মেঘ দেখা যায়, পর্ব্বতটী আগাগোড়া তাই। যেন সোনার রস ঢালিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, তাহারও উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, এটী তাহারই বর্ষ-পর্ব্বত; এখানটী তপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র। এখানে তপস্যা করিলে সিদ্ধি হইবেই হইবে। এখানে মরীচির পুত্র কশ্যপের আশ্রম। মরীচি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তাঁহার পুত্র কশ্যপ। তিনি সুর, অসুর, গরুড়, নাগ প্রভৃতি প্রাণী সকলেরই পিতা। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "বটে, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হইবে।" রথ থামিল চাকার শব্দ হইল না; ধুলা উড়িল না, মাটি স্পর্শ করিল না। রথ নামিলেও নামিল, বলিয়া বোধ হইল না, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারীচের আশ্রম কোন্ দিকে?" মাতলি হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া ঐ যে গাছের গুঁড়ির মত অচল মুনি তপস্যা করিতেছেন, ঐ দিকে দেখ, মুনির দেহ অর্দ্ধেকটী উঁইয়ের ঢিপিতে ডুবিয়া আছে। কত সাপের খোলস উঁহার বুকে জড়াইয়া আছে, কত পুরাণ লতা উঁহার গলায় জড়াইয়া আঁটিয়া গিয়াছে। কাঁধের উপর জটা পড়িয়াছে, তাহাতে পাখীরা বাসা করিয়াছে।" রাজা দেখিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কি কঠোর তপস্যা !!! রাজা আবার বলিলেন, "এখানকার তপোবন দেখিতেছি আশ্চর্য্য! এখানে কত কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, যাহাই চায়, তাহাই পায়, তথাপি লোকে বায়ু ভক্ষণ

করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। সোণার পদ্ম ফুটিয়া আছে, তাহার ফুলের ধুলায় জল হলুদ হইয়া গিয়াছে, সেই জলে ইঁহাদের পূজাপাঠ হয়। রত্নশিলাতলে বসিয়া ইঁহারা ধ্যান করিতেছেন। অপ্সরাদের সম্মুখে বসিয়া সংযম করিতেছেন। আমাদের মুনিরা যাহা পাইবার জন্য তপস্যা করেন, সেই সব পাইয়াও ইঁহারা তপস্যা ছাড়িতেছেন না।" মাতলি বলিলেন, "লোকের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উঁচার দিকেই উঠে। অহে বৃদ্ধ শাকল্য! মারীচ মুনি এখন কি করিতেছেন?" "দাক্ষায়ণী তাঁহাকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তিনি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেছেন।" রাজা বলিলেন, "তবে ত তাঁহার অবকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।" আমাদের কর্ত্তাদের মত রাজা ব্যস্ত হইলেন না। বলিলেন না, "তবে আজ থাক, আর এক সময় দেখা পাইব।" মাতলি বলিলেন, "আচ্ছা আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি তাঁহার ফুরসত দেখিয়া খবর দিই।"

ইতিমধ্যে রাজার সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আলাপ হইল, শকুন্তলার সঙ্গে আলাপ হইল। রাজা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। ক্ষমা চাহিলেন। শকুন্তলার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল। তাহার পর মাতলি আসিয়া তাঁহাকে প্রজাপতির কাছে লইয়া গেলেন। রাজাও শকুন্তলা ও সর্ব্বদমনকে সঙ্গে লইলেন।

প্রজাপতি কশ্যপ দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া দাক্ষায়ণীকে বলিলেন, "ঐ দেখ, রাজা দুষ্যন্ত পৃথিবীর রাজা, তোমার পুত্রের প্রধান সহায়, অসুরযুদ্ধে ইনি ইন্দ্রের আগে আগে গিয়া অসুর নাশ করেন। ইন্দ্রের শত্রু বধ ইঁহার হাতেই হয়। তাঁহার বজ্র এখন আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার আকার তেজ দেখিয়া সেটা আমি বেশ বুঝিয়াছি।" মাতলি বলিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখুন, দেবতাদের পিতা-মাতা আপনাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতেছেন। উঁহাদের নিকট যান।"

রাজা বলিলেন, "মুনিরা যাঁহাদের দ্বাদশ আদিত্যের জনক-জননী বলেন, যাঁহারা যজ্ঞভাগেশ্বর ইন্দ্রের পিতা ও মাতা; পরম পুরুষ যে দম্পতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহারাই কি তাঁহারা? দক্ষ ও মরীচি ইঁহাদের উৎপত্তিস্থান। ইঁহারা ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে কেবল এক পুরুষ মাত্র অন্তর।" তিনি আগু বাড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রের দাস আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছেন।" দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। শকুন্তলাও তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন। মারীচ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার স্বামী ইন্দ্রের সমান, তোমার পুত্র জয়ন্তের সমান, তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি শচীর সমান হও।" দাক্ষায়ণীও শকুন্তলাকে "পতিসোহাগিনী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ছেলেটীকেও 'রাজচক্রবর্ত্তী হউক' বলিয়া দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করি; কিন্তু ইনি যখন আমার কাছে আসিলেন, কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না যে, ইঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম;

সুতরাং ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কণ্বমুনির কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলাম। তাহার পর আঙটী দেখিয়া আমার সব কথা মনে হইল। কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারিতেছি না!" তখন মারীচ বলিয়া দিলেন, "আমি ধ্যানে জানিয়াছি দুর্ব্বাসার শাপই ইহার কারণ।" তখন শকুন্তলা ভারী খুসী যে রাজা তাঁহাকে অকারণে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু শাপের কথা তিনি ত জানিতেন না, কখনও শুনেনও নাই, তবে সখীরা তাঁহাকে আঙটীটা রাজাকে দেখাইবার জন্য বড় জেদ করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি অনুমান করিলেন—শাপ হইয়াছিল। তখন মারীচ বলিলেন, "শোন মা, তোমার যে অদৃষ্টে দুঃখ হইয়াছে, তাহার কারণ শাপ; সেই শাপে রাজার স্মরণশক্তির লোপ করিয়া দিয়াছিল। এখন শাপের অবসান হইয়াছে। এখন স্বামীর উপর তোমার খুব প্রভুত্ব হইবে। দেখ, আরসীতে যতক্ষণ মলা থাকে, তখন ছায়া তাহাতে খেলিতে পারে না। পরিষ্কার আরসীতে খুব খেলে।"

শকুন্তলায় ব্রাহ্মণের প্রভাব অসীম। এক ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার শাপে অপ্সরার মেয়ে বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার কত কষ্ট। তপোবন হইতে বিদায়, রাজার নিকট তাড়না, বিজনে অনাথিনীর মত থাকা। সবই ত সেই দুর্ব্বাসার শাপে। আবার অন্যদিকে দেখ, প্রথমেই রাজা হরিণ মারা বন্ধ করিতেই তপস্বীরা আশীর্ব্বাদ করিল, 'তোমার পুত্র হউক্, সে চক্রবর্ত্তী রাজা হউক্।' সেই আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র—কণ্বমুনিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরও সেই কথাই বলিলেন। চক্রবর্ত্তী ত যে সে লোক হইতে পারে না। রাজার ছেলেটীর সংস্কার করিল কে? স্বয়ং মারীচ—ব্রহ্মার নাতি। সে ছেলে যে চক্রবর্ত্তী হইবে, তাহার আবার কথা! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে নাটক আরম্ভ; আশীর্ব্বাদ ফলিল, নাটকও শেষ হইল।

নারায়ণ
মাঘ, ১৩২৪

এক এক রাজার তিন তিন রাণী

কালিদাসের নাটকগুলিতে এক এক রাজার তিন তিন রাণী। মালবিকায় তিন রাণীই রঙ্গমঞ্চে উঠিয়াছেন। একটীর নাম ধারিণী, একটীর নাম ইরাবতী ও আর একটীর নাম মালবিকা। বিক্রমোর্ব্বশীতে এক রাণীর নাম ঔশীনরী, আর এক রাণী উর্ব্বশী। রাজার তৃতীয় ভালবাসার সামগ্রী উদয়বতী নামে বিদ্যাধরকন্যা। শকুন্তলায় রাজার পাটরাণী বসুমতী, আর এক রাণী হংসপদিকা, আর এক রাণী শকুন্তলা। তিন জায়গায়ই পুরাণ রাণীটী পাটরাণী; কোন রাজার মেয়ে, বয়স একটু হইয়াছে, গৃহিণীপনায় খুব মজবুত। দ্বিতীয়টী নাচে, গানে, ছবি আঁকায় খুব পটু, তার উপর খুব রূপসী, খুব চালাক চতুর। আর তৃতীয়টী নাটকের নায়িকা, উহার সহিত রাজার প্রেম লইয়াই নাটক। শেষ তিনিই আর দুই রাণীকে ছাপাইয়া উঠিলেন।

মালবিকায় তিনটী রাণীকেই রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়। উর্ব্বশীতে দুইটীকে ও শকুন্তলায় মাত্র একটীকে। রঙ্গমঞ্চে দেখিতে না পাইলেও তাঁহারা সকলেই আছেন ও কাজ করিতেছেন। নাটকের কাব্যাংশটাকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। তিনখানি নাটক মন দিয়া পড়িলে বেশ মনে হয়, যেন কালিদাস মালবিকার তিনটী রাণীকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আবার যদি তিনটাকেই বাহির করেন, তাহা হইলে জিনিসটা কতকটা একঘেয়ে হইয়া যাইবে। তাই একটী একটী করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীতে এমনই কৌশলে একটী ত্যাগ করিয়াছেন যে, লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। তিনি ঔশীনরীকে দুইবার আনিয়াছেন; একবার আনিয়াছেন, ইরাবতীর মত। ভয়ানক মান। রাজা অন্যের প্রতি আসক্ত, হঠাৎ পথে একখানা ভূর্জ্জপত্রে এই কথাটা পড়িয়া একেবারে রাজার কাছে আসিয়া তাঁহাকে যার পর নাই তিরস্কার। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙ্গাইতে গেলেন, তাহাতে রাণীর মান ভাঙ্গিল না। তিনি রাগে গর্ গর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিদূষক রাজাকে উঠাইল। অগ্নিমিত্র ইরাবতীর উপর রাগ করিয়াছিলেন: "এত করে পায়ে পড়িলাম, তাতেও মান ভাঙ্গিল না। যাক্, ওর কথা আর ভাবিব না, কারণ সে ত একটা চাকরাণী বই নয়।" পুরূরবা কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "দেখ, আমার আর রাণীর উপর সে রকম টান নাই, সে কথাটা যখন তিনি বুঝিয়াছেন,

তখন আমি যতই ভাল কথা বলি, তাঁহার কানে উঠিবে কেন? প্রাণে লাগিবে কেন?" তবে তিনি পাটরাণী বলিয়া উহাকে একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না। অপমানের পর অগ্নিমিত্র আর ইরাবতীর নামও করেন নাই! কিন্তু শেষ মিলনের সময় যখন উর্ব্বশী আয়ুকে বড়মার কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন, তখন রাজা পুরূরবা বলিলেন, "না না, তা হইবে না, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁর কাছে যাব।"

এই ত গেল ঔশীনরীর সহিত ইরাবতীর স্বভাবের মিল। কিন্তু ঔশীনরীর আর এক মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তিতে তিনি ধারিণীকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন: 'আজি হইতে আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসিবেন, অথবা যে আমার স্বামীকে ভালবাসিবে, আমি তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসার করিব।' কালিদাস যেন ধারিণী ও ইরাবতী, দুইটী রাণী ভাঙ্গিয়া ঔশীনরীকে গড়িয়াছেন। সুতরাং, ভাল সমজদার এই একটী রাণীকে দুইটী করিয়া লইতে পারেন। তথাপি যে অত সমজদার নয়, তাহার জন্য উদয়বতী সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পথে পথেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে ত তাহাকে আনেনই নাই, অঙ্কেও তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবেশকে তাহার নাম করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শকুন্তলায় ইরাবতীও আছেন, ধারিণীও আছেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উঠেন নাই। ঐ যে রাণী হংসপদিকা গানে বলিতেছেন—'ভৃঙ্গরাজ, তুমি আমের বউলে একটী চুমা দিয়াই পদ্মের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে, বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না'—এটীতে রাজার উপর বেশ ঠেস আছে, রাজা দূর হইতে গান শুনিয়া সেটী বেশ বুঝিলেন। আর বলিলেন, "বসুমতীর কাছে অধিক থাকি বলিয়া হংসপদিকা আমায় বেশ তিরস্কার করিল।" হংসপদিকায়ও ইরাবতীর গন্ধ ভর ভর করিতেছে। আর বসুমতীও যেন ধারিণীর ছাঁচে ঢালা। তিনি রাজার দাসীর হাত হইতে রং ও তুলি কাড়িয়া লইয়া নিজেই সেগুলি রাজাকে দিতে আসিতেছিলেন; পথে শুনিলেন, মন্ত্রীর পত্র লইয়া দ্বারবান যাইতেছে, তাই রাজকার্য্যে বাধা দিবেন না বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। অথবা বসুমতীকে ঔশীনরীর নকলও বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে একাধারে মানিনীর ও প্রবীণার বেশ মিল হইয়াছে।

শুধু যে একঘেয়ে হবার ভয়েই কালিদাস এক একটী করিয়া রাণীকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এমন নহে। ওরূপ করার আরও কারণ ছিল। কালিদাসের যতই বয়স হইতেছিল, তাঁহার হাতও ততই পাকিতেছিল। আগে মনের যে কথাটা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অনেক আড়ম্বর করিতে হইত, পরে সেটা এক কথায় বলার ক্ষমতা তাঁহার জমিয়া আসিতে লাগিল। আগে যেটা ফুটাইবার জন্য তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসিতে হইত, শেষ একবার তুলি বুলাইলেই সেটা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাই অগ্নিমিত্রে যাহা লম্বা চওড়া, শকুন্তলায় সেটা খুব

সংক্ষেপ। এইরূপে নায়কনায়িকা-ঘটিত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়া কালিদাস নাটককে লোকশিক্ষার দাস করিয়া তুলিতে পারিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যেমন চিনি ঔষধের দাস, চিনির ভিতর ঔষধের শুধু বীজটী সূক্ষ্মভাবে আছে, কালিদাসের নাটক তেমনি শিক্ষার দাস, নাটকের মধ্যে ঔষধ বা শিক্ষা সূক্ষ্মভাবে লাগিয়া আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মত মধুতে মাড়িয়া ঔষধ খাইলে ঔষধটা আরও তিত হয়। অশ্বঘোষের কাব্য মধুমাড়া তিত ঔষধ। কালিদাসের সেরূপ নহে।

কালিদাসের হাতপাকার কথা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। দেখুন, মালবিকাগ্নিমিত্রে রাণীরা তিনজনেই রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন। একে নূতন কবি, তাহাতে আবার খুব মুখফোঁড় নয়, পাছে রাণীদের চরিত্র লোকে না বুঝিতে পারে, তাই কালিদাস প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে এক একটী চেটী দিয়াছেন। চেটীটী রাণীর দোছোট, রাণীও যখন রঙ্গমঞ্চে, চেটীটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে, যেন নূতন কবি রাণীকে একেলা সেখানে আনিতে নারাজ। তাহারা কত কথাই কয়, কত কাজই করে, কেবল রাণীর মনের ভাবটা প্রেক্ষককে বুঝাইবার জন্য। তবু কবির মন স্পষ্ট হয় না যে, সকলে তাহার কথাটা ঠিক বুঝিতেছে। কিন্তু উর্ব্বশীতে তত আড়ম্বর নাই, তত সন্দেহ নাই, কবির যেন বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহার প্রেক্ষককুল তাঁহার মতলবের যথার্থ সমজদার। তাই তিনি পাটরাণীকে একবার বাহির করিলেন মানিনী তেজস্বিনী ইরাবতী সাজাইয়া, আর একবার বাহির করিলেন গম্ভীর গৃহিণী সাজাইয়া। সঙ্গে সেই একই চেটী, কিন্তু সে কথাবার্ত্তা বড় একটা কয় না। শকুন্তলায় রাণীদের রঙ্গমঞ্চেই আনিলেন না। একজনকে নেপথ্যে একটী গান করাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি মানিনী, ঈর্ষ্যায় ভরপুর হইতেছেন; আর একজনকে পথে পথে বিদায় করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, গম্ভীরা গৃহিণী হইলেও তিনি, রমণী ও রমণীর যাহা স্বভাব তাঁহাতে সেটী পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। রাজা যে অন্যের প্রতি আসক্ত, এটা তিনি সহিতে পারেন না। এইরূপে একবার মাত্র তুলি বুলাইয়াই তিনি সব কথাগুলি ফুটাইয়া তুলিলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে কালিদাসের কেবল হাত পাকিয়াছে, সংক্ষেপ করার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, এমন নহে। তিনি অনেকটা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছেন। সে খর খর ভাব, সে তীব্রতাটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ রাগে ইরাবতী রাজাকে হার ছুঁড়িয়া মারিল ও আর রাজার মুখ দেখিল না, বরং রাজার ছবির কাছে গিয়া মাপ চাহিবে, তবু জীয়ন্তে রাজার কাছে যাইবে না। তাহার চক্ষে, যে অন্যের প্রতি আসক্ত, আমার পক্ষে সে একখানি ছবিমাত্র, একটী পাথরের প্রতিমা মাত্র। ঠিক সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ রাগ বটে; ঔশীনরী অত দূর করিলেন না। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙ্গাইতে গেলেও তাহার মান ভাঙ্গিল না, কিন্তু আবার সে আসিয়া বলিয়া গেল, 'আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসেন বা যে আমার স্বামীকে

ভালবাসে, সে আমার ভগিনী, আমি তাহার সহিত ভগিনী ভাবে ঘরকরণা করিব।' রাণী বসুমতীর অবস্থাও তেমনি, রাগও তেমনি। তিনিও একটা হাঙ্গাম করিবার জন্য দাসীর হাত থেকে রংএর বাক্স ও তুলি কাড়িয়া লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত জানিয়া ফিরিয়া গেলেন। বসুমতীর এই আচরণে তাঁহার উপর আমাদের বড়ই শ্রদ্ধা হয়। তাঁহার রাগের কারণ আছে সবাই জানে, তাঁহার ব্যথায় সকলেই ব্যথী, তিনি একটা হাঙ্গাম করিলেও লোকে তাঁহার নিন্দা করিত না। কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগ অসীম : 'আমার স্বামী রাজা, রাজকার্য্য তাঁহার সকলের চেয়ে বড় ; আমি তাঁহার রাণী, বড় রাণী, গৃহিণী, সর্ব্বময়ী, সব সত্য ; কিন্তু রাজার রাজকার্য্য গৃহিণী রাণী অপেক্ষা ঢের বড়।' সুতরাং রাণী রাজ-কার্য্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিলেন, অন্ততঃ মনের রাগ মনে মারিয়া সরিয়া গেলেন। কবি যে কত মোলায়েম হইয়াছেন, ইহাতেই তাহা বোধ হইবে।

আর একটা কথা, তিন রাণীকে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া কালিদাস কি দেখাইয়াছিলেন ? দেখাইয়াছেন—রিষের বিষ, ঈর্ষ্যার ঝাল, দ্বেষের চূড়ান্ত। ইরাবতীর রিষ বড়ই রিষ; কিন্তু তাহাতে পরের অপকারের চেষ্টা নাই। সে রিষের ফল আত্মবিসর্জ্জন, অনুতাপ। কেন মজিয়াছিলাম, কেন ভুলিয়াছিলাম ; আমি যে দাসী ছিলাম, সে ত ছিল ভাল। দুদিনের তরে রাণী হইয়া আমার সব গেল। পরের অপকার-চেষ্টা নাই বটে, কিন্তু পরের উপর বিশেষ অনুরাগও নাই, বরং তফাৎ থাকার ইচ্ছা অধিক। কিন্তু ধারিণীর রিষের ফল ইরাবতীর সর্ব্বনাশ, তাহাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণও হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়া, মতলব করিয়া, তলায় তলায় ষড়যন্ত্র করিয়া ইরাবতীটীর লোপ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লোপ হইলেন, তবুও ইরাবতীর উপর যে ঝালটা ঝাড়িতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ। কবি রাণীকে এই আনন্দটুকু উপভোগ করাইয়াই তাঁহার লোপ করিয়া দিলেন। তাঁহার দেবী শব্দটীও গেল, তিনি চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এই যে রিষের বিষ, এটা ছেলেবেলায়ই ভাল লাগে। আর পরের মন্দ করিতে গিয়া নিজের মন্দ করাও সে অবস্থায় বেশ ভাল লাগে। তাই কালিদাস অল্প বয়সে মালবিকাগ্নিমিত্রে তাই বেশী করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু বয়স হইলে ওটা আর তত ভাল লাগে না, অথচ ওটা প্রকৃতির খেলা, ছাড়িবার যো নাই। তাই ওটাকে একেবারে লোপ না করিয়া নরম করিয়া মোলায়েম করিয়া আনিয়াছেন। হংসপদিকার রিষটা কি রকম দেখুন। সেও ত ঝগড়া করিতে পারিত, একটা হাঙ্গাম করিতে পারিত, কিন্তু কিছুই করিল না। আপন মনে বীণাটী ধরিয়া মনের দুঃখে গান করিতে লাগিল। সে গান কত মধুর ; তাতে ঝালের লেশও নাই। আছে কেবল করুণাভিক্ষা ও সেই সঙ্গে একটু হোমিওপ্যাথিক ডোজে একটু তিরস্কার ! তুমি আমের বউলে একটী

মাত্র চুমা দিয়া কমলের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে; বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না। এ কথায় তিরস্কার একটু আছেই, কিন্তু তার চেয়ে করুণাভিক্ষাই অধিক। ওগো, তোমার এমন করিয়া ভুলে থাকা উচিত নয়; মাঝে মাঝে আমায় এক একবার মনে করিও। রাজা করিলেনও তাই, বিদূষককে পাঠাইয়া দিয়া তিনি যে ভুলেন নাই, সেটা জানাইয়া দিলেন। এই মান আর ইরাবতীর মানে কত তফাৎ।

ইরাবতীর প্রতি রাজার আসক্তি ধারিণী সহিতে পারেন নাই। তাহার সর্ব্ব-নাশের কতই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ঔশীনরী কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিলেন না, নিজে পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইয়া একটা হীন সন্ধি করিয়া গেলেন, হার মানিয়া নিজের মান বজায় রাখিয়া গেলেন। আর বসুমতী জিনিসটাকে বড় একটা গ্রাহ্যই করিলেন না। একটু বিরক্ত হইলেন বটে, একটু চঞ্চল হইলেন বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২৪

রঘুবংশের গাঁথুনি

কালিদাসের রঘুবংশ লইয়া পণ্ডিত মহলে দুই রকম মত আছে। কেহ কেহ বলেন, উহা কাব্যই নয়; পুরাণ হইতে পারে, ইতিহাস হইতে পারে; কিন্তু কাব্যের 'কা'টী পর্য্যন্ত নয়। টোলের পণ্ডিতেরা সেকালেও বলিতেন, এখনও বলেন, 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্'। আবার কেহ কেহ বলেন, 'এমন কাব্য হয়নি, হবে না, ঐ এক, উহার তুলনা নাই।' ইংরাজীওয়ালাদের ভিতরেও দুই মত। বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে, উহা পুরাণ, কালিদাসের শিক্ষানবিসীর সময়ে লেখা; যখন উহা লেখা হয়, তখন তাঁহার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় প্রবল; উহার অনেক পরে কুমারসম্ভব লেখা হয়; কুমারসম্ভবের সমস্তটাই স্থির, গভীর, ধীর। তিনি রঘুবংশের অষ্টম সর্গের অজবিলাপের

> ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
> নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥ [৮।৫৫]

এই কবিতাটীর সহিত কুমারসম্ভবের

> গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
> অহমস্য দশেব পশ্য মামবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥ [৪।৩০]

এই কবিতা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, অজ-বিলাপের কান্না "যৌবনের কান্না।" রঘুবংশ কাঁচা হাতের লেখা, আর কুমারসম্ভব পাকা হাতের লেখা।* বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাসের দোষগুণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, কতকগুলি অতি উত্তম উৎকৃষ্ট ছোট ছোট কাব্যের সমষ্টিই রঘুবংশ।† আমিও এককালে এই মতই প্রচার করিয়াছিলাম। যখন সঞ্জীব বাবু বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দেন ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উহার কর্ত্তা হন, তখন আমি বঙ্গদর্শনে লিখি যে, রঘুবংশ Hale's Longer English Poems এর মত কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি, তবে একটী বংশ ধরিয়াই যখন সব কাব্যগুলি লেখা হইয়াছে তখন উহা এক সূতায় গাঁথা আছে।** প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের খানিকটা পর্য্যন্ত 'দিলীপ-সুদক্ষিণা-কাব্য'; তৃতীয়ের শেষটা, চতুর্থ ও পঞ্চমের খানিকটা লইয়া 'রঘুকাব্য'; পঞ্চমের শেষ দিক্‌টা, ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম 'অজ-ইন্দুমতী-কাব্য'; নবম 'দশরথ'; একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, ও পঞ্চদশ সর্গে 'রামায়ণ'; ষোড়শ 'কুশ-কুমুদ্বতী-কাব্য'; সপ্তদশ 'অতিথি; অষ্টাদশে 'অতিথির উত্তরাধিকারিগণ'; উনবিংশে 'অগ্নিবর্ণ-শৃঙ্গার-কাব্য'; এতগুলি কাব্য লইয়া রঘুবংশ। তবে এ কাব্যগুলি সবই পাকা হাতের লেখা, ইহাদের অর্থ অতি গভীর, এবং ইহাতে উপদেশ অতি মধুর, অতি হিতকর। একজন ব্রাহ্মণের এক কথায় সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আপন স্ত্রীকে লইয়া রাখাল সাজিলেন, এ বড় সহজ কথা নয়। বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর

---

* "আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটী কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—প্রথম অজবিলাপে, 'ইদমুচ্ছ্বসিতালকং.........॥' এটি যৌবনের কান্না। তারপর রতিবিলাপে, 'গত এব ন তে নিবর্ত্ততে.........॥' এটি বুড়া বয়সের কান্না।" দ্রষ্টব্য 'বুড়া বয়সের কথা', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮৪।—সম্পাদক—।

* সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১২৯৯) বলেন্দ্রনাথের "কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'য় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের কতিপয় প্রবন্ধ 'সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া' বাঙ্গালা ১৩০১ সালে 'চিত্র ও কাব্য' এই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ "কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা"য় বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে [রঘুবংশ] কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রতিভা লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত।......অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম।......সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র।..."—সম্পাদক—।

** দ্রষ্টব্য 'রঘুবংশ' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৮৩-৯৪। প্রবন্ধটী ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রের কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।—সম্পাদক—।

সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, "বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথা তোমার লেখা?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এইরূপ বারবার লিখিবে?" আমি বলিলাম, "ইচ্ছা ত আছে।" তিনি তখন বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি তখন গরম হইয়া বলিলেন, "আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না। তুমি কি না বল, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কি?" দেখিলাম, তিনি বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, "আপনি যদি রাগ করেন, আমি না হয় লিখিব না।" কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ঐ কথাই তুলিতে লাগিলেন। আমি যথাসময়ে চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু সেই অবধি আমার মনে খট্‌কা লাগিয়া রহিল যে, রঘুবংশ এত বড় একখানা কাব্য, ইহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশেরই যা কিছু বড়, যা কিছু নূতন, যা কিছু সুন্দর, সব একত্র করিয়া ধরিয়াছে, আর এমন ভাবে বর্ণন করিয়াছে যে, সেরূপ আর দেখা যায় না। একটা নগরের, একটা রাজবাড়ীর, একটা বাগানের বা একটা দেশের বর্ণনায় এক একখানি মহাকাব্য হয়; আর এত বড় এক মহাদেশের এত বড় একটা মহা বর্ণনায় রঘুবংশ মহাকাব্য হইবে না? এক রাজা-রাণীকে নায়ক-নায়িকা করিয়া, দু পাঁচ বছরের ঘটনা লইয়া, এক একখানি মহাকাব্য হয়; আর আঠার পুরুষ ধরিয়া কত রাজা কত রাণী লইয়াও রঘুবংশখানি মহাকাব্য হইবে না? তাহার পর ভারতবর্ষে যাহা কিছু বর্ণনার জিনিস আছে—জড় জগতে হউক, অন্তর্জ্জগতে হউক, ধর্ম্মে হউক, কর্ম্মে হউক—সবই ত রঘুবংশে আছে; অথচ রঘুবংশ মহাকাব্য হইবে না? কালিদাস কি সত্য সত্যই একখানি পুরাণ লিখিয়া গিয়াছিলেন? যদি তাই করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহাতে এত কল্পনা, এত বর্ণনা, এত রস, এত ভাব, এত উপদেশ, ভাবের এত গাম্ভীর্য্য, এ সব কেন? ইতিহাসে ত এ সকলের দরকার হয় না; আর এত বড় কাব্যখানিকে ইতিহাস বলিতেও প্রাণ চায় না।

তখন সংস্কৃত মহাকাব্যের কি লক্ষণ, তাই পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, নায়ক-নায়িকা না হইলে কাব্য হয় না, আর যত কাব্য আছে, প্রায় সবগুলিরই এক নায়ক, এক নায়িকা। কাব্যাদর্শে মহাকাব্যের লক্ষণে "চতুরোদাত্তনায়কং" এই কথাটী আছে [১।১৫]। সমাস ভাঙ্গিতে গেলে ঐ নায়ক শব্দ হইতে নায়ক নায়িকা দুই বুঝাইতে পারে, ও এক নায়ক—বহু নায়কও বুঝাইতে পারে। টীকাকার

প্রেমচাঁদও [প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ] তাহাই বুঝাইয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার খুলিয়া বলিলেন —"একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা"—অর্থাৎ মহাকাব্যে এক বংশের অনেক রাজাও নায়ক হইতে পারেন। এইরূপে সংস্কৃত অলঙ্কারে রঘুবংশকে মহাকাব্যের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এ লক্ষণে ত তৃপ্তি হয় না। একখানি কাব্য লিখিতে গেলে আগাগোড়া এক সূতায় গাঁথা চাই, নহিলে জমাট হইবে কেন? জমাটই ত কাব্যের প্রাণ। জমাট না হইয়া যদি তার কাটিয়া গেল, তাহা হইলে আর কাব্যের কি হইল। সেই জমাট—তা রঘুবংশে কই? এক সূতায় গাঁথা কই? যদি বল, সব রাজারাই এক বংশের—'একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা'—একটা সূতা বটে, কিন্তু এ কাব্যের সূতা নয়। কাব্যের যে সূতা হইবে, তাহাতে "সূত্রে মণিমালা ইব" এক অপূর্ব্ব বাঁধনে সমস্ত কাব্যখানি বাঁধা থাকিবে। একটী কবিতার একটী কথার নড়-চড় হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে। সে সূতা রঘুবংশে কই? অথচ রঘুবংশখানি বেশ জমাট। কোথা হইতেও একটী কবিতা উঠাইবার বা একটী শব্দ বদলাইবার যো নাই। পড়—আরম্ভ করিলে ছাড়িতে পারিবে না, কোথাও তার কাটিল বলিয়া মনে হইবে না। আগাগোড়া কাব্যখানি এক মনে এক ধ্যানে পড়, মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইবে, তোমার সমস্ত স্বভাব যেন বদলাইয়া যাইবে; তুমি পড়িবার আগে যে মানুষটী ছিলে, পড়া শেষ করিলে তোমার মনে হইবে, যেন তুমি আর এক মানুষ হইয়া গিয়াছ, অনেক ভাল হইয়া গিয়াছ। অথচ সেই কাব্যের সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বুঝিলাম, সেইটুকু পাওয়া যায় নাই বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত বড় মহাকাব্যখানিকে পুরাণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন; বলেন্দ্রবাবুও উহা ছোট ছোট কাব্যের সমষ্টিমাত্র বলিয়া গিয়াছেন, আমিও Hale's Longer English Poems বলিয়াছি।

বঙ্কিমবাবুর সহিত কথাবার্ত্তার পর আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ এই সূত্রটুকু (unity of purpose) খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, ততদিন আমি আর রঘুবংশ সম্বন্ধে কিছুই লিখিব না। কিন্তু যদি সেটী খুঁজিয়া পাই, বঙ্কিমবাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর আবার রঘুবংশের কথা লিখিব। সে সূত্রটী ধরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না; দেখাইতে পারিলে তিনি কি বলিতেন, তাহাও জানিবার কোনও সুযোগ হইল না।

কতদিন কতভাবে সে সূত্র ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, ধরিতে পারি নাই। একবার মনে হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচারই বোধ হয় এই সূত্র। গোব্রাহ্মণে ভক্তিই ত হিন্দুর ধর্ম্ম। দিলীপ সুদক্ষিণা দুইটীরই সেবা করিলেন। রঘু নন্দিনীর অনুগ্রহে ইন্দ্রকে জয় করিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণের শাপেই পুত্রলাভ করিলেও মরিবার সময় কোন পুত্রই দশরথের কাছে রহিল না। রামায়ণময়

ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব—পুত্রেষ্টি যজ্ঞে রামচন্দ্রের জন্ম, অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনি আবার পুত্র লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কাব্য তত জমিল না। কই, অজইন্দুমতীর কয় সর্গে ত ব্রাহ্মণের কথাই নাই। কুশ, অতিথি ও শেষ রাজাদের কথার মধ্যেও ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব নাই। আর এক কথা—ওটা ত উপদেশ মাত্র। শুধু উপদেশ লইয়া ত কাব্যের সূত্র হইতে পারে না।

আবার মনে হইল, যেন পুরুষের পর পুরুষ রাজাদের শরীর ও মনে উন্নতি বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। দিলীপ হইতে রঘু বড়, রঘু হইতে অজ বড়, অজ হইতে দশরথ বড়, দশরথ হইতে রাম বড়। কিন্তু এতক্ষণ ত কোন রকমে বড় করা যাইতেছিল, কিন্তু রামের পর ত আর কোন রকমে বড় করা যায় না। সুতরাং ও সূতাটী কিছুই নয়, 'ক্রমোন্নতি'র সূত্র টিকিল না।

হঠাৎ একদিন মনে হইল, রামায়ণ হইতে রঘুবংশ বড় কিসে? বাল্মীকিও বড় কবি, কালিদাসও একজন বড় কবি। বাল্মীকি সাধারণ লোকের মন ভুলাইবার বেশী চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস শিক্ষিত ও সভ্য লোকের মনোরঞ্জনের বেশী চেষ্টা করেন। বাল্মীকির রামায়ণ রাম ও সীতার ছবিতেই উজ্জ্বল—যেন দুখানি দেবপ্রতিমা সামনে ধরিয়া দিয়াছে। কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপরেও টেক্কা দেওয়া। তিনি রাম ও সীতার ছবি আঁকিতে গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রাম-সীতার আশে পাশে আরও অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড তিনি এক সর্গে ১০৪টী কবিতায় সারিয়া দিলেন [দ্বাদশ সর্গ]। কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এ ত গেল খাস রামায়ণে—যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণের বাহিরে যে সব ছবি, বাল্মীকিতে ত সেগুলি নাই; সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে Background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।

এও গেল বাহিরের কথা—ফটোগ্রাফের কথা—দুর্গা-প্রতিমার কথা—চালচিত্রের কথা। ভিতরের কথা কি? ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড দেওয়া ত আর সূত্র হইতে পারে না। তখন মনে হইল—বাল্মীকির উদ্দেশ্য যা, কালিদাসের উদ্দেশ্যও তাই—শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান। বাল্মীকি রামচন্দ্রেরই জয়গান করিয়া গিয়াছেন; কালিদাস সূর্য্যবংশের সকল রাজারই গুণগান করিয়া সকলেরই উপর শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান গাইয়া গিয়াছেন।

এই সকল কথা যখন পরিষ্কার হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত রঘুবংশটী এক কোমল-মনোহর সূতায় গাঁথা। সে সূতাটী যে কি, তাহা দেখাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কালিদাস দেখিলেন, নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহার জয়গানই রঘুবংশের উদ্দেশ্য। কিন্তু নারায়ণ কি বস্তু? যাঁহাকে যোগী ঋষি ধ্যানে পান না, তিনি কি বস্তু? কালিদাস যত বড় মহাকবিই হউন, তাঁহার কল্পনা যতই শক্তিশালী হউক, তাঁহার দৃষ্টি যতই প্রখর হউক, তাঁহার প্রতিভা যতই সর্ব্বতোমুখী হউক, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, নারায়ণ কি বস্তু—"ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা" [১৩।৫]—ধারণার অতীত। কিন্তু মানুষের এক বিষম দোষ যে, ঠিক পারুক বা নাই পারুক, তাহারা সব জিনিসেরই মনে মনে একটা ধারণা করিয়া দেয়। যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে নারায়ণ কি বস্তু—তাহার একটা না একটা ধারণা করিয়া লইয়াছে। সে ধারণার মূল এই:—মানুষের যতগুলি সদ্‌গুণ আছে, নারায়ণে সেগুলি সব আছে, কিন্তু তাহার মাত্রা অনেক বেশী। ততদূর মানুষ পৌঁছাইতেই পারে না—তাহাকে সাধু ভাষায় পরাকাষ্ঠা বল, চরম উৎকর্ষ বল, 'চরম' বল, অথবা বৌদ্ধ ভাষায় পারমিতাপ্রাপ্তই বল। তাহা হইলে নারায়ণ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই যে—মানুষের ধারণায় যত রকম সদ্‌গুণ হইতে পারে, সে সবগুলিই নারায়ণে চরম মাত্রায় উঠিয়াছে। বাল্মীকির রামও সেই সকল চরম সদ্‌গুণের আধার। এখন যদি কালিদাস রঘুবংশের রাজাদের মধ্যে এক একজনে এক একটী গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, আর সেইগুলি একত্র করিয়া রামচন্দ্রে পরিষ্কার করিয়া ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে রঘুবংশ—এই প্রকাণ্ড ছবিটী—জ্বলিয়া উঠে। তিনি দিলীপে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, দশরথে সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,—এই সকল গুণরাশি ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিল ও রামচন্দ্রে একত্র মিশিয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বতচূড়ায় পরিণত হইল। রাজাগুলি যেন পিরামিডের ধাপ, রামচন্দ্র যেন সেই পিরামিডের শিখর। পর্ব্বতে দেখা যায়—একদিকে ধাপে ধাপে উঠে, অল্পে অল্পে উচা হইতে থাকে, শিখরে উঠিয়া অপর দিকে একেবারে নামিয়া যায়। একদিকে অল্পে অল্পে চড়াই হয়, আর একদিকে উতরাই অত্যন্ত খাড়া খাড়া থাকে। রঘুবংশে তেমনি দিলীপ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, দশরথ হইতে রামচন্দ্র। তাহার পরই একেবারে নামিয়া গেল। রামচন্দ্রের সদ্‌গুণগুলি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোপ পাইয়া আসিল। চড়াই হইল ১৫ সর্গে, উতরাই হইল ৪ সর্গে। যখন সব গুণগুলি লোপ পাইল, তখন অগ্নিবর্ণ স্ত্রীলোকের নেশায়, মদের নেশায় আত্মহারা হইয়া শেষে রাজযক্ষ্মায় প্রাণ হারাইলেন। এত বড় রঘুবংশে কি পরিণাম হইল? গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রীরা রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।

এক এক রাজায় এক এক গুণের চরম, আর রামচন্দ্রে সকল গুণের চরম। এই রঘুবংশের সূত্র। এই রঘুবংশের "unity of action"। এই রঘুবংশের বীজ। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাণ। এইটুকু বুঝিবামাত্রেই যেন এক নূতন আলোক আসিয়া শুধু যে রঘুবংশকেই উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল, তাহা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, সমস্ত আর্য্য-সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল। ভারতের মনে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিল, ভারতভূমিকে ধন্য করিল, পবিত্র করিল—ভারত নারায়ণের নিজস্ব দেশ হইল।

নারায়ণ
শ্রাবণ, ১৩২৫